বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চিন্তা
(১৯৪৭-১৯৭১)

সুলতানা নিগার চৌধুরী

GIFT

382333

Dhaka University Library

382333

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যায়নপত্র

প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে আমার বর্তমান গবেষণা একটি মৌলিক কাজ এবং এই অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ পূর্বে কোন গ্রন্থ বা সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়নি।

সুলতানা নিগার চৌধুরী ৮.৬.'৯৬ 382333

স্বাক্ষর
সুলতানা নিগার চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
ঢাকা।

৮.৬.৯৬

প্রতিস্বাক্ষর
ডঃ কে, এম, মোহসীন
প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ
ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণা কর্মে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্র ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। উনবিংশ শতাব্দীর যে সম্প্রদায়ভিত্তিক জাতি চিন্তা এবং শতাব্দীর মধ্যভাগে যে অসাম্প্রদায়িক জাতি চিন্তা; উভয়ের উত্থান, বিকাশ ও পরিণতির জন্য যে ঐতিহাসিক উপাদান ক্রিয়াশীল ছিল তার মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার গুরুত্ব সর্বাধিক। এ কারণে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার গতি প্রকৃতি ও পরিবর্তিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিচার বিশ্লেষণে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হয়েছে। এ অঞ্চলের জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জাতীয়তাবাদী চিন্তার গতি প্রকৃতি পরিবর্তনের সহায়ক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ যেমন ধর্মকে আশ্রয় করে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছিল, অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদ তেমন ভাষাকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছিল। ফলে ভাষা সংস্কৃতির উপরও গুরুত্ব দিতে হয়েছে।

বাঙালী জাতি আধুনিক যুগে হঠাৎ করে মধ্যযুগীয় ধর্মাশ্রীত জাতিসত্ত্বাকে আত্মপরিচয়ের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে। আবার ধর্মীয় জাতিসত্ত্বাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের পর ধর্মকে বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক শাশ্বত জাতিসত্ত্বাকে স্বীয় আত্মপরিচয়ের উপাদান হিসেবে বেছে নেয়। বিষয়টি যেমন চমকপ্রদ তেমন কৌতুহল উদ্দীপক। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন আমাকে এই গবেষণায় আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করেছে।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মূলতঃ গ্রন্থাগার ভিত্তিক। ফলে অনেক গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতে হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী, ভারতীয় তথ্য কেন্দ্র, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আমাকে বাধিত করেছেন। গবেষণার জন্য বাংলাদেশ উনয়ন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত ডাটা ও জরিপ ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত সাক্ষাৎকার থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

কোন গবেষণার জন্য বহু ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা আবশ্যক। আমার এ গবেষণা কর্মে যাঁরা সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কে, এম, মোহসীন, যিনি কলা অনুষদের ডীন থাকাকালীন সময়ে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হতে সম্মত হয়েছেন, মনযোগের সঙ্গে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পাঠ করেছেন, প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করেছেন ও নিজস্ব চিন্তা প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। তিনি আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক। আমি এই প্রবীণ, প্রজ্ঞাশীল ও প্রথিতযশা ইতিহাসবিদের কাছে অতিমাত্রায় কৃতজ্ঞ। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোফাখ্খারুল ইসলাম নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ রাবেয়া খানমের সহযোগিতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিনা ছুটিতে গবেষণার অনুমতি প্রদান করে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এছাড়া ইডেন কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন এবং বর্তমান বিভাগীয় প্রধান যথাক্রমে জুলেখা হক ও মাহজুজা খানমকে তাঁদের সাহায্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমার কাজের প্রতি আমার সহকর্মীদের আগ্রহ আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। আমার বাবা, মা, ভাইবোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিরন্তর উৎসাহের গুরুত্ব আমার কাছে অপরিসীম। তাঁদের প্রতি রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ। সর্বোপরি যারা বিভিন্ন সময়ে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, তথ্য ও দলিলপত্র সরবরাহ করে গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
১৯ মে, ১৯৯৬

সুলতানা নিগার চৌধুরী

382333

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

উপক্রমণিকা	:	বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চিন্তা (১৯৪৭-১৯৭১)	২-৭
প্রথম অধ্যায়	:	জাতীয়তাবাদী চিন্তার পটভূমি	৮-৩১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	জাতীয়তাবাদী প্রবণতাসমূহ	৩২-৫৭
তৃতীয় অধ্যায়	:	সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ	৫৮-৮৬
চতুর্থ অধ্যায়	:	দেশবিভাগ উত্তর জাতীয়তাবাদী চিন্তা	৮৭-১১২
পঞ্চম অধ্যায়	:	বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ	১১৩-১৪৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের রাজনৈতিক ধারা	১৪৭-১৭৬
সপ্তম অধ্যায়	:	বাঙালী জাতীয়তাবাদ	১৭৭-২০২
উপসংহার	:		২০৩-২০৯
পরিশিষ্ট	:		২১০-২২৬
দলিল পত্র, রিপোর্ট	:		২২৭-২২৮
গ্রন্থপঞ্জি	:		২২৯-২৩৫
পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী	:		২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

উপক্রমণিকা

বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চিন্তা

(১৯৪৭—১৯৭১)

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের আদর্শ এ অঞ্চলের জনগণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ছিল ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের চেতনা। তখন বাঙালী জাতিসত্ত্বা স্বল্প সময়ের জন্য ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের কাছে পরাজিত হলেও এ সত্ত্বা ধ্বংস না হয়ে থেকে যায় সুপ্ত, নির্লিপ্ত। ভাষাভিত্তিক এ জাতীয়তাবোধের স্রোতধারা বহুকাল থেকে এ অঞ্চলে অতি সন্তর্পণে বহমান ছিল। একই ভাষা ঐতিহ্যের অধিকারী বাঙালী জনগোষ্ঠীকে নিয়ে অখন্ড বাংলার চিন্তা তারই ফসল। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে শুরু হয় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তার পুনর্জাগরণ ; পরবর্তীতে পূর্ব বাংলার জনগণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ।

জাতীয়তাবাদের ভাবধারা আদর্শ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যে যে উপাদানের প্রয়োজন, দক্ষিণ এশিয়ার এ ভূখন্ডের বাংলা ভাষা-ভাষী জনগণের মধ্যে তা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। যেমন একটি নির্দিষ্ট ভাষা, ভূখন্ড, একই ভূখন্ডে অবস্থানরত নির্দিষ্ট ভাষা–ভাষী জনগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা, মনমানসিকতা, সর্বোপরি জনগণের প্রায় অভিন্ন আর্থিক জীবন।

জাতীয়তাবাদের আদর্শের জন্ম স্থান ইউরোপে হলেও পরবর্তীতে এ আদর্শ দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপের জাতীয়তাবাদ আদর্শের পশ্চাতে যেমন ভিন্ন প্রেক্ষিত কাজ করেছে, লক্ষ্যও ছিল তেমন ভিন্ন। তখনকার ইউরোপের সাধারণ মানুষ সামান্ততন্ত্রের যাতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। সামন্ততন্ত্রের প্রতি জনগণের সীমাহীন ক্ষোভ এবং ঘৃণাকে বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণী সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগায় তাদের শ্রেণী স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে। বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অভিপ্রায়ে জাতীয়তাবাদ আদর্শ সামনে তুলে ধরে। সুতরাং জাতীয়তাবাদ সেখানে পুঁজিবাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

উনিশ শতকে এ উপমহাদেশে ধর্মভিত্তিক যে জাতীয় চেতনা দেখা যায় তার মূলেও ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ। অখন্ড ভারতে হিন্দু বুর্জোয়াদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়টেকা অসম্ভব ভেবেই বিকাশোন্মুখ মুসলিম বুর্জোয়া শ্রেণী পরবর্তীতে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের জোয়ার তুলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে। বাঙালী মুসলমান সেই জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাঙালী উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ অবাঙালী বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক ব্যাহত হতে থাকে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মোহ ভেঙ্গে যায়। অবাঙালী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে এবং শোষণ-শাসনের পথ নিরাপদ করার জন্য বাঙালীর ভাষা সংস্কৃতির উপর পরিকল্পিত আক্রমণ চালায়।

মেকিয়েভেলীর মতে কোন জাতিকে পদানত করতে হলে প্রথমে সে জাতির মাতৃভাষাকে ধ্বংস করা প্রয়োজন। সাথে সাথে প্রয়োজন শাসকগোষ্ঠীর ভাষার ব্যাপক প্রচলন। পাকিস্তানের পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী শাসকগোষ্ঠী সে পথেই অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু গোখলের বিখ্যাত উক্তি "What Bengal thinks to-day, the rest of India would think tomorrow"[১] সত্য বলে প্রমাণিত হয়। বাঙালী তার সহজাত বুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টির বলে পাকিস্তানী শাসক শ্রেণীর অভিপ্রায় আঁচ করতে পারে। এ কারণে আক্রমণ ভাষা সংস্কৃতির উপর হলেও আড়ালে লুকিয়ে রাখা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক শোষণের বিষদাঁত বিচক্ষণ বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টি এড়ায়নি।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি সামনে আসার ফলে বাংলা ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালীর ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। পরবর্তী সময় এই ভাষা আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ ছাত্রসমাজ এ আন্দোলন গড়ে তোলে। আশাহত সাধারণ বাঙালী জনগোষ্ঠী, যারা ভেবেছিল পাকিস্তান হলে তাদের ভাগ্য খুলে যাবে তারাও তীব্র শোষণের শিকার হয়ে আন্দোলনে সামিল হতে থাকে। এভাবে ভাষা আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে

১। বাংলায়ই প্রথম জাতীয়তাবাদী চেতনার সূত্রপাত হয় এবং বাঙালীরাই জাতীয়তাবাদী আদর্শ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে দেয়। বৃটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিপ্লব বাংলাদেশ থেকে আরম্ভ হয়। একারণে গোপালকৃষ্ণ গোখলে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য ঐতিহাসিক রচিত *'বাংলাদেশের ইতিহাস'* গ্রন্থের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় এই মন্তব্যের উল্লেখ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রূপান্তরিত হয়। পরবর্তী সময়ে বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়। মূলতঃ পূর্ব পাকিস্তান হয়ে পড়ে পাকিস্তানের উপনিবেশ। সুতরাং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ধীরে ধীরে বাঙালীর শোষণ শাসন থেকে মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে থাকে। বাঙালী জাতীয়তাবাদের চেতনা রূপ নেয় পাকিস্তানের উপনিবেশ থেকে মুক্তিলাভের আদর্শ হিসেবে। সর্বসাধারণ এই আন্দোলনে অংশ নিলেও নেতৃত্ব থাকে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে। সে কারণে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আত্মত্যাগের ফল ভোগ করে এক বিশেষ শ্রেণী।

ব্লাউটের মতে "জাতীয় সংগ্রাম যদি হয় একটি স্বাধীন এবং উন্নত দেশে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় সে জাতীয়তাবাদ মূলতঃ বুর্জোয়া শ্রেণীর মতাদর্শ হিসেবেই কাজ করে, আর যদি তা তৃতীয় বিশ্বের কোন অনুন্নত দেশের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়, তাহলে জাতীয়তাবাদ শুধু সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের মতাদর্শগত হাতিয়ার হিসেবেই কাজ করেনা, তা দেশের কৃষক শ্রমিকসহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মুক্তি সংগ্রামের মতাদর্শ হিসেবে কাজ করে, ফলে জাতীয় সংগ্রাম হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিবাদ বিরোধী তথা জাতীয় শোষণ ও শ্রেণী শোষণ বিরোধী এক ব্যাপক শ্রেণী সংগ্রাম।"[২]

উপরোক্ত মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ভাষা আন্দোলনকে আশ্রয় করে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তা পরবর্তী সময়ে জাতীয় সংগ্রাম তথা শ্রেণী সংগ্রামে রূপ নিয়ে ছিল। তবে ব্লাউটের মতের পরবর্তী অংশ অর্থাৎ যাতে তিনি বলেছেন এই জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব যদি থাকে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে তাহলে তারা বিরাজমান শোষণমূলক রাষ্ট্রকাঠামোকে ধ্বংস করে না। এই কাঠামো তারা রক্ষা করে। পরবর্তী সময় এই দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীকে নির্যাতন এবং শোষণ করার কাজে রাষ্ট্রকাঠামো ব্যবহার করে। এই বক্তব্যের প্রতিফলন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ঘটেছে। বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে থাকার দরুণ শোষণ মুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব হয় নাই বরং দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর অগ্রযাত্রার পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে বাঙালীর ধর্মীয় অনুভূতির স্পর্শকাতরতা এবং সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে পুঞ্জিভূত ক্ষোভকে হাতিয়ার করে এম, এ, জিন্নাহ এবং তাঁর অনুসারীরা কৌশলে পূর্ব বাংলা ও আসামের একাংশকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আবদ্ধ করে ফেলেন। পাকিস্তানে বাঙালীর আত্মপরিচয় বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে তার গায়ে সেঁটে দেয়া হয় পাকিস্তানী সাইনবোর্ড। বাঙালীকে সব দিক থেকে শোষণ-শাসনের পথ করা হয় উন্মুক্ত। প্রকাশ্যে আক্রমণ করা হয় তার ভাষা-সংস্কৃতির ওপর। ফলে সচেতন বাঙালী স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিজের জাতিসত্ত্বা এবং নব্য সৃষ্ট রাষ্ট্রে তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

বাঙালী জাতির আরেক অংশ দিল্লীর শোষণ-শাসন মেনে নিয়ে ভারতীয় হয়ে স্বীয় বাঙালী সত্ত্বাকে অবলুপ্ত করে। বাঙালী জাতি এক বার আবেগপ্রবণ হলে সে তীব্র বেগে লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হতে থাকে। ফলে আটচল্লিশে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বাঙালীর আবেগ বায়ান্নের মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে ফেটে পড়ে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তির ওপর সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ ঘটে রাষ্ট্রভাষা বাংলা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। যে ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালী জাতির সৃষ্টি সেই ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বাঙালীর জাতীয় চেতনার উৎপত্তি। এই জাতীয় চেতনারই ফসল চুয়ান্নের নির্বাচন, বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন, ছেষট্টির ছয়দফা আন্দোলন। এই চেতনা উনসত্তরে বাঙালীকে করেছে বিদ্রোহী। সত্তরে নির্বাচনের রায়ও ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদের পক্ষে। একাত্তরের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট রাষ্ট্র বাংলাদেশ, বাঙালীর স্বাধীন আবাসভূমি বাঙালীর তীব্র জাতীয় চেতনার উদাহরণ। এভাবে ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে এবং সৃষ্টি হয় জনসংখ্যার দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্র গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের।

২। ব্লাউট শ্রেণী সংগ্রাম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। অনেক লেখক, গবেষক মনে করেন জাতীয়তাবাদ একটি বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। মার্কসবাদী ধারণায় প্রকৃত পক্ষে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নাই। সকল মুক্তিসংগ্রামই শ্রেণী সংগ্রামের আওতাধীন এক ও অভিন্ন মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। ব্লাউট তাঁর রচিত *"The National Question-Decolonising The theory of Nationalism"* গ্রন্থের ১২,১৩ পৃষ্ঠায় এই মতামত ব্যক্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যার বিবরণ

বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, বিকাশ ও পরিপূর্ণতা লাভে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিঃসন্দেহে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে। ভাষা, সাহিত্য, সাংস্কৃতি বাঙালী জাতীয়তাবাদের বাহন, চালিকা শক্তি ও অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে প্রতীয়মান। বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা কি সে বিষয়ে নতুন করে প্রশ্ন তোলে: ভাষা আন্দোলন না হলে এই জনপদ স্বাধীন জাতিসত্ত্বার মালিক হতে পারতো কি? বিকাশমান জাতীয়তাবাদের হাত ধরে সার্বভৌম ভূখণ্ডে বসবাসরত বাঙালীরা পৃথিবীতে একটি অভিন্ন জাতি হিসেবে পরিচিত লাভে সক্ষম হতো কি? ভাষা আন্দোলন কেন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল? ভাষা আন্দোলন না হলে বাঙালীদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা কি বিলুপ্ত হতো? বাঙালীর অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য কি ভাষা আন্দোলনের শুভফল না এটি বাঙালী চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। এই অসাম্প্রদায়িক চেতনা বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিকাশে কতটুকু সহায়ক ছিল?

কেন এ অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সমাজ ও জনগণ প্রতিটি আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের চিন্তা চেতনা এবং আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হলেন? কেন জাতীয়তাবাদ প্রশ্নটি সব ফেলে সামনে এসে দাঁড়াল? এই জাতীয়তাবাদের চিন্তার পেছনে রাজনৈতিক বঞ্চনা অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামাজিক অবমাননার ক্ষোভ কিভাবে এবং কতটুকু সহায়তা করেছে তা আলোচনার প্রয়োজন। কোন্ ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করার জন্য পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ জাতীয়তাবাদের আদর্শের পতাকা উর্ধ্বে তুলে দৃঢ় ভাবে এগিয়ে গেছে? বাঙালী জাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত অতীতের সেই ষড়যন্ত্রের ইতিহাস উন্মুক্ত করা প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন কিভাবে অধিকার বঞ্চিত বাঙালীর জাতীয়তাবাদের চেতনা একটি জাতিসত্ত্বাভিত্তিক রাষ্ট্রের জন্ম দিল। জানা প্রয়োজন কোন্ মনমানসিকতার কারণে এই ভূখন্ডের জনগণ দ্বিজাতীয়তত্ত্বের আদর্শে সৃষ্ট রাষ্ট্রের বয়স এক বছর পূর্ণ না হতেই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ভাষা সংস্কৃতি ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত এই ভূখন্ডে যে জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগ্রত হয়েছিল এচেতনার বিকাশ এবং পরিপূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগঠনের কি ভূমিকা ছিল। বাঙালীর আত্মপরিচয় উদ্ধারের সংগ্রামে রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য শ্রেণীর কাছে জাতি কতটুকু ঋণী? তারাই বা এক্ষেত্রে কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছেন? এদেশের জনগণের জাতিসত্ত্বা ধ্বংসের সুদূর প্রসারী চক্রান্তের অতীত ইতিহাস উন্মোচন, বাঙালীর দুই যুগের সংগ্রামী ইতিহাস পর্যালোচনা; সর্বোপরি সংগ্রামী জনতার স্বীয় জাতিসত্ত্বার স্বকীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা—বিস্তারিত গবেষণার মাধ্যমেই এসব বহু মাত্রিক প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয়া সম্ভব।

গবেষণার উদ্দেশ্য

জাতিসত্ত্বা ভিত্তিক রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে বাঙালী জাতীয়তাবাদ মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তাছাড়া ভাষা আন্দোলনের অসাম্প্রদায়িক পথে যাত্রা প্রমাণ করে বাঙালী জাতীয়তাবাদ মধ্যযুগের চিন্তার বদ্ধাত্ব থেকে মুক্ত ছিল। এতে মুসলিম স্বাতন্ত্রবাদের মানসিকতা ঠাঁই পায়নি। অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূল বন্ধনই ছিল ধর্মের। ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে যে বাঙালী মুসলমানের সবচেয়ে বেশী অবদান ছিল, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী কোন্ অবস্থার পটভূমিতে এবং কেন রাষ্ট্রীয় চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাতি চেতনায় সম্পৃক্ত হতে থাকে, তা এখনও গবেষণার বিষয়বস্তু। সে পটভূমির সুবিশাল প্রেক্ষাপট নিয়ে তেমন কোন গবেষণা হয়নি বললেই চলে। বাঙালীর আত্মপরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা জরুরী।

মধ্যযুগীয় ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত বাঙালী পরবর্তীতে কিভাবে জাতিকে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল সে বিষয়ে নিরীক্ষাধর্মী বিশ্লেষণ করে তথ্য নির্ভর ইতিহাস রচনা প্রয়োজন। আত্মরক্ষার্থে বাঙালীর অসাম্প্রদায়িক পথে অগ্রযাত্রা সঠিক ছিল। আজকের বাঙালী ও বাংলাদেশ তার প্রমাণ। বাঙালী পরিচয় ভাষা ভিত্তিক। বাংলা ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী বাঙালীর এ সহজ সত্য পরিচয়টি ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙালী অসাম্প্রদায়িক পথে যাত্রা শুভ ছিল, সঠিক ছিল এ সত্য উদঘাটনের সময় উপস্থিত।

যেহেতু ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশ সেহেতু ১৯৪৭-৭১ সাল পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন দিক এবং আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পটভূটি অনিবার্য বিষয় বলে বিবেচিত হতে বাধ্য, বিবেচিত হতে বাধ্য অন্যান্য আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসও। তাছাড়া বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব পরিষ্কার করতে হলে বাঙালী জাতির অভিন্ন সত্ত্বা, অভিন্ন ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে তার সম্ভাব্য সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন। কোন্ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষিতে বাঙালী জাতি এক অভিন্ন সত্ত্বায় রূপান্তরিত হলো তা উদঘাটন করা প্রয়োজন।

প্রাচীনকালে ভাষা সংস্কৃতির ঐক্য কিভাবে মধ্যযুগে এনেছিল রাজনেতিক ঐক্য। সমগ্র বাঙালী হলো একজাতি ভুক্ত। বাংলা পরিণত হলো একটি রাষ্ট্রে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বহিরাগত তুর্কী সুলতান কর্তৃক সম্পাদিত এই অভূতপূর্ব ঘটনায় শুধু ঐক্যবদ্ধ বাংলা রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠিত হলো না সঙ্গে বাঙালী জাতিসত্ত্বার ঐক্যের বীজও উপ্ত হলো। দৃঢ় হলো বাংলা ভাষার বন্ধন। কেননা বৌদ্ধ আমলে সৃষ্ট বাংলা ভাষা এ সময়ে হিন্দু মুসলিম উভয়ের কাছে সমাদৃত হয়। সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় ভয়ভীতি উপেক্ষা করে বাংলা ভাষা সাহিত্য চর্চায় নিয়োজিত হলো হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোক।

আবার উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে উচ্চ শিক্ষিত এবং পশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার প্রভাবে প্রভাবিত উচ্চ বর্ণের বাঙালী হিন্দু এবং অভিজাত মুসলমানগণ মুক্ত চিন্তার অধিকারী না হয়ে কেন মধ্যযুগীয় ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হলো, কেন হয়ে উঠল ধর্মীয় জাতীয়তাবাদমুখী, কেন বাঙালী হিন্দু হয়ে উঠল হিন্দুস্থান ভিত্তিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। কেন বাঙালী মুসলমান স্বাতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী হয়ে নিজেকে ঠেলে দিল পাকিস্তানের দ্বিজাতিতত্ত্বের পথে—ইতিহাসের নিরিখে তারও বিশ্লেষণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অথচ মুসলিম স্বাতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে রচিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালী মুসলমানের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের মোহ ভঙ্গ হতে এক বছরও সময় লাগেনি। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বের ভাষা বিতর্কই পাকিস্তান সৃষ্টির পরবর্তী সময়ে বাঙালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর মোহমুক্তি ঘটায়। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি সে সময় অগ্রাধিকার পাওয়ার কারণে ভাষা আন্দোলনকে আশ্রয় করে পূর্ব বাংলার আশাহত জনগণের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ফেটে পড়লেও এর পেছনে মূল কারণ কি ছিল? এই কারণগুলি উদঘাটন করা এই গবেষণার লক্ষ্য। তাছাড়া বাঙালী জাতীয়তাবাদের চিন্তার উন্মেষের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কি পরিমাণ ভূমিকা রেখেছিল তা নির্ণয় করা এবং অন্যান্য আন্দোলনে এই জাতীয়তাবাদের চেতনার অপরিহার্যতা প্রমাণ করাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য। ভাষা আন্দোলন যেমন জাতীয় ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি তেমন জাতীয়বাদের চিন্তার ফসল জাতিসত্ত্বা ভিত্তিক রাষ্ট্র ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি। পাকিস্তানের শাসকবৃন্দের চক্রান্ত, সাংস্কৃতিক সংঘাতের স্বরূপ উদঘাটন, পূর্ব বাংলার প্রতি তাদের বৈষম্যমূলক আচরণ; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বঞ্চনার সঠিক ইতিহাস উন্মোচন এই গবেষণার বিষয়। তাছাড়া এই সব শোষণ বঞ্চনার প্রেক্ষিতে কিভাবে এ অঞ্চলের জনগণ ক্রমশ জাতীয়তাবাদের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং জাতীয়তাবাদের চেতনাকে মুক্তির আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধিকার, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে পা বাড়ায় তার গবেষণামূলক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের চিন্তা সম্পর্কে গবেষণামূলক পর্যালোচনা করতে গেলে প্রথমে এই অঞ্চলের জনগণের আত্মপরিচয় উদঘাটন প্রয়োজন। এছাড়া ১৯৪৭ সালে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের পেছনে যে জাতীয়তাবাদ কাজ করেছে তার উদ্ভবের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ, পরবর্তীতে এর পরিণতি আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রয়োজন ১৯৪৮ তেকে ১৯৫২ সালের জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ; এর পরিণতি পর্যালোচনা। সর্বোপরি বায়ান্নর পর থেকে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের স্তরে স্তরে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক শক্তিসমূহ সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা উপস্থিত করাও এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

বাংলা-বাঙালী, বাংলা ভাষাও বাঙালীর আত্মপরিচয়

'আজ বাংলার ইতিহাসের উপকরণ পরিমাণে মুষ্টিমেয়। কিন্তু মুষ্টি হইলেও ইহা ধূলিমুষ্টি নহে, স্বর্ণ মুষ্টি'[৩] ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাঙালীর ইতিহাস সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসের অনেকাংশই এখনও কালো চাদরে ঢাকা পড়ে আছে। তার মতে 'আজ ইতিহাসের এক টুকরা মাত্র আমরা জানি কিন্তু হীরার টুকরার মতই ইহার দীপ্তি অতীতের অন্ধকার উজ্জ্বল করিয়াছে।'[৪]

---

৩. বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার এ মন্তব্য করেন। *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীনযুগ)* পৃষ্ঠা ২৯৮।

৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার উক্ত গ্রন্থের একই পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধশালী। প্রমাণস্বরূপ আবিষ্কৃত পুরাতাত্ত্বিক নির্দেশনসমূহ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। যতটুকু নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেগুলো অতীতের উজ্জ্বল ইতিহাসের প্রমাণ বহন করে এবং অনাবিষ্কৃত অজানা ইতিহাসকে আলোকিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা প্রত্মতাত্ত্বিক নির্দশনগুলি হীরার দ্যুতি ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করছে এবং প্রমাণ করছে, এই অঞ্চলের আদিবাসীরা অর্থাৎ বাঙালীর পূর্ব পুরুষরাও এক উন্নতমানের সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা ছিল। বাঙালীর পূর্ব পুরুষ কত হাজার বছর পূর্বে বাংলা ভূখন্ডে আগমন করে ছিল, সে হিসাব আজো অজানা। তবে যে, প্রত্মতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গেছে তা থেকে জানা অসম্ভব নয়, যে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে তারা উন্নত সভ্যতা সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করেছে। এই সভ্য সংস্কৃতবান জাতিকে আদি বাঙালী হিসেবে গণ্য করা এবং এ নামে অভিহিত করা অসঙ্গত হবে না। খৃষ্টপূর্ব যুগের এই আদি বাঙালীদের একটি রাষ্ট্রের উল্লেখ পাওয়া যায় গ্রীক এবং ল্যাটিন লেখকদের লেখায় তারা রাষ্ট্রটিকে 'গন্ডরিডাই 'বা' গঙ্গরিডই' বলে উল্লেখ করেছেন।

তুর্কীদের আগমনের আগে পর্যন্ত আদি বাঙালী জনগোষ্ঠীর কোন নির্দিষ্ট নামের অখন্ড আবাসভূমি ছিল না। প্রাচীনকাল থেকে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশের নাম সীমা যেমন যুগে যুগে বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের কারণে সমগ্র বাংলার বিস্তৃতি বা সীমা যথাযথভাবে চিহ্নিত করাও সম্ভব হয়নি। তবু প্রাচীনকালে অর্থাৎ হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে বাংলার বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নামের থেকে এই সমস্ত অঞ্চলের সাধারণ সীমানা বিস্তৃতি অনুমান করা যায়। আধুনিককালের বাংলার বিভিন্ন অংশের সাথে মিলিয়ে বলা যায় : ১। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব বাংলা—বঙ্গ সমতট বাঙ্গাল ও বাংলা ২। উত্তর ও পশ্চিম বাংলার কিছু অংশ—গৌড় ৩। উত্তর বাংলা—বরেন্দ্র, লক্ষ্মণাবতী ও পুন্ড্রবর্ধন ৪। পশ্চিম বাংলা—রাঢ়।

আরণ্যক ব্রাহ্মণে এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থসমূহে বঙ্গ জনপদের নাম উল্লেখ আছে। বঙ্গ বা বাংলা বলতে মুসলিম শাসক এবং ঐতিহাসিকগণ মুসলিম শাসন আমলের শুরুর দিকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাকে চিহ্নিত করেছেন। প্রাচীনকালেও বুঝাতো শুধুমাত্র সমতট অঞ্চলকে যা হচ্ছে বর্তমানকালের ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম বিভাগ। সমতট অঞ্চলের কেন্দ্রভূমি ছিল বর্তমানের ঢাকা-ফরিদপুর জেলা। বাঙালী জনগোষ্ঠী যারা 'বাঙ্গাল' নামে পরিচিত ছিল তারাই ঐ ভূখন্ডে প্রথম বসতি স্থাপন করে। পরবর্তী সময়ে জনগোষ্ঠীর নাম অনুসারেই দেশটির নাম হয়। এ নামটিকে সামনে রেখেই এভাবেই কালক্রমে বাঙ্গাল-বাঙ্গালাহ-বাংলা বাংলাদেশ এই নামে শেষ পরিণতি লাভ করে।[৫]

এ ভূখন্ডের প্রাচীন অঞ্চলগুলোতে নগর সভ্যতার প্রমাণ থাকলেও এই অঞ্চলগুলি একত্রিত করে একটি অখন্ড রাষ্ট্রে রূপ দেয়া সম্ভব হয়নি। এটি সম্ভব হয় ১৩৪২ সালে তুর্কী সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ যখন সামরিক শক্তিবলে এক কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শক্তির অধীনে অখন্ড বাংলা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শাহ-ই-বাঙ্গালাহ ও সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ নাম গ্রহণ করে সর্বপ্রথম স্বাধীন সার্বভৌম ঐক্যবদ্ধ স্বতন্ত্র বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকে বাংলা ভাষা-ভাষী ভূ-ভাগ যেমন বাঙ্গালা নামে পরিচিত হতে লাগল তেমন অধিবাসীরা বাঙালী এই পরিচিতি লাভ করে। ইংরেজ উপনিবেশ আমলে এই অঞ্চল ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ হিসেবে গণ্য হতে থাকে এই সময় প্রদেশটি ইংরেজীতে বেঙ্গল, বাংলা ভাষায় বাংলা, উভয় নামেই অভিহিত হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে খন্ডিত ভারতে বাংলা ও দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি পশ্চিম বাংলা, অপরটি পূর্ব বাংলা। পূর্ব বাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা পরিণত হয় বাংলাদেশে।

বাঙালীর আদি পুরুষের এ অঞ্চলে আগমন বসবাসের কাল নির্ণয় যেমন কঠিন, তেমন তাদের আদি পুরুষের পরিচয় সম্পর্কেও সংশয় দূর করা কঠিন, তবু আর্য জনগোষ্ঠীর আগমন পূর্বে এই অঞ্চলে বসবাসরত জাতিগুলির ভাষাগত ঐক্যের উপর নির্ভর করে এদেরকে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক বা অষ্ট্রীক জাত ভুক্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ এদেরকে নিষাদ জাতি বলেও অভিহিত করেছেন। এই জনগোষ্ঠীর সাথে মংগলীয়, ককেশীয় ইত্যাদি এবং পরবর্তী সময়ে তুর্কী মোঘলের শোণিত স্রোতে মিশ্রিত হয়ে বাঙালী জাতি এক সংকর জাতিতে পরিণত হয়েছে।

বাঙালী জাতির মতই বাংলা ভাষার জন্ম কালরূপ, বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা কঠিন। পণ্ডিতগণের মতে পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। যদিও এর জন্ম প্রক্রিয়া শুরু হয় আরো আগে। বৌদ্ধ পাল রাজাদের শাসনামল বাংলা ভাষার সৃষ্টির কাল হিসেবে চিহ্নিত। শুধু ভাষা নয় এই ভাষাকে আশ্রয় করে এসময় থেকেই বাংলায় নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি রূপ নিতে থাকে। সমস্ত বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলকে একত্রিত করে বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হলেও পাল যুগ থেকেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র দূর হয়ে ঐক্য গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বহিরাগত তুর্কী সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ রাজনৈতিক ঐক্য

---

৫. সম্রাট আকবরের ইতিহাস লেখক আবুল ফজল বাঙ্গলা নামের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন এই দেশের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ। প্রাচীনকালে এ দেশের রাজারা ১০ গজ উঁচু ২০ গজ প্রশস্ত আল নির্মাণ করতেন। এ থেকেই বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি হয়েছে। মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য রচিত *বাংলাদেশের ইতিহাস* গ্রন্থের ৪ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ আছে।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি করে সমগ্র বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের নাম দেন বাঙ্গালাহ। ফলে ইতিহাসে প্রথম বারের মত বাঙালীর রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আদি বাঙালীরা এভাবেই বহিঃশক্তির সহায়তায় মধ্যযুগে একটি অভিন্ন জাতিতে রূপান্তরিত হয়। এভাবেই বাঙালীর জাতিসত্ত্বা বিকাশের জন্য একটি সার্বভৌম স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণ হয়।

মধ্যযুগের বাঙ্গালাহ বা বাংলাদেশের নাম অনুসারে এ জাতির ভাষার নাম হয় বাংলা। বাংলা ভাষাই পরবর্তী সময় বাঙালী জাতীয়তাবাদের পথ প্রদর্শক এবং রক্ষক হয়ে উঠে। আধুনিক যুগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক উৎপাটিত বাঙালী জাতীয়তাবাদ বৃক্ষটি তারই সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। সেটি সম্ভব হয় ভাষা আন্দোলনকে ভিত্তি করেই। এভাবে বাংলা ভাষা বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিকাশের ভিত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

এ গবেষণা কাজটি মূলতঃ গ্রন্থাগার ভিত্তিক। জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আন্দোলন বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য সমৃদ্ধ নিবন্ধ ও পুস্তক পর্যালোচনা এ প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত। বাঙালী জাতির স্বরূপ উন্মোচন ও উৎসের সন্ধানে তথ্য সংগ্রহের জন্য সমাজের নানা শ্রেণীর ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহের জন্য একটি জরিপ কাজ চালানো হয়। আলোচ্য বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার জন্য খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণা কাজটি সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সামাজিক জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

বাঙালীর দীর্ঘকালের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করে যে, সত্যটি উদঘাটিত হয়েছে তা হলো ভাষা আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে একটি সংকীর্ণ সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলেও মূলতঃ এটা ছিল বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আন্দোলন। বাঙালী মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণ আকাংখা জাগ্রত হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এ ব্যবস্থা স্থায়ী না হওয়ায় হতাশ বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভের ইচ্ছা স্তিমিত হতে থাকে। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রশ্নে তা আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে পূর্ব বাংলার বাঙালীরা সেই অধিকার লাভের সম্ভাবনা দেখতে পায়। কিন্তু লাহোর প্রস্তাবে প্রস্তাবিত পাকিস্তান আর জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের ফসল পাকিস্তান একছিল না। ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির পর কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্য নীতি তাদের মনে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভের আকাংখার জন্ম দেয়।

বাঙালী যুগ যুগ ধরে বিদেশীদের দ্বারা শোষিত শাসিত হয়েছে। জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধভাবে তারা কখনও রুখে দাঁড়ায়নি। বিদ্রোহ হয়েছে, প্রতিরোধ হয়েছে—খন্ডিতভাবে বিচ্ছিন্নভাবে। কোন আন্দোলন বা বিদ্রোহ সমগ্র বাঙালী জাতির শেকড়ে নাড়া দিতে পারেনি, কখনও স্বতন্ত্র জাতি চেতনার উদয় হয়নি। বাঙালী প্রথম বারের মত ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার জাতিসত্ত্বার সমন্বিত রূপ আবিষ্কার করে। প্রথম বারের মত বাঙালী বুঝতে পারে বাংলা ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্র একটি জাতি। এই জাতীয়তাবোধকে সামনে রেখে জাতিসত্ত্বাভিত্তিক একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দিকে এগিয়ে চলে বাঙালীর সংগ্রাম।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক শোষণ চলেছে যুগ যুগ ধরে সেখানে আর্থ-সামাজিক বিকাশও ঘটে অসমভাবে। ফলে ঐ সমস্ত দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্ষমতা অবসানের পরও তাদের শোষিত হতে হয় অপেক্ষাকৃত উন্নত এলাকার হাতে। পাকিস্তানেও এর ব্যতিক্রম হয় নাই। অপেক্ষাকৃত উন্নত পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শোষিত হতে থাকে। অবাঙালী পুঁজিপতিদের কল-কারখানায় বাঙালী শ্রমিক ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত হয়। বিকাশাকাংখী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয় অবাঙালী বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক। পূর্ব বাংলার যে শিক্ষিত পেশাজীবী শ্রেণী গড়ে ওঠে সেখানে তাদের চেয়ে অবাঙালীদের বেশী প্রাধান্য দেয়া হতে থাকে। যে পাট রপ্তানি করে পাকিস্তানের অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল, সেই পাট চাষীরা হয় তীব্র শোষণের শিকার। এই কৃষক পরিবার থেকে আগত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ছাত্র সমাজ তাদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে। ফলে পশ্চিম অঞ্চলের শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ভাষাকে কেন্দ্র করে সেই বিক্ষোভ আন্দোলনে রূপ নেয়। প্রথম দিকে ব্যাপকতা না থাকলেও পরের দিকে ব্যাপকহারে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের অংশগ্রহণের ফলে ভাষা আন্দোলন এক গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এই আন্দোলনে জাতীয় ঐক্যের আদর্শকে সামনে রেখে বাঙালী একটির পর একটি আন্দোলন করেছে। জাতিকে ঠেলে দিয়েছে জাতিসত্ত্বাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের পথে। এভাবে আবিরাম সংগ্রাম আর ত্যাগের বিনিময়ে বাঙালী পেয়েছে তার ঠিকানা, জন্ম হয়েছে বাংলাদেশের।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
জাতীয়তাবাদী চিন্তার পটভূমি

"The Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs, literatures. They neither intermarry nor interdine together and indeed, they belong to two different civilisations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their outlooks on life are different.... To yoke together such nations under a single state must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be built up for the government of such a state."[১]

১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সপ্তবিংশতিতম অধিবেশনে মুসলিম জাতির স্বতন্ত্র সত্ত্বা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে যেয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। তাঁর এ বক্তব্যের আলোকে প্রস্তুত লাহোর প্রস্তাব, উক্ত অধিবেশনে পাশ করা হয়। এই প্রস্তাব যেমন ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তার ফসল দ্বিজাতিতত্ত্বের বিকাশের পথ সুগম করে, তেমন এই তত্ত্বের বাস্তবায়ন লক্ষ্যে মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস ভূমির কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে। তবে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিকাশ এবং বাস্তবায়ন জিন্নাহ কর্তৃক হলেও এর উদ্ভাবক তিনি ছিলেন না। এই আদর্শের উদ্ভাবক সৈয়দ আহমদ খান, বাস্তবায়নের পথনির্দেশক মূলতঃ ছিলেন আবদুল লতিফ, আমীর আলী, কবি আল্লামা ইকবাল, কেমব্রিজ গ্রুপ ছাত্র সমাজ। ১৯৩০ সালে দার্শনিক ইকবাল সর্বদিক থেকে ভারতীয় মুসলিমদের পৃথক সত্ত্বার কথা উল্লেখ করে, তাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের কথা ব্যক্ত করতে যেয়ে বলেন 'উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের নিয়ে সুসংহত রাষ্ট্র গঠন করাই আমার মতে মুসলমানদের চূড়ান্ত নিয়তি (final destiny)।'[২]

এর কয়েক বছর পর ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলীর নেতৃত্বে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 'Now or Never' নামক পুস্তকে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে উত্তর-পশ্চিম ভারতকে বিভক্ত করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ইকবাল এবং কেমব্রিজ গ্রুপ ছাত্রদের দাবীর প্রতি মুসলিম লীগ নেতাদের মনযোগ না থাকলেও ১৯৩৭ সালে, নির্বাচন উত্তরকালে দ্বিজাতিতত্ত্ব ও তার প্রয়োগের প্রশ্নটি দ্রুত সামনে চলে আসে।[৩] নেতারাও এই আদর্শকে আশ্রয় করে ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করার বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত চল্লিশ সালের লাহোর প্রস্তাব এই আদর্শ বাস্তবায়নের মাইল ফলক হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে যায়।

মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে দ্বিজাতিতত্ত্বের আইন সম্মত স্বীকৃতির দলিল, লাহোর প্রস্তাব যা পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির ভিত্তি হিসাবে কাজে লাগানো হয়েছিল তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

"That is the considered view of this session of the All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles viz, that geographically contiguoues units are demarcated into regious which should be so constituted with such territorial adjustments as may be necessary, that the area in which the Muslims are numerically in a majority, as in the North-Western and Eastern Zones of India should be grouped to constitute independent states in which the constituted units shall be autonomous and sovereign.

That adequate effective and mandatory safeguard, should be specifically provided in the constitution for minorities in the units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them.

That this session further authorises the Working Committe to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles providing for the assumption finally by the respective regions of all powers such as defence, external affairs, communications, customs and such other matters as may be necessary."[4]

Dhaka University Institutional Repository

একথা অনিস্বীকার্য যে, চল্লিশে জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষে দৃঢ় সমর্থন পুষ্ট বক্তব্যের ফলে এবং তাঁরই নেতৃত্বের গুণে এই আদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং জন্ম নেয় তীব্র মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার। যার ফলশ্রুতিতে সাতচল্লিশে দ্বিখন্ডিত হয় ভারত উপমহাদেশ। হিন্দু-মুসলমান দুই জাতির জন্য সৃষ্টি হয় দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রদ্বয়ের জন্মের পিছনে যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের চেতনা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আদর্শ কাজ করেছিল তার জন্ম একদিনে হয় নাই; এর রয়েছে সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস।

শতশত বছর পাশাপাশি বাস করার ফলে যে হিন্দু-মুসলিম, পরস্পরের ধর্মীয় চেতনার সংকীর্ণতা সম্পর্কে সচেতন ছিল না, অথচ তারাই সাতচল্লিশে এসে কেন ধর্মভিত্তিক পশ্চাদমুখী জাতীয়তাবাদের জোয়ারে গা ভাসিয়ে ধর্মভিত্তিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করেছিল, আজো তা ঐতিহাসিকদের বিস্ময়। বাংলায় মুসলিম শাসনকালে হিন্দু-মুসলিম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমৃদ্ধ করেছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। অসাম্প্রদায়িক চেতনার ছোঁয়া লেগেছিল এ অঞ্চলের সংস্কৃতিতে। পাশাপাশি প্রতিবেশী হিসেবে একসাথে বাস করেছে, একসাথে কাজ করেছে ক্ষেতে খামারে। উৎজ্জাপন করেছে পরস্পরের ধর্মীয় পালাপার্বণ উৎসব। নবাবী শাসন আমলেও এ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ভাটা পড়েনি। অথচ এরই মধ্যে এমন কি ঐতিহাসিক উপাদানের উদ্ভব ঘটেছিল, যা সবার অলক্ষ্যে এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিতে ফাঁটল ধরিয়ে ছিল।

ঐতিহাসিকদের মতে এই অঞ্চলে বৃটিশ পুঁজির উপস্থিতি শোষণ প্রক্রিয়া এই পরিবর্তনের মূল কারণ। মার্কস যেমন এশিয়া উৎপাদন রীতিতে স্থবির এই অঞ্চলের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলোর অর্থনীতি সচল করার জন্য বাইরের এক ধাক্কার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন এবং যে ধাক্কা এসেছিল বৃটিশ পুঁজির মাধ্যমে। মার্কসের সে ধাক্কা শুধু স্থবির এশীয় উৎপাদন রীতিতেই পরিবর্তন আনেনি, পরিবর্তন এনেছিল সমাজ জীবনে এবং এ অঞ্চলের রাজনীতিতেও। এই পরিবর্তনের হাওয়া অতি ধীর গতিতে বয়ে গিয়েছিল এ অঞ্চলের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সামাজিক জীবনে। যার সাথে তাল রেখে পরিবর্তিত হচ্ছিল জনগণের মানসিকতা। পরবর্তীতে বিদেশী ঔপনিবেশিক শোষণ শাসনের মানসিকতার মধ্যে এর আসল অবয়ব ধরা পড়েছিল। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে হিন্দু মুসলমিদের মধ্যেকার বহুকালের সুসম্পর্কের ভাঙ্গন ধরিয়ে, বৃটিশ শোষণ শাসনের কাল দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে, বৃটিশরা বিভিন্ন কৌশলে হিন্দু মুসলমান দুই জাতি এই চেতনার বীজ বপন করেছিল এ মাটিতে। উচ্চ বর্ণ এবং উচ্চবিত্তের হিন্দু সম্প্রদায় যাঁরা এক সময়ে বিজয়ী মুসলিমদের শাসক হিসাবে স্বাগত জানিয়ে নিজের অবস্থান ঠিক রাখতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, পরবর্তীতে বিদেশী বৃটিশ বেনিয়া শাসকদের প্রতিও একই মানসিকতা নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কেননা উভয় শাসকই ছিল তাঁদের কাছে বিদেশী। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই সুযোগে লুফে নিয়েছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের সহযোগীদের সহযোগিতার হাত এবং এর উপর ভরসা করে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল নিজের আখের গোছাতে। অপরদিকে রাজ্যহারা মুসলিমরা যেমন হয়ে উঠেছিল বৃটিশ বিদ্বেষী তেমন বৃটিশরাও পারেনি তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকাল ব্যাপী ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তায় এই অঞ্চলের রাজনৈতিক অঙ্গন আচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই ধর্মীয় স্বতন্ত্রতাবোধের বীজ উপ্ত হয়েছিল আরো আগে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন আমল থেকেই কোম্পানীর শাসকদের রাজ্যচ্যুত মুসলিমদের প্রতি বৈরী মনোভাব, হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে চলমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে থাকে। এর পর উনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভব ঘটে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তার। শেষ পর্যন্ত যা সর্বভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদে রূপ নেয়। ইতিহাসের গতিধারার এ পর্যায়ে মুসলিমরা নিজেদেরকে দেখতে পায় বিচ্ছিন্ন এবং বিপর্যস্ত অবস্থায়। তীব্র ভাবে অনুভব করতে থাকে স্বীয় স্বতন্ত্র সত্ত্বাকে। বিদেশী ইংরেজ শাসককুলের বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতা, হিন্দু জাতীয়তাবাদের উগ্র সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মূর্তি এ অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তার পথে ঠেলে দেয়। ভারতীয় মুসলিমরা নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এ পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়। এর ফলশ্রুতিতে দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। এই আদর্শভিত্তিক চেতনা দৃঢ় হতে থাকে এবং ব্যাপক মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এর গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যা ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক কাঠামো লাভ করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে এই জাতীয়তাবাদী চেতনার আদর্শ বাস্তব রূপ লাভ করে।

হিন্দু মুসলিম দুইটি জাতি এই চিন্তার বীজ সুকৌশলে বৃটিশ শাসকরাই এদেশের জনগণের মস্তিষ্কে রোপণ করেন তাদের 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতির মাধ্যমে। সুতরাং কোম্পানীর শাসনের সূত্রপাত থেকেই এই নীতি ধীর গতিতে সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী হতে থাকে। বৃটিশরা এই নীতি বাস্তবায়িত করে বাংলাকে শোষণ শাসনের জন্য এবং এই অঞ্চলে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের আধিপত্য দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে। হিন্দুরা বৃটিশ কোম্পানীর এই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক খেলার ক্রীড়নক হন সচেতন ভাবেই স্বীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থানকে দৃঢ় করণের জন্য। অপর দিকে রাজ্যহারা মুসলিমরা প্রথম দিকে স্বীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে সিংহাসন কেড়ে নেয়া 'নাসারাদের' প্রতি তীব্র বিদ্বেষ এবং ঘৃণায়। পরবর্তীতে ধর্মীয় স্বতন্ত্র সত্ত্বাকে আকড়ে ধরে অস্তিত্ব রক্ষার মানসে। এই তিন ধরণের ঐতিহাসিক সত্ত্বার তিন মানসিকতার প্রেক্ষিত পরবর্তীতে এই অঞ্চলে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বা দ্বিজাতিতত্ত্বের আদর্শ দৃঢ়তা লাভ করতে সক্ষম হয়।

সাতচল্লিশের যে জাতীয়তাবাদী চিন্তার ফলে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের সৃষ্টি তা ছিল প্রায় দুইশতকের অবহেলিত, বিভ্রান্ত, আশাহত, পশ্চাদপদ মুসলিমদের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী চেতনা। সুতরাং ১৯৪৭ সালের জাতীয়তাবাদী চিন্তা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা অর্জন করতে হলে এর সুবিশাল প্রেক্ষাপটের ইতিহাস প্রদক্ষিণ করে আসা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক পটভূমি

১৬০০ খৃষ্টাব্দের ২৪ অক্টোবর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হেক্টর নামক পাঁচশোটনি বাণিজ্য তরী সুরাট বন্দরে নোঙ্গর ধ্বনি, এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক বিপর্যয়কর বিবর্তনের অশনি সংকেত ধ্বনি হয়ে বেজে উঠে।[৫] যে ভয়াবহ সংকেত ধ্বনির অর্থ বোঝার ক্ষমতা না ছিল এ উপমহাদেশের অচেতন জনগোষ্ঠীর না ছিল অদূরদর্শী ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের। ফলে খুব সহজেই হেক্টর বাণিজ্য তরীর ক্যাপ্টেন হকিন্স বাদশাহী ফরমানের মাধ্যমে সুরাট বন্দরে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি লাভ করেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এই অনুমতি প্রাপ্তির ফলে কোম্পানী এবং পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমৃদ্ধি ও লাভের অঙ্কের হিসেব গুনতে, প্রায় আড়াইশ বছর উপমহাদেশের জনগণকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পাতায় লিখে যেতে হয় তাদের চরম লোকসানের হিসেব। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে বাংলার নদী পথে ভেসে এসেছিল এই বিদেশী বণিক কোম্পানীর আরেক বাণিজ্য তরীর বহর। ভিড়েছিল গঙ্গা তীরের সূতানটী গ্রামে, নাবিক ছিল জব চার্নক নামে এক দুধর্ষ ইংরেজ। জব চার্নকের বঙ্গ ভূমিতে পদার্পণ ছিল বাংলাকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকভাবে পদানত করার কূটকৌশল আর ষড়যন্ত্রের নিরবিচ্ছিন্ন ইতিহাসের এক ভিন্ন অধ্যায়ে পদার্পণ সংকেত।

জব চার্নক সূতানটি গ্রামে কোম্পানীর কার্যালয় স্থাপন করে মূলতঃ ভবিষ্যত বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত রচনা করেছিলেন। ১৬৯৮ সালে এই ভিত আরো মজবুদ হয় যখন কোম্পানী কোলকাতা সূতানটি এবং গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের জমিদারী লাভ করতে সক্ষম হয়। একই সময়ে স্থাপিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ। যে দূর্গ পরবর্তী সময়ে ইংরেজ ইষ্ট কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষা দূর্গে পরিণত হয়ে ছিল। জাহাঙ্গীর যেমন ক্যাপ্টেন হকিন্সকে সুরাট বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ দানের সুদূর প্রসারী ফলের কথা ভাবেননি, তেমন সম্রাট আওরাঙ্গজেবও বিদেশী ইংরেজ কোম্পানীকে জমিদারী সনদ প্রদানের ফলে অদূর ভবিষ্যতে এর পরিণতি কি হতে পারে তা ভেবে দেখেননি। মোঘল সম্রাটদের এই অপরিণামদর্শিতা কোম্পানীর বিচক্ষণ ও চতুর প্রতিনিধি ও কর্মচারীরা স্বীয় স্বার্থে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে কোম্পানীর জমিদারী বৃদ্ধি পেয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গের শক্তি, যে শক্তি শেষ পর্যন্ত বাংলার নবাবের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাংলার মাটিতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জমিদারী ১৬৯৮ সালে শুরু হলেও বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়েছিল এরও আগে ১৬৩৩ সালে। ১৬৮০ সালের মধ্যে সারা দেশময় কোম্পানীর বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়।[৬]

এ অঞ্চলে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য সম্প্রসারিত হলেও নির্বিঘ্ন ছিল না। পরবর্তীতে বাংলার শাসককর্তৃক সুজার আদেশ এবং দিল্লীর সম্রাটের সনদ অনুসারে বাণিজ্য করতে না দেয়ায় এবং রাজ কর্মচারীদের দ্বারা পদে পদে বাধা প্রাপ্তির ফলে কোম্পানীর লোকজনের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যা পরবর্তী সময়ে দ্রুত রাজনৈতিক অধিকার হরণের দিকে ধাবিত হয়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোম্পানীর চতুর কর্মচারীরা বাংলা বিহার উড়িষ্যার মসনদকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে শুরু করে। ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীরা যখন তাদের ভাগ্যোন্নয়নের সুযোগের অপেক্ষায় ঠিক সে সময় কেন্দ্রে এবং বাংলায় শুরু হয় আত্মঘাতী প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। কোম্পানী এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে একদিকে রাজনৈতিক অধিকার লাভের পথে পা বাড়ায় অপর দিকে এই বিশৃংখল পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে একচেটিয়া অবাধ এবং অবৈধ বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা আদায়ে প্রয়াসী হয়। উভয় ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ের মধ্যে কোম্পানী লাভ করে চরম সাফল্য।

Dhaka University Institutional Repository

১৭০৭ সালে সম্রাট আওরাঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যে গৃহযুদ্ধ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার সেই অন্তর্দ্বন্দ্বই ইংরেজ বণিকদের সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে সহায়তা করে। অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে কোম্পানী বিভিন্ন ব্যক্তিকে উৎকোচ, উপঢৌকন ইত্যাদি প্রদান করে অবৈধ সুবিধা আদায় করে নিতে থাকে। এমনকি ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে গৃহবিবাদের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন সম্রাট ফারুখ শিয়ার ইংরেজদের দেওয়া উপঢৌকনে এতই সন্তুষ্ট হন যে তাদের অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেয়ার নামে দেশের আংশিক সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। সম্রাট কতৃক জারীকৃত ফরমানের মূল বক্তব্যের দিকে নজর দিলে বিষয়টি অনুমান করা সহজ হবে। সম্রাট ফারুখ শিয়ারের কাছ থেকে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর প্রাপ্ত ফরমানের মূল বিষয় বস্তু নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১। কোম্পানী সরকারকে বাৎসরিক মাত্র তিন হাজার টাকা রাজস্বদানের পরিবর্তে সারাদেশে বিনাশুল্কে অবাধ বাণিজ্য করবে।

২। কোম্পানীর মালামাল কোথাও চুরি হলে সরকার তা ফেরত দিতে চেষ্টা করবে বা সমমূল্যের ক্ষতিপূরণ দিবে।

৩। কোন শুল্ক চৌকিতে কোম্পানীর নৌকা-জাহাজ কোন রকম অজুহাতে আটক করা যাবে না।

৪। মুর্শিদাবাদের টাকশালে কোম্পানী তার নিজস্ব টাকা তৈরি করতে পারবে।

৫। সুবাদার কোলকাতার আশে পাশে আরও আটত্রিশটি গ্রামের উপর জমিদারী সনদ কোম্পানীকে দিবে।

৬। কোম্পানীর অধীনস্থ দেশীয় কর্মচারীদের বিচার করার অধিকার কোম্পানীর থাকবে।[৭]

দিল্লীর সম্রাটের নিকট থেকে উপরোক্ত ফরমান লাভ করেও প্রাপ্ত ফরমান অনুসারে কোম্পানী সুবে বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। কেননা সুবেদার মুর্শিদ কুলী খাঁ তৎপরবর্তী শাসকগণ যথাক্রমে সুজা উদ্দীন (১৭২৭-৩৯) ও আলীবর্দী খান (১৭৪০-৫৬) উক্ত ফরমান অনুসারে এদেশে বাণিজ্য করতে দিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জানান। একদিকে বাংলার শাসকদের কেন্দ্রের ফরমান অনুসারে এদেশে বাণিজ্য করা থেকে কোম্পানীকে বিরত রাখার চেষ্টা অপর দিকে কোম্পানীর সম্রাটের সনদ অনুসারে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে সংঘাত সংঘর্ষ হয়ে পড়ে অনিবার্য। কিন্তু বাংলার কৌশলী শাসকগণ মুর্শিদ কুলী খাঁ থেকে আলীবর্দী খান পর্যন্ত প্রত্যেকে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে থাকেন। যদিও এ সময় থেকে অর্থাৎ মুর্শিদ কুলী খাঁর পর বাংলার রাজনীতিতে সূত্রপাত ঘটে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের। এক দিকে গৃহবিবাদের ফলে কেন্দ্রে উদ্ভুত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মোঘল শাসকদের দূর্বলতা যেমন এই সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য করে তুলে ছিল; অপর দিকে তখন বাংলা বিহার উড়িষ্যার মসনদ ঘিরে আত্মঘাতী ষড়যন্ত্র এই অঞ্চলের প্রশাসনকে করে তোলে অস্থিতিশীল। মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখল করেন তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন। এরপর পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার মসনদে বসেন। তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন আলীবর্দী খান কতৃক। এভাবে বাংলায় ক্রমাগত ক্ষমতার হাত বদল হতে থাকে। যার একনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক ছিল ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিরা। আলীবর্দীর সময়ে প্রশাসন কিছুটা স্থিতিশীল হলেও তাঁর মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের পুনরাবির্ভাব ঘটে। নবাব পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষমতার তৃষ্ণা পুরো প্রশাসনকে নিক্ষেপ করে এক আত্মঘাতী বিশৃঙ্খলার মধ্যে। অভিজাত ও দেশীয় বণিক শ্রেণীর সঙ্গে বিদেশী ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় জড়িয়ে পড়ায় ষড়যন্ত্র ভয়ংকররূপ পরিগ্রহ করে। বিদেশীদের ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণে যেমন ছিল তীক্ষ্ণ স্বার্থ বুদ্ধি, ছিল নিষ্ঠা, ছিল সতর্কতা, তেমন অংশ গ্রহণের অন্তর্নিহিত কারণটিও লুকিয়ে রাখার ব্যাপারেও এরা লালন করেছে একনিষ্ঠ সতর্কতা। এভাবে বাংলার উচ্চাকাংখী স্বার্থোম্মত্ত অভিজাত, ধনিকশ্রেণী ও বিদেশী বাণিজ্য সংস্থা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ফল হয় মর্মান্তিক। বাংলার মসনদের কর্তৃত্ব চলে যায় বিদেশী বণিক শ্রেণীর হাতে। বিদেশী বণিক এবং দেশীয় ধনিক শ্রেণীর ক্রিড়নকে পরিণত হয় ক্ষমতা লোভী অভিজাতবর্গ। ফলে দেশী বিদেশী বণিকরা একক শক্তিতে পরিণত হয় এবং এরা বাংলার মসনদে এদের সুবিধা মতো শাসক বদল শুরু করে।

১৭৫৭ সালে পলাশীতে বাংলার ভাগ্য বিপর্যয়ের পর নবাব সিরাজউদ্দৌলার বদলে সিংহাসনে বসানো হয় মীরজাফরকে। কোম্পানীর অর্থনৈতিক স্বার্থ পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করতে অক্ষম মীরজাফরের পরিবর্তে ক্ষমতা অর্পিত হয় মীর কাশিমের হাতে। দেশ প্রেমিক মীর কাশিম দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বিদেশীদের স্বার্থ রক্ষায় সম্পুর্ণভাবে অনিহা প্রকাশ করেন। কোম্পানীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বার্থ হতে থাকে চরমভাবে ব্যাহত। নবাব ইংরেজের হাতের নাগালের বাইরে চলে যান। এতো ত্যাগ কৌশল ষড়যন্ত্র আর চাতুর্যের বলে বাংলার মসনদের উপর তাদের যে কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছিল তাও হাত ছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়। ফলে সঙ্গত কারণেই সংঘাত হয়ে উঠে অনিবার্য। যার চরম পরিণতি ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ২২ অক্টোবরের বক্সারের যুদ্ধ। এক পক্ষে ইংরেজ, মীরজাফর এবং তার সমর্থকগণ, অপর

Dhaka University Institutional Repository

দিকে মীর কাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম।[৮] বক্সারের যুদ্ধে মিত্র বাহিনীর চরম পরাজয় বাংলা তথা সমগ্র উপমহাদেশের ভাগ্য বিপর্জয়ের ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে আসে। এ যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয়ে যেমন বাংলার রাজনৈতিক স্বাধীনতা উদ্ধার প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় তেমন অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লীর সম্রাট উভয়ই বাধ্য হন অমর্যাদাকর সন্ধি মেনে নিতে। শুধু বাংলার বা অযোধ্যার নয় কেন্দ্রের শক্তির দুর্বলতা বিদেশী বণিক শ্রেণীর চোখে প্রকট হয়ে ধরা পড়ে।

বক্সারের যুদ্ধে পরাজয় যেমন বাংলার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের শেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়, তেমন ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবেই চলে যায় বিদেশী পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিভূ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং দেশীয় বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণীর হাতে। জাহাঙ্গীরের আমলে যখন ইউরোপীয় বণিকরা এদেশে বাণিজ্য করার সুযোগ সুবিধা লাভ করে, তখন থেকেই এই উপমহাদেশে মুদ্রা অর্থনীতি গড়ে উঠতে থাকে। ইউরোপীয় বণিকরা রৌপ্য ধাতুর বিনিময়ে দেশীয় পণ্য ক্রয় করা শুরু করলে দেশীয় বণিক শ্রেণীর হাতে প্রচুর রৌপ্য সম্পদ জমা হতে থাকে। এই সম্পদের কল্যাণে উপমহাদেশে এক প্রভাবশালী ধনিক শ্রেণীর উদয় হয়। এই ধনিক শ্রেণী ধীরে ধীরে এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠে যে রাষ্ট্র অর্থনীতি পর্যন্ত এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বাংলার অর্থনীতিতেও এই পরিবর্তনের হাওয়া পরিলক্ষিত হয়। ফলে বাংলাদেশেও এই ধনিক শ্রেণীর আর্বিভাব লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে জগৎশেঠের বংশের ১৭১৮ থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত বাংলা তথা ভারতীয় অর্থনীতিতে ছিল দোর্দণ্ড প্রভাব।[৯] জগৎশেঠ একজন বৃহৎ ব্যাংকার ছিলেন। ঢাকা থেকে দিল্লী পর্যন্ত পূর্ব ও উত্তর ভারতের প্রায় সব বড় বড় শহরেই তাঁর ব্যাংকের শাখা ছিল। জগৎশেঠ পরিবার সম্পর্কে কোম্পানীর মুর্শিদাবাদের আবাসিক কর্মচারী ক্রেফটন লিখেছেন :

"Jagoth Seth is a manner the Governments Banker; about two-thirds of the revenues are paid into his house, and the government give their duft on him in the same manner as a merchant on bank and by what I can learn the Seth makes yearly by this business about 40 lacs." [১০]

শুধু জগৎশেঠ পরিবার নয় বিদেশী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দালাল হিসেবেও এই সময় আরো ধনী ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে যারা বাংলার অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিতেও দ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এই শ্রেণীই বিদেশী বণিক শ্রেণীর সঙ্গে নিজ স্বার্থে হাত মেলায় এবং ক্ষমতা লোভী অভিজাত সম্প্রদায়কে তাদের হাতের পুতুলে পরিণত করে। মীর কাশিমের পরাজয়ের পর থেকে ক্ষমতা এক রকম এদের হাতে চলে যায়। যেহেতু ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়েছিল মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে সেহেতু তাদের প্রতি বিদেশী এবং দেশী অমুসলিম বণিক সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ অবিশ্বাস আর সন্দেহের পাহাড় জমে উঠে। যে কারণে নিরুপায় অযোধ্যার নবাব দিল্লীর সম্রাট উভয়কে সন্ধি করতে হয় স্বীয় মর্যাদা বিকিয়ে দিয়ে। ইংরেজ কোম্পানীও শাসকদের এই দুর্বলতার সুযোগে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ব্যবস্থা করে। এই বিদ্বেষ মূলক নীতির প্রেক্ষিতে মুলতঃ পলাশী যুদ্ধের পর থেকে দেড়শত বছরের মধ্যে মুসলিমদের মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াবার কোন উপায় থাকে না। ফলে ১৭৫৭ সাল থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত এ উপমহাদেশের মুসলিমদের জন্য ছিল চরম দুঃসময়, যে সময়কে 'অন্ধকার যুগ' বলে চিহ্নিত করা যায়।[১১]

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসকরা একদিকে যেমন রাজ্যহারা মুসলিমদের প্রতি ভয় বিদ্বেষ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাদের দূরে ঠেলে দিতে থাকে অপর দিকে হিন্দু সম্প্রদায়কে কাছে টেনে নেয় পরম নির্ভরতায়। একটি সচেতন নীতির মাধ্যমেই ইংরেজ শাসকরা কৌশলে হিন্দু মুসলিম দুই শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্যের সূত্রপাত ঘটায়। হিন্দু মুসলিম দুই জাতি এই তত্ত্বের শিকড়টি এ মাটিতে দৃঢ়ভাবে রোপণ করে ইংরেজ শাসকরা যা পরবর্তী সময়ে বিরাট মহিরুহে রূপান্তরিত হয়। বৃটিশ শাসকরা তাদের এই নীতি প্রয়োজন মত কাজে লাগাতে পিছ পা হয়নি। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমতায় আসার পর তাদের এই বিবেধ নীতি অর্থাৎ ডিভাইড এ্যান্ড রুল নীতির প্রথম বলি ছিল বাংলার মুসলমানরা।

যদিও সম্ভ্রান্ত বিত্তবান মুসলমান পরিবারগুলোকে দরিদ্র ও নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল প্রত্যক্ষ ইংরেজ শাসন শুরুর আগে থেকেই। ভেট, ঘুষ, ব্যক্তিগত পরিতোষক, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি আকারে কোম্পানী প্রচুর অর্থ আদায় করেছে নবাব পরিবার রাজকর্মচারী এবং প্রশাসন থেকে। কাল মার্কসের হিসেবে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি শুধু মাত্র নবাব পরিবার ও সরকারী প্রশাসন থেকে যে পরিমাণ ভেট এবং ঘুষ আদায় করেছিল তার পরিমাণ ছিল ষাট লক্ষ পাউন্ড ষ্টার্লিং।[১২] যদিও এই হিসেবের মধ্যে শুধু নগদ অর্থ ছাড়া আর কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত এই আট বছর কোম্পানী নবাব, নবাব-পরিবার, রাজকর্মচারী এবং সরকারী প্রশাসন থেকে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করেছে তাতে একদিকে যেমন নবাবের কোষাগার শূন্য হয়ে পড়েছে, অপর দিকে সম্ভ্রান্ত বিত্তবান মুসলমান পরিবারগুলোর ভাগ্য বিপর্যয়ের পথ খুলে দিয়েছে। কেননা নবাবের ভাগ্যের সঙ্গে এ অঞ্চলের অভিজাত বর্গের ভাগ্যও ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং তার অর্থনৈতিক বিপর্যয় যেমন এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের অর্থনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

স্থিতিশীলতাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে, তেমন ইংরেজ কোম্পানীর অর্থলোভ তাদের নিঃস্বকরণের কাজটি ত্বরান্বিত করেছিল। নিম্নের সারণীতে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো।

কোম্পানী কর্তৃক অর্থ আদায়ের খতিয়ান

খাত	টাকার পরিমাণ
১। ১৭৫৭ সালে সিংহান বসবার সময় মীরজাফরের কাছ থেকে প্রাপ্ত (এর সাথে বীরভূম, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার রাজস্ব স্বত্ব)	১২,৩৮,৫৭৫
২। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভকে ব্যক্তিগত পরিতোষিক (এর সাথে বর্ধমান জেলার রাজস্ব স্বত্ব)	৩,১৫,০০০
৩। ১৭৬০ সালে মীর কাশিম সিংহাসনে বসলে রাজ কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত	২,০০,২৬১
৪। ১৭৬০ সালে ভ্যানসিটার্টের ব্যক্তিগত পরিতোষিক	৫৮,৩৩৩
৫। ১৭৬৪ সালে মীরজাফরকে দ্বিতীয়বার নবাব করার সময়	৫,০০,১৬৫
৬। ১৭৬৫ সালে মীরজাফরের অবৈধ পুত্র নাজিম-উদ-দৌলা নবাব হবার সময়	২,৩০,৮৩৩
৭। এই আট বছরে (১৭৫৭-৬৫) বিভিন্ন সময়ে রাজকর্মচারীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবী করে প্রাপ্ত	৩৭,৭০,৮৩৩
মোট =	৬০,৩০,০২৩

সূত্র : রমেশচন্দ্র দত্ত, *ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস* (১৭৫৭-১৮৩৭) ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৮

কয়েকশত বছর ধরে মুসলিম শাসনের ফলে বাংলার উচ্চমহল থেকে আরম্ভকরে সর্বত্র মুসলিম প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য। মুসলিম শাসনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়। এই অভিজাত শ্রেণীর বিচরণ ভূমি মালিকানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না এরা দখল করে ছিলেন রাজ্যের উচ্চ সরকারী পদ গুলোও। সেনাবাহিনী থেকে রাজস্ব বিভাগ, বিচার বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো ছিল মুসলিমদের দখলে। এই সকল বিভাগ গুলোতে সংখ্যার দিক দিয়েও মুসলিমরা ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ। ইংরেজরা প্রথম পদক্ষেপেই উপরোক্ত বিভাগগুলো থেকে মুসলমান কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ নিঃসন্দেহে ছিল সামরিক বিভাগ। সে সময়ে রাষ্ট্রের অস্থিত্ব রাজার ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল সামরিক শক্তির উপর। যেহেতু শাসকরা ছিল মুসলমান, ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসার এবং সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল বেশী। তাছাড়া শত শত বছর ধরে বাংলায় মুসলিম শাসন চালু থাকায় এই বিভাগে মুসলিমদের অন্তর্ভূক্তি ঐতিহ্যে পরিণত হয়। ভিন্ন ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় বিভাগটি প্রায় একচেটিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পেশায় পরিণত হয়। মুসলমানদের দূর্বল করা এবং মুসলিম শাসকদের শক্তি খর্ব করার লক্ষ্যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমতায় আসার আগেই সেনাবাহিনী থেকে মুসলমানদের কৌশলে উৎখাতের ব্যবস্থা করে। ১৭৬৩-৬৪ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্যে মীরজাফর দ্বিতীয় দফা নবাব হলে কোম্পানী কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মীরজাফর যাতে মীর কাশিমের মত বিদ্রোহী হয়ে না উঠে বা বাংলায় যাতে আরেকটি মীর কাশিম জন্মাতে না পারে সে জন্য নতুন নবাবকে ৪০ হাজার মুসলমান সৈন্য বরখাস্ত করতে বাদ্য করা হয়। এ সময় সাধারণ সৈনিকদের সাথে নবাবের সেনাবাহিনীতে কর্মরত বিভিন্ন স্তরের মুসলমান অফিসারদেরকেও বরখাস্ত করা হয়। ফলে নবাবের সেনাবাহিনীতে মুসলিমদের একচটিয়া অধিকারও প্রভাব খর্ব হয়। এই ৪০ হাজার সৈন্য ছাড়াও আরো ৪০ হাজার সৈন্য মীর কাশিমের পরাজয়ের পর মধ্যভারতের দুর্গম অঞ্চলে পলায়ন করে। এদের প্রায় সবাই ছিল মুসলমান। তাছাড়া কোম্পানীর সেনাবাহিনীতে বাংলার মুসলিমদের যোগদান ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[১৩] কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই এক বিরাট সংখ্যক মুসলমান কর্মক্ষম পেশাজীবী সম্প্রদায় বেকার হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় এদের ভবিষ্যৎ কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনাও সম্পূর্ণ রূপে তীরহিত হয়। এভাবে বাংলার বিপুল সংখ্যক মুসলমান চক্রান্তের শিকার হয়ে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ায়। উপায়হীন হতাশাগ্রস্থ বেকার সৈনিকরা শেষ পর্যন্ত কৃষিকে উপজীবীকা হিসেবে বেছে নিয়ে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করতে বাধ্য হয়।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ ছিল রাজস্ব। মুসলিম শাসন আমলে রাজস্ব আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো ছিল মুসলমানদের দ্বারা পূর্ণ। এই সমস্ত মুসলমান কর্মকর্তার অধীনে থেকে কর্মরত হিন্দু কর্মচারীরা কৃষকদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করত। মীর কাশিমের শাসন আমল তৎপরবর্তী কিছু কাল ধরে রাজস্ব বলতে মূলতঃ ভূমি

Dhaka University Institutional Repository

রাজস্বই বুঝাতো। কেননা বাণিজ্যের ওপর থেকে নবাব রাজস্ব বাতিল করার ফলে তখনও উক্তক্ষেত্রে কোন কর আরোপ করা হয় নাই। সুতরাং অন্যান্য খাত থেকে যা আয় হতো তা সবই ছিল করের আওতাভুক্ত রাজস্বর নয়।[১৪] মীর কাশিমের শাসন আমলের পূর্বেই বাংলা থেকে দিল্লীর সম্রাটদের রাজস্ব প্রাপ্তিতে ছিল প্রয়াশাই অনিয়ম। এর মূল কারণ ছিল বাংলার শাসককুলের স্বাধীনচেতা মনোভাব, সুযোগ পেলেই তাঁরা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করত। পরবর্তীতে ক্রমাগত গৃহযুদ্ধ লেগে থাকার দরুণ সম্রাট বাংলার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর বিপর্যয়ের পর রাজস্ব প্রাপ্তি সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয় মোঘল সম্রাটকে বিব্রত করে। কেননা মীর কাশিমের মিত্র বাহিনীতে অযোধ্যার নবাবই নয় দিল্লীর সম্রাট ও সামিল ছিলেন। এই পরাজয় সম্রাটকে বিদেশী বণিকদের কাছে নত করেছিল। তাছাড়া সুবে বাংলা থেকে নিয়মিত রাজস্ব লাভের আশায় সম্রাট শাহ আলম ভবিষ্যতে এর অশুভ পরিণতির কথা না ভেবে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দীউয়ানীর সনদ প্রদান করেন।

উপরোক্ত অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া দীউয়ানী লাভের রাজনৈতিক কারণও ছিল। কোম্পানীর দীউয়ানী লাভের রাজনৈতিক পটভূমি আলোচনা করতে যেয়ে সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন

"১৭৬৫ সালের মাঝামাঝিতে বিদ্যমান রাজনীতির আপেক্ষিক অবস্থা এই যে স্বাধীনতার প্রয়াসী নবাব মীর কাশিম চূড়ান্ত ভাবে পর্যুদস্ত, মীর জাফরের নাবালক পুত্র নাজমুদ্দৌল্লাহ কোম্পানীর কৃপায় গদীনসীন, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লাহ কোম্পানীর কৃপা প্রার্থী সম্রাজ্যহীন সম্রাট শাহ আলম সহায় সম্পদহীন অবস্থায় নবাব সুজাউদ্দৌল্লাহর হাতে প্রায় বন্দী। এক কথায়, আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্যতা নষ্ট হয়ে কোম্পানীই এখন এ অঞ্চলের ভাগ্যবিধাতা আর দেশীয় রাজশক্তিগুলি অবক্ষয়ের আবর্তে জীবন্মৃত। এ পরিস্থিতিতে রবার্ট ক্লাইভ চট্টগ্রাম থেকে দিল্লী পর্যন্ত সমগ্র এলাকার উপর সার্বভৌমত্ব দাবী না করে যখন নগদ বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব দানের বিনিময়ে শুধু বাংলা বিহার উড়িষার দীউয়ানী প্রার্থনা করেন তখন সম্রাট শাহ আলম ক্লাইভের প্রস্তাব দু-হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেন।"[১৫]

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে দীউয়ানীর শর্ত সম্বলিত দুটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এর একটি সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে (১২ আগষ্ট ১৭৬৫ সন) যাতে ঘোষণা করা হয় সম্রাট শাহ আলম, "কোম্পানীর ভালবাসা (বাদশাহর প্রতি) শৌর্যবীর্যে, যুদ্ধে অপরাজেয়তা সরকারের প্রতি শুভেচ্ছা, রাজ্যের উচ্চতম আমীরের পদবী প্রাপ্ত হওয়ার বিবেচনায় আমরা (বাদশাহ শাহ আলম) কোম্পানীকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দীউয়ানী দান করেছি। কোম্পানী অঙ্গীকার করছে যে বাংলার নবাব নাজমুদ্দৌল্লাহ রাজস্ব হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাৎসরিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করবেন এবং সে টাকা নিয়মিত পাঠাবার জামীন থাকবে কোম্পানী। কোম্পানীর যেহেতু বিরাট সেনাবাহিনী প্রদেশের নিরাপত্তার জন্য রাখতে হয়, সেহেতু নিজামত সরকার পরিচালনা বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ নবাবকে দিয়ে বাদ বাকী সমস্ত রাজস্ব আয় কোম্পানীর প্রাপ্য হবে। এ দীউয়ানী কোম্পানী যুগ যুগ ধরে ভোগ করবে।"[১৬]

অপর চুক্তি ছিল মীরজাফরের নাবালক পুত্র নাজমুদ্দৌল্লাহর সঙ্গে। এই চুক্তিতে নবাব ঘোষণা করেন "কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে বাদশাহ কর্তৃক ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দীউয়ানী শাসন অর্পণ করা হয়। একটি শর্ত এই যে নিজামত শাসন পরিচালনার জন্য দেশের রাজস্ব থেকে পরিমিত অর্থ বরাদ্দ রাখা উচিত। সে সূত্রে সকলকে জ্ঞাত করা হচ্ছে যে নিজামত শাসনের জন্য বাৎসরিক ৫৩,৮৬,১৩১ টাকা ৯ আনা যথেষ্ট বলে মনে করি এবং এ অংক আমি কোম্পানীর কাছ থেকে গ্রহণ করতে রাজী। উক্ত টাকা দু'ভাগে বিভক্ত যথা, আমার নিজস্ব পরিবার পরিজন চাকর নোকরদের খরচ বাবদ ১৭,৭৮,৮৫৪ টাকা ১ আনা; আর বাদ বাকী ৩৬,০৭,২৭৭ টাকা ৮ আনা নিজামত আমলা, ঘোড়া, সিপাহী প্রভৃতির খরচ বাবদ। যতদিন ইংরেজ ফ্যাক্টরী এদেশে বলবৎ থাকবে ততদিন এ চুক্তি নবাব মেনে চলবে।"[১৭]

এই চুক্তি দ্বয়ের ফলে যে দীউয়ানী লাভ করা হয় তাতে এ অঞ্চলের কোম্পানীর ক্ষমতা কি পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তার আভাস পাওয়া যায় রবার্ট ক্লাইভ কর্তৃক দীউয়ানী লাভের গুরুত্ব সম্পর্কে কোর্ট অব ডাইরেক্টদের কে লিখিত মন্তব্যে। এতে তিনি বলেন "কোম্পানী ও নবাবের সঙ্গে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের চির অবসান ঘটলো। নবাব এখন বস্তুতত কোম্পানীর পেনশনার মাত্র। বাদশাও তাই। সমস্ত ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে ... দীউয়ানীর ফলে কোম্পানীর যে আয় হবে তা দিয়ে কোম্পানীর সমস্ত খরচ কুলিয়ে ব্যবসার সমস্ত পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব।"[১৮]

এই ভাবেই রবার্ট ক্লাইভ প্রচুর উপঢৌকনের বিনিময়ে সম্রাটের এবং নবাবের কাছ থেকে সনদের নামে বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের একচেটিয়া ক্ষমতা লাভ করে। দিল্লী কর্তৃক বিদেশী বণিক কোম্পানীকে এই অভাবিত ক্ষমতা প্রদানে

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি হয় দ্বৈত শাসনের। যাতে করে কোম্পানী লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা, নবাব পরিণত হন ক্ষমতাহীন শাসকে। অথচ তাঁর দায়িত্ব থেকে যায় ষোল আনা। ফলে বাংলায় এক অভূতপূর্ণ প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়, যার চরম মাশুল দিতে হয় এদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে। নবাবকে ক্ষমতাহীন পুতুলে পরিণত করে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা হাতের মুঠোয় রেখে কোম্পানী শুরু করে সীমাহীন, নির্মম অর্থনৈতিক শোষণ এবং লুণ্ঠন। যার ফলে ১৭৭০ সালের গ্রীষ্মকালে দেখা দেয় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। বাংলার সুজলা সুফলা প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে নিরন্ন নিরিহ মানুষের লাশের সারি। এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায় কোম্পানীর তৎকালীন মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি রিচার্ড বেচারের প্রেরিত ২৫ জুন ১৭৭০ সালে রিপোর্টে। এতে তিনি লিখেছেন: "ইহা এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। ইহার বর্ণনা অসম্ভব। দেশের কয়েকটি অংশে যে জীবিত মানুষ মৃত মানুষকে ভক্ষণ করিতেছে তাহা গুজব নয়, অতি সত্য। অনাহার জনিত মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি ষোল জনের মধ্যে ছয় জন।"[১৯]

চার্লস গ্রান্ট নামে আরেক জন ইংরেজ প্রত্যক্ষদর্শী দুর্ভিক্ষ কবলিত মুর্শিদাবাদের এক মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেছেন: "আমি স্বচোখে যাহা দেখিলাম, মুর্শিদাবাদে ৭৭ হাজার লোককে অনেক মাস যাবৎ খাওয়ানোর পর ও প্রত্যহ সেখানে প্রায় পাঁচ শত লোক মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে। বিশেষ একদল লোক রাস্তাঘাট হইতে মৃতদেহ কুড়াইবার জন্য নিয়োজিত হয়। মৃতদেহ যাহারা কুড়ায় তাহারা ও ক্ষুধার জ্বালায় একে একে মৃত্যু বরণ করে। রাস্তা ঘাটেও ঘরের ভিতর পড়িয়া থাকা মৃতদেহ শিয়াল, কুকুর, শকুনী খাইতে থাকে। পঁচা দেহের পুতিগন্ধ ও অর্ধজীবিতের কান্না-কাত্‌রানির জন্য রাস্তায় বাহির হওয়া দায়। পরিস্থিতি এমন পাশবিক যে শিশু মৃত পিতা মাতাকে খায়, মাতা তাহার মৃত বাচ্চাকে খায়।"[২০]

এই মর্মান্তিক বিপর্যয় এবং পরবর্তীতে সৃষ্ট মহামারীতে বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করলেও কোম্পানীর শোষণ চলে পূর্বের নিয়মেই। এ শোষণের তীব্রতার নমুনা দীউয়ানী লাভ করার পর থেকে কোম্পানীর রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণে ও তার ব্যবহার এবং দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছরের সংগৃহীত রাজস্বর পরিমাণ উল্লেখ করা সারণীটি লক্ষ্য করলে অনুধাবন করা যাবে।

রাজস্ব সংগ্রহ ও তা ব্যবহারের ধরন

বৎসর মে-এপ্রিল	মোট আদায় (পাউন্ড)	মোঘল বাদশার কর নবাবের ভাতা, আদায়ের খরচ, বেতন কমিশন প্রভৃতি বাদ দিয়ে নীট রাজস্ব (পাউন্ড)	বেসামরিক সামরিক গৃহনির্মাণ দূর্গ প্রভৃতি খাতে মোট ব্যয় (পাউন্ড)	বাৎসরিক নীট উদ্বৃত্ত (পাউন্ড)
১৭৬৫-৬৬	২২৫৮২২৭	১৬৮১৪২৭	১২১০৩৬০	৪৭১০৬৭
১৭৬৬-৬৭	৩৮০৫৮১৭	২৫২৭৫৯৪	১২৭৪০৯৩	১২৫৩৫০১
১৭৬৭-৬৮	৩৬০৮০০৯	২৩৫৯০০৫	১৪৮৭৩৮৩	৮৭১৬৬২
১৭৬৮-৬৯	৩৭৮৭২০৭	২৪০২১৯১	১৫৭৩১২৯	৮২৯০৬২
১৭৬৯-৭০	৩৩৪১৯৭৬	২০৮৯৩৬৮	১৭৫২৫৫৬	৩৩৬৮১২
১৭৭০-৭১	৩৩৩২৫৭৯	২০০৭১৭৬	১৭৩২০৮৮	২৭৫০৮৮
মোট =	২০১৩৩৫৭৯	১৩০৬৬৭৬১	৯০২৯৬০৯	৪০৩৭১৯২

সূত্র: রমেশচন্দ্র দত্ত, *ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস* (১৭৫৭-১৮৩৭) ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৯

উপরোক্ত সারণী থেকে প্রমাণিত হয় যে দুর্ভিক্ষ (প্রায় এক কোটি মৃত্যু বরণ করে) মহামারীতে বাংলার ব্যাপক সংখ্যক মানুষ নিহত এবং নিঃস্ব হলেও রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ কমেনি। বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে সিরাজুল ইসলাম এ সম্পর্কে লিখেছেন "১৭৬৫-৭০ সনে গড়ে বাৎসরিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৪৩,০০,০০০ টাকা। আর দুর্ভিক্ষ-বৎসর ১৭৭০ সালে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১৩৬,৯৯,৫৩৮ টাকা। ...বাংলার বৃহত্তর অংশ যেখানে দুর্ভিক্ষে ধ্বংসপ্রাপ্ত, সেখানে রাজস্ব সংগ্রহ যদি পূর্বেকার বৎসরের প্রায় সমান হয় তবে ইহা বলিতে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে এই রাজস্ব সংগ্রহ করিতে বৃটিশরা নিশ্চয়ই অতি ঘৃণ্য পাশবিক বর্বরোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পন্থার বিরুদ্ধে রেজা খানের যুক্তি তর্ক বাদ প্রতিবাদ তাহাদের নির্মম কানে প্রবিষ্ট হয় নাই। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছিল এই যে অনেক রাইয়ত সরকারী আমিনের অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া বাড়ী ঘর ফেলিয়া পলায়ন করে, দস্যুবৃত্তি বা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। তাহাদের জমি অনাবাদ পড়িয়া থাকে। এমনিভাবে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও পলায়নের ফলে বাংলাদেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জমি পতিত ও জংগলাকীর্ণ হইয়া পড়ে।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার মানুষকে শোষণ করে যে রাজস্ব আদায় হতো তার এক তৃতীয়াংশের বেশী চলে যেত বিলাতে। যেহেতু সে সময় বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা ছিল বেশী সেহেতু এই শোষণের তীব্র শিকার হয়ে ছিল বাংলার কৃষক ও শ্রমজীবী মুসলিম জনসাধারণ। যে দুই ধরনের মেহনতী মানুষ নিয়ে গড়ে উঠে ছিল তৎকালীন বাংলার বৃহৎ মুসলিম সামাজিক কাঠামো।[২২] এ সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের বক্তব্য হচ্ছে : "মুসলমান-প্রধান বাংলাদেশের কৃষকও শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের যে প্রধান্য ছিল, এখন অনুমান করা চলে। অতএব ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা সাধারণ প্রজাদের যে দুর্দশার কথা আমরা বলেছি, ঘটনাক্রমে তাদের অধিকাংশই ছিলেন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী।"[২৩]

এভাবে দ্বৈত শাসন এবং রাজস্ব আদায়ের তীব্র চাপের মুখে বাংলার বৃহৎ মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে তারা হয়ে উঠে তীব্রভাবে ইংরেজ বিরোধী। এ সময়ে দীউয়ানী কোম্পানীর হাতে থাকলেও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন রাজস্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খান। কোম্পানী দিউয়ানী সনদ লাভ করলেও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কোম্পানীর রাজস্ব প্রশাসন চালাবার মত লোক বলও ছিল না। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে তারা রেজা খানের হাতেই রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করে এবং মোঘল আমলের প্রথা ও নিয়ম কানুন রাজস্ব প্রশাসনে বজায় থাকে। কিন্তু ১৭৬৭ সালে ক্লাইভের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থায় ফাঁটল ধরে। কেননা প্রথম দিকে কোম্পানীর কর্মচারীরা রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে নাই। কিন্তু ক্লাইভের প্রত্যাবর্তনের পরে তারা রাজস্ব বৃদ্ধির চাপ দিতে থাকে। অপর দিকে কোম্পানীর কর্মচারী গোমস্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা লুণ্ঠন অত্যাচারের দরুণ শেকড় পর্যায়ে অর্থনীতি ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়তে থাকে। এ সম্পর্কে রেজা খানের সতর্ক বাণী কোম্পানীর কর্মকর্তাদের কর্ণগোচর হয় নাই। ফলে বাধ্য হয়ে রেজা খানকে চাপের মুখে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে হয়, কৃষক জমি ছেড়ে পালিয়ে বাঁচে। অপর দিকে দেখা দেয় পূর্ব উল্লেখিত দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ অবস্থা দেশের আইন শৃঙ্খলার অবনতি এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা দ্বৈত শাসনের চরম ব্যর্থতার বহিপ্রকাশ বলে বিবেচিত হয়। কোম্পানী দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বীয় হস্তে দীউয়ানী প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ স্থির করে। তাছাড়া নবাব আমলের মুসলমান কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ছিল চরম ভাবে ইংরেজ বিদ্বেষী। ফলে রাজস্ব আদায়ের মত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব মুসলমান কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপর দিয়ে কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিগণ স্বস্তি পায়নি। তাদের অস্বস্থি যে অকারণে ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় মীর কাশিমের আমলের ঢাকায় নবাবের রাজস্ব আদায়কারী মোহম্মদ আলী কর্তৃক লিখিত এক পত্রে। তিনি সন্দ্বীপ পরগনার আমিনকে লিখিত ভাবে জানান : "কোনো ইংরেজকে সহ্য করবে না এবং ইংরেজ নামধারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে শাস্তি দিবে।"[২৪]

এই ধরনের তীব্র ইংরেজ বিদ্বেষীদের রাজস্ব প্রশাসন থেকে অপসারণের বিষয়টি কোম্পানীর অস্তিত্বের প্রশ্নের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। সুতরাং এদের উৎখাত করার জন্যও দীউয়ানী প্রশাসন স্বহস্তে গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সর্বময় ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে কুক্ষিগত করার লক্ষ্যেও দ্বৈত শাসনের অবসান প্রয়োজন ছিল। কোম্পানীর দীউয়ানী প্রশাসন নিজ হাতে গ্রহণের পেছনে শুধু মাত্র দ্বৈত শাসনের ব্যর্থতা কাজ করেনি কোম্পানীর গোমস্তা কর্মচারী কর্তৃক জনসাধারণকে চরম নির্যাতন এবং তাদের উপর সাধ্যাতীত কর আরোপের বিরুদ্ধে রেজা খানের পুনঃ পুনঃ প্রতিবেদন যেমন কাজ করেছে, তেমন এই কয় বছরের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের আলোকে মোঘল আমলের সমস্ত কাঠামোকে ভেঙ্গে নতুন করে কোম্পানীর লোক দিয়ে দীউয়ানী শাসন পরিচালনার বিষয়টি কাজ করেছে। এতে দু'ধরনের সুবিধা; এক মোঘল আমলের কর্মচারী কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করণ, যাদের বেশী ভাগই ছিল মুসলমান, দুই হচ্ছে নির্বিঘ্নে নিজস্ব নিয়মে শোষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করণ। যেখানে রেজা খানের মত লোকদের বাদ প্রতিবাদ বা সতর্কবাণীর সম্মুখীন হতে হবে না। বা মোহাম্মদ আলীর মত তীব্র ইংরেজ বিদ্বেষী কর্মকর্তা কর্মচারীরা থাকবে না। ওয়ারেন হেষ্টিংস এ ক্ষেত্রে স্বীয় কৃতিত্ব জাহির এবং বাংলার ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য এতই ব্যস্ত হয়ে উঠেন যে রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে অর্পণ করার জন্য তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৭৭২ সালে কোর্ট অব ডাইরেক্টরের আদেশ অনুসারে দীউয়ান রেজা খানকে অপসারণ করে কোম্পানীর সরকার নিজ হাতে দীউয়ানী পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। এ সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন ১৭৬৯ সনে কোম্পানী কর্তৃক জেলায় জেলায় ইংরেজ "সুপারভাইজার নিয়োগের মাধ্যমে কোম্পানী মুঘল শাসন পদ্ধতি ও মুঘল আমলাতন্ত্র সরিয়ে কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং এর ফলে ক্ষমতাকাঠামোয় দেখা দেয় দ্বৈততা। সে দ্বৈততার অবসান হয় ১৭৭২ সনে। কোম্পানী তখন সরাসরি দীউয়ানী শাসন গ্রহণ করে এবং মুঘল আমলাতন্ত্রের বদলে কোম্পানীর আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।"[২৫]

এভাবে কোম্পানীর আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে দীউয়ানী শাসন ব্যবস্থা নিজস্ব নিয়মে পরিচালিত করার জন্য এবং জমির সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে হেষ্টিংস জমি নিলামের মাধ্যমের পাঁচ বছরের জন্য ইজারা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। নিলামে সর্বোচ্চ ডাকের যে বন্দোবস্ত নিতে ইচ্ছুক তাকেই পাঁচ বছর মেয়াদী বন্দোবস্ত দেয়া হয়। এর মাধ্যমে কোম্পানী এদেশের সম্পদ পরিমাপের সম্ভাবনা দেখতে পায়। তাছাড়া বনেদী জমিদার পরিবার গুলো যাঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন মুসলমান অথবা মুসলিম শাসনে অভ্যস্ত তাদের ধ্বংস করে দেয়ার পথটিও সুগম হয়ে যায়। এই বনেদী জমিদার পরিবার গুলো ছিল মুলতঃ ১৭২২ সনে নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ কর্তৃক সৃষ্ট ২৫টি জমিদারী ও ১৩টি জায়গীর প্রথার দশ সালা বন্দোবস্তে আওতাধীন জমিদার পরিবার সমূহ। এই দীর্ঘ দিনের ইতিহাস সমৃদ্ধ অভিজাত জমিদারদের হেষ্টিংস এর পঞ্চসনা বন্দোবস্তের মাধ্যমে উৎখাত করা হয়। এই জমিদারী নিলামের সর্বোচ্চ মুল্য হাঁকার ক্ষমতা তাদেরই ছিলো যারা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে বছরের পর বছর বাণিজ্য করে প্রচুর কাঁচা পয়সার মালিক হয়েছিল। এরা সবাই ছিল কোলকাতার বাঙালী হিন্দু বিত্তশালী বণিক শ্রেণী।

এরপর পঞ্চসনা বা পাঁচ সালা বন্দোবস্ত প্রথা বিলোপ করে এক সনা বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে নিলামী ব্যবস্থা বাতিল হয়ে বাৎসরিক মেয়াদে জমিদারের সঙ্গে রাজস্ব বন্দোবস্তের প্রথা চালু হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক কাউন্সিলও উঠিয়ে দেয়া হয় তার পরিবর্তে স্থাপিত হয় শক্তিশালী 'বোর্ড অব রেভেনিউ'। বোর্ড রাজস্ব আদায়ের জন্য জেলায় জেলায় নিয়োগ করে ইংরেজ কালেক্টর। যার অনিবার্য পরিণতিতে জেলায় জেলায় রাজস্ব আদায়ের সাথে জড়িত মুসলমান কর্মকর্তা চাকুরী হারান। কেননা শত শত বছর ধরে বাংলার মুসলিম শাসনের ফলে এই বিভাগের সমস্ত উচ্চ পদ গুলি মুসলিমদের দখলে ছিল। পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৭৮৯-৯০ সালে দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে রাজস্ব বিভাগ থেকে মুসলমানরা সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত হয়। এভাবে হাজার হাজার মুসলমান বেকার হয়ে পড়ে এবং আকস্মিক ভাবে সহায় সম্বলহীন হয়ে হতাশার চরম সীমায় নিমজ্জিত হয়।

১৭৯৩ সালে মার্চ মাসে দশ সনা বন্দোবস্তকে কর্ণওয়ালীস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে ঘোষণা করেন। বাংলার মুসলমানদের জন্য যা দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে আসে।[২৬] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণার ফলে যেমন চিরস্থায়ী ভিত্তিতে জমিদারী প্রথা সংক্রান্ত আইন চালু হয় তেমন সূর্যাস্ত আইনের বলে দু'বছরের মধ্যে বাংলার প্রায় অর্ধেক জমিদারী নিলাম হয়ে যায়। এ সম্পর্কে ভাষা আন্দোলন: অর্থনৈতিক পটভূমি গ্রন্থে বলা হয় : "বনেদী জমিদারগণ অধিকাংশই 'সূর্যাস্ত আইনের' সুবাদে জমিদারী হারায়। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল মুসলমান। তার ওপর মুসলমান আমলে লাখে রাজ সম্পত্তি বা নিষ্কর রায়তী স্বত্বের অধিকারী যে এক শ্রেণীর ভূমিমালিক ছিল, তাদের মালিকানার প্রকৃতি ছিল প্রায় ২৭ রকম। তার মধ্যে অধিকাংশ প্রকৃতির মালিকানাই মুসলমানদের দখলে ছিল। এর মধ্যে মাত্র 'আয়মা' সম্পত্তির মালিক বর্ধমান সহ চারটি জেলাতে ছিল প্রায় ৪০০০ জন। ১৮২৮ সালের নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইনে এসব সম্পত্তির অধিকাংশ মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার দরিদ্র হয়ে যায় বা ধ্বংস হয়ে যায়।"[২৭]

ইংরেজরা ভূমি মালিকানা ও রাজস্ব বিভাগ থেকে মুসলিমদের উৎখাত করা ছাড়াও একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করে। এর মূল উদ্দেশ্যেই ছিল রাজস্ব আদায়ের ওছিলায় হিন্দুদের মধ্য থেকে জমিদার নামক একটি অভিজাত শ্রেণী গড়ে তোলা। যাদের কাঁধে ভর করে তারা টিকিয়ে রাখবে শোষণ শাসন। অনভিজ্ঞ ইংরেজ কালেক্টর যে হিন্দু দীউয়ান সেরেস্তাদারদের সাহায্যে কাজ করত সেই হিন্দু দীউয়ান সেরেস্তাদার মুন্সী মুৎসুদ্দিদের নিয়ে সৃষ্টি করা হয় নতুন অভিজাত শ্রেণী। উইলিয়াম হান্টার এ বিষয়ে আলোকপাত করতে যেয়ে বলেন : "এ পর্যন্ত যে সব হিন্দু গোমস্তা অত্যন্ত ছোট খাটো স্তরের কাজে নিযুক্ত ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তারা সবাই জমিদার বনে গেল, জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করল এবং তাদের ঘরে সেই সব ধন দওলত জমা হতে লাগল যে গুলি পূর্বে মুসলমানদের আমলাদারীতে তাদের ঘরেই জমায়েত হত।"[২৮]

হান্টারের এই বক্তব্যের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় ১৮০৫-৬ সালের কলিকাতার বার্ষিক ডাইরেক্টরীতে। এতে বারো জন এদেশীয় বণিক দালাল ও মহাজনের নাম উল্লেখ আছে যারা সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং যাদেরকে কেন্দ্র করে নব্য অভিজাত শ্রেণীর জন্ম।[২৯]

পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্যায় ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের উত্থানের কাল যা সংঘটিত হয় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। এই উত্থানের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় ভাষা আন্দোলন ঃ অর্থনৈতিক পটভূমি গ্রন্থেও : "১৮৫৮ সালের এক হিসেবে বাঙ্গালী পরিচালিত কয়েকটি বড়ো বড়ো বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বৃহত্তর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ৯ টি এবং এর অংশীদারদের সংখ্যা মোট ১৮ জন। বলা বাহুল্য, উক্ত ১৮ জন অংশীদারের সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চবর্ণভূক্ত। এছাড়াও আরও ৬৫ জন বেনিয়ার নাম পাওয়া যায় যারা প্রত্যেকেই হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত এবং এদের অধিকাংশই উচ্চ-বর্ণজাত। ফলে ইংরেজ শাসনামলে বাংলার জমিদার বেনিয়া-ব্যবসায়ী ইত্যাদি যে সকল বিত্তশালী সামাজিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুদেরই ছিল একক প্রধান্য। বাংলার ব্যাপক মুসলমান জনগোষ্ঠী তো বটেই, এমনকি আগেকার মুসলিম আমলা-কর্মচারী পরিবারগুলিও ক্রমাগত নব্য জমিদারের অধীনস্থ রায়তে পরিণত হয়েছিল। তাই খুব নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগে যে সকল অ-কৃষক সামাজিক শ্রেণী গড়ে উঠেছিল তা মূলত : ছিল বাংলার হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ।"[৩০]

বৃটিশ শাসকদের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরতা তাদের প্রধান্য দেওয়ার পেছনে যে বিভেদনীতি কাজ করেছিল এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লন্ডনের কমন্সসভার সিনেট কমিটিতে স্যার জন ম্যাকসের ভাষণেও দুরভিসন্ধিমূলক বিভেদ নীতির কথা খোলা মেলা ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তার পেশকৃত বক্তব্যে বলা হয় : "আমার বিশ্বাস এই যে, মুসলিম জনসংখ্যার (বঙ্গীয় এলাকায়) একটা বিরাট অংশ তেমন সন্তুষ্ট নয়। কারণ এদের স্মৃতিতে ক্ষমতা হারাবার ভয়ংকর দহন বিদ্যমান রয়েছে। অথচ হিন্দুদের স্মৃতিতে এ ধরনের কোন জ্বালা নেই। তাই হিন্দুরা যদি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে কেউ বৃটিশ শক্তি বিশেষ ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না। এ জন্যই ভারত বর্ষে আমাদের (বৃটিশদের) নিরাপত্তার প্রধান অবলম্বনই হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন।"[৩১]

ইংরেজ শাসকদের বিভেদ নীতির জন্য এই মানসিকতা ও বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে এবং এভাবেই এর থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতির ফলে এ অঞ্চলের ইতিহাস হয়ে দাড়ায় মুসলিমদের অবস্থার ক্রমাবনতি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের উত্থানের ইতিহাস। গবেষক বিনয় ঘোষ এই জন্যই বলেছেন : "শোভাবাজার জোড়াসাঁকো পাথুরিয়াঘাটা, বাগবাজার, শ্যামবাজার, কলুটোলা প্রভৃতি অঞ্চলে নতুন রাজধানী কলকাতায় যখন ইংরেজ আমলের সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবার প্রতিষ্ঠাতারা ধন সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন মুর্শিদাবাদ, হুগলি প্রভৃতি পুরাতন মুসলমান শাসন কেন্দ্রে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ক্রম বিলুপ্তি ঘটছিল। বাঙালী দেওয়ান বেনিয়ান মুৎসুদ্দিদের মধ্যে মুসলমানদের নাম একরকম পাওয়াই যায় না বলা চলে।"[৩২]

দুই সম্প্রদায়ের প্রতি দুই ধরনের নীতির ফলে সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে মুসলিমরা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়। যদিও মুসলিমদের এই দুরবস্থার জন্য শাসকদের প্রতি তাদের অসহযোগিতামূলক মনোভাবও কিছুটা দায়ী ছিল সন্দেহ নাই। বিদেশী শাসকদের বৈরী মনোভাব একদিকে মুসলিমদের করে তুলেছিল ইংরেজ বিদ্বেষী অপরদিকে এই বিদ্বেষ কোম্পানীর বিভেদ নীতিকে করেছিল শক্তিশালী। ফলে হিন্দু মুসলমান দুই জাতি এই বোধ আরো দৃঢ়ভাবে এ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষের বক্তব্য হচ্ছে : "বাঙালী মুসলমানদের ইংরেজ বিদ্বেষ সেই সময় অনেক বেশী তীব্র ছিল। ... মুসলমান সমাজ এই সব ক্ষেত্রে, রাজ্যচ্যুতি ও মর্যাদাহানির বিক্ষোভ থেকে ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছেন। শিক্ষা, রাজসম্মান ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই তারা কোনো সুযোগ গ্রহণ করতে চাননি, বরং, তাদের অসহযোগ নীতির পূর্ণ সুযোগ ইংরেজরা তাদের শাসনস্বার্থে গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজরা সেই সুযোগে শিক্ষা ও অর্থ উভয় ক্ষেত্রে, সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভে হিন্দু সমাজকে সাহায্য করেছেন এবং সম্প্রদায়িক ভেদনীতির বীজ বপন করে ভবিষ্যতের জন্য তাদের সিংহাসনটিকে অটল করবার চেষ্টা করেছেন।"[৩৩]

এই সিংহাসন অটল রাখার আকাংখা নিয়েই এক সচেতন নীতির মাধ্যমে বৃটিশ কোম্পানী এদেশে 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল এই নীতি পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ মাত্র। একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যেমন রাজস্ব বিভাগের উচ্চ পদ থেকে মুসলমানরা অপসারিত হয় তেমন ভূমিমালিকানা থেকে তারা বঞ্চিতহতে থাকে। রাজস্ব বিভাগের উচ্চ পদ গুলো থেকে মুসলমান কর্মকর্তাদের অপসারিত করে ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগ করা হলেও তাদের অধীনে কর্মরত হিন্দু কর্মচারীরা যারা কৃষকদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করত তাদের অবস্থানের কোন হেরফের ঘটে নাই। তারা শুধু মুসলমান কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে ইংরেজ বস লাভ করলো এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগে নিজেরাই সম্পদশালী হয়ে উঠলো। অপর দিকে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে মুসলমান উচ্চবিত্ত এবং অভিজাত জমিদার শ্রেণীর পরিবর্তে হিন্দু উচ্চবিত্ত এবং অভিজাত জমিদার শ্রেণীর জন্ম হলো। এই নব্য জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব প্রত্যক্ষ বৃটিশ সহযোগিতার কথা বলতে যেয়ে নরহরি কবিরাজ তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালা গ্রন্থে বলেছেন : "নব সৃষ্ট জমিদার পরিবার গুলোর জন্মের ইতিহাস থেকে ইংরেজদের এই উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। প্রথমেই কাশিম বাজারের রাজপরিবারের উৎপত্তির কথা ধরা যাক। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু ওয়ারেন হেষ্টিংসের দেওয়ান ছিলেন হেষ্টিংসের কৃপায় নাটোরের রাজার জমিদারীর কিছুটা আত্মসাৎ করে তিনি বিরাট জমিদারীর মালিক হন।

হেষ্টিংসের অনুগ্রহে তার মুন্সী নবকিষণ কোলকাতার সব চেয়ে বড় জমিদার রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইনিই শোভাবাজার রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।

Dhaka University Institutional Repository

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন হুগলী থেকে কোলকাতা, সূতানটি, গোবিন্দপুর এসে বসতি স্থাপন করল, তখন তাদের সঙ্গে হুগলীর একদল বণিক এল কোলকাতায়। এই বণিক সমাজের প্রধান লক্ষীকান্ত ধর ওরফে নকু ধর কোম্পানীকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করেন। ইনিই আবার প্রথম মারাঠা যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য ইংরেজকে নয় লক্ষ টাকা সাহায্য করেন। কোম্পানী তাঁর পৌত্রকে মহারাজা উপাধিতে সম্মানিত করেন। এই লক্ষীকান্তের বংশধরেরাই কোলকাতার প্রসিদ্ধ পোস্তা রাজপরিবার।

কাঁদি ও পাইকপাড়া জমিদার বংশের ইতিহাসও একই ধরনের। পলাশীর যুদ্ধের আগে এই বংশের রাধাকান্ত সিংহ সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন ও ইংরেজকে সরকারী দলিলপত্র দিয়ে সাহায্য করেন। এই বংশের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন হেষ্টিংসের প্রধান সহায়, কাজেই কোম্পানীর অনুগ্রহে তাদের সম্পত্তি ও সম্পদ বেড়ে চলল।"[৩৪]

এই ধরনের আরো পরিবারের উদাহরণ তিনি উপস্থিতি করেছে। যাদের সমৃদ্ধি এবং উত্থান ঘটেছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অনুগ্রহে। যেমন পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর পরিবার, জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার, বড় বাজারের মল্লিক বংশ সিমলার ছাতুবাবুর বংশ হাটখোলার দত্ত বংশ ইত্যাদি।

পরবর্তীতে লর্ড বেন্টিঙ্ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে নব্য জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন : "গণ বিক্ষোভ বা গণ বিপ্লব থেকে নিরাপত্তা রক্ষার দিক থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটা বিশেষ মূল্য আছে। এই বন্দোবস্ত অন্যান্য অনেক দিক থেকে এবং অনেক মূল বিষয়ে একেবারে নিরর্থক হলেও বৃটিশ অধিপত্যের উপর নির্ভরশীল এক ধনী জমিদার গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছে।"[৩৫]

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এবং সচেতনভাবে এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করে ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভাষায় বড় বড় জমিদারেরা তাদের প্রচন্ড প্রভাব ব্যবহার করে থাকেন সরকারের বিরুদ্ধে এবং সেই জন্যই তাদের প্রভাব নষ্ট করা বাঞ্ছনীয়।[৩৬] এই প্রতিষ্ঠিত বড় বড় জমিদারদের ধ্বংস করে তাদের প্রভাব নষ্ট করে তার শূন্যস্থান পূরণকরার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে পূর্ব উল্লেখিত হিন্দু জমিদার শ্রেণী, যারা সর্বদা ছিল কোম্পানী শাসনের অনুকূলে। কোম্পানীও মুসলিম শাসনের প্রতি অনুরক্ত বড় বড় জমিদারদের ধ্বংস করে যে হিন্দু সুবিধাবাদী অভিজাত শ্রেণী গড়ে তুলবে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য থাকবে অবিচল। অর্থাৎ এই অঞ্চলে নব্য সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী এবং বৃটিশ শাসন হয়ে উঠেছিল পরস্পরের সম্পূরক শক্তি। এ জন্যই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক লর্ড কর্নওয়ালিস বলেছেন : "আমাদের নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই (এদেশের) ভূ-স্বামিগণকে আমাদের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে। যে ভূ-স্বামিগণ একটি লাভজনক ভূ-সম্পত্তি নিশ্চিত মনে ও সুখেশান্তিতে ভোগ করিতে পারে, তাহার মনে উহার কোন পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগিতেই পারে না।"[৩৭]

বাস্তবে ঘটে ছিলও তাই এই সব জমিদাররা কোলকাতায় রাজার হালে জীবন যাপন করত এবং বৃটিশের তাবেদারি করত। এভাবেই তারা এদেশে প্রায় দুশ বছর বিদেশী দুঃশাসনে সহায়তা করেছে। অপর দিকে বনেদী জমিদার শ্রেণী চরম ধ্বংসের মুখে পড়ে কালের আবর্তে নিঃশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই ধ্বংস যজ্ঞের উপর দাড়িয়ে ইংরেজ কোম্পানী এবং তাদের সৃষ্ট অভিজাত হিন্দু জমিদার শ্রেণী 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেছে। ফলে এ অঞ্চলের হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। ইষ্টি ইন্ডিয়া কোম্পানী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারী ব্যবস্থা চালু করে মুসলিম অভিজাত শ্রেণী ধ্বংস করে ছিল সম্পুর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। তবে এর পেছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য টুকু শুধু সীমাহীন শোষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, রাজস্ব সংক্রান্ত কাজকর্ম থেকে মুসলিমদের অপসারণ করে নিজস্ব অবস্থান দৃঢ় করার সাথেও সম্পৃক্ত ছিল। অপর দিকে মুসলমান জমিদার শ্রেণীর শূন্যস্থান পূরণের জন্য হিন্দু জমিদার শ্রেণী সৃষ্টির পেছনে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার বিষয় সমভাবে কাজ করেছে।

এখানে উল্লেখ্য ঊনবিংশ শতকের হিন্দু বণিক শ্রেণী শুধু মাত্র ব্যবসা বাণিজ্য করে পরিতৃপ্ত ছিলেন না। অনেকেই এতোবেশী সম্পদের মালিক হয়েছিলেন যে তাঁরা ইউরোপীয় ষ্টাইলে এদেশে শিল্প কারখানা স্থাপনের স্বপ্ন দেখে ছিলেন। হিন্দু বিত্তবানদের এই স্বপ্ন কৌশলে ধূলিসাৎ করে তাদের সম্ভাব্য দেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিদের ধ্বংস করাও কোম্পানীর ভূমি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল। যেহেতু কোম্পানী তাদের বিশ্বস্ত এবং অনুগত বণিক শ্রেণীকে অসন্তুষ্ট করা সঙ্গত মনে করেনি সেহেতু ভিন্ন ভাবে তাদের নিরস্ত করার পথ বেছে নেয়া হয়। আভিজাত্যহীন অথচ আভিজাত্যের মোহে মোহগ্রস্ত দেশীয় বণিক শ্রেণীর মানসিকতা বুঝে ঠিক সময়ে তাদের জমি ক্রয়ের ফাঁদে ফেলে দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালের ৬ মার্চ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লন্ডস্থ ডিরেক্টরদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছিলেন : "ভূমিস্বত্বকে নিরাপদ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশীয়দের হাতে যে বিরাট পুঁজি আছে সেটাকে তারা অন্য কোনো ভাবে নিয়োগ করার উপায় না দেখে ভূসম্পত্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করবে।"[৩৮] লর্ড কর্ণওয়ালীস আরও আশা করে ছিলেন যে, এর ফলে "ভূসম্পত্তি অভূতপূর্ব মূল্য ধারণ করবে, বর্তমানে কলকাতায় যে সব ধনীলোকের মহাপুঁজি শুধু লবণের ব্যবসা আর ফটকাবাজিতে নিয়োজিত তারা তাদের পুঁজি ভূমি ক্রয় ও উন্নয়নে বিনিয়োগ করবে।" [৩৯]

মূলতঃ এই বণিক শ্রেণীর হাতে প্রচুর অর্থ থাকলেও এদের সামাজিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত নিম্ন স্তরে। যে সমাজের আভিজাত্যের মাপকাঠি হচ্ছে ভূমির মালিকানা সে সমাজে অর্থ বিত্ত থাকা সত্ত্বেও এই বণিক শ্রেণী সমাজের চোখে ছিল সওদাগর, দালাল-কয়াল বা ফটকাবাজ। সুতরাং একমাত্র ভূমি ক্রয় তাদের দিতে পারে আভিজাত্য যা তারা অর্জন করেছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে।

বাঙালী হিন্দু বিত্তবান শ্রেণীর মধ্যে যারা শিল্পপতি হওয়ার আকাংখা হৃদয়ে লালন করতেন তাঁরা প্রায় সবাই কোম্পানীর কৌশলে জমিদারে রূপান্তরিত হলেন। সব কূল রক্ষা পেল শাসক গোষ্ঠীর। একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে তারা তাদের দেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিদের প্রায় নিঃশ্চিহ্ন করে একচেটিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের পথ নিষ্কন্টক রাখলো অপরদিকে সম্ভাব্য কিন্তু ধ্বংস প্রাপ্ত এই প্রতিদ্বন্দ্বিদের মধ্য থেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হলো এমন এক শ্রেণী যারা নব্য অভিজাত হলেও চিরকালের জন্য হয়ে রইল বৃটিশ সম্রাজ্যের শক্ত ভিত। অথচ এই অনুগত হিন্দু অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি করতে যেয়ে এই ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসর মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছিল মুসলমান অভিজাত পরিবারগুলোকে। সম্ভ্রান্ত, অবস্থাপন্ন, উচ্চপদস্থ মুসলমানরা ক্রমশ রাজ্যহারা সম্পদ হারা জীবিকা হারা হয়ে দারিদ্রের চরম সীমায় এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়।

আর্থ-সামাজিক পটভূমি

পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অর্থনীতির নির্মম শিকার বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভিন্ন ধারায় বিকাশের পেছনে বৃটিশ পুঁজির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ পুঁজির আগ্রাসনে যেমন নিশ্চল পরিবর্তন বিমুখ গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল, তেমন মোঘল আমলের অর্থনীতির মূল কাঠামো অর্থাৎ এশীয় উৎপাদন পদ্ধতির শেকড় উৎপাটন করে এ অঞ্চলের অর্থনীতিতে নুতন প্রাণের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রাণ প্রাচুর্য বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিকাশের স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়ে প্রথমে বৃটিশ বাণিজ্যিকগত পুঁজির প্রয়োজনে, পরবর্তীতে বৃটিশ শিল্প গত পুঁজির স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে এই পরিবর্তন স্বাভাবিক ছিল না ছিল অস্বাভাবিক চাপিয়ে দেয়া পরিবর্তন। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণেই এ অঞ্চলে না ঘটল মধ্য যুগীয় সামন্ত ব্যবস্থার অবসান; না হলো দেশীয় পুঁজির যথার্থ বিকাশ। বরং দুই-এর সমন্বয়ে সৃষ্টি হলো দুর্বল আর্থ-সামাজিক কাঠামো। অথচ প্রাচীনকাল থেকে মোঘলদের আগমনের আগ পর্যন্ত বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিকাশ ঘটেছে মোটামুটিভাবে নিজস্ব নিয়মে।

অধ্যাপক রংগলাল সেন বাংলার সামাজিক স্তর বিন্যাস করতে যেয়ে যে অর্থনৈতিক কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন কালানুক্রমিকভাবে তা হচ্ছে 'আদিম সাম্যবাদ, প্রাচ্য ধরনের দাস ব্যবস্থা ও সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্র।' যদিও তিনি বলেছেন সুক্ষ্ম তাত্ত্বিক বিচারে উপরোক্ত স্তর বিন্যাস সঠিক বলে প্রমাণিত নাও হতে পারে। তবু এই কাঠামোকে সামনে রেখে অতীতের শেকড়ে পৌছানো একেবারে অসম্ভব নয়।[৪০]

বাংলার আদিম যুগ সম্পর্কে এখনও স্পষ্ট ধারণা অসম্ভব। তবু নৃবিজ্ঞানী মর্গানের 'বন্যদশা' যুগটিকে বাংলার 'নিষাদ সমাজের' যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৪১] এর পরে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা; এই ব্যবস্থা বাঙালীর আদি পুরুষ অষ্ট্রিয়দের দ্বারা প্রবর্তিত হয়। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আর্থসামাজিক স্তর বিন্যাস দেখা দেয়। লৌহ যুগে পারিবারিক সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হয়। ধীরে ধীরে সমাজে সম্পদভিত্তিক শ্রেণী সৃষ্টি হতে থাকে। চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে বাংলায় কৃষি অর্থনীতি দৃঢ় হয়। সামাজিক স্তর বিন্যাস মূলতঃ শুরু হয় গুপ্ত শাসন শুরুর মধ্যদিয়ে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে।[৪২]

এরপর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় দাস সামন্ততন্ত্রের প্রথম পর্যায় শুরু হয়। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়ে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতায় ছিল গুপ্ত, পাল ও সেন বংশের রাজারা। এই সময়ে সমাজ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিন্যস্ত ছিল। যদিও এর বিন্যাস ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি স্তরে। তবু সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে চার বর্ণ দ্বিমাত্রিক শ্রেণী ব্যবস্থায় পরিণত হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নিয়ে শাসক শ্রেণী (যদিও সব

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করতে পারেননি, ফলে রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত যারা তার নিম্নস্তর ভুক্তই রয়ে গেছেন) এবং বৈশ্য ও শূদ্র মিলে হয় শাসিত গোষ্ঠী।[৪৩]

মৌর্য যুগে আমলাতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। যে ধরনের সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটে তা পাশ্চাত্যের সামন্ততন্ত্র থেকে ভিন্ন ধরনের। এতে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ব্যাহত হয়।[৪৪] তবে সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠার শুরু থেকে প্রাচীন বাংলার গ্রাম সমাজ এবং শহুরে সমাজ এ দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। গ্রাম সমাজ ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল আর শহুরে সমাজ ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। গ্রাম সংলগ্ন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরগুলির সাথে গ্রামগুলোর খুব একটা পার্থক্য ছিল না। তাছাড়া 'ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র' সদৃশ্য বাংলার চিরায়িত গ্রামীণ সমাজ ছিল সম্পূর্ণ পরিবর্তন বিমুখ। এ কারণেই কার্ল মার্কস বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজকে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় সমাজ' বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৫]

ঐতিহাসিক কোশাম্বীর মতে বাংলায় মুসলিম বিজয়ের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে তথা বাজারের বিকাশের একটি সম্পর্ক ছিল। মুসলিম বিজয়কালেও বাংলায় সনাতন উৎপাদন পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ত্রয়োদশ শতকের শরুতে বাংলায় বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক কাঠামো থেকে মুক্তিলাভের আশায় আগে যেমন সাধারণ জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল তেমন আবার ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে। এতে বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোর তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কেননা ইসলামের ধর্মীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের কোন যোগসূত্র ছিল না। এ সময়ে হিন্দু সমাজের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মধ্যস্তরের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। এক ধরনের লগ্নি পুঁজির প্রচলন হওয়াতে 'মহাজন' শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। গ্রামের ধনী মহাজন পরিণত হয় জমিদারে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের স্থান দখল করে মুসলমান উলেমারা। মুসলিম শাসন আমলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। অর্থনৈতিক মেরুদন্ড খাড়া রাখার স্বার্থে মুসলিম শাসকরা যেমন হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিল্পী শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক হয়, তেমন পেশাগত নিরাপত্তার খাতিরে এরাও মুসলমান শাসকদের সাথে নিজের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলে। এ সময়ে বহিরাগত মুসলিম এলিটবর্গের সঙ্গে উচ্চ জাতিবর্ণের হিন্দুদের সমঝোতা গড়ে ওঠে। এ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার অভূতপূর্ব নিদর্শন হচ্ছে, আকবরের প্রবর্তিত ধর্মীয় মতবাদ দীন-এ-এলাহী।[৪৬]

যদিও মোঘল আমলই বাংলার মুসলিম সমাজের মধ্যে একটি সামাজিক স্তর বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। ঐ সময়ই মুসলিম সমাজে 'আশরাফ আতরাফ' নামে সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী দুইটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। অবশ্য মুসলিম সমাজের এ স্তর বিন্যাসের সুনির্দিষ্ট কোন ধর্মীয় বা হিন্দু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মতো পেশাভিত্তিক কোন স্তর বিন্যাস ছিল না, বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ স্থানীয়।

বাংলায় সুলতানী আমলের স্ব-শাসনকালে এই অঞ্চলে একটি ইসলামীভাব আদর্শ গড়ে উঠে। বাংলার সুলতানরা দিল্লীর অধীনে থাকার চেয়ে বাংলায় বাঙালী হয়ে দেশ শাসনকে বেশী শ্রেয় মনে করতেন। তবে মোঘল আমলে এই স্ব-শাসন ব্যাহত হয়, যা অল্পকালের ব্যতিক্রমসহ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আগেই বলা হয়েছে মোঘল পূর্ব যুগে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ছিল নিজস্ব নিয়মে সৃষ্ট এবং পরিচালিত।

মোঘল আমলের পূর্ব সৃষ্ট বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে বলতে যেয়ে ওয়াহিদুল হক সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এক প্রবন্ধে বলেছেন: "মোঘল দখলের আগে বাংলা ছিল স্বশাসিত। বাইরের দখলদাররা বাংলায় এসে শাসনভার হাতে নিলেও, অচিরেই তারা স্বঘোষিত স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন এবং নিজেদের বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতেন। পাঠানদের শাসনের ফলে পূর্ব বাংলায় এক ধরনের সামাজিক বিকাশ ঘটে একে ইসলামী ভাবাদর্শই বলা চলে। তবে এ সময়ে এ ভাবাদর্শেই সকল জাতের অধিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল।"[৪৭]

পরবর্তীতে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে মোঘলরা এ অঞ্চল দখল করে নিলে বাংলার রাজনৈতিক স্বাধীনতার অবসান ঘটে। পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোয়। কার্ল মার্কসের মতে এশীয় উৎপাদন পদ্ধতির আওতায় নিশ্চল গ্রামীণ সমাজই ছিল এই কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য।

উপরে উল্লেখিত গ্রামীণ সমাজকে আশ্রয় করে এবং এর ভিতের উপর বেড়ে উঠতে থাকে এদেশের নিজস্ব স্থানীয় সামন্ত প্রথা। কিন্তু তুর্কী আফগান এবং মোঘল সম্রাটগণ এক কৃত্রিম কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় সামন্ত প্রথার সৃষ্টি করে দেশীয় সামন্ত প্রথার সহজ বিকাশ ব্যাহত করে। তখন মূলতঃ কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন জায়গীরদার ও সুবাদারগণ এবং গ্রামীণ সমাজ থেকে খাজনা আদায়কারী জমিদারগণ একাই ছিল রাষ্ট্রীয় সামন্ত প্রথার ভিত্তি। কেন্দ্রের শাসকগণের বাধা সত্ত্বেও কিছুটা হলেও দেশীয় সামন্ত প্রথার বিকাশ ঘটেছিল। ইউরোপীয় সামন্তবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে

Dhaka University Institutional Repository

লর্ডদের জমি যেমন ছিল সীমাহীন শোষণের শক্ত ঘাঁটি তেমন বাংলায় তথা ভারতে গ্রামীণ সমাজ ছিল প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি। তবু কেন্দ্রীয় শাসকগণের তীব্র শোষণ উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় জনগণ দেশীয় সামন্তরাজগণের পিছনে শক্তি হিসেবে কাজ করত। গণসমর্থনের ফলে স্বাধীনচেতা সামন্তরাজগণ যেমন প্রবল শক্তিশালী হয়ে উঠেন তেমন এদের প্রচন্ড আঘাতে মোঘল শক্তি হয়ে পড়ে দুর্বল। এই দুর্বলতার সুযোগে সমাজে আরেক পরিবর্তন দেখা দেয়। যে পরিবর্তনের ধারা শুধু নিশ্চল গ্রামীণ সমাজই নয় এ অঞ্চলের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সর্বস্তরের ভিত নড়বরে করে দিয়ে যায়। এই পরিবর্তনের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে বৃটিশ পুঁজির উপস্থাপকরা এবং তাদের সাথে অর্থনৈতিক স্বার্থে সম্পৃক্ত দেশীয় বণিক শ্রেণী।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই ভারতীয় সমাজে ধীর গতিতে এই শ্রেণী নিজ গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে থাকে। তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ফলেই তারা সমাজে ক্রমশ একটি বিশেষ শ্রেণীরূপে নিজেদের আসন করে নেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই এরা সমাজের একটা শক্তিশালী শ্রেণীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এরাই হচ্ছে ভারতীয় নিশ্চল সমাজকে সচলকারী প্রবল শক্তিধর মধ্য শ্রেণী। বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আশীর্বাদ পুষ্ট এই শ্রেণী বিদেশী বণিকদের সাথে যুক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোয় এক ভয়াবহ পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়। এর আগেও এদেশের উপর দিয়ে বহু রাজনৈতিক ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে; অথচ আর্থ-সামাজিক কাঠামোর এমন ব্যাপক পরিবর্তন ইতিপূর্বে আর কখনই লক্ষ্য করা যায়নি। যা দেখা গেছে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগ্রাসনের ফলে। এ সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম বলেছেন: "প্রাগ-বৃটিশ যুগের রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর ফলে ক্ষমতাশীন বিশেষ বংশ বা শ্রেণীই পরিবর্তিত হত এবং বাকী সমাজদেহ থাকত অনড়। এর ব্যত্যয় ঘটলো বৃটিশ শাসনের বেলায়। কোম্পানী বাহাদুর শুধু মুর্শিদাবাদের শাসকচক্রকে উৎখাত করেনি, দেশের সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতিটি স্তর, উপস্তর উপলব্ধি করে কোম্পানীর আধিপত্যের উপদ্রব। নবাব হারায় ক্ষমতা, অভিজাত শাসক শ্রেণী হারায় এর শাসনক্ষমতা ও অর্থনৈতিক শক্তি। জমিদার হারায় তার প্রভাব-প্রতিপত্তি সহায়সম্পত্তি। শোষিত রায়তশ্রেণী শুষ্কশীর্ণ অবস্থায় ঘন ঘন দুর্ভিক্ষে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। ব্যবসায়ী তার পুঁজি হারায়, হারায় তার অস্তিত্ব, তাঁতী; মালঙ্গী রূপান্তরিত হয় প্রায় ক্রীতদাসে এমনকি সংসারত্যাগী ফকীর সন্ন্যাসীরা পর্যন্ত ইংরেজ শাসনে শংকিত। তারা এখন আগের মত অবাধে ভিখ ও মুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে না। নিরাপদে তীর্থস্থান ভ্রমণ করতে পারে না। নবাবের সিংহাসন থেকে গরীবের পর্ণকুটির পর্যন্ত এমন আকাশপাতাল প্রলয়ংকরী ওলটপালট ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি।"[৪৮]

এই প্রলয়ংকরী ওলটপালটের ফলে শুরু হয় কোম্পানী কর্তৃক তীব্র অর্থনৈতিক শোষণ নিপীড়নের করুণ অধ্যায়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এই তীব্র শোষণ নির্মম নিপীড়ন প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বৃটিশ অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ বলেছিলেন: "কোন ব্যবসায়ী কোম্পানীর একচ্ছত্র শাসনই যে কোন দেশের বিভিন্ন প্রকারের শাসনব্যবস্থার মধ্যে নিকৃষ্টতম শাসন।"[৪৯]

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং কোম্পানীর এদেশীয় কর্মচারী অর্থাৎ গোমস্তা, বেনিয়া, জমিদার প্রভৃতিকে তাদের লুণ্ঠনের ভাগীদার করে সারা বাংলার বুকে শোষণ শাসনের তান্ডব নৃত্য শুরু করে। এই শোষণের তীব্রতা এতো বেশী ছিল যে, খোদ ইংল্যান্ডের মাটিতেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

তবে এটা ঠিক যে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শোষণের বুনিয়াদ ও শাসনের সুবিশাল যন্ত্র একদিনে গড়ে উঠেনি। পুঁজির অনুপ্রবেশ এবং এর স্বার্থে এ অঞ্চলের শিল্প কৃষি পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করা, গড়ে ওঠা বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি, সম্পদ ধ্বংস করার ইতিহাসও একদিনের নয়। প্রায় দেড়শত বছর ধরে ধীরে ধীরে বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে কোম্পানী যেমন আঠারো শতকের মধ্যে এ অঞ্চলের প্রবল অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেকে সুসংহত করেছিল, তেমন ঐ সময় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভাবের মহড়া শুরু করেছিল।[৫০]

শিল্প ধ্বংস

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ইংরেজ কোম্পানী ধীরে ধীরে এ অঞ্চল গ্রাস করার পায়তারা করছে তখনও বাংলা ছিল বস্ত্র শিল্প সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন পণ্য রপ্তানিযোগ্য অঞ্চল। বৃটিশ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যবসাই ছিল এদেশ থেকে নামমাত্র মূল্যে বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করে প্রচুর লাভের বিনিময়ে এ সমস্ত পণ্য বৃটেন অথবা ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করা। ঐ সময় বিশেষ করে বাংলা বিহারে চরকা এবং হাতে চালিত তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো বস্ত্রশিল্প ইংল্যান্ড কেন সমগ্র ইউরোপে কোথাও প্রস্তুত

Dhaka University Institutional Repository

হতো না। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক প্রেরিত এই সমস্ত বস্ত্র বৃটেন ও ইউরোপের বাজার প্লাবিত করে ফেললে, ইউরোপে প্রস্তুত নিম্নমানের বস্ত্র ভারতীয় উন্নতমানের বস্ত্রের কাছে মার খেয়ে যেতে থাকে। ফলে বৃটিশ বস্ত্র শিল্প মালিক সম্প্রদায় তাদের বস্ত্র শিল্প রক্ষার তাগিদে ভারতীয় বস্ত্র আমদানির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। (এখানে উল্লেখ্য যে ১৭৩৫ সালে অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের আগেই ইংল্যান্ডে বাংলার রেশমী বস্ত্র আমদানির বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপা হতে থাকে)। এতে যে প্রতিক্রিয়া হয় এর ফল দাঁড়ায় দুই ধরনের যেমন এক, বৃটেনের বাজারে এ অঞ্চলের বস্ত্র প্রবেশ ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে যায়। দুই, ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবসায়ের লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃটিশ পণ্য এ অঞ্চলে রপ্তানির প্রয়োজন দেখা দেয়। বস্ত্র শিল্প রক্ষা, বাণিজ্যিক ভারসাম্য ব্যবস্থা এবং ভারত থেকে লুণ্ঠিত ধন-সম্পদের সমন্বয়ে গ্রেট বৃটেনে শুরু হয় এক অভূতপূর্ব বিপ্লব। ইতিহাসে যা শিল্প বিপ্লব নামে খ্যাত।[৫১]

ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের অর্থ যেমন যোগান দিতে বাধ্য হয়েছিল বাংলার জনগণ তেমন বৃটিশ পুঁজিপতিদের মুনাফা লাভের আকাংখা চরিতার্থের নির্মমতার শিকারও হতে হয়েছিল এ অঞ্চলের জনগণকেই। কেননা ইউরোপে তাদের পণ্যের বাজার গড়ে তোলার স্বপ্ন প্রথমেই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। অথচ শিল্প বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন পণ্যের জন্য প্রয়োজন ছিল বিশাল বাজারের। বৃটিশ পুঁজিপতিরা এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইউরোপে অবাধ বাণিজ্যের ধূয়া তুলে ইউরোপের বাজার তাদের পণ্যে ছেয়ে দিতে চেয়েছিল। ফলে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো অবাধ বাণিজ্য নীতির উদ্দেশ্যমূলক আক্রমণ থেকে স্ব স্ব পণ্য রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে। বৃটিশ পুঁজির আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তারা বৃটিশ পণ্যের উচ্চহারে রক্ষা শুল্ক বসিয়ে এই অসম শিল্প নীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধের দেয়াল গড়ে তোলে। ফলে ইউরোপে বৃটিশ পণ্যের বাজারের সম্ভাবনা শুরুতেই ভেসে যায়। সুতরাং প্রয়োজন পড়ে বিশাল এবং নিশ্চিত এক বিকল্প বাজারের সে বাজার এমন হবে যা হারাবার শংকা কম। অধিকৃত বাংলা তথা ভারতবর্ষ পরিণত হলো বৃটিশ পণ্যের সেই বিশাল নিশ্চিত বাজারে। বৃটিশ পুঁজির স্বার্থে বলি হতে হলো বাংলার বস্ত্র শিল্পকে, বন্ধ হয়ে গেল এর উজ্জ্বলতম সম্ভাবনার দ্বার। প্রথমে এই সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছিল ইংল্যান্ডের বাজারে এ অঞ্চলের বস্ত্র পণ্য প্রবেশ নিষিদ্ধ করার কারণে। পরে এই শিল্প মার খেয়ে গেল উন্নতমানের যন্ত্রচালিত তাঁতে বোনা বৃটিশ বস্ত্র শিল্পের কাছে। ফলে যে বাংলা বা ভারতবর্ষ এক সময়ে ছিল শিল্পের রপ্তানিকারক, বিদেশী পুঁজির আক্রমণের অসহায় শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত পরিণত হলো আমদানিকারক দেশে। এই পুঁজি আক্রমণ এবং তার ধ্বংসাত্মক ভূমিকা সম্পর্কে মার্কস বলেছেন: "বাণিজ্যের সমস্ত চরিত্রই বদলাইয়া গিয়াছে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল রপ্তানিকারী দেশ, আর এখন ভারতবর্ষ আমদানীকারী দেশে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্তন এত দ্রুত দেখা দিয়াছে যে, এমনকি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দেই টাকার বিনিময়মূল্য দুই শিলিং ছয় পেন্স হইতে হ্রাস পাইয়া দুই শিলিংয়ে পরিণত হইয়াছে। যে ভারতবর্ষ স্মরণাতীতকাল হইতে সমগ্র বিশ্বের বস্ত্রের কারখানা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, সেই ভারতবর্ষ এখন ইংল্যান্ডে উৎপন্ন সুতা ও তুলাজাত দ্রব্যের দ্বারা প্লাবিত হইল।...ইহার অনিবার্য পরিণতি হইল বিখ্যাত ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ধ্বংস।"[৫২]

১৭৭০ সাল থেকে বৃটেনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্যগত পুঁজিতন্ত্র বনাম শিল্পজাত পুঁজিতন্ত্রের যে লড়াই ছিল তার জয় ক্রমশ শিল্পজাত পুঁজিতন্ত্রের দিকে ধাবিত হতে থাকে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ইংল্যান্ডের শিল্পপতিরা সরকারের উপর কর্তৃত্ব অর্জনের যে প্রচেষ্টা চালায় তাতে তারা সাফল্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের স্বার্থে ভারতীয় শিল্প ধ্বংসের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে। কোম্পানীর রাজনৈতিক অধিকার খর্বকারী ১৭৭৩ সালের লর্ড নর্থের রেগুলেটিং এ্যাক্ট ও ১৭৭৪ সালে পিটের ইন্ডিয়া এ্যাক্ট এই ব্যবস্থা গ্রহণের বাস্তব পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বাস্তব পদক্ষেপ এবং এর ক্রুদ্ধ আক্রোশে ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায় বাংলার প্রতিষ্ঠিত শিল্প; বস্ত্র শিল্পসহ অন্যান্য শিল্প। শুরু হয়ে যায় শিল্প সমৃদ্ধ সুজলা সুফলা বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ধ্বংসের ধ্বংসাত্মক তান্ডবলীলা।

এ ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের পরিণতি হয় এই যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দখলকৃত ভারতীয় অঞ্চল সমূহের কুটীর শিল্প ধ্বংসের সাথে সাথে প্রাচীন গ্রামীণ সমাজের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। অথচ এ ধ্বংসের উপর এমন কোন আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি যা এই অঞ্চলের জন্য শুভ বলে বিবেচিত হয়েছে। এ কারণে মার্কস এই অঞ্চলের পরিবর্তন বিমুখ নিশ্চল গ্রামীণ সমাজ ধ্বংসের জন্য যেমন সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তেমন এই ধ্বংসের উপর নূতন কোন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে হয়ে উঠেছেন তীব্র সমালোচনামুখর। তাঁর ভাষায় এই পরিবর্তনের দুঃখজনক পরিণতি যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তা উল্লেখ করা হলো: "বিভিন্ন সময়ের গৃহযুদ্ধ, বিভিন্ন আক্রমণ, বিভিন্ন রাজ্য দখল, সকল দুর্ভিক্ষ—এইগুলি হিন্দুস্থানের বুকের উপর যতই অদ্ভুত রকমের জটিল, যতই দ্রুত যতই ধ্বংসকারী রূপে একটার পর

Dhaka University Institutional Repository

একটা ঘটুক না কেন, এইগুলি কখনই ভারতীয় সমাজের উপরের স্তর ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইংল্যান্ড ভারতীয় সমাজের ভিত্তিমূল ও কাঠামোটা ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পুনর্গঠনের কোন লক্ষণ এ পর্যন্ত দেখা দেয় নাই। পুরাতন সমাজ হারাবার ও তাহার পরিবর্তে কোন নূতন সমাজ সৃষ্টি না হইবার ফলে...অসহনীয় দুঃখের জীবনে বিশেষ ধরনের একটা বিষন্নতার ভাব ফুটিয়া উঠে এবং বৃটেন দ্বারা শাসিত হিন্দুস্থান তাহার সকল প্রাচীন ঐতিহ্য ও সমগ্র প্রাচীন ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।"[৫৩]

বাংলার শোষিত নিপীড়িত জনগণের মৃত্যু ধ্বংস আর সম্পদের বিনিময়ে ইংল্যান্ডে গড়ে উঠা শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের প্রয়োজনীয় বাজার লাভের জন্য এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার আত্মসাৎকৃত অর্থ সম্পদ বৃটিশদের মনে ভারতীয় সম্পদের প্রতি যে লোভের জন্ম দিয়েছিল, সেই সম্পদ লিপ্সা এবং বাজার সৃষ্টির আকাংখা দুইই সমগ্র উপমহাদেশ দখলে ইংরেজদের উৎসাহিত করতে থাকে।

এদিকে ১৮১৩ সালের চার্টারে শিল্প পুঁজিতন্ত্রের জয় সূচিত হলে, ভারতে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। ১৮১৩-এর চার্টার আইন অনুসারে কোম্পানীর এই অধিকার অবসানের তাৎপর্য হলো যে, এখন থেকে ভারতবর্ষ সরাসরি বৃটিশ শিল্পগত পুঁজির অবাধ শোষণের উপনিবেশে পরিণত হলো।[৫৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তার সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রক্রিয়া চালু হবার পর বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের আরেকটি সম্ভাবনা দেখা দেয়। কেননা উক্ত চার্টার অনুযায়ী এ অঞ্চলে ইংল্যান্ড থেকে পুঁজি আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে দেশীয় বেনিয়া ও ব্যবসায়ীদের হাতে সঞ্চিত হতে থাকে বিপুল পরিমাণের অর্থ। এই দেশীয় পুঁজির সাথে ইংল্যান্ড থেকে আগত পুঁজির সমন্বয়ে অথবা স্বাধীনভাবে বাংলাদেশে শিল্প গড়ে তোলা এবং বিকাশের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশী পুঁজি শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের পথ একেবারেই বন্ধ করে দেয়া হয়। বাংলার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যে ভিন্ন ধারার বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবেই বৃটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হতে থাকে।

এ কারণেই ১৮৫৭ সালের ভারতীয় প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ পুঁজি বাংলায় লগ্নি হলেও এর সুফল বাংলার জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন বা এতে বাংলার অর্থনীতির বিন্দুমাত্র উন্নতি সাধিত হয়নি। এই লগ্নিকৃত পুঁজি ছিল মূলতঃ বাণিজ্য পুঁজি, ফলে এ পুঁজির জন্য সহায়ক শিল্প ব্যতীত অন্য কোন কিছু এ অঞ্চলে গড়ে উঠতে দেখা যায়নি। এর আরেকটি দিক হচ্ছে লগ্নিকৃত পুঁজির সমস্ত মুনাফাই চলে গেছে সমুদ্র পার হয়ে বৃটিশ শিল্পপতিদের হাতে। ফলে যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দ্বার বাংলায় উন্মোচিত হওয়ার কথা তা হয়ে যায় রুদ্ধ। নিম্নের সারণীতে ১৮৫৮-৫৯ সাল থেকে ১৯১৩-১৪ সাল পর্যন্ত আমদানি পুঁজি ও রপ্তানি পুঁজির যে পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে, এ অঞ্চলে নিয়োগকৃত পুঁজির অতিরিক্ত মুনাফাও পাচার হয়ে গেছে।

১৮৫৮-৫৯ সাল থেকে ১৯১৩-১৪ সাল পর্যন্ত আমদানি পুঁজি ও রপ্তানি পুঁজির পরিমাণ

কোটি রুপী হিসাবে

সময়	আমদানি পুঁজির পরিমাণ	রপ্তানি পুঁজির পরিমাণ	অতিরিক্ত রপ্তানি
১৮৫৮-৫৯	২৪,৩০,০০০০০	২৮,৯০,০০০০০	৪,৬০,০০০০০
১৮৭৯-৮০	৪১,২০,০০০০০	৬৯,২০,০০০০০	২৮,০০০০০০০
১৮৯৫-৯৬	৭৩,০০০০০০০	১১৮,৬০,০০০০০	৪৫,৬০,০০০০০
১৯১৩-১৪	১৯১,০০০০০০০	২৪৯,০০০০০০০	৫৮,০০০০০০০

সূত্র : আতিউর রহমান, লেনিন আজাদ: *ভাষা আন্দোলন অর্থনৈতিক পটভূমি* পৃষ্ঠা ৩০

উপরোক্ত সারণী অনুসারে অর্জিত মুনাফা সমেত পুঁজির রপ্তানির ফলে এ অঞ্চলে পুঁজি গড়ে উঠতে না পারার কারণে স্থানীয় পুঁজির গতিমুখ হয়ে পড়ে স্তব্ধ। এ কারণে উনিশ শতকের প্রথমার্ধকাল পর্যন্ত দেশী বণিক শ্রেণী শিল্প বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে জমিদারী ক্রয় করে, অথবা শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে অন্য কোন পেশায় আত্মনিয়োগ করে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি ধ্বংস

অপরদিকে বাংলার শিল্প অর্থাৎ বস্ত্রশিল্প থেকে লবণ শিল্প পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর বাংলার জনগণের কৃষি ছাড়া আর কোন জীবিকার উপর নির্ভর করার উপায় ছিল না। অথচ আকস্মিকভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার ফলে বাংলার কৃষক শ্রেণী একদিকে সর্বগ্রাসী জমিদার শ্রেণী এবং অপরদিকে বৃটিশ পণ্যের নির্মম শোষণের অসহায় শিকারে পরিণত হয়।

দেশীয় বণিক শ্রেণীর ধ্বংস লগ্নিপুঁজির ব্যাপক প্রভাব এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রেও এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এবং লগ্নি পুঁজির বাজারের জন্য কৃষিপণ্য সরবরাহ করার কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা মূলতঃ বাজার মুখী হয়ে পড়ে। এ কারণে গ্রামীণ সমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণা সমবায় জীবন ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। এর পরিবর্তে প্রতিযোগীমূলক এবং ব্যক্তি স্বার্থ নির্ভর মানসিকতার বিকাশ ঘটে।[৫৫] কেননা ধনতান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ।

সুতরাং বৃটিশ ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের আদর্শ বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সঞ্চারিত করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়। এই আদর্শের ভিত্তিতে এ অঞ্চলের শাসন শোষণ ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস করা হয় এবং এই পুনর্বিন্যাস প্রচেষ্টার প্রথম ধ্বংসাত্মক আঘাত এসে লাগে বাংলা বিহারের গ্রাম সমাজ ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থায়। জমির উপর কৃষকের ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভূসম্পত্তির উপর গ্রাম সমাজের যৌথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এছাড়া প্রাগ বৃটিশ যুগে রাজস্ব হিসেবে গ্রামের সমগ্র জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের একাংশ গ্রাম সমাজের যৌথ অধিকার ভোগী কৃষকরা সমবেতভাবে প্রদান করত। রাষ্ট্র রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করত মোট ফসলের একটা অংশ। মুদ্রায় কর প্রদান ছিল সম্পূর্ণরূপে গ্রাম সমাজের ইচ্ছা নির্ভর। কিন্তু নূতন ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে যেমন সর্বত্র ব্যক্তিগতভাবে ভূমি রাজস্ব ধার্যবিধি প্রবর্তিত হয়, তেমন শাসক কর্তৃক তাদের ইচ্ছামত ভূমির নির্ধারিত মূল্যের ভিত্তিতে নগদ অর্থের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের নিয়ম চালু হয়। যে কোন অবস্থায় বা যে কোন পরিস্থিতিতে কৃষক বাৎসরিক ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে এই নির্দিষ্ট কর বা খাজনা দিতে বাধ্য হতো। কোন অবস্থাতেই এই খাজনা থেকে কৃষকের মুক্তি পাওয়ার উপায় ছিল না। এই নূতন ভূমি ব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে বলতে যেয়ে স্যালভেনকার বলেছেন: "নূতন শাসকগোষ্ঠী যে কৃষি ব্যবস্থাকে বলপূর্বক ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই কৃষি ব্যবস্থা বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং বৃটিশ পূর্ব যুগের শস্যের পরিবর্তে মুদ্রা দ্বারা ভূমি রাজস্ব প্রদানের নিয়ম প্রবর্তনের ফলে আরও দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। যাহা এতদিন চিরাচরিত প্রথা হিসেবেই অপরিবর্তনীয় ছিল, তাহা মুদ্রার প্রচলনের ফলে ধ্বংস হইয়া যায়...ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদের দ্বারা কৃষি ভূমির ইজারা দান বিক্রয় বন্ধক প্রভৃতি যাহা বৃটিশ পূর্ব যুগে আত্মসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের যৌথ বিচার বিবেচনার দ্বারা তদারক ও নিয়ন্ত্রিত করা হইত, তাহা এখন ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক কৃষকই বৃটিশ আইনের বলে এবং নূতন বিচারালয়ে যাইয়া অর্থ গৃধ্ন আইনজীবীদের সাহায্যে সম্পন্ন করিয়া ফেলিতে পারে।"[৫৬]

এভাবে ভূমি ব্যবস্থায় চাপিয়ে দেয়া পরিবর্তনের ফলে শুধু গ্রাম সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভাঙ্গন ধরেনি যৌথ পরিবারগুলোর মধ্যেও ভাঙ্গন দেখা দেয়। "লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক চাপের ফলে জমিজমার পারিবারিক হোল্ডিং ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে থাকে এবং কৃষকরা মহাজনদের খপ্পরে নিপতিত হয়।"[৫৭]

মহাজনের খপ্পরে পড়েই কৃষকরা ক্রমশঃ সমাজের এক নিঃস্বশ্রেণীতে পরিণত হতে থাকে। বৃটিশ শাসকদের মূল উদ্দেশ্য যেমন ছিল অবাধ শোষণ তেমন এদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহায়তায় সৃষ্টি হতে থকে সমাজের স্তরে স্তরে শোষক শ্রেণীর। প্রাগ বৃটিশ যুগে যে ভারতের গ্রামীণ সমাজে মহাজন ছিল সমাজসেবক কৃষকের ত্রাণকর্তা সেই মহাজন শ্রেণীই বৃটিশ ভারতে পরিণত হলো ঋণগ্রস্ত অসহায় কৃষকের জমি আত্মসাৎকারী হিসেবে। এ সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় বলেছেন: "বৃটিশ শাসনের যুগে পূর্বের সকল ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিল। এই বৈদেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় নিরীহ সমাজসেবক মহাজন প্রাণঘাতী শোষকে পরিণত হইল।"[৫৮]

এইভাবে ঋণগ্রস্ত কৃষকের জমি আত্মসাৎ করে মহাজন পরিণত হয় জমির মালিকে এবং জমির সত্ত্বাধিকারী কৃষক রূপান্তরিত হয় ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকে অথবা ভাগ চাষীতে। এই রূপান্তর সম্পর্কে বলতে যেয়ে ঐতিহাসিক রজনী পাম দত্ত বলেছেন: "মহাজন কৃষকগণকেই শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করিয়া ক্রমশঃ গ্রামের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র মূলধনীর ভূমিকা গ্রহণ করে। কৃষকের সমস্ত দুঃখ দুর্দশার মূল কারণ ও প্রত্যক্ষ উৎপীড়ক হিসেবে হয়ত প্রথমে মহাজনের উপরই

Dhaka University Institutional Repository

কৃষকের ক্রোধানল বর্ষিত হইতে পারে কিন্তু তাহারা শীঘ্রই দেখিতে পায় যে, মহাজনের পশ্চাতেই দন্ডায়মান রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র শক্তি। মহাজনই হইল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনও মহাজনী মূলধনের (Finance Capital-এর) সমগ্র শোষণচক্রের একটি অপরিহার্য মূলদণ্ড স্বরূপ।"[৫৯]

এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষক শ্রেণীর উপর নেমে আসে চরম শোষণ নির্যাতনের যাতাকল। বৃটিশ ভারতে কৃষকদেরকে তিন ধরনের শোষকের মুখোমুখি হতে হয় যেমন প্রথম বৃটিশ শাসক শ্রেণী; যারা আদায় করত ভূমি রাজস্ব দ্বিতীয় জমিদার শ্রেণী; যারা আদায় করত খাজনা এবং তৃতীয় শোষক মহাজন শ্রেণী; যাদের দিতে হতো ঋণের সুদ হিসেবে কৃষকের অবশিষ্ট ফসলের সবটাই।[৬০] ভারতের বৃটিশ ধনতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার মূল এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শোষণ; এই শোষণ নির্বিঘ্নে করার লক্ষ্যে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় আনা হয় এই জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল একটাই : "বিশেষ অর্থনৈতিক শোষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাতে ভারতীয় কৃষক কেবল বৃটিশ শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা পূরণ করবে এবং বৃটিশ কল কারখানায় যন্ত্র দ্বারা উৎপন্ন পণ্য সম্ভার ক্রয় করবে। বৃটিশ শিল্পের প্রয়োজনেই ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নূতন কৃষি বিপ্লব সম্পন্ন করা হয়। সেই প্রয়োজনেই গ্রামাঞ্চলে মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন করে প্রাচীন গ্রাম সমাজের ধ্বংসাবশেষ এবং বস্ত্র লবণ প্রভৃতি কৃষকদের শিল্পগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়।"[৬১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মুদ্রার প্রচলন অর্থের মাধ্যমে রাজস্ব প্রদানের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা, জমিতে কৃষকদের ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা, বাজারমুখী কৃষি উৎপাদন, সর্বোপরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষি ব্যবস্থার এই অযাচিত পরিবর্তনে বাংলার কৃষকের মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে। বৃটিশ রাজত্বকালে কৃষক শ্রেণীর মেরুদন্ড খাড়া করে দাঁড়াবার আর কোন উপায় থাকে না। তার উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী জগদ্দল পাথরের মতো বাংলার কৃষকের বুকে চেপে বসে। ভূমির রাজস্ব উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জমির উৎপাদন উত্তর উত্তর কমতে থাকে। এ সময়ে সম্পদ উন্নয়নের বা জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাথমিকভাবে এই উন্নয়নের দায়দায়িত্ব বর্তেছিল কৃষক এবং জমিদার শ্রেণীর উপর। কিন্তু নানা সমস্যায় জর্জরিত এবং রাজস্বের ভারে নত কৃষকগণের আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনে হলেও কৃষির ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব ছিল না। অপরদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তের কারণে জমিদার শ্রেণীর পায়ের নীচে মাটিও স্থায়ী হতে পারেনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত অনুসরে জমিদারগণ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেয় রাজস্ব সরকারকে দিতে অক্ষম হলে সরকার তাদের জমিদারী থেকে প্রয়োজনমত জমির অংশ বিক্রি করে বাকী রাজস্ব আদায় করার ক্ষমতা লাভ করে। যার ফলে জমিদার শ্রেণীর উপর ধার্য বিপুল পরিমাণ রাজস্ব সঠিক সময়ে দিতে না পারার কারণে অনেককেই জমিদারীর অংশ অথবা পুরো জমিদারীই হারাতে হতো। এ কারণেই এরা এদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতো রাজস্ব আদায়ে, জমির উন্নয়নে নয়। এভাবেই পুরাতন অভিজাত জমিদার শ্রেণী রাজস্ব দিতে অপরাগতার কারণে জমিদারী অংশ বা পুরো জমিদারী হারায়। আর এই বাজেয়াপ্ত ভূসম্পত্তি কিনে নিতে থাকে তৎকালীন সমাজের ধনী মহাজন, কোম্পানীর বেনিয়া ও মুৎসুদ্ধিগণ। যারা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে জমিজমার সঙ্গে বহু বছরের সম্পর্ক যুক্ত বনেদী জমিদার শ্রেণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর স্থান দখল করে নেয় শহরবাসী জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ উপরোক্ত ধনী ব্যক্তিবর্গ। এই নব্য জমিদার শ্রেণীর রাজস্ব আদায়ের প্রতি পুরোমাত্রায় আগ্রহ থাকলেও জমির প্রতি বিন্দুমাত্র দরদ ছিল না। এরা অনুপস্থিতি জমিদার (Absentee landlord) হিসেবে জমি থেকে প্রাপ্ত অর্থে শহরে নিশ্চিন্তে বিলাস ব্যাসনে দিনযাপন করত। এই অবস্থায় অর্থের প্রয়োজন হলেই এরা জমির উপর রাজস্ব বৃদ্ধি করত। কর ভারে জর্জরিত কৃষক অতিরিক্ত রাজস্ব দিতে অক্ষম হয়ে দৈহিক নিপীড়নের ভয়ে জমি ছেড়ে পালিয়ে বাঁচত। একদিকে অনুপস্থিত জমিদার শ্রেণীর নায়েম গোমস্তা কর্মচারীদের সীমাহীন অত্যাচার এবং নব সৃষ্ট মধ্যস্বত্ব ভোগী শ্রেণীর তীব্র শোষণ, ক্রমবর্ধমান রাজস্বের হার অপরদিকে জমির উৎপাদন শক্তি হ্রাস, ফলে বাংলার কৃষকের সাথে কৃষি ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং ভূমির উপর চাপিয়ে দেয়া পরিবর্তন ক্রমশঃ কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংসের ইতিহাসে রূপ নেয়।

শুধু কৃষি নয় পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সারা অঞ্চল জুড়ে সর্বত্র শুরু হয় এক অস্থিতিশীল রাজনৈতিক এবং প্রবল সামাজিক অস্থিরতা। চরম শোষণ শাসনের শিকার দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বাংলার কৃষক সাধারণ মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। বাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ক্রমাগত স্থানে স্থানে

Dhaka University Institutional Repository

জ্বলতে থাকে বিদ্রোহের আগুন। পলাশীর বিপর্যয়ের পর থেকে শুরু হয় এই বিদ্রোহ। এ ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত ক্রমাগত বিদ্রোহ চলতে থাকে।[৬২]

সর্বোপরি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগুন দাবানলের মতো সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে কোম্পানীর শাসনের ভিত্তিতে ধ্বস নামে। কোম্পানীর শাসন অবসানের পরও সুন্দরবন অঞ্চলে ১৮৬১ সালে, সিরাজগঞ্জে ১৮৭২ সালে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই সমস্ত বিদ্রোহগুলোতে কোম্পানী আমলে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী দৃঢ়ভাবে শাসকদের পক্ষ অবলম্বন করে।

তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে শুধু একটি তাবেদার শ্রেণী গড়ে তুললেও এর ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ধীরে ধীরে যে স্তর বিন্যাস দেখা দেয়। তার মধ্য থেকে এমন এক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। যারা সামাজিক অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য বৃটিশ শোষণ শাসনকে দৃঢ়ভাবে দায়ী করতে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে অন্তরায় সৃষ্টি করতে থাকে। যদিও প্রথম দিকে এই নব্য সৃষ্ট শিক্ষিত শ্রেণী অনুগত জমিদার শ্রেণীর মতই বৃটিশ প্রভুর ভক্ত ছিল। পরবর্তীতে এরাই বৃটিশ শাসন শোষণের শেকড় উপড়ে ফেলার আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। এই শ্রেণীই হচ্ছে বাংলা তথা ভারতের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে পরিচালিত প্রায় সমস্ত আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এ শ্রেণীর মধ্যেই প্রথম জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১।	C. H Philips (ed.),	ঃ	The Evolution of India and Pakistan, 1858-1947, Select Document P. 354.
২।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ পৃষ্ঠা ৪৪৮।
৩।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৪৪৮।
৪।	Moudud Ahmed,	ঃ	Bangladesh: Constitutional Quest For Autonomy P. 3
৫।	ওলন্দাজ বণিকরা ইংল্যান্ডে গরম মশলা সরবরাহ করত। এরা হঠাৎ করে গোল মরিচের মূল্য পাউণ্ড প্রতি পাঁচ শিলিং বাড়িয়ে দেয়। ইংল্যান্ডে এর তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। এ সময়ে ১৫৯৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর চব্বিশ জন ধনী ব্যবসায়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানী গঠন করে। তিন মাসের মধ্যে কোম্পানী রাণী প্রথম এলিজাবেথের কাছ থেকে উত্তমাশা অন্তরীপের অপর প্রান্তে সকল অঞ্চলে অবাধ বাণিজ্যের পূর্ণ অধিকার লাভ করে। এক বছরের মধ্যে কোম্পানীর বাণিজ্য তরী ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সুরাট বন্দরে নোঙ্গর করে। বাণিজ্য তরী হেক্টরের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হলে মোঘল সম্রাট তাকে আশাতীত অভ্যর্থনা জানিয়ে ক্ষান্ত হননি তাকে মহামূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করেন এবং শাহী ফরমানের মাধ্যমে সুরাট বন্দরে বানিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দান করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে বাণিজ্যে কোম্পানী অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে। এই কোম্পানীর বদৌলতে পরবর্তী একশ বছরে ইংল্যান্ডে শিল্প-পুঁজির দ্রুত বিকাশ ঘটে এবং আরো অর্ধ শতাব্দী পরে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়। কোম্পানী হয়ে ওঠে এদেশের ভাগ্য বিধাতা। সৈয়দ মকসুদ আলী রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ পৃষ্ঠা ১-২।		
৬।	১৬৩৩ সালের মে মাসে মহানদীর মুখে হরিহরপুরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের দীর্ঘকাল পরে ১৬৫১ সালে হুগলী শহরে আরেকটি কুঠি স্থাপিত হয়। ঐ বৎসর মাত্র তিন হাজার টাকা বাৎসরিক রাজস্ব প্রদানের শর্তে কোম্পানী শাহজাদা সুজার কাছ থেকে বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। ফলে কোম্পানীর বাণিজ্য দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৬৫৮ সালে কাশিমবাজার ও পাটনা, ১৬৬৮ সালে ঢাকা রাজমহল ও মালদহ প্রভৃতি স্থানে নূতন নূতন কুঠি স্থাপন করা হয়। ১৬৮০ সালের মধ্যে সারাদেশে বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের সঙ্গে কোম্পানীর সংঘাতও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৬৮৬ সাল থেকে ১৬৮৯ সাল পর্যন্ত মোঘল সরকার ও কোম্পানীর মধ্যে জলে স্থলে যুদ্ধ চলে। ১৬৯০ সালে কোম্পানী সম্রাট আওরঙ্গজেবের সঙ্গে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে তিন হাজার টাকা বাৎসরিক রাজস্ব প্রদানের শর্তে পুনরায় সারাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। ১৬৯৮ সালে কোম্পানী কোলকাতা, সুতানটি; গোবিন্দপুর তিনটি গ্রামের জমিদারী সনদ লাভ করে এবং ফোর্ট ইউলিয়াম দুর্গ প্রতিমা করে ও ভবিষ্যৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতস্থাপন করে। মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য বাংলাদেশের ইতিহাস পৃষ্ঠা ৩৪১-৩৪২।		
৭।	মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	বাংলাদেশের ইতিহাস পৃষ্ঠা ৩৪২-৪৩।
৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩১৯-৩২০।
৯।	জগৎ শেঠের পূর্বপুরুষরা ছিলেন মাড়োয়ারের অধিবাসী। পাটনায় আসেন ব্যবসা উপলক্ষে। এই বংশের বণিক চাঁদ ঢাকায় অর্থ ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী কারণে মুর্শিদ কুলী খাঁর সঙ্গে মুর্শিদবাদে চলে আসেন। পরবর্তী বংশধর ফতে চাঁদ বা জগৎ শেঠের আমলে এ বংশের ব্যবসা সারা ভারতে ছড়িয়ে পরে। এর সমৃদ্ধি এতোখানি বৃদ্ধি পায় যে বার্ক এই পরিবারের কারাবারের সঙ্গে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের কারবারের তুলনা করেন। জগৎ শেঠ পরিবার বাংলার নবাব এবং জমিদারদের ব্যাংক হিসেবে কাজ করতো। নবাব এই পরিবারের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল ছিলেন বলে এই পরিবারের বিরাট রাজনৈতিক প্রভাব গড়ে ওঠে। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন জগৎ শেঠ। ১৭১৮ সাল থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত এই ৪২ বছর ধরে জগৎ শেঠের পরিবার বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে অভাবিত প্রভাব বিস্তারেসক্ষম হয়। নরহরি কবিরাজ। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা পৃষ্ঠা ১৩।		

Dhaka University Institutional Repository

১০।	**Rangalal Sen**	ঃ	**Political Elites in Bangladesh** P. 119
১১।	এম, আর, আখতার, মুকুল	ঃ	কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী পৃষ্ঠা ২৯।
১২।	কার্ল মার্কস	ঃ	ক্যাপিটাল ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৯৪।
১৩।	উইলিয়াম হান্টার তার দি ইন্ডিয়ান মুসলমান গ্রন্থে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে বলতে যেয়ে বলেছেন : 'সেনা দলে নিয়োগ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। কোনো উচ্চ বংশজাত মুসলমান এখন আমাদের সেনা দলে প্রবেশাধিকার পায় না। যদিও বা আমাদের সেনা দলে তার চাকরি মেলে, তাহলেও তার পূর্বেকার মতো উপার্জনের সম্ভাবনা আর নেই।' তিনি তার গ্রন্থে আরো লিখেছেন : 'খুব কম সংখ্যক মুসলমানই গবর্ণর জেনারেলের কমিশনপ্রাপ্ত আছেন এবং আমার জানা মতে মহারাণীর কমিশনপ্রাপ্ত আছেন এবং আমার জানামতে মহারাণীর কমিশনপ্রাপ্ত একজনও নেই। এখন ভারতবাসী একজন সামান্য সিপাই হিসেবেই ফৌজে ঢুকতে পারে...।' উইলিয়াম হান্টার, দিন ইন্ডিয়ান মুসলমান (অনুবাদ আবদুল মওদুদ) পৃষ্ঠা ১৫৪।		
১৪।	আতিউর রহমান, লেনিন আজাদ	ঃ	ভাষা আন্দোলন অর্থনৈতিক পটভূমি পৃষ্ঠা ১২।
১৫।	সিরাজুল ইসলাম,	ঃ	বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো পৃষ্ঠা ৫৭
১৬।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৫৮।
১৭।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৫৮।
১৮।	**W. K. Firminger**	ঃ	**Historical Indroduction to the Bengal Portion of The fifth Report (Indian Studies Edition 1962)** P. 162-163
১৯।	মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৪৯।
২০।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩৫০।
২১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩৫০-৩৫১।
২২।	মযহারুল ইসলাম	ঃ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পৃষ্ঠা ৩৩।
২৩।	আনিসুজ্জামান	ঃ	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য পৃষ্ঠা ৯।
২৪।	**K.K. Datta**	ঃ	**History of Bengal subah** P. 319.
২৫।	সিরাজুল ইসলাম	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬০।
২৬।	উইলিয়াম হান্টার তাঁর গ্রন্থে এই দুর্ভাগ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন : '...সাবেক ব্যবস্থার উপরে মারাত্মক আঘাত এলো একরকম পরোক্ষভাবে, যার সম্বন্ধে কি ইংরেজরা কি মুসলমানরা, কেউই পূর্বে চিন্তা করতে পারেনি। সেটা হলো লর্ড কর্ণওয়ালিস ও স্যার জন শোর কর্তৃক কতকগুলি নীতির পরিবর্তন, যার শেষ পরিণতি হয়েছিল ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনে। এই ব্যবস্থার দ্বারা আমরা গোমস্তা ও সরকারের মধ্যবর্তী মুসলমান উচ্চপদস্থ কর্মচারদের স্থান অধিকার করলাম। এই মুসলমান উপরওয়ালাদের ঘোড়সওয়ার সিপাহীরাই ছিল খাযনা ওয়াসীল করার প্রদান হাতিয়ার। এরপর আমরা মুসলমান খাযনা-তহশীলদার ও তাদের সিপাহী বরকন্দায সরিয়ে ফেলে প্রত্যেক জিলায় একজন কালেক্টর নিয়োগ করলাম এবং তাঁর কোর্টে সাধারণ পিয়াদার মতো কতকগুলি নিরস্ত্র পাইক বরকন্দাজ রেখে দিলাম। তার ফলে মুসলমান ভদ্রশ্রেণীরা সাবেক খাযনার সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হলো এবং জমির উপস্বত্বের কতকটা অস্থায়ী মালিকানা নিয়ে সাধারণ জমিদার হয়ে গেল।' উইলিয়াম হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমান (অনুবাদ আবদুল মওদুদ) পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৭।		
২৭।	আতিউর রহমান লেনিন আজাদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৩।
২৮।	উইলিয়াম হান্টার (অনুবাদ আবদুল মওদুদ)	ঃ	দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস পৃষ্ঠা ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

২৯।	নব্য অভিজাত শ্রেণীভূক্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের বার জন ব্যবসায়ীদের নাম; লক্ষ্মীকান্ত বড়াল, দত্তরাম দত্ত, রামমোহন লাল, মথুরা মোহন সেন, নিত্যচরণ সেন, রামসুন্দর গাইন, স্বরূপ চাঁদ শীল, জগমোহন শীল, আনন্দমোহন শীল, স্বরূপ চাঁদ আঢ্য, কানাই লাল বড়াল, সনাতন শীল। তথ্যের মূল উৎস: বার্ষিক ডিরেক্টরী ও আলম্যানাক ১৮০৫-৬ (উদ্ধৃত বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি পৃষ্ঠা ৫৭)।		
৩০।	আতিউর রহমান লেনিন আজাদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৪
৩১।	১৮১৩ সালে ইংল্যান্ডের কমনন্সসভার সিলেক্ট কমিটিতে স্যার জন ম্যাকসের ভাষণ পৃষ্ঠা ১১৬।		
৩২।	বিনয় ঘোষ	ঃ	বাংলার বিদ্যৎ সমাজ (২য় সংস্কার ১৯৭৮) পৃষ্ঠা ৩০।
৩৩।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩১।
৩৪।	নরহরি কবিরাজ	ঃ	স্বাধীতার সংগ্রামে বাঙলা পৃষ্ঠা ৩৭।
৩৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩৭।
৩৬।	**Introduction to the fifth Report.**	ঃ	উদ্ধৃত নরহরি কবিরাজ পৃষ্ঠা ৩৬।
৩৭।	সুপ্রকাশ রায়	ঃ	ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পৃষ্ঠা ১৩।
৩৮।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন পৃষ্ঠা ১৬-১৭।
৩৯।	Governor General in Council to court A Directors 12th April 1790 Geneal Letter (Revenue) Para 7		
৪০।	রংগলাল সেন,	ঃ	বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস পৃষ্ঠা ২৫।
৪১।	রংগলাল সেন বাংলায় যে সময়কে 'নিষাদ সমাজের' যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। সে সময় বাংলার মানুষ দলবদ্ধ হয়েবনে জঙ্গলে বসবাস করতো। পশুপাখি এবং নদী ও সমুদ্রে মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতো। পরিবার ও সম্পত্তি নামক সমাজ কাঠামোর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের তখনও বিকাশ ঘটেনি। যে কারণে ঐ সময়ে সামাজিক শ্রেণীরও উদ্ভব ঘটেনি। এ সমাজের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তার মূল ভিত্তি ছিল 'টোটেম'। বাঙালীর আদিম সমাজ বিভিন্ন 'টোটেম' নির্ভর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলে (ক্ল্যানে) বিভক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে কূলবৃদ্ধ টোটেমের নেতা নির্বাচিত হওয়ার নিয়ম চালু হলে বাংলাদেশের আদিম সমাজের অভ্যন্তরে এক ধরনের স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি হয়। রংগলাল সেন, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস পৃষ্ঠা ২৮।		
৪২।	রংগলাল সেন,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৯-৩১।
৪৩।	ঐ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৯-৩১।
৪৪।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩১-৩২।
৪৫।	অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম বাংলার উদ্বৃত সম্পদের অধিকারী ছিল রাষ্ট্র। শহরের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং সামরিক বিভাগের কর্মচারীরা ছিল উদ্বৃত সম্পদ ভোগকারী শ্রেণী। চতুর্থ, পঞ্চম থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রামীণ সামাজিক স্তর বিন্যাস এবং অর্থনৈতিক কাঠামো অপরিবর্তিত ছিল। সপ্তমশতকে এক ধরনের সদাগরী ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। অষ্টমশতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত শহরগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করত রাষ্ট্র এবং সমাজের প্রয়োজনের উপর। তৎকালীন বেশীর ভাগ শহর আসলে ছিল বর্ধিষ্ণু গ্রাম। রংগলাল সেন, বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস পৃষ্ঠা ৪১-৪৫।		
৪৬।	রংগলাল সেন,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৫০।
৪৭।	ওয়াহিদুল হক,	ঃ	ভাষা আন্দোলন-পূর্ব বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস একটি দ্রুত দৃষ্টিপাত; প্রবন্ধ বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা পৃষ্ঠা ১-৬।
৪৮।	সিরাজুল ইসলাম,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৯৬-২৯৭।
৪৯।	**Adam Smith**	ঃ	Essays on political Economy P.131-132.

Dhaka University Institutional Repository

৫০।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১-২
৫১।	শিল্প বিপ্লব সম্ভব ছিল না যদি না বাংলার অর্থ গ্রেট বৃটেনে যেয়ে পৌছতো। ক্রুক এডামস-এর ভাষায় : 'পলাশী যুদ্ধের পর থেকে বাংলা থেকে লুণ্ঠিত ধন সম্পদ ইংল্যান্ডে পৌছতে শুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এর ফল দেখা দেয়। কারণ বিশেষজ্ঞগণ সকলেই একথা স্বীকার করবেন যে, যে শিল্প বিপ্লব উনবিংশ শতাব্দীকে পূর্বের সকল যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সেই শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল ১৭৬০ সাল থেকে। (অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের মাত্র তিন বছর পর থেকে)...পলাশী যুদ্ধ হয়েছিল ১৭৫৭ সালে। আর এর পর থেকে যে পরিবর্তন শুরু হয়, ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না।....ইংল্যান্ডে ভারতের ধনসম্পদ এসে পৌছবার এবং ঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে প্রয়োজনীয় শক্তি (অর্থাৎ মূলধন) ইংল্যান্ডে ছিল না। বাষ্পীয় যন্ত্রের উদ্ভাবক জেমস ওয়াট যদি আর পঞ্চাশ বছর আগে জন্মাতেন তাহলেতার সাথে তার আবিষ্কৃত যন্ত্রটিও নিশ্চিহ্ন হয়েযেতো। ভারতবর্ষ থেকে যে পরিমাণ মুনাফা লুণ্ঠিত হয়েছে তা সম্ভবত পৃথিবীর জন্মকাল থেকে এ সময় পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। যে সময় পৃথিবীর কোথাও (উৎপাদনের জন্য) মূলধন লগ্নি আরম্ভ হয় নাই, সেই সময় ভারতবর্ষ থেকে লুণ্ঠিত ধন সম্পদ লগ্নি করে ইংল্যান্ড বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করেছিল। কারণ প্রায় পঞ্চাশ বছর ইংল্যান্ড পৃথিবীর কোথাও কোন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয় নাই। ১৬৬৪ সাল থেকে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) পর্যন্ত ইংল্যান্ডের সমৃদ্ধির গতি ছিল অতি ধীর, কিন্তু ১৭৬০ থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত এই গত হয়েছিল অতি দ্রুত এবং বিস্ময়কর। ক্রুক এ্যাডামস, দি ল অফ সিভিলাইজেশন এন্ড ডিকে পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬০।		
৫২।	**Karl Marx,**	ঃ	**The East India Compony** (crticle Newyork Tribune 1853)
৫৩।	ঐ	ঃ	**Britsh Rule in India** (Article Newyourk Tribune) 10th June 1853.
৫৪।	আতিউর রহমান লেনিন আজাদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৯-৩১।
৫৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩১।
৫৬।	**K.S. Shalvankar,**	ঃ	**Problems of Indna** P. 105-106.
৫৭।	রংগলাল সেন	ঃ	বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো ঐতিহাসিক পটভূমি: পৃষ্ঠা ১৩৭।
৫৮।	সুপ্রকাশ রায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৬৫।
৫৯।	**R.P. Dutt**	ঃ	**India Today** P. 88.
৬০।	সুপ্রকাশ রায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৬৬।
৬১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৭।
৬২।	বৃটিশ শাসন আমলে বাংলার সর্বত্র কৃষক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। শতবর্ষব্যাপী ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৪০টির মতো কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফকির বিদ্রোহ ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-৭৮), মেদিনীপুরের বিদ্রোহ (১৭৬৩-৮৩), ত্রিপুরার সমশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), সন্দ্বীপের বিদ্রোহ (১৭৬৯), কৃষক তন্তুবায়ের সংগ্রাম (১৭৭০-৮০) পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকলা বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৭) তিতুমীরের লড়াই (১৮২৭-৩১), ফারাইজী আন্দোলন (১৮৩১-৫৭), সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩)। এর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং ভয়াবহ ছিল নীলচাষীদের বিদ্রোহ (১৭৭৮-১৮৬০)। নীলচাষীদের বিদ্রোহ এতো শক্তিশালী ছিল যে শেষ পর্যন্ত ১৮৬০ সালে সরকার আইন পাসের মাধ্যমে নীলচাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন ব্যাপারে পরিণত করতে বাধ্য হয়। আরো ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭)। জমিদার শ্রেণীর অসহনীয় শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ময়মনসিংহের গারো উপজাতি কয়েক দফা বিদ্রোহ করে। ১৮২৫ সালে বিদ্রোহের সূত্রপাত ১৮৮২ সালে এর অবসান হয়। উল্লেখিত বিদ্রোহগুলো ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আরো অনেক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে। তাছাড়া এমন অনেক বিদ্রোহ সংগঠিতহয়েছে যার অনেক তথ্যই জানা যায় না। সুপ্রকাশ রায়, ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পৃষ্ঠা ২২১-৩৬৯।		

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
জাতীয়তাবাদী প্রবণতাসমূহ

১৭৫৭ সালে বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যায়ের পর চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সূত্রপাত ঘটে। এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে বৃটিশ পুঁজি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহত করার স্বার্থে। বৃটিশ পুঁজির সম্প্রসারণবাদ নীতি এবং রাজনৈতিক আগ্রাসনে বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের দুর্গ গ্রাম-সমাজ ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোও ভেঙ্গে পড়ে; যে কাঠামো উভয় সম্প্রদায়ের লোককে যুগ যুগ ধরে নিজস্ব পেশায় নিয়োজিত থেকে গ্রাম সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা সচল রাখতে হতো। এই অর্থনৈতিক অবস্থাই উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য যথেষ্ট ছিল। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে বিদেশী বণিক কোম্পানীর তীব্র শোষণের থাবা প্রতিহত করতে উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। গড়ে তুলে ছিল প্রতিরোধের দেয়াল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ঐক্য স্থিতিশীল থাকেনি। বৃটিশ অনুসৃত অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক নীতির কারণে। তবু কখনও কখনও দেশের স্বার্থে উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা ঐক্যের ডাক দিয়েছেন। গড়ে তুলতে চেয়েছেন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, কিন্তু তা কাংখীত সুফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে কখনও অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক স্বার্থ, কখনও বা ধর্মীয় সামজিক দ্বন্দ্বের কারণে। এক পর্যায়ে উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা স্ব স্ব ধর্ম সংস্কারকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে তোলেন। যা পরবর্তীতে ধর্ম ভিত্তিক দ্বিমুখী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়।

প্রায় আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির পেছনে বৃটিশ বিভেদ নীতির প্রভাব কখনও ছিল প্রত্যক্ষ কখনও ছিল পরোক্ষ। কেননা বৃটিশ সৃষ্ট শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকল আন্দোলনে ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী। হিন্দু, মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পর্যায়ক্রমে হাতে রেখে শাসকবর্গ তাদের বিভেদ নীতিকে করেছে শক্তিশালী। পরবর্তীতে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং আরো পরে সৃষ্ট মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত বিভেদ নীতিরই জয় হয়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে উঠা অর্থনৈতিক বৈষ্যম্যের, দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে, দ্বিমুখী ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের মাধ্যমে।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের পেছনে যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদান কাজ করেছে তা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করার প্রচেষ্টা নেয়া হলো।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী

পূর্ব থেকেই এই অঞ্চলের সামাজিক স্তর বিন্যাসের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি ক্ষীণ ধারা বিদ্যমান ছিল। ঐ সময়ে সমাজের কোন স্তরেই এদের কোন প্রভাব ছিল না। কেননা যে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে এদের উদ্ভব সেই কাঠামোয় এদের পেশার গুরুত্ব ছিল কম। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল এই শ্রেণীর মূল পেশা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেও এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। উক্ত পেশায় সহজেই বিত্তশালী হওয়ার সম্ভবনা থাকলেও বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ পেশা গ্রহণের ছিল চরম অনিহা।

লোক মুখে তৎকালের প্রচলিত প্রবচন ছিল, "উত্তম খেতি মধ্যম বান (অর্থাৎ বানিয়া, বেনে বা বণিক) অধম চাকরি ভিখ নিদান (অর্থাৎ শেষ ভরসা)"[১] এ থেকে বুঝা যায় ব্যবসা বাণিজ্য থেকে উদ্ভুত মধ্য শ্রেণীর স্থান ছিল সমাজে দ্বিতীয় স্তরে। এর একটি কারণ হচ্ছে প্রচুর বিত্তের মালিক হলেও ভূম্যাধিকারীদের আভিজাত্য, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি অতিক্রম করে সামন্ত সমাজে আর কোন শ্রেণী বা স্তরের স্থান করে নেয়া ছিল অসম্ভব। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থাই সমাজে ভূঁইফোড় মধ্য শ্রেণীকে এই ধরনের শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিতে নারাজ ছিল। তবে মধ্য যুগ থেকে ক্রমশ এদের উত্তরণ ঘটতে থাকে। যদিও এই উত্তরণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যই সীমাবদ্ধ থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য যুগে মুসলিমদের এ অঞ্চলে আগমনের ফলে আর্থ সামাজিক কাঠামোয় ইসলামী ভাবধারা প্রবাহিত হতে শুরু করলেও অন্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। আগত মুসলিম জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেনি। এসম্পর্কে রংগলাল সেন বলেছেন :

"যারা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে আসেন তাদের ব্যবসা মূলক কর্মকান্ডের কোনো ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা ছিলো না এরা ছিলো প্রধানত যোদ্ধা শ্রেণী। ব্যবসা বাণিজ্যকে তারা সম্মানজনক পেশা বলেও মনে করতেন না।"[২]

তাছাড়া এরা প্রশাসনের সঙ্গে নিয়োজিত থাকতে পছন্দ করতেন। রাজ কর্মচারী হিসেবে দক্ষ্যতা তাঁদের ভাগ্যোন্নায়নের পথ খুলে দিত। এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রচুর সম্পদের মালিক হন তঁরা তাঁদের সম্পদ ব্যয় করেন ভূমি লাভের প্রয়োজনে। তখনও ভূমি ছিল এই অঞ্চলের আভিজাত্যের মাপকাঠি। এভাবেই এদেশে আগত এলিট মুসলমানদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের কোন ঐতিহ্য গড়ে উঠেনি।

অপর দিকে স্থানীয় জনগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের অর্থনৈতিক ভাগ্যের কোন উন্নয়ন ঘটেনি শুধু সামাজিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করেছিল। ফলে ব্যবসা বাণিজ্য করার মত প্রচুর সম্পদ তাদের ছিল না। হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়ার ফলে এই সমস্ত নিম্ন স্তরের লোকজনের পেশার যে কোন পরিবর্তন হয়নি, তার ছবি আমরা দেখতে পাই ষোড়শ শতকের শেষ পাদের কবি মুকন্দ রামের কবিতায়:

রোজা নমাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা।
তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা।
বলদে বাহিয়া নাম বলয়ে মুকেরি।
পীঠা বেচিয়া নাম ধরাল্য পীঠারি।
মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাল্য কাবারি।
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি॥
হিন্দু হয়ে মুসলমান বৈসে গয়সাল। ইত্যাদি[৩]

উপরোক্ত কবিতাটির পরবর্তী অংশেও নানান পেশার বর্ণনা আছে যা ধর্মান্তরী হওয়ার পরও পরিবর্তীত হয় নাই। এ থেকে বুঝা যায় এরা, এক সময়ে হিন্দু ছিল কিন্তু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েও পূর্বের পেশার সঙ্গে যুক্ত আছে। তাছাড়া ব্যবসার জন্য যে পুঁজি বা সম্পদের প্রয়োজন তা যেমন তাদের আগেও ছিল না ধর্মান্তরীত হওয়ার পরেও অর্জিত হয়নি। সুতরাং দেখা যায় মুসলিম শাসন আমলের যে স্বর্ণ যুগের কথা ঐতিহাসিকরা বলেছেন, সে যুগেও বাংলার মুসলমান ব্যবসা বাণিজ্যের মত পেশায় যুক্ত হতে আগ্রহী ছিল না। ফলে বেনিয়া শ্রেণীয় মধ্য থেকে বিবর্তনের ধারায় আধুনিক কালে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎপত্তি সেই শ্রেণীর মধ্যে মুসলিমদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িত থাকা প্রসঙ্গে বলতে যেয়ে ঐতিহাসিক নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ বলেছেন : "The muslims did not play any conspicuous role in Inland trade and banking."[৪]

অপর দিকে প্রাচীন কাল থেকেই পেশা নির্ভর বর্ণ প্রথার কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের ঐতিহ্য বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীতে মুসলমান শাসন কালেও তাদের এই পেশায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়নি। এ সম্পর্কে রংগলাল সেন বলেছেন: "পাঁচ শত বৎসরের মুসলিম শাসনামলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় খুব সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে। তবে সরকারের রদবদল হয়েছে অনেক। সম্পত্তি সম্পর্ক ও উৎপাদক শ্রেণী কাঠামো মোটামুটি অপরিবর্তীত থাকে। সঙ্গত কারণেই ব্যবসা ও লগ্নি পুঁজির ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকরা হিন্দু বৈশ্যবর্ণের সনাতন পেশায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি। ...মুসলিম শাসকরা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, দেশী হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিল্পী শ্রেণীর ক্ষতি করলে দেশের অর্থনীতিই বিপন্ন হয়ে পড়বে। অপর পক্ষে, ব্যবসায়ীরাও তাদের সম্পদ সুরক্ষিত রাখার স্বার্থে মুসলিম শাসকবর্গের সাথে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেন।"[৫]

এ প্রসঙ্গে সেন পনের ও ষোড়শ শতকে বাংলায় হিন্দু ধর্ম ত্যাগের প্রবণতায় প্রভাবিত শ্রেণীর কথা বলতে যেয়ে লিখেছেন : "সমাজের নিম্ন স্তরের কারিগর এবং ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিকরা এ প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। অন্যদিকে উচ্চস্তরের হিন্দুরাও (স্বল্প সংখ্যক হলেও) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু সমাজের মধ্যস্তরে অস্থানকারী ব্যবসায়ীরা তুলনা মূলকভাবে অধিকতর রক্ষণশীল থাকায় এদের ভেতর ধর্মান্তকরন কম হয়। এর ফলে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে হিন্দুদের আধিপত্য অব্যাহত থাকে।"[৬]

এভাবেই হিন্দু সম্প্রদায় ব্যবসা বাণিজ্যের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলে, এক যুগ থেকে আরেক যুগ পর্যন্ত। পরবর্তীতে এরা বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন এদেরকে সমাজে এক শক্তিশালী শ্রেণীতে পরিণত করে।

অপর দিকে আধুনিক কালে বিদেশী পুঁজি অর্থাৎ ইউরোপীয় পুঁজির উপস্থিতিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের এই ব্যবসায়ী

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীর অপ্রতিরুদ্ধ জয়যাত্রার পথ উন্মুক্ত হয়। একারণেই দেখা যায় বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানী বিশেষ করে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করে এরা বিদেশীদের ক্ষমতা দখলের আগেই নিজেদেরকে এক শক্তিশালী শ্রেণীতে পরিণত করতে সক্ষম হয়। শেষ পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভাগ্য এদের হাতের মুঠোয় চলে যায়। আর এরা চলে যায় বিদেশী বণিক কোম্পানীর হাতের মুঠোয়। পলাশী যুদ্ধের বহু আগেই এই বণিক শ্রেণী একটি বিশেষ শক্তি রূপে সমাজে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়।[৭] এভাবে সৃষ্ট একদল দেশী মানুষ যাদের স্বার্থ ইউরোপীয় বণিক শ্রেণীর স্বার্থের সাথে একাত্ম হয়ে যায়, তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে যেয়ে সৈয়দ আমীরুল ইসলাম বলেছেন : "শ্রেণী বিন্যাসের এই প্রক্রিয়ায় আসলে গোমস্তা-কর্মচারী-বানিয়া-মুৎসুদ্দি-কয়াল-পাইকার-দালাল-বেপারী-বণিক-ব্যবসায়ীর মধ্যদিয়ে একটি নতুন সামাজিক স্তরের সৃষ্টি হয় যার ভবিষ্যৎ নাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী।"[৮]

এই ভবিষ্যৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে যেয়ে ভাষা আন্দোলন: অর্থনৈতিক পটভূমি গ্রন্থর লেখকদ্বয়, সরাসরি দৈহিক শ্রম থেকে বিযুক্ত এবং একই ভাবে ভূমি ভিত্তিক প্রত্যক্ষ শোষণ প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানসিক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল শিক্ষিত যে সামাজিক স্তরটি আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাকেই বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৯]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার ফলে যেমন কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী ধ্বংস হয়ে যায়, তেমন সমাজে অপর একটি শক্তির উত্থানের পথ সুগম হয়ে যায়। যদিও তৎকালীন শাসকবর্গই নিজেদের স্বার্থে এই শ্রেণীর উদ্ভাবনের সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছিল। শাসন শোষণের স্বার্থে শাসকবর্গ উনিশ শতকের শুরু থেকেই ভারতীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকাশের কাজে তৎপর হয়ে উঠে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে ১৮১৩ সালে কোম্পানী সরকার ভারতে পাশ্চাত্যের শিক্ষা সংস্কৃতি জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসারের ইচ্ছা ব্যক্ত করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলে ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করতে যেয়ে যে মন্তব্য করেন তাতেই তাদের ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের মূল উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। মেকলে তার বক্তব্যে বলেন : "We must at present do our best to form class who may be interpreters between us and the millions whom we govern a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, in opinions, in morals and in intellect"[১০]

মেকলের এই ধরনের উদ্যোগের পেছনে এদেশে ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষাই মূল কারণ ছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। এভাবেই ইংরেজ ভাবাপন্ন যে দেশীয় শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়, তারাই হলো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তবে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বলতে আমরা যাদের বুঝি সেই শ্রেণীর বিকাশ হয়েছে মূলতঃ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে চালর্স উড এর ডেসপ্যাচ ঘোষিত হওয়ার পর থেকে।[১১] ইংরেজী শিক্ষা পবর্তণের এই নীতি হিন্দু সম্প্রদায় যত দ্রুত স্বাগত জানিয়ে এর সাথে নিজেদের একাত্ম করে দিয়েছিল, মুসলমান সম্প্রদায় ছিল ঠিক ততটাই দূরে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন ব্যবসা বাণিজ্যের ঐতিহ্য ছিল না। ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে যে জমিদারী প্রথা চালু হয় তাতে বাংলার মুসলমানের কোন ভূমিকা খুঁজে পাওয়া যায় না। সঙ্গত কারণেই এই জমিদার শ্রেণীর মাধ্যমে যে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টির হয়ে ছিল তাতে মুসলিম সমাজ ছিল অনুপস্থিত। একারণেই বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎসের জন্য ভিন্ন পথে অগ্রসর হতে হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা এর উৎস সম্পর্কে দুটি বিষয়ের দিকে নজর দিয়েছেন। এক ক্ষয়িষ্ণু এবং বৃহৎ সামন্ত অভিজাত শ্রেণী অপরটি হচ্ছে ছোট ও মাঝারি তালুকদার, জোতদার উদ্বৃত্ত কৃষক ইত্যাদি; তবে দ্বিতীয় গ্রুপই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।[১২]

বহিরাগত নানা ভাষাভাষী ও জাতি বর্ণের মুসলমান এবং পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত মুসলমান, উভয়ের সামাজিক বিবর্তণের মধ্যে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী জন্মলগ্নের বৈশিষ্ট্য গুলো চিহ্নিত করা সম্ভব। অধ্যাপক রংগলাল সেনের বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে এম, এম, আকাশ তার গ্রন্থে এই বৈশিষ্ট্য গুলি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হচ্ছে:

"(ক) স্থানীয় জনগণের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রতাপে অস্থির ছিল, বিশেষ অত্যাচারিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ এবং শূদ্র বর্ণের লোকেরা তাঁরাই প্রধানত ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ স্থানীয়দের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন সমাজের অধঃস্তন জনগোষ্ঠী।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে বিজয়ী মুসলমানদের বিরোধের চেয়ে সখ্য মৈত্রীর পরিমাণ ছিল বেশী অল্প সংখ্যক মুসলিম বিজয়ীরা দ্রুত বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছিলেন। বাঙালী আচার-আচরণ সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিলেন। ফলে তারা দুই-তিন প্রজন্ম অতিক্রমের পর তাদের আদি পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

(গ) তবে অতীতের জের হিসেবে বাঙালী মুসলমান সমাজে পৃথক মর্যাদা সম্পন্ন দুটি স্তরের উদ্ভব হল, যেমন; আশরাফ-আতরাফ, অভিজাত-অনভিজাত ইত্যাদি। প্রথমোক্তরা তাদের আদি উৎস হিসেবে বাহিরাগত বিজয়ী মুসলমানদেরকে চিহ্নিত করতেন এবং তা নিয়ে গর্ববোধ করতেন।[১৩]

সমাজবিজ্ঞানী নাজমুল করিমের মতে আশরাফ আতরাফ এ দুটি স্তরের "আতরাফ ভাল মানুষদের" মধ্য থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ লাভ ঘটেছিল। আর এই বিকাশ প্রকৃত পক্ষে হয়ে ছিল অনেক পরে, বৃটিশ আমলে।

১৮৩৭ সালে রাজভাষা ফারসী বিলুপ্ত হলে ক্রমশ ইংরেজী তার স্থান দখল করে নিতে থাকে। ফলে ইংরেজী শিক্ষা তখন হয়ে যায় সরকারী চাকুরী প্রাপ্তির অগ্রগণ্য বিষয়ে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এই সুযোগ হাত ছাড়া করেনি ফলে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চালু হওয়ার সঙ্গে এরা দ্রুত সামনের দিকে এগুতে থাকে। গোড়া মুসলমানরা সম্পূর্ণ রূপে বিষয়টি উপক্ষো করে। ফলে ইংরেজী শিক্ষা চালু হওয়ার সাথে সাথে সে সুযোগ গ্রহণ করা হিন্দুদের পক্ষে সহজ হলেও মুসলমানদের কাছে সহজ ছিল না। তাছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়দের অর্থনৈতিক অবস্থাও তাদের ইংরেজী শিক্ষা থেকে বিরত রেখেছে। এভাবে সব দিক থেকেই আধুনিকতার সকল সম্ভবনার দ্বার মুসলমানের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। ঐ সময়কার বাঙালী মুসলমানদের অবস্থার করুণ চিত্র আমরা দেখতে পাই উইলিয়াম হান্টারের সেন্সাস রিপোর্টে। যদিও এই রিপোর্ট তৈরী এবং মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতার চিত্র তুলে ধরার পেছনে তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, তবু এর মধ্য থেকে যে সত্যটি বেরিয়ে এসেছে তা হলো সরকারী কর্মচারী হিসেবে মুসলিমদের কোন স্থানই ছিল না বললে চলে। নিম্নে হান্টার কর্তৃক প্রণীত ১৮৭১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের সরকারী কর্মচারীদের যে পরিসংখ্যান নেয়া আছে তা তুলে দেয়া হলো।

সরকারী কর্মচারীদের হিসাব[১৪]

	বিভাগ	হিন্দু	মুসলমান	ইংরেজ
১।	সিভিল সার্ভিস	০	০	২৬০
২।	বিচার বিভাগ	০	০	৪৭
৩।	অতিরিক্ত সরকারী কমিশনার	৭	০	২৬
৪।	গেজেটেড পুলিশ অফিসার	৩	০	১০৬
৫।	জন কল্যাণ বিভাগ (ইঞ্জিনিয়ার)	১৯	০	১৫৪
৬	চিকিৎসা বিভাগ	৬৫	৪	৮৯
৭।	জনশিক্ষা বিভাগ	১৪	১	৩৮
৮।	কাষ্টমস, নৌ জরিপ ও অফিস ইত্যাদি	১০	০	৪১২
	মোট=	১১৮ জন	৫ জন	১১৩২ জন

মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃটিশ বিদ্বেষী মনোভাব বৃটিশ বিভেদ নীতি সর্বোপরি বাঙালী মুসলমানের অর্থনৈতিক অক্ষমতা, এঁদের ব্যাপক হারে শিক্ষা অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া যে স্বল্প সংখ্যক বাঙালী মুসলমান শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন সরকারী বৈষম্যনীতির শিকার হয়ে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ লাভে ব্যর্থ হন। শুধু মাত্র যাঁরা নিজেদেরকে সরকারের কাছে বিশ্বস্ত বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হন তাঁরাই সরকারী পদ লাভ করেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে এদের সংখ্যা ছিল কম। অপর দিকে এই পদে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিয়োগ ছিল বেশী। একই সময়ে প্রস্তুত অপর একটি সারণীতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী পদে বৈষম্য[১৫]

	পদের নাম	হিন্দু	মুসলমান
১।	ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট	১১৩	৩০
২।	ডেপুটি কালেক্টর		
৩।	আয়কর বিভাগ	৪৩	৬
৪।	রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ	২৫	২
৫।	ছোট আদালতের জজ	২৫	৮
৬।	মুন্সেফ	১৭৮	৩৭
৭।	জনকল্যাণ বিভাগ (একাউন্টস)	৫৪	৬
৮।	জনকল্যাণ বিভাগ (অন্যান্য)	১২৫	৪
	মোট =	৫৬৩ জন	৯৩ জন

১৮৭১ সালের হিসাব অনুসারে দেখা যায় হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমরা শতকরা মাত্র ৪ ভাগ সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভে সক্ষম হয়েছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পাট চাষ এবং এর চাহিদা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে পূর্ব বঙ্গ এবং উত্তর বঙ্গের দরিদ্র কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক ছিল মুসলমান। ফলে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান কৃষকদের হাতে কাঁচা পয়সার আমদানি হতে থাকে। এছাড়া ১৮৫৯ সালে প্রজাসত্ত্ব আইন প্রণয়নের ফলে কৃষকদের জমির মালিকানা লাভ, ১৯০২ সালে জমিদারদের জোরপূর্বক রাজস্ব সংগ্রহের উপর বিধি নিষেধ আরোপের কারণে জমিদারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করার আইনগত ভিত্তি সৃষ্টি, ধান পাটের দাম এবং উৎপাদন বৃদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে পাটের চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির ফলে বাংলার কৃষকদের মধ্যে যেমন আত্মনির্ভরতার ভাব সৃষ্টি হয়, তেমন এই পরিস্থিতি এদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতা মূলক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। একই ভাবে দরিদ্র কৃষকের হাতে অর্থ সমাগম হওয়ার ফলে আশরাফ-আতরাফের শ্রেণীগত ব্যবধান ঘুচে যেতে থাকে। অপর দিকে আতরাফ শ্রেণীর মধ্য থেকে একটি শিক্ষিত শ্রেণী বেরিয়ে আসতে থাকে। তাছাড়া ধর্মীয় দায়িত্ব বোধ থেকে উৎসারিত হয়ে কোলকাতায় সাহেবদের অধিনে চাকুরীরত খানসামারা অনেক দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদের আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে এদের পড়ালেখার সুযোগ করে দিতে থাকে।[১৬]

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতে সামন্ত মুসলমান অভিজাত পরিবার থেকে একটা শিক্ষিত এলিট শ্রেণী জন্ম হতে থাকে। ১৮৮৫ সালে ইংরেজী শিক্ষা দ্রুত প্রসার ঘটে। এর বিশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। দেরীতে হলেও এসময়ে বাঙালী মুসলমানের মধ্যে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটতে শুরু করে। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ইংরেজী শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য হারে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে হিন্দু মুসলিম উভয়ের মধ্যে এক তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। এ সময় বাংলার মুসলমান ছাত্র বৃদ্ধির হার বেড়ে যায় বিস্ময়কর ভাবে। এ সম্পর্কে ভাষা আন্দোলন: অর্থনৈতিক পটভূমি গ্রন্থে যে তথ্য দেয়া হয়েছে তাতে বলা হয় : "এক হিসাব থেকে জানা যায় ১৯০৭ সালে বাংলার মোট মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৯ হাজার ৪৪৪ জন মাত্র। পাঁচ বছরের ভিতর এর সংখ্যা দাড়ায় ৫ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৭৪ জনে, শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বিস্ময়কর উন্নতি নিশ্চিতই পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের ফল ছিল। বঙ্গ ভঙ্গ এবং বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন মুসলমানদের ভিতর একটি শিক্ষিত শ্রেণী বিকাশের অনিবার্যতাকে ত্বরান্বিত করেছিল মাত্র।"[১৭]

উক্ত গ্রন্থের সূত্র থেকে উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে ক্রমবর্ধমান উচ্চ শিক্ষায় মুসলিম ছাত্র বৃদ্ধির তালিকা দেয়া হলো।

উচ্চ শিক্ষিত মুসলমান ছাত্রদের শ্রেণী বিভাগ[১৮]

সাল	বি, এ (পাশ)	বি, এ (সম্মান)	বি, এল	এম, এ
১৮৫১-৬০	০	০	০	০
১৮৬১ -৭০	১৩	২	২	১
১৮৭১-৮০	২৫	৩	৯	৯
১৮৮১-৯০	১২০	৪১	৩৮	১৪
১৮৯১-১৯০০	২৩০	৬৭	৭৩	৩০

Dhaka University Institutional Repository

দ্য গ্রোথ অফ এডুকেশন এ্যান্ড পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট: ১৮৮৯-১৯২০: অপর্ণা বসুর এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত তথ্য অনুসারে এম, এম, আকাশ দেখাতে চেয়েছেন যে পূর্ব বাংলার পাটের তেজী ভাবের সঙ্গে শিক্ষা বিকাশের একটি সম্পর্ক রয়েছে। সে কারণেই পাটের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে, তেমন বেড়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও। অপর্ণা বসুর তথ্য অনুযায়ী ঢাকা জেলায় ১৮৯৬-৯৭ সালে ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা ছিল ২০টি পক্ষান্তরে ১৯২১-২২ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৮ টি। একই ভাবে ফরিদপুর জেলার ৭টি হাই স্কুল ঐ একই সময়ে বেড়ে ২২ টিতে পরিণত হয়েছিল। আরেক হিসেবে দেখা যায় বাংলাদেশের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় এবং আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা ১৯০০ সালে যে জায়গায় ছিল যথাক্রমে ১৭৮ ও ৬৮ জন, ১৯১২ সালে তা পরিণত হয় যথাক্রমে ৬১০ ও ১৭৩ জনে।[১৯]

বাংলায় যখন ইংরেজী শিক্ষার জোয়ার এবং বাঙালী মুসলমান যখন ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে ভিড় জমাচ্ছে, ঠিক সে সময় ১৯২১ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় একটি বিশ্ববিদ্যালয় আর এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৮ বছরের মধ্যে, একে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে গড়ে উঠে একটি শক্তিশালী উচ্চ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

এভাবে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্রুত বিকাশ কালে, প্রাগ্রসর বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে এক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিযোগী মানসিকতা পরবর্তীতে মধ্যবিত্ত মানসে সাম্প্রদায়িক চেতনার জন্ম দেয়। এক দিকে অনুপস্থিত বাঙালী হিন্দু ভূস্বামীদের প্রতি দরিদ্র মুসলমান কৃষক শ্রেণীর সুপ্ত ক্ষোভ, অপর দিকে শহরে বিভিন্ন পেশা, চাকুরী ও ব্যবসা নিয়ে সৃষ্টি নানান ধরনের দ্বন্দ্ব মিলে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক আবহাওয়া এক পরিবর্তনের সংকেত বয়ে আনতে থাকে। মূলতঃ এই পরিবর্তনের হোতা হিন্দু, মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। শেষ পর্যন্ত এদের প্রতিযোগিতা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার জন্ম দেয়, তাতে উভয় সম্প্রদায়ের কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষের এর সহগামী হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

এই মানসিকতার বসবর্তী হয়ে পরবর্তীতে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি; শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার। যার ফলে হিন্দু মুসলিম বৃটিশ শাসনের দুশো বছরের বিভেদ নীতির নির্মম শিকার হয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই মানসিকতায় জন্ম হয় সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনারও, যে চেতনা ১৯৪৭ সালে ছিল তুঙ্গে।

নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তন এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত বয়ে আনে। অপর দিকে উক্ত শতকের দ্বিতীয়ার্থে ইউরোপের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে তার ঢেউ এসে লাগে বাংলায়। ফলে বাঙালী মানসে এক নবজাগরণের সূচনা হয়। বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের দিকনির্দেশনায় ক্রমান্বয়ে যা দেশবাসীর মধ্যে আত্মসচেতনতা, আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাতন্ত্রবোধ তীব্রভাবে জাগ্রত করতে সাহায্য করে।

প্রাথমিক পর্যায়ে আপোষকামী বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব জনগণের মধ্যে তাঁদের অজান্তে যে স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনার সৃষ্টি করেন, পরবর্তীতে এই বোধ তাঁদের উত্তরসূরীদের নেতৃত্বকে আপোষকামী সংস্কারের পথ পরিহার করে রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের পথে ঠেলে দেয়। 'নবজাগরণ' বা 'রেনেসাঁসের' মাধ্যমে যে সংস্কারমুখী আন্দোলনের ধারা সৃষ্টি হয়েছিল শেষ পর্যন্ত এই ধারা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সৃষ্ট, জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং তার প্রকৃতি নির্দেশ করে। সংস্কার আন্দোলন সমূহের মাধ্যমেই ভারতীয় জাতীয় চেতনার এবং জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক ভিত দৃঢ়ভাবে নির্মিত হয়ে যায়। এই ভিত নির্মাণের দায়িত্ব প্রথম থেকেই পালন করে আসছিলেন বাংলার অভিজাত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। এই শ্রেণী উনিশ শতকে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার শুধু শক্তিশালী স্তম্ভেই পরিণত হয়নি শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালী সমাজের শীর্ষস্থানটিও এঁরা দখল করে নিয়েছিলো। অর্থনৈতিকভাবে এঁরা প্রভুত্ব অর্জন করতে সক্ষম হলেও কুসংস্কার আচ্ছন্ন সমাজে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সর্বত্র তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ব্রাহ্মণদের অতিমাত্রায় রক্ষণশীলতা, পদে পদে ধর্মীয় গোড়ামীকে অগ্রাধিকার দেয়ার ফলে বাংলার আপামার জনসাধারণের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। সুপ্রকাশ রায়ের ভাষায় : "সমাজের এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধেই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকামী নূতন অভিজাত শ্রেণীটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহ ঘোষিত হয় প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে, প্রচলিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, প্রচলিত সাহিত্যের বিরুদ্ধে, প্রচলিত সামাজিত রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহেরই ফলস্বরূপ আমরা লাভ করিয়াছি নূতন ধর্ম (ব্রাহ্মধর্ম ও নবহিন্দুবাদ), নূতন শিক্ষা, নূতন সাহিত্য, নূতন

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক আদর্শ ও রীতি-নীতি এবং 'সতীদাহ' নামক পাশবিক সামাজিক রীতির উচ্ছেদ ও বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন। ইহার সঙ্গে দেখা দিতে থাকে, জাতীয় চেতনার নবাঙ্কুর। তৎকালের বঙ্গীয় সমাজে ইহাদের প্রত্যেকটি বিষয়ই ছিল সম্পূর্ণ নূতন এবং উন্নততর সমাজ গঠনের অপরিহার্য উপাদান এই সকল সমাজ সংস্কার মূলক ক্রিয়াকলাপই সমগ্রভাবে ইউরোপীয় 'রিনাসান্সের' অনুকরণে বঙ্গীয় "রিনাসান্স" বা বাঙলার "নবজাগৃতি" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।"[২০]

এভাবে সারা উপমহাদেশে বাংলা হয়ে ওঠে আধুনিক চিন্তা চেতনার কেন্দ্রস্থল। ইংরেজী শিক্ষা পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে বাঙালী হয়ে উঠে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক বাহক। নির্দিধায় মধ্যযুগীয় চেতনাকে প্রত্যাখ্যান করে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গীকে স্বাগত জানিয়ে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই হন আধুনিক ভাবাপন্ন। এই নবভাবধারা প্রসারে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কিছু সংখ্যক উদারচেতা প্রশাসকের অবদানের কথাও স্বীকার করতে হবে। দেশী ভাষা সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রবল উৎসাহ দেখিয়েছেন হেষ্টিংস, এ্যালফিনিষ্টোন, ম্যালকোম, মনরো, ম্যাটকাফ প্রমুখ ইংরেজ প্রশাসকবৃন্দ। এঁরা ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য ভাবধারা জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনে উজ্জীবিত করাকে তাঁদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাছাড়া খৃষ্টান মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাও আধুনিক শিক্ষা ভাবধারা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।[২১]

শুধু স্থানীয় প্রভাব নয় কিছু সংখ্যক ভারতীয় ব্যক্তিত্বও ঐ সময়ে ইউরোপ ভ্রমণের মধ্যদিয়ে সরাসরি পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলার মুক্তচিন্তা সম্পন্ন আধুনিক পুরুষ ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়। যদিও তাঁর আগে ১৭৬৫ সালে মির্জা এতেশামউদ্দীন বিলাত গমন করেছিলেন।[২২]

উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার নবজাগরণ ক্ষেত্রে দুটি ভিন্নমুখী আদর্শের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। একটি পাশ্চাত্য প্রভাব (Westernism) অপরটি প্রাচ্যচিন্তার প্রভাব (Orientalism)। পাশ্চত্যধারার স্রষ্টা ছিলেন রামমোহন রায়, অপরটি অর্থাৎ প্রাচ্যচিন্তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় রাধাকান্ত দেবের আদর্শে। উনিশ শতকের পুনরজাগরণ আন্দোলন যেমন তাঁর নেতৃত্বে অন্তর্মুখী প্রবণতা লাভ করেছিল তেমন রামমোহনের নেতৃত্বে যে আদর্শের বিস্তার ঘটে তা ছিল বহির্মুখী। এই আদর্শের নেতৃত্বের প্রকৃতিকে আবার দুই ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। রামমোহনের নেতৃত্বে ছিল উদারনীতি, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা এবং আপোষকামীতা। অপর দিকে তাঁর উত্তরসূরী ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের স্রষ্টা ডিরোজিও তাঁর অনুসারীগণ উপস্থিত করেন উগ্র, উদ্দাম ও আপোষহীন নেতৃত্বের।[২৩]

অপর দিকে বাংলা সাহিত্যে যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয় পরবর্তীতে এ সাহিত্যে অন্তর্মুখী প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সে কারণে ক্রমাগত সাহিত্য হয়ে উঠতে থাকে স্বদেশী ইতিহাস কৃষ্টি সভ্যতা ঐতিহ্যের পূজারী। হয়ে উঠতে থাকে প্রতিবাদী, ক্ষোভ সঞ্চার হতে থাকে বিদেশী শাসন শোষণের বিরুদ্ধে। ফলে একদিকে বহির্মুখী প্রভাব অপরদিকে অন্তর্মুখী প্রবণতা দুই ধারার সমন্বয়ে বাংলা সাহিত্য হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদ বিকাশের উল্লেখযোগ্য উপাদান।

বাংলার নবজাগরণের স্রষ্টা ছিলেন রামমোহন রায়। আঠারো শতকে ইউরোপের বৈপ্লবীক পরিবর্তনের মুক্ত আদর্শ দ্বারা রামমোহন শুধু নিজেকে উজ্জীবিত করেননি, তার বিশ্বাস, আদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছেন স্বদেশবাসীর মধ্যে। তিনি ফরাসী বিপ্লবের অমর বাণী সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ দ্বারা গভীর ভাবে আলোড়িত হন। জনলক, মন্তেস্কু, রুশো, ভলটেয়ার, প্রমুখ মনীষীর মতাদর্শ তাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। ১৮১৫ সালে তার কোলকাতা আগমন বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। শতশত বছরের ধর্মীয় জীবনের কুসংস্কার কুপ্রথা থেকে হিন্দু ধর্মকে মুক্ত করে আদি একেশ্বরবাদের উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর মুক্ত চিন্তার প্রাথমিক প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর ধর্মীয় সংস্কার প্রয়াসের মধ্যে। ঐ বছর তিনি 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও তাঁর ধর্মীয় কুসংস্কার বিরোধী প্রচার আগেই শুরু হয়ে ছিল।

তৎকালীন কোলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং প্রভাবশালী অভিজাত জমিদার শ্রেণীর বহুলোক তাঁর আত্মীয় সভার সদস্য পদ গ্রহণ করেন। হিন্দু রক্ষণশীল মহলের প্রবল প্রতিক্রিয়ার মুখে তিনি তার ধর্মীয় প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৮২৮ সালের ২০ আগষ্ট তিনি 'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করে এ উপমহাদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেন। তাঁর ধর্মমত ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে থাকে এবং বাংলার বাইরেও ব্রাহ্মধর্ম সমাদৃত হতে থাকে। রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম ছিল বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের এক প্রয়াস। তিনি এর মাধ্যমে সনাতন সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করার এক সর্বজনগ্রাহ্য উদারবাদী ধর্মমত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ কোন ধর্মমতের উপর আঘাত না করে তিনি চেয়েছিলেন সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন রচনা করতে।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

রামমোহন রায়ের ধর্মীয় সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁর উদার মুক্ত হৃদয়ের প্রতিফলন ঘটলেও এ কথা স্বীকার করতে হয় যে তাঁর সৃষ্ট ব্রাহ্ম সমাজ মূলতঃ কোলকাতা কেন্দ্রিক ছিল। পরবর্তীতে বাংলার বাইরে এই ধর্মমত ছড়িয়ে পড়লেও তা ছিল অভিজাত শিক্ষিত উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই মতবাদ বাংলা এবং বাংলার বাইরে কোথাও সর্ব শ্রেণীর ধর্ম হয়ে উঠতে পারেনি। সুতরাং এর যতই জনপ্রিয়তা থাকুক না কেন তা ছিল শুধু শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমন কি সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীরা বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, কুলিনপ্রথা বিলোপ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন, একেশ্বরবাদ প্রচার ইত্যাদির তীব্র বিরোধীতা শুরু করেন। সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীরা ধর্ম বিপন্ন ভেবে স্বীয় ধর্মের আচার অনুষ্ঠান প্রথার প্রতি অধিক রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেন এবং ব্রাহ্ম সভার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ধর্ম সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধর্ম সভা হিন্দু ধর্মের স্বাতন্ত্রবোধ সম্পর্কে তীব্র সচেতনতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যে কারণে অভিজাত, শিক্ষিত মহল ছাড়া হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতা স্বাতন্ত্রবোধ তীব্র হতে থাকে এবং কিছু কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে এই ধর্মের সনাতনী রীতিনীতি আরো দৃঢ় হয়ে হিন্দু মনভাবের প্রখরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রামমোহনের সংস্কার এবং নব ধর্ম থেকে তাঁর স্বধর্মের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ছিল বিচ্ছিন্ন।

তাছাড়া তাঁর ধর্মীয় এবং সামাজিক সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজ। উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্ম সভার মাধ্যমে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যস্থাপন। তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে ব্যর্থ হয়। তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ হলেও সেই মহত্ত্ব উপলব্ধী করার মতো উদার মানসিকতা মানবিক মূল্যবোধ খুব কম ভারতবাসীরই ছিল। যে কারণে তাঁকে শুধু সমাজচ্যুত করে রক্ষণশীল সমাজের সমাজপতিরা ক্ষ্যান্ত হননি মৃত্যুর ভয়ও দেখিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই সংস্কার কোন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। যদিও রামমোহনের ধর্মসভায় সবধরনের সব ধর্মের লোকজনের প্রবেশাধিকার ছিল। তবু কোন মুসলমান এই ধর্মমত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই ধর্ম গ্রহণ করেছেন বলে শোনা যায় না। সংস্কার আন্দোলন নবজাগরণ বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী কৃষক সমাজের মধ্য কোন প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়। প্রথমতঃ এদের মধ্যে ছিল প্রবল ধর্মীয় গোড়ামী এবং সংস্কার। দ্বিতীয়তঃ এরা ছিল সম্পূর্ণভাবেই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। সর্বোপরি এ কথা অনস্বীকার্য যে বাংলার দরিদ্র কৃষককুলের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান।

এই কৃষককুল বৃটিশ শাসনের উষালগ্ন থেকে তীব্র শোষণের শিকারে পরিণত হয়। রাজশক্তির বিদ্বেষ নীতির ফলে বাংলার প্রায় গ্রামের কৃষকরা তাদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হতে থাকে। একে শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার তার উপর তাদের সৃষ্ট জমিদার শ্রেণীর অত্যাচার; যাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত। রাজশক্তি ছিল অত্যাচারী জমিদারের পক্ষে। তাই দেখা যায় খাজনা আদায়ের জন্য প্রজা পীড়ন আইন সিদ্ধ করা এবং অত্যাচারী জমিদারকে রক্ষার জন্য সরকার একের পর এক আইন জারী করছে। ১৭৯৭ সালে কৃষকদের উপর অত্যাচার আইনসম্মত করার জন্য লর্ড ওয়েলেসী সপ্তম আইন (হপ্তম আইন) নামে এক আইন জারী করেন। শুধু তাই নয় জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজার নালিশ বন্ধের জন্য ১৮১২ সালে পঞ্চম আইন নামে আরোও একটি আইন জারী করা হয়।[২২] এভাবে বৃটিশ ভারতে বৃটিশ প্রশাসন পরিণত হয় অত্যাচারী জমিদারের রক্ষাকর্তায়। বাংলার কৃষক প্রজা পরিণত হয় অসহায় নিপীড়িত ও শোষিত জনগোষ্ঠীতে। ফলে ঘন ঘন কৃষক বিদ্রোহ ছিল সাধারণ ব্যাপার। এই তীব্র ক্ষোভ মূলতঃ পরিচালিত হয়ে ছিল জমিদারী শোষণ এবং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। এই বিক্ষুব্ধ কৃষককুল বিশেষ করে মুসলমান কৃষক এবং মুসলিম সমাজ কোন অবস্থাতেই এই নবজাগরণ আন্দোলনের সামিল হতে পারেনি। হিন্দু জমিদার এবং উক্ত শ্রেণী থেকে উদ্ভুত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত সংস্কার আন্দোলন তাঁদের স্পর্শ করবে না এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া শহরকেন্দ্রিক এই জাগরণ বাংলার গ্রামে গঞ্জে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়।

অপর দিকে রামমোহন রায় প্রথম দিকে ইংরেজ শাসনের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব প্রকাশ করলেও পরবর্তীতে বৃটিশ শাসনকে স্বাগত জানান, এর কল্যাণকর দিকের প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে প্রায়সী হন। তিনি যে বৃটিশ শাসনকে ভারতবাসীর জন্য কল্যাণকর বলে বুঝাতে চেয়েছেন, সেই শাসকদের হাতেই মুসলমান বিশেষ করে বাঙালী মুসলমান সবচেয়ে বেশী নিগৃহীত হয়েছে। বৃটিশ শাসকরা যেমন মুসলিম শাসন আমলকে হেয় প্রতিপন্য করতে সচেষ্ট ছিল রামমোহনও মনে করতেন মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থার অরাজতা দূর হয়ে বৃটিশ শাসনের প্রভাবে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু বাঙালী মুসলিমদের কাছে এই আইনের শাসনের রূপ ছিল ভিন্ন। কথিত এ আইনের বলে বাঙালী মুসলমান সবধরনের চাকুরী থেকে বঞ্চিত, চাকুরীচ্যুত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জন্য চাকুরী নিষিদ্ধ ছিল। বৃটিশ ভারতে আইনের প্রতিষ্ঠাতারা বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রকাশ্যে এ কথা ঘোষণা করতে দ্বিধা

Dhaka University Institutional Repository

করেননি। এ ধরণের বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে ১৮৬৯ সালের ১৪ জুলাই তারিখে ফারসী ভাষায় প্রকাশিত 'দুরবীণ' নামক পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়। এতে বলা হয় : "বড় ছোট সমস্ত রকমের চাকুরী মুসলমানদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য জাতীয় লোকদের, বিশেষ করে হিন্দুদের দেওয়া হচ্ছে। সরকার বাহাদুরের কর্তব্য হচ্ছে সর্ব শ্রেণীর প্রজার উপরে সমদৃষ্টি হওয়া। কিন্তু এখন এমন কাল এসেছে যখন সরকারী চাকুরী থেকে মুসলমানদের বাদ দেওয়ার কথা প্রকাশ্য ভাবে গেজেটে লেখা হয়। সম্প্রতি সুন্দরবন কমিশনারের আপিসে কতকগুলি চাকুরী খালি হলে উক্ত রাজকর্মচারী সরকারী গেজেটে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দেন যে, এই সব পদ হিন্দু ভিন্ন আর কাউকে দেওয়া হবে না। মোটের উপর মুসলমানদের এখন এমন দুর্গতি হয়েছে যে, সরকারী চাকুরির যোগ্যতা তাদের লাভ হলেও সরকারী ইস্তাহার সহযোগে ইচ্ছা করে তাদের দূরে রাখা হয়। কেউ তাঁদের অসহায় অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করে না। তাঁরা যে আছে এই কথাটাও উচ্চতর রাজকর্মচারীদের মনে স্থান পায় না।"[২৬]

শুধু উচ্চতর রাজকর্মচারীরা নয় নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনের নেতারাও কেউ বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিশাল মুসিলম জনগোষ্ঠীর কথা ভাবেননি। ভাবেননি বলেই সংস্কার আন্দোলন যখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে, রামমোহনের মৃত্যুরও অনেক পরে শাসক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে বঞ্চিত এবং হেয় করে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রচার সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া রামমোহন রায় যে শাসনকে মধ্যযুগীয় অরাজগতা বলেছেন তা ছিল মুসলিম শাসনের যুগ। বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে তালদিয়ে মুসলিম শাসন আমলের সমালোচনার ফলে রামমোহন রায় এবং তাঁর অনুসারীদের মুসলিমরা তাদের আপনজনভাবতে পারেনি।

ইতিহাসবিদদের মতে রামমোহন রায় সকল সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার সকল রকম সংকীর্ণতা আর গোড়ামীর উর্দ্ধে ছিলেন। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তিনি ভারতবর্ষকে আধুনিক যুগের পথ দেখিয়েছেন। তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের উদারনৈতিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ প্রদর্শক।[২৭]

উপরোক্ত বক্তব্য যথার্থ সন্দেহ নাই, তবু অস্বীকার করার উপায় নাই তাঁর প্রদর্শিত পথে, তাঁর অনুসারীদের সহযাত্রী বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় হতে পারেনি। মুক্ত চিন্তার আলো যখন সারা ভারতকে আলোড়িত করছে, চরম নিগৃহীত বাংলার মুসলিম সমাজ তখন সংস্কার বিমুখ হয়ে বিভ্রান্ত ধর্মীয় নেতৃত্বে ঘুরপাক খাচ্ছে। সর্বক্ষেত্রে অনগ্রসর হওয়ার কারণে বঞ্চিত মুসলমান সম্প্রদায় আরো হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই বৈষম্য হতাশাই শেষ পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও সংঘাতের জন্ম দেয়। ফলে ঐ সময় থেকে হিন্দু মুসলিম বিরোধ ক্রমশ তীব্রতর হতে থাকে।[২৮]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে ছিল রামমোহন রায়ের উদারনৈতিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব। তাঁর মৃত্যুর পর এই চিন্তাধারা বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের আচ্ছন্ন করে রাখে। তাঁর আন্দোলনের ধারা দৃঢ়ভাবে বাঁচিয়ে রাখে হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্রবৃন্দ ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের মাধ্যমে। যার নেতৃত্বে ছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরী লুইস ডিরোজিও।[২৯] যিনি আপোষকামীতার পথ পরিহার করে তার শিষ্যদের সর্বধরনের কর্তৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন এবং সমালোচনা করার কাজে উৎসাহিত করেন। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার শিক্ষা দিয়ে ছিলেন বলেই যুগ যুগ সঞ্চিত আচারের নামে অনাচার, ধর্মের নামে প্রাণহীন অনুষ্ঠান সর্বস্বতা, শাসনের নামে কুশাসন লৌকিক আচারের নামে কূপমন্ডুকতা, সমাজে প্রাধান্যের নামে পুরোহিত-ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে তারা যুক্তিনিষ্ঠ প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছেন।[৩০]

ডিরোজিওর শিষ্যবৃন্দ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসী বিপ্লব দ্বারা গভীর ভাবে উজ্জীবিত হন। ফরাসী বিপ্লব তাদের মধ্যে এতোখানি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় যে 'বেঙ্গল হরকরা' নামক পত্রিকায় তারা ভারতের সামাজিক ও অর্থনেতিক দুর্দশা দূর করার আহ্বান জানান। এই আহ্বানে ভীত বৃটিশ অনুগত সংবাদপত্রে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলা হয় 'ভারত বর্ষে ফরাসী অনুকরণে বিপ্লব হলে গঙ্গার জল রক্তে লাল হয়ে উঠবে আর উদ্যানগুলিতে শুধু মানুষের মাথা পড়ে থাকবে।'[৩১]

ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের সদস্যারা সব সময়ে ইউরোপের বিপ্লবকে স্বগত জানিয়েছে। এদের কার্যাবলী ভারতীয় জনগণ বৃটিশ কর্তৃক শাসিত এবং শোণিত এই চেতনা জাগ্রত করতে সাহায্য করেছে। যে কারণে প্রেস আইন, মরিশাসে ভারতীয় শ্রমিক রপ্তানি, ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতি উদাসী ১৮৩৩ সালের চার্টার আইন এদের দ্বারা তীব্র ভাবে সমালোচিত হয়েছে। ডিরোজিওর শিষ্যরা রামমোহনের আপোষকামী পথ পরিহার করে যে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তীতে এই সাহসী ভূমিকায় অনেকেই অবতীর্ণ হন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অক্ষয় কুমার দত্ত, যিনি যুক্তিবাদ ও রাজনৈতিক উদারনীতিবাদের প্রবক্তা হিসেবে ছিলেন রামমোহনের যোগ্য উত্তরসূরী। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন ভারতে বৃটিশ শাসনের ফলে দেশবাসীর উন্নতি সংক্রান্ত রামমোহনের তত্ত্বের ঘোর বিরোধী। উপনিবেশ

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপনের ফলে উন্নত জাতির সংস্পর্শে অনুন্নত জাতির কল্যাণ সাধন হয় তিনি এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন ভারতবাসীর উন্নতি ভারতবাসীর দ্বারাই সম্ভব। বৃটিশ শাসন যে দেশবাসীর জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসেনি তা তিনি লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া কি হয়ে ছিল, এই পরিবর্তন ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ, কৃষি ব্যবস্থা কিভাবে ধ্বংস করে দিয়ে ছিল তার এক স্বচ্ছবর্ণনা তুলে ধরেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভুত শ্রেণী; জমিদার, মধ্যসত্ত্বভোগী, মহাজন শ্রেণী, এছাড়ও নীলের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নীলকর সাহেবদের ভয়ানক শোষণ নিপীড়ন অমানসিক অত্যাচার কাহিনী তিনি তার লেখনিতে নির্দ্বিধায় লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বৃটিশ শাসন শোষণের ফলে বিশেষ করে বাংলার কৃষি ক্ষেত্রে এবং প্রজার জীবনে যে ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে আসে তা পরিষ্কার ভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

এ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, বৃটিশের যে সহযোগী শ্রেণীর নেতৃত্বে নবজাগরণ শুরু হয়েছিল তাদের মধ্যেও একটি বিরুদ্ধ স্রোত বিরাজমান ছিল। যাঁদের মতবাদ বাংলা তথা সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে আত্মসচেতনতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। বৃটিশ শোষণ শাসন কিভাবে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে দরিদ্র আত্মমর্যাদাহীন জাতিতে পরিণত করেছে, তার উদাহরণ এই বিরুদ্ধ স্রোত সৃষ্টিকারী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লেখনীতে ঠাঁই পেতে থাকে। এই ধরনের লেখায় দেশবাসী বিদেশী শাসনাধীনে নিজ অবস্থান উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। ঐ সময়ে আরো কিছু কিছু ঘটনা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে হীনমন্যতা দূর করে আত্মবিশ্বাস আত্মমর্যাদা বোধ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাশ্চাত্য মনীষী ম্যাক্সমূলার, উইলিয়ম জোনস, উইলসন প্রমুখ কর্তৃক ভারতের ধর্ম সাহিত্য সংস্কৃতির ভূয়োসী প্রশংসা এবং প্রত্মতত্ত্ববিদগণ কর্তৃক প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা আবিস্কার।[৩২]

এর ফলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্বজাতির অতীত ঐতিহ্য এবং ঐশ্বর্যমন্ডিত ইতিহাস কৃষ্টি সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাতে থাকে। যে আগ্রহ ক্রমাগত ধাপে ধাপে জাতীয় ঐক্যের দিকে ধাবিত হয়। এই আত্মসচেতন শ্রেণী একদিকে পরাধীনতার শিকলের ভার টের পেতে থাকে। আরেক দিকে শিকল ভাঙ্গার প্রয়োজনও অনুভব করতে থাকে। তবে তা তখন পর্যন্ত ছিল অনুভবের এবং রামমোহনের প্রদর্শিত নিয়মতান্ত্রিক পথে সীমাবদ্ধ। রামমোহন রায় স্বয়ং ভারতবাসীর স্বাধীনতার কথা অস্বীকার করেননি। তিনি আপোষকামী মনোভাবের পরিচয় দিলেও স্বাধীনতার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতেও পিছপা হননি।[৩৩]

উনিশ শতকে নবজাগরণ সমগ্র শিক্ষিত সমাজকে যে ভাবে আলোড়িত করে ছিল তাতে বাংলা ভাষা সাহিত্যেও সৃষ্টি হয়ে ছিল নবযুগের। নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলার কবি সাহিত্যিকগণ শুধু মাতৃভাষা চর্চায় ব্রতী হন নাই এর উৎকর্ষতা সাধনেও আত্মনিয়োগ করেন। তারা ভাষা সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে সচেষ্ট হন। তাদের লেখনিতে শোষিত নিপীড়িত দেশবাসীর বাস্তব অবস্থা ফুটে উঠতে থাকে। এর ফলে বাঙালী মানসে দেশপ্রেম জাতীয় চেতনার দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। সাহিত্যকে নুতন আঙ্গিকে সাজিয়ে একে করে তোলেন আধুনিক ভাষাগুলোর সমকক্ষ। প্রাচ্যও পাশ্চাত্যের ভাব রস ও রূপের সংমিশ্রণে বাংলা সাহিত্য পরিণত হয় বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য রত্নভান্ডারে। শুধু তাই নয় এঁরা এদের লেখনির মাধ্যমে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে দেশাত্মবোধ জাতীয় চেতনা জাগ্রত করতে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। একাধারে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের নবরূপ এবং নবজীবন দান করে ছিলেন সৃষ্টি করেছিলেন জাতীয় চেতনা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি শুধু রাজা রামমোহনের উত্তরসূরী সমাজ সংস্কারকই নন বাংলা ভাষা সাহিত্যের নব রূপদানকারীদের এক জন। বাংলা কাব্য সাহিত্যে যুগান্ত সৃষ্টিকারী কবি মাইকেল মধুসুদন দত্তের লেখনিতেও বাঙালী চেতনা মূর্ত হয়ে ওঠে। স্বজাতির প্রতি তার দরদ গভীরভাবে বাঙালীর হৃদয় ছুঁয়ে যায়। দীনবন্ধু মিত্র তার বিখ্যাত নাটক নীলদর্পনে ইংরেজ শোষণের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে বাংলার নিঃস্ব শোষিত কৃষক সমাজের সুখ, দুঃখের প্রতি তার গভীর মনোযোগই শুধু পরিলক্ষিত হয়নি বাঙালী কৃষক সমাজের পক্ষ হয়ে কথা বলার যে সাহস দেখিয়েছেন, সে সাহস পরবর্তীতে সাহিত্যে শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। তার লেখনীতে বাঙালী জাতীয় চেতনার আভাস তাঁকে বাংলা সাহিত্যের দেশপ্রেমী ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করেছে। এ ছাড়া লাল বিহারী দের 'বাংলার রূপকথা' কালী প্রসাদ দত্ত কর্তৃক রচিত 'ভারত গীতিকা' বাঙালী মানসে জাতীয়তাবোধের স্ফুরণ ঘটায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ নাট্যকার যেমন বাংলা নাট্য সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন তেমন তাঁদের লিখিত নাটক বাঙালীর মনে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের আবেগ সঞ্চারে সহায়তা করে।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিস্তার ঘটিয়ে যুগের দাবী যিনি পূরণ করেছিলেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্র তার লেখনির মাধ্যমে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী চিন্তার রূপকার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। তাঁর সৃষ্ট ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা পরবর্তীতে রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ কর্তৃক গভীর ও ব্যাপক ভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক রূপলাভ করে। এইভাবেই ধর্মভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম হয়। যা ছিল মূলতঃ বাঙালী হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ। এই চেতনার পথ ধরেই শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনার উদয়। জাতীয় চেতনা সঞ্চারের শক্তিশালী কলম নিয়ে বাংলা সাহিত্য সাধনায় যিনি ব্রতী হয়ে ছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর রচিত কবিতা গান বাংলার ঘরে ঘরে জাতীয় চেতনার আলো ছড়িয়ে ছিল। এছাড়া নবীন সেন, বিহারী লাল চক্রবর্তী, রংগলাল বন্দোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালী প্রসন্ন সিংহ প্রমুখের রচনায় যেমন বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল, তেমন এঁরা সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্তার ঘটিয়ে ছিলেন। যদিও তাঁদের এই জাতীয় চেতনা ছিল সংকীর্ণ ধর্মভিত্তিক সর্বভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা। ফলে সাহিত্যে যে জাগরণ যে সামাজিক সংস্কার ও ধর্মীয় সংস্কার সবই হিন্দু সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেতে থাকে।

সে সময়ে বাংলা ভাষা সাহিত্য চর্চা বাঙালী মুসলিমদের জন্য ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। এক সময় যে বাংলা ভাষা সাহিত্য মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধি লাভ করে ছিল, হিন্দু মুসলিম সম্মিলিত ভাবে যে ভাষাকে গড়ে তুলেছিল পরম নিষ্ঠা আর দরদ দিয়ে, সে ভাষা বাঙালী মুসলিমদের জন্য ছিলো 'কাফেরদের ভাষা'। ইংরেজ শাসন কালে হতাশাগ্রস্ত পশ্চাদপদ অশিক্ষিত বাঙালী মুসলিমদের দুরাবস্তা এবং নেতৃত্ব শূন্যতার সুযোগে এক শ্রেণীর গোড়া মোল্লা ও মৌলবী এ ধরনের 'ফতোয়া' জারী করতে সাহস পায়। একদিকে ইংরেজী বিধর্মীয়দের ভাষা বলে তা শিক্ষা থেকে মুসলিমদের বিরত রাখে আরেক দিকে মাতৃভাষা চর্চা থেকে ও তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়। এই ফতোয়া জারীর ফলে বাঙালী মুসলমান সংকীর্ণ ধর্মীয় গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে বাংলা ভাষা সাহিত্য যখন নবরূপে আত্মপ্রকাশ করছে, ভাষা সাহিত্য জুড়ে চলছ পরিবর্তনের উৎসব, তখন বাঙালী মুসলমান এতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। একদিকে ধর্মীয় নেতাদের জারীকৃত ফতোয়া অপর দিকে নবজাগরণ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ধর্মীয় সংকীর্ণতা, ফলে হিন্দু মুসলিম সম্মিলিত ভাবে বাংলা ভাষা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবে বাংলাভাষা কিছু কালের জন্যে বাঙালী মুসলিমদের কাছে চরম অবহেলার শিকারে পরিণত হয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণী জাতীয় মনোভাব সৃষ্টিতে সচেষ্ট হন। এতে সচেতন ভাবে সক্রিয় এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র। এঁরা ১৮৬৫ সালে 'প্যাট্রিয়েট এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৪] পরবর্তী বছর রাজানারায়ণ বসুর অগ্রণী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'Society for the promotion of National Feeling among the Educated Nations of Bengal' বাঙালী মানস গঠনে এ সমাজ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এবং বাঙালীর চিন্তা জগতে এক যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।[৩৫] পরের বছর তিনি শিক্ষিত মানুষের মধ্যে জাতীয় মনোভাব জাগ্রত করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয় নবগোপাল মিত্র এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের সহযোগিতায় 'হিন্দু মেলা' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।[৩৬] কোলকাতায় তিন চার দিনের জন্য এই মেলার আয়োজন হতো। জনগণকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষে মেলায় জাতীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান এবং দেশীয় জিনিস পত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হতো।

উনিশ শতকের ষাটের দশকের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রসার ঘটে ছিল। তা মূলতঃ ছিল ধর্ম কেন্দ্রিক। নবগোপাল মিত্র তাঁর 'National Society' ও 'National paper' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতব্যাপী যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন তা ছিল সর্ব ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ। তিনি অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মতোই হিন্দু সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র একটি জাতি হিসেবে দেখেছেন। এভাবেই রামমোহন কতৃক সৃষ্ট নবজাগরণ আন্দোলনের উদার মানসিকতা ধর্মীয় সংকীর্ণতায় হারিয়ে যেতে থাকে। তাঁর মৃত্যুর বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে সমগ্র সমাজকে তার চিন্তার উল্টো দিকে প্রবাহিত হতে দেখা যায়। তিনি যে হিন্দু সমাজকে কুসংস্কার গোড়ামী থেকে মুক্তি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ছিলেন সেই হিন্দু সমাজকেই তাঁর চেয়ে প্রবল বেগে প্রবল শক্তিতে পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থক সফল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তৎপরবর্তীকালের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। এভাবে রামমোহন কতৃক সৃষ্ট সংস্কার আন্দোলন চরম ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয় রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মের সনাতনপন্থী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। ফলে সর্বভারতীয় অসম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা এবং তার বিকাশের পথ হয় রুদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াহাবী আন্দোলন

উনিশ শতকের হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলনের নেতারা যখন বিদেশী ইংরেজ শাসকদের এদেশের জনগণের ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন তখন ওয়াহাবী আন্দোলনের ঢেউয়ের ফলে মুসলমান সমাজের মধ্যে বিপরীত মুখী একভাবধারা বিরাজ করছিল। মুসলিম নবজাগরণ আন্দোলনের নেতারা বিধর্মী ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' বা দুশমনের দেশ বলে চিহ্নিত করেছেন।[৩৭] বিধর্মী শাসকের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মীয় যুদ্ধ ন্যায় সঙ্গত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ফলে ঐ সময়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্বত্র সমান্তরাল ভাবে চলেছে দুইটি সংস্কার আন্দোলন, নবজাগরণের দুটি ধারা একটি হিন্দু সম্প্রদায়ের অপরটি মুসলিম সম্প্রদায়ের। এ উপমহাদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংস্কার বা নবজাগরণ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (১৭৮৬-১৮৩১)। যদিও এ আন্দোলনের শেকড় ছিল আরো অতীতের গভীরে, ভিন্ন পরিবেশে এবং ভিন্ন দেশের মাটিতে। আষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের প্রায় দেশের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক অধঃগতি চরমে পৌছে, এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আরবদেশে এক সংস্কার আন্দোলনের সুত্রপাত ঘটে। যা তারিখ-ই-মুহম্মদিয়া আন্দোলন নামে খ্যাত। আরবের নেযাদ রাজ্যের অধিবাসী ও ধর্মীয় নেতা মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহবের (১৭০৩-১৭৯৩) নেতৃত্বে আরবে এই আন্দোলন শুরু হয়। তাঁর মৃত্যু পর শেখ মুহম্মদ ইবন সউদ আন্দোনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আরবের বিভিন্ন স্থানে যেমন আন্দোলনের প্রসার ঘটান, তেমন এর বাণী হজ্বের সময় অন্যান্য দেশের মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করার জন্য মক্কা মদীনায় প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি দূরকরে পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের নির্দেশিত সহজ সরল আদর্শে মুসলিম সমাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।[৩৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরবে সংঘটিত এই তারিখ-ই-মুহম্মদিয়া আন্দোলন এ অঞ্চলে ওয়াহাবী আন্দোলনের ধারা সৃষ্টি করে। আরবের মুহম্মদিয়া পন্থীদের আদর্শই ভারতের ধর্মীয় সংস্কার পন্থীরা তাদের আদর্শ বলে গ্রহণ করেন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ইংরেজ শাসক বর্গ মুহম্মদিয়া পন্থীদের হেয় করার লক্ষ্যে বিদ্রুপ করে ওয়াহাবী বলে আখ্যায়িত করত।[৩৯] যেহতেু ঐতিহাসিক গবেষক পন্ডিত ব্যক্তিরা মুহম্মদিয়া বা ওয়াহাবী আন্দোলনের যথার্থ এবং গ্রহণযোগ্য কোন ভিন্ন নাম দেয়ার বিষয়ে ঐক্যমত্যে আসতে পারেননি সেহেতু ইংরেজ শাসক ও লেখকগণ কর্তৃক আখ্যায়িত ওয়াহাবী নামটিই অদ্যাবধী প্রচলিত আছে।

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরু করার আগেই ভারতবর্ষে ধর্মীয় সংস্কার চিন্তার বলয় সৃষ্টি হয়েছিল। মোঘল আমল থেকেই এ অঞ্চলে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিপন্নদশা শুরু হয়। ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে এই সময় থেকেই বিধর্মীদের রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, ক্রমবর্ধমান হারে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে এই সম্প্রদায়কে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে থাকে। এই অবস্থায় ইসলামের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার কল্পে ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইংরেজ শাসনকালে এই প্রয়াস সাংগঠনিক রূপ লাভ করে ওয়াহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে। ভারতবর্ষে এই আন্দোলন প্রাথমিক ভাবে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসেবেই শুরু হয়েছিল। পর্যায়ে এটি একটি তীব্র ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে মুসলমান সমাজের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র জাতিবোধ বিরাজমান ছিল, ছিল ইংরেজ বিদ্বেষ। পরবর্তীতে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই বোধ আরো তীব্র করে তোলে।

উপমহাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের তাত্ত্বিক বুনিয়াদ যিনি রচনা করেছিলেন তিনি ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬৪)।[৪০] তিনি বিশ্বাস করতেন মুসলিম সমাজে কুফরি বা ইসলাম বিরোধী রাজনীতির প্রাধান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের অধঃপতরেন মূল কারণ। সুতরাং মুসলিম সমাজকে রক্ষার জন্য সর্বপ্রথম এ সমাজকে কুফরি মুক্ত করতে হবে। এরজন্য প্রয়োজন হলে জেহাদ ঘোষণাকেও তিনি কর্তব্য বলে মনে করেন। তিনি ইংরেজ রাজশক্তিকে মুসলিমদের জন্য একটি অশুভ শক্তি বলে গণ্য করেন এবং প্রয়োজন হলে এই শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করাকে তিনি ন্যায় সঙ্গত বলে উল্লেখ করেন। কেননা এই বিধর্মী শাসন ইসলামী রীতিনীতি এবং জীবন ব্যবস্থার অবক্ষয় এবং ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তিনি ইসলামী বিধি বিধানের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে নতুন ভাবে চিন্তাভাবনা করার বিষয়টি স্বীকার করলেও তা সনাতন ইসলামী ঐতিহ্যধারা এবং ইসলামের আদি বৈশিষ্ট্য গুলোকে বহাল রেখেই করেছেন। রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতিতে আদি ইসলামী সমাজে যে ধরনের খলিফাতন্ত্র প্রচলিত ছিল তিনি সেই ধরনের শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শাসকদের বিলাসিতাহীন সরল জীবন যাপনের পরামর্শ দেন এবং প্রজাদের উপর যাতে বিপুল করভার অর্পণ না করা হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলেন। তিনি সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য যেমন অগ্রগতির প্রতিবন্ধক মনে করতেন তেমন শাসক

Dhaka University Institutional Repository

শাসিতের মধ্যেও অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি শ্রমজীবী মানুষকে ভারবাহী পশুতে পরিণত করার বিরোধী ছিলেন।[৪১]

তাঁর চিন্তা চেতনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদ। তিনি পৃথিবীর সকল মুসলমানকে এক কওম বা জাতির সদস্য বলে উল্লেখ করেছেন। দেশ জাতি গোত্র বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মুসলমানকে তিনি সমানভাবে দেখেছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ নিঃসন্দেহে ইসলামী তত্ত্ববিশারদ এবং প্রতিভাধর চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁর সামাজিক রাজনৈতিক এবং ধর্মবিষয়ক চিন্তা চেতনা প্রকৃত পক্ষে সমকালীন অবস্থা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। সক্রিয়ভাবে তিনি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করলেও তার মতাদর্শ ওয়াহাবী আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এদিক থেকে শাহ ওয়ালীউল্লাহকে তারিক-ই-মুহম্মদীয়া আন্দোলনের তাত্ত্বিক রূপকার বলা যেতে পারে। যদিও একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে তাঁর সকল চিন্তাভাবনা ছিল তাঁর নিজ সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। সম্প্রদায়গত স্বার্থচিন্তার উর্দ্ধে তিনি উঠতে পারেন নাই। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে পতন মুখী মুসলিম ভারতকে সুসংহতরূপে পুনরুজ্জীবনের জন্য এই ধরনের সম্প্রদায়গত চিন্তা ছিল তৎকালীন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক। সে যাই হোক ভারতবর্ষের মুসলিমদের বিপন্নদশা দূর করার লক্ষ্যে তাঁর প্রচারিত আদর্শ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধর্মীয় সচেতনতার জন্ম দিয়েছিল তা ক্রমশ স্বতন্ত্র মুসলিম জাতি চিন্তার পথ উন্মুক্ত করে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ আন্দোলনের যে তাত্ত্বিক বুনিয়াদ রচনা করেছিলেন, পরবর্তীতে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী সেই বুনিয়াদের উপর আন্দোলনের বিশাল ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহর সুযোগ্য পুত্র ধর্মীয় নেতা শাহ আব্দুল আজিজ পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' বা দুশমনের দেশ বলে ফতোয়া জারী করেন। তিনি বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদ ন্যায়সঙ্গত বলে ঘোষণা দেন। ভারতবর্ষের তারিক-ই-মুহম্মদীয়া আন্দোলনের পথিকৃৎ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী যৌবনে তাঁর মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। মুহম্মদীয়া বা ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে নিজেকে ইমাম মেহদি বলে ঘোষণা দিয়ে ধর্মীয় পরিশুদ্ধী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই আন্দোলনে নিষ্ঠার সাথে নেতৃত্ব দেন। সৈয়দ আহমদ তাঁর প্রচারিত যে আদর্শের উপর ভিত্তি করে আন্দোলন গড়ে তুলে ছিলেন তা সম্পূর্ণই ছিল ধর্মভিত্তিক। যেমন :

১। প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহর একত্বে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে।
২। প্রত্যেকের জন্য আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য।
৩। বিধর্মীয়দের আচার আনুষ্ঠান বর্জনীয়।
৪। অমুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা অনুচিত।
৫। ইসলাম ধর্মকে পরিশুদ্ধ রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনবোধে জেহাদ করা কর্তব্য।
৬। পৌত্তলিকতা মহাপাপ।
৭। আল্লাহর বিধানে বিশ্বাসী খলিফার নেতৃত্বে শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে হবে; এবং
৮। সরকারের কর্তব্য জনকল্যাণমূলক নীতি অনুসরণ করা।[৪২]

আপত দৃষ্টিতে ওয়াহাবী আন্দোলন ধর্মীয় আন্দোলন মনে হলেও এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল এর মূল পরিচালিকা শক্তি। 'দারুল হারব'কে 'দারুল ইসলামে' রূপ দেয়ার উপরই এর সাফল্য নির্ভরশীল ছিল। ওয়াহাবীরা ভিন্ন ধর্ম বিদ্বেষী না হলেও স্বধর্মীদের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী সংগ্রাম করেছেন। ১৮২০ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত এদের সংগ্রাম চলেছে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং এর প্রতি ছিল মুসলিম জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন। ওয়াহাবী আন্দোলন সম্পর্কে পি, এন, চোপরা বলেছেন: "The first organized attempt to drive out the British and restore the Muslim rule was made by the Wahabis under saiyed Ahmad of Rai Bareli (1786-1831). This movement spread throughout the country particularly in Bengal, Bihar, Uttar pradesh, the punjab and North West Frontier Provinces. It Continued for about half a century (1820-1870) with the active support of Villagers and peasants who generously donated money out of there meagre savings and volunteered their services for getting rid of the foreign rulers. No doubt, the movement was anti-sikh in the beginning as the punjab was under their rule at that time but later on after the occupation of the punjab by the British, it turned completely against the English"[৪৩]

ওয়াহাবী আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন বৃটিশ বিরোধী প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

সুসংগঠিত সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। যা সৈয়দ আহমদের মৃত্যু পরেও প্রায় ত্রিশ বছর অব্যাহত থাকে। এদেশের মুসলমানের মধ্যে ওয়াহাবী আদর্শ অর্ধ শতাব্দীব্যাপী যে নবজাগরণ এবং হতাশাগ্রস্ত মুসলমান সমাজের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছিল সেই আদর্শের প্রভাব এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠার বাস্তব সংগ্রাম মুসলিম সম্প্রদায়কে সর্বভারতীয় অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধর্মভিত্তিক একটি জাতিতে পরিণত হতে সাহায্য করে। যদিও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ তখনও সৃষ্টি হয় নাই তবে যে সমস্ত ঘটনা প্রবাহ এই উপমহাদেশের জনগোষ্ঠিকে দুটি ধর্মভিত্তিক জাতিতে বিভক্ত করে দেয়, ওয়াহাবী বা তারিখ-ই মুহম্মদীয়া আন্দোলন নিঃসন্দেহে সেই ধরনের একটি ঐতিহাসিক প্রবণতা।

বাংলার ওয়াহাবী আন্দোলনের নায়ক তিতুমীর তৎকালীন নীলকর জমিদার গোষ্ঠীর শোষণ উৎপীড়ন সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ব থেকে কৃষক প্রজাকুলকে রক্ষার জন্য ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য থেকে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৪৪] আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে এটি একটি সংগঠিত বিদ্রোহে রূপ নেয়। যে বিদ্রোহকে লেখক গবেষকরা নানানভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। থর্নটনের মতে তিতুমীরের শান্তিপূর্ণ ধর্ম সংস্কার আন্দোলনকে, অকারণে ভীতির চোখে দেখে বিষয়টিকে কর আদায়ের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে, জমিদারগণ মুসলিম কৃষকদের উপর যে অত্যাচার শুরু করেন সে অত্যাচারই বিদ্রোহের আসল কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৪৫]

ওয়াহাবী আন্দোলন সম্পর্কে ওকেনলির লিখিত বিবরণেও বলা হয়েছে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, জমিদার শ্রেণীর উৎপীড়নের কারণে বিদ্রোহী রূপ ধারণ করেছিল।[৪৬] অপর দিকে হান্টার তাঁর Indian Mushalmans বইতে 'বারাসাত বিদ্রোহকে' মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের রূপে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষকদের গণঅভ্যুত্থান বলে অভিহিত করেছেন।[৪৭]

এদের বক্তব্য থেকে প্রতিয়মান হচ্ছে যে ওয়াহাবী আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও জমিদার শ্রেণীর উৎপীড়ন অত্যাচার একে একটি বিক্ষুব্ধ কৃষক বিদ্রোহে পরিণত করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আন্দোলন (দারুল ইসলামে পরিণত করার আন্দোলন) শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলের সর্বসাধারণের অর্থনৈতিক শোষণ মুক্তির সশস্ত্র লড়াইয়ে পরিণত হয়। তিতুমীরের সংস্কার আন্দোলন হিন্দু মুসলিম জমিদার অভিজাত ধনিক শ্রেণী মোল্লা পুরোহিত কেউ সুনজরে দেখেনি। হান্টার তার গ্রন্থে বলেছেন : "হিন্দু হউক, আর মুসলমানই হউক যে কোন স্থানে যে কোন বিত্তশালী বা কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই ওয়াহাবীদের উপস্থিতি একটা ভীতির কারণ।...যে সকল মসজিদের বা পথিপার্শ্বস্থ মন্দিরের কয়েক বিঘা করিয়া ভূসম্পতি আছে, তাহাদের প্রত্যেকটি মসজিদ বা মন্দিরের মোল্লা বা পূরোহিতই গত অর্ধশতাব্দীকাল ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে তারস্বরে চিৎকার করিয়োছে।...অন্যান্য স্থানের মত ভারতবর্ষের ভুস্বামী ও মোল্লা পুরোহিত গোষ্ঠী যে কোন পরিবর্তনকে ভয় করে। রাজনৈতিক হউক বা ধর্মীয় হউক যে কোন প্রকার বিরোধীতাই কায়েমী স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক। আর উভয় বিষয়েই ওয়াহাবীরা ছিল প্রচলিত ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী।"[৪৮]

এ আন্দোলনকে সম্প্রদায় নির্বিশেষে উচ্চ শ্রেণীর সুনজরে না দেখার কারণ হচ্ছে এতে অংশ গ্রহণকারীরা শুধুমাত্র একটি শ্রেণীর লোক হলেও এক সম্প্রদায়ের ছিল না। এতে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বিত্তবান অভিজাত ও মোল্লা পুরোহিত অনেকেরই স্বার্থ ব্যাহত হচ্ছিল। যে কারণে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ধনী অভিজাত মহাজন জমিদার শ্রেণীতো বটেই এমনকি নীলকর সাহেবরা পর্যন্ত এর তীব্র বিরোধীতা করে। যার ফলে ওয়াহাবীদের সাথে এদের সংঘর্ষ হয়ে পড়ে অনিবার্য। সমাকালীন সরকারী বিবরণেও বাংলাদেশের ওয়াহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : "ইহারা (বঙ্গদেশ) সংখ্যায় আশি হাজার ইহাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই, সকলেই নিম্নশ্রেণীর মানুষ।"[৪৯]

ক্যান্টোয়েল স্মিথের মতে অর্থনৈতিক দিক থেকে ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল পূর্ণ মাত্রায় শ্রেণী সংগ্রাম। শিল্প বিকাশের পূর্ব যুগে যে ভাবে ধর্মীয় ধ্বনি দিয়ে শ্রেণী সংগ্রাম শুরু হয়। এখানেও সে ভাবে বিষয়টি শুরু হয়েছে। তাঁর মতে এই ধর্মীয় ধ্বনি সাম্প্রদায়িক ছিল না।[৫০] এই আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক চেতনা ছিল না। এ বিষয় যুক্তি দেখাতে যেয়ে তিনি বলেছেন, ওয়াহাবী বিদ্রোহ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিম্ন শ্রেণীর মুসলিমদের ক্ষিপ্ত করে, তাদের প্রকাশ্যে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করে নাই, বা মুসলিম শ্রেণীশত্রুকে সাম্প্রদায়িক বন্ধু বলে তাদের সাথে ঐক্য স্থাপন করে, নিম্নশ্রেণীর মুসলিমদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম থেকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে নাই।[৫১]

ওয়াহাবীদের মধ্যে এই ধরনের অসাম্প্রদায়িক চেতনার পেছনে কারণ ছিল তাদের আদর্শ। সে আদর্শে বিধর্মীদের আচার অনুষ্ঠান সংস্কার বর্জনের কথা বলা হলেও সেখানে বিধর্মীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ অনুচিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াহাবী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় সংস্কার এবং কোম্পানী শাসনের উৎখাত। স্বদেশী ভিন্ন সম্প্রদায়ের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি বিদ্বেষ পোষণ নয়। এই ধরণের বিদ্বেষ প্রদর্শীত হলে ওয়াহাবীদের আদর্শ চ্যুতি ঘটত। আন্দোলনেরও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং আন্দোলনের স্বার্থেই তাঁদের বিধর্মী হলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়েছে। যে সম্পর্ক হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবিত্তের সাধারণ মানুষ গুলোকে, স্বসম্প্রদায়ের উচ্চবিত্ত অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক সৃষ্ট (নবজাগরণ) আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে, স্বশ্রেণীর কিন্তু বিধর্মী ভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের পরিচালিত আন্দোলনে সম্পৃক্ত করেছিল। এই অংশগ্রহণ ছিল নিম্নবিত্তের নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিজাত উচ্চবিত্ত উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং অন্যান্য শোষক শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের তীব্র ঘৃণার বর্হিপ্রকাশ। এর অর্থ এই নয় যে এদের অংশ গ্রহণ আন্দোলনের ধর্মীয় আদর্শকে গুরুত্বহীন করে। মনে রাখতে হবে কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান। তাছাড়া হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকদের সাধারণ শত্রু ছিল জমিদার মহাজন পুরোহিত মোল্লা নীলকর এবং ধনী ব্যক্তিরা।

ভারতবর্ষের পরবর্তী কালের ইতিহাস প্রমাণ করে যে এ অঞ্চলে কোন আন্দোলনেই ধর্ম নিজেকে গোপন রাখতে পারেনি। অনেক উদারপন্থী দেশপ্রেমী মানবতাবাদী নেতাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ধর্ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সংঘাত বেধেছে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে। ভারতের স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে পরিণত করেছে এক সম্ভাবনাহীন প্রয়াসে। দৃঢ় হয়েছে বিদেশী শাসন শোষণ। বাংলার ওয়াহাবী আন্দোলন যতটুকুই ধর্মীয় ঐক্য আনুক না কেন তাও সহ্য হয়নি জমিদার শ্রেণীর। তারা এতে সাম্প্রদায়িকতার রং চড়িয়ে দৃঢ় হাতে দমনে প্রয়াসী হয়েছে। অথচ নির্যাতীত হওয়ার বেলায় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কৃষক সমভাবে অত্যাচারিত হয়েছে। জমিদার শ্রেণী ওয়াহাবী আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক বলতে সক্ষম হয়েছিলেন কারণ এর কর্তৃত্ব নেতৃত্ব এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগ্রহণকারী ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের। এর পেছনে আদর্শ ছিল মুসলিম ধর্মীয় সংস্কার, উদ্দেশ্য ছিল 'দারুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠা।

ওহায়াবী আন্দোলন ধর্মীয় আদর্শের উপর ভিত্তি করে শুরু হলেও আন্দোলনের নেতা এবং অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে উগ্র ধর্মীয় বিদ্বেষ বা সংকীর্ণতা ছিল না। এ কারণেই ওয়াহাবী আন্দোলনের মত নির্ভেজাল একটি ধর্মীয় আদর্শ দ্বারা পরিচালিত আন্দোলন হিন্দু কৃষক সম্প্রদায় অংশ গ্রহণ করেছিল। অথচ এই অংশ গ্রহণে তাদের বাধ্য করছিল নিজ সম্প্রদায়ের জমিদার মহাজন শ্রেণীর আচরণ। একথা প্রমাণিত সত্য যে শোষণের কোন দেশ কাল জাতি ধর্ম বর্ণ নেই। তাই হিন্দু জমিদার মহাজন শ্রেণীর নির্মম শোষণ থেকে হিন্দু বলেই কোন প্রজা পার পেয়ে যায়নি। সুতরাং একারণেই শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ধর্ম তাঁদের জন্য কোন বাধা বলে বিবেচিত হয়নি। তাছাড়া শত শত বছর ধরে উভয় সম্প্রদায়ের একত্রে বসবাস অতীতের গ্রাম সমাজ ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় এরা ছিল অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ। তাই মুসলিম সম্প্রদায়ও তাদের সংগ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ভিন্ন চোখে দেখেনি।

ওয়াহাবী আন্দোলনের যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল 'দারুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠা, তাতেও হিন্দু কৃষক শ্রেণীর যুক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কেননা এর আগে মুসলিম রাজা বাদশারাই ছিল তাদের শাসক। শত শত বছর ধরে এরা মুসলিম শাসনেই অভ্যস্ত ছিল। সন্দেহ নাই সেই আমলেও তাদের শোষণের শিকার হতে হয়েছে, তবে কোম্পানী আমলের শোষণের সাথে তার কোন তুলনা হয় না। বহিরাগত মুসলমান শাসকরা এদেশের অধিবাসী হয়ে দেশ শাসন করেছিলেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্য সংহত করে দেশ শাসন। সুতরাং এক্ষেত্রে রাজার প্রাপ্য আদায়ের সাথে প্রজা পালন, তার ভালমন্দ দিকে লক্ষ্য রাখাও শাসকরা তাদের পবিত্র দায়িত্ব ভেবেছেন। যে ভাবনা বৃটিশদের ছিল না, কেননা তারা এদেশে এসেছিল শুধু শোষণ করতে শাসনও ছিল শোষণের প্রয়োজনে। দরিদ্র প্রজাকুলের বিশেষ করে হিন্দু কৃষক শ্রেণীর কাছে উভয়ে বিদেশী হলেও উভয়ের আচরণের বাস্তব ফল ভোগ করতে হয়েছে তাদের। দুইয়ের মধ্যেকার পার্থক্য বোঝার সুযোগ পেয়েছে তারাই। মুসলিম শাসকদের প্রতি তাদের দুর্বলতার এটিও একটি কারণ। এই বৈষম্য বোঝার ক্ষমতা এবং অতীত শাসকদের প্রতি আনুগত্যের কারণেই ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকেই দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়ে ছিল। এতে বোঝা যায় ইংরেজ কোম্পানীর ক্ষমতা গ্রহণের প্রায় একশত বছর হলেও এদেশের ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে জনসাধারণ মোঘলদেরকেই তাদের শাসক হিসেবে উপযুক্ত এবং যোগ্য বলে বিবেচনা করত। সুতরাং ওয়াহাবী আন্দোলনের মত ধর্মীয় আন্দোলনে সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলার কৃষক যদি অংশ গ্রহণ করে থাকে তাহলেই তাকে শ্রেণী সংগ্রাম বলা কতটুকু যুক্তিসংগত তা ভেবে দেখা দরকার। হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের নিম্নবিত্তের লোকজনকে উচ্চবর্ণের অভিজাত শ্রেণী মানুষ বলেই গণ্য করত না। এই অবস্থায় যদি তারা তাদের বাঁচার স্বার্থে সহানুভূতিশীল ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলে তাহলে এই ঐক্যে ধর্মীয় স্বাতন্ত্রবোধ বিলুপ্ত হবে এমনটি ভাবার কোন কারণ নাই। এই ঐক্যের মাধ্যমে তারা যেমন শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিল তেমন মুসলিম শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। এ

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের শুধু নেতৃত্ব নয় স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণকারী সংখ্যাগরিষ্ঠরাই ছিল মুসলমান। এই আন্দোলনের মাধ্যমে তারা পূর্বের শাসককে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে নতুন কিছু প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি। সুতরাং এর মধ্যে আধুনিক যুগের শ্রেণী সংগ্রামের ধারণা কাজ করেনি কাজ করেছে মধ্য যুগের ধর্মীয় চেতনা এবং পূর্ব শাসকদের প্রতি আনুগত্য। মুসলিম ধর্মীয় আদর্শ এর মধ্যে প্রবলভাবে ছিল বলেই মুসলিম জনগোষ্ঠী এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশ নিয়েছে। হান্টারের আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমান গ্রন্থে আছে : "পূর্ব বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলা থেকে ওয়াহাবী প্রচারকেরা সাধারণতঃ বিশ বৎসরের কম বয়সের শত শত সরলমতি যুবককে অনেক সময় তাদের পিতামাতার অজ্ঞাতে নিশ্চিত প্রায় মৃত্যুর পথে সঁপে দিয়েছে। শত সহস্র কৃষক পরিবারে তারা দারিদ্রও শোক প্রবিষ্ট করিয়েছে, আর আশা ভরসাস্থল যুবকদের সম্বন্ধে পরিজনের অন্তরে একটা স্থায়ী দুর্ভাবনা এনে দিয়েছে। যে ওয়াহাবী পিতার বিশেষ গুণবান অথবা বিশেষ ধর্মপ্রাণ পুত্র বিদ্যমান তিনি জানেন না কোন সময়ে তার পুত্র গ্রাম থেকে উধাও হয়ে যাবে।"[৫২]

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে শত সহস্র যুবক ওয়াহাবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তারা ধর্মপ্রাণ এবং মুসলিম কৃষক পরিবারে সন্তান ছিল। হান্টারের বর্ণনা অনুযায়ী বিশেষ ধর্মপ্রাণ যুবকদেরই এই আন্দোলনে যোগদানের সম্ভবনা ছিল অধিক এবং এরাই অধিক সংখ্যক ওয়াহাবী বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। সুতরাং ওয়াহাবী আন্দোলনের ধর্মীয় দিকটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল গবেষকদের এই বক্তব্য নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া যায় না। ক্যান্টোয়েল স্মিথ ওয়াহাবী আন্দোলনকে অসাম্প্রদায়িক শ্রেণী সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করলেও পরবর্তীতে এর ধর্মীয় প্রভাবের কথাও স্বীকার করেছেন। তার মতে আন্দোলনের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দিক থাকা সত্ত্বেও এর ধর্মীয় ধ্বনির জন্যই ওয়াহাবী আন্দোলন সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উৎসাহিত করেছে এবং পরবর্তীতে বিপুল সংখ্যক মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রচার সহজেই সাড়া জাগিয়ে ছিল। ধর্মের প্রশ্নটি এই বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে এই বিপুল সংখ্যক সম্প্রদায়গত সাড়া সম্ভব ছিল না।[৫৩]

ওয়াহাবী আন্দোলনে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম সংস্কার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার অন্দোলন এবং অংশ গ্রহণকারীরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক ছিল তা বিভিন্ন লেখকের লেখনিতে ধরা পড়েছে। সুপ্রকাশ রায় তাঁর গ্রন্থে বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যাপক ভাবে এই মতবাদে প্রভাবিত হওয়া সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা উল্লেখ করা হলো: "১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় তিতুমীরের সহিত সৈয়দ আহম্মদের দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ ঘটে। সৈয়দ আহম্মদ ওয়াহাবী আদর্শ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া এই সময় কলিকাতায় উপস্থিত হন। বাংলাদেশের মুসলমান জনসাধারণ ইতিপুর্বেই আহম্মদ এর নাম ও তাঁহার আদর্শ শুনিয়া ছিল। তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইবা মাত্র বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে সহস্র মুসলমান কলিকাতায় আসিয়া তাহার মুখ হইতে ওয়াহাবী আদর্শের ব্যাখ্যা শুনিয়া এই আদর্শে দীক্ষিত হয়। আহম্মদের সহিত সাক্ষাতের পর তিতুমীর সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে ওয়াহাবীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত ও আদর্শ প্রচারের কার্য আরম্ভ করেন।"[৫৪]

সৈয়দ আহমদে ব্রেলভীর কোলকাতা উপস্থিতি এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণে ইচ্ছুকদের সংখ্যা একই ভাবে অন্যান্য লেখদের বর্ণনায় এসেছে। তার অনুসারী হতে আগ্রহীর সংখ্যা এতো বেশী ছিল যে তাদের সকলের সঙ্গে তার হাত মেলানো সম্ভব ছিল না। ফলে তৎপরিবর্তে সৈয়দ আহমদ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে ছিলেন হান্টারের ভাষায় : "Unfold his turban, therefore, he declared that all who touched any part of its ample length became his disciple"[৫৫]

উল্লেখ্য সৈয়দ আহমদের অনুসারীরা এরা সবাই ছিলেন মুসলমান এবং এরাই পরবর্তীতে ওয়াহাবী আদর্শের বার্তা বাংলার গ্রামে গঞ্জে পৌছে দেন। ওয়াহাবী নেতা তিতুমীর জমিদার কর্তৃক মসজিদ ধ্বংসের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ১৮৩০ সালের ৬ মে যে প্রতিহিংসা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ছিলেন তাতেও কোন হিন্দু প্রজার উপস্থিত থাকাটা ছিল অস্বাবাভিক। তিতুমীরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার এ ঘটনার বর্ণনা দিতে যেয়ে লিখেছেন : "এই দিন পুঁড়া গ্রামের বারোয়ারি তলায় পূজা ও যাত্রা হইতেছিল। তিতু আসিতেছে শুনিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া যায় এবং লোকজন পলায়ন করে। কিন্তু পূজার পুরোহিত পলাইতে পারেন নাই তিতু বারোয়ারি তলায় আসিয়া একটি গরু হত্যা করে। পুরোহিত তাহা দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। তিনি মন্দিরের শানিত খড়গ গ্রহণ করিয়া প্রবল বেগে মুসলমানদের প্রতি ধাবিত হন। তাহার খড়গাঘাতে কয়েকজন মুসলমান নিহত হইলে তিতুর দল ভীষণ ক্ষিপ্ত হইয়া পুরোহিতকে হত্যা করে।"[৫৬]

এই বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে আন্দোলন সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত ছিলনা। বিধর্মীদের প্রতি বিদ্বেষ ওয়াহাবী আদর্শ বিরোধী হলেও হিন্দু জমিদার শ্রেণীর আচরণ ওয়াহাবীদের বিদ্বেষ প্রকাশে বাধ্য করেছে। এই জমিদার শ্রেণী ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। অন্যান্য অঞ্চলের ওয়াহাবীদের মতো বাংলাদেশের ওয়াহাবীরাও কোম্পানীর শাসনের সমাপ্তি এবং মুসলিম শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। তিতুমীর পুঁড়া গ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমণ ঘটনার কয়েকদিন পরেই এক ঘোষণা প্রদান করেন। এতে বলা হয় : "কোম্পানীর লীলা সঙ্গ হইয়াছে। ইউরোপীয়রা অন্যায়পূর্বক মুসলমান এর রাজত্ব আত্মসাৎ করিয়াছে। উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলমানগণই এদেশের রাজা।"[৫৭]

এ কারণে ওয়াহাবী আন্দোলনের ধর্মীয় চেতনাকে যতই গৌণ করার চেষ্টা করা হোক না কেন মূলতঃ ধর্মীয় চেতনাই ছিল এর প্রাণ। এ আন্দোলনের ফলে মুসলমান সমাজের মধ্যে যে তীব্র স্বাতন্ত্রবোধ জাগ্রত হয় তা সর্বোচ্চ স্তরে যেয়ে পৌছায় দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমে। গোপাল হালদার তার সংস্কৃতির রূপান্তর গ্রন্থে বাঙালী মুসলমানের উপর ওয়াহাবী আন্দোলনের ধর্মীয় প্রভাব সম্পর্কে বলতে যেয়ে বলেছেন : "উনবিংশ শতাব্দীর অর্ধভাগ ব্যাপিয়া উত্তরা পথে ওহাবী Puricanism এর বিদ্রোহ ও প্রভাব থাকে—উহা শেষ হয় স্যার সৈয়দ আহমদের অনুষ্ঠিত আলীগড় আন্দোলনের পরে। বাংলায়ও ওহাবী আন্দোলন প্রবল ছিল। তাহারা এখানেও বিদ্রোহ করিয়াছে, সন্ত্রাসবাদের পথও তখন গ্রহণ করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা যাহা বড় কথা—ইসলামের আসল প্রভাব তখনই বিস্তৃত হইয়াছে বাঙালী মুসলমান জনগণের মধ্যে। বাংলার মুসলমান সাধারণ বিশেষত পূর্ব বাংলার মুসলমান, ওহাবী আন্দোলনে—উহার প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় দুই ভাবেই—বিশেষ রকমে শরিয়ত নিষ্ঠ মুসলমান হইয়া উঠেন। তাহার ফলে তাঁহাদের ধর্মানুরাগ বাড়িয়াছে—মাদ্রাসা, মক্তব ও তাহাতে কোরান হাদীসের চর্চা বাড়িয়াছে।"[৫৮]

বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে ওয়াহাবী আন্দোলন ধর্মীয় চেতনার কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন বিপুল সাড়া জাগিয়ে ছিল তেমন গভীর এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়েছিল। যে প্রভাব ভারতীয় মুসলমানকে অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাদের মধ্যে যেমন সৃষ্টি করে চরম ইংরেজ বিদ্বেষ তেমন সৃষ্টি করে ছিল ইংরেজদের সহযোগী শক্তি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি ক্ষোভ আর ঘৃণা। যে মনোভাব শেষ পর্যন্ত এই দুই সম্প্রদায়কে কোন ইস্যুতেই এক প্ল্যাটফরমে দাঁড়াতে দেয়নি। এজন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের সৃষ্ট আন্দোলনে মুসলিম সম্প্রদায় দূরে থেকেছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে গড়ে উঠা আন্দোলনে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর আমাদের মুক্তি সংগ্রাম নাম গ্রন্থে লিখেছেন : "মুজাহিদ গণের (ওহাবী) আদর্শ ছিল মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলাম। পক্ষান্তরে হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের আদর্শ হইল মুক্ত ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা। ধর্ম ভিত্তি করিয়া জেহাদ এবং সন্তাসবাদ আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়া ছিল বলিয়া প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে হিন্দুরা এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে মুসলমানেরা অংশ গ্রহণ করে নাই।"[৫৯]

এভাবে বৃটিশ শাসন আমলের একের পর এক ঘটনা হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায়কে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিতে থাকে। এক দিকে বৃটিশ বৈষম্যমূলক নীতি অপরদিকে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় রক্ষণশীল মনোভাব, ফলে একই দেশের অধিবাসী একই ভাষা সংস্কৃতির ধারক বাহক হওয়া সত্ত্বেও এদের পথ হয়ে যায় ভিন্ন। এই ভিন্ন পথে চলার প্রবণতা তাঁদের ক্রমশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই বিচ্ছিন্ন মনোভাব শেষ পর্যন্ত বিশ শতকের মধ্য ভাগে ধর্মকে আশ্রয় করে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়।

ফরায়েজী আন্দোলন

উত্তর ভারত ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যখন ওয়াহাবী আন্দোলনের জোয়ার চলছে; যখন পশ্চিম বঙ্গের বারাসাত অঞ্চলে এই আন্দোলন তিতুমীরের নেতৃত্বে প্রবল আকার ধারণ করেছে, প্রায় একই সময়ে তখন দক্ষিণ বাংলায় হাজী শরিয়তুল্লাহ এবং পরবর্তীতে তদীয় পুত্র দুদু মিয়ার নেতৃত্বে বিস্তৃতি লাভ করছে রক্ষণশীল শরিয়তপন্থী ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী ফরায়েজী আন্দোলন।

উনিশ শতকে ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজে যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়ে ছিল, বাংলায় তার দুটি ধারা প্রবাহমান ছিল, যার একটি ওয়াহাবী বা মুহম্মদীয়া আন্দোলন অপরটি ফরায়েজী আন্দোলন নামে খ্যাত। উভয় আন্দেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় সামাজিক কুসংস্কার দূর করে মুসলিম সম্প্রদায়কে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের সঠিক পথ নির্দেশ করা। বাংলায় ওয়াহাবীরা তিতুমীরের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে ছিল, তিতুমীর ছিলেন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর অনুসারী। অপর দিকে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরিয়তুল্লাহ ছিলেন সরাসরি আরবের তারিক-ই-মুহম্মদিয়া আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত। তৎকালিন বাংলাদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ দুটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে বাইরের প্রভাব সম্পর্কে মুইনউদ্দিন আহমদ খান বলেছেন : "...Titu Mir's programme of religious reform was on extension of Tariqah-i-Muhammadiyah to rural Bengal. Hence, it was in the tradition of sayyid Ahmad shahid and shah Wali Allah. The inspiration of Haji shari at Allah on the other hand, was drawn from Arabia and

Dhaka University Institutional Repository

had no connection with the religious development in Delhi."[৬০]

দুটি আন্দোলনের শেকড় আরব দেশে হলেও একটির আদর্শ সরাসরি প্রভাব বিস্তার করেছে হাজী শরিয়তুল্লাহর নেতৃত্বের মাধ্যমে। তবে দুটি সংস্কার আন্দোলনের মূল এক জায়গায় এবং আদর্শ উদ্দেশ্য এক হলেও এর মধ্যে কিছুটা মৌলিক পার্থক্য ছিল। তাছাড়া আন্দোলন দুটির নেতাদের মধ্যেও কোন যোগাযোগ ছিল না। হাজী শরিয়তুল্লাহর পুত্র দুদু মিয়া যখন ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তখন তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলার ওয়াহাবী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে (১৮৪০)।[৬১] তাছাড়া তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত ওয়াহাবী আন্দোলনের সূত্রপাত পশ্চিম বঙ্গে। অপর দিকে ফারায়েজী আন্দোলন শুরু হয় পূর্ব বঙ্গের ফরিদপুরে। পরে এই আন্দোলনে ঢাকা নারায়নগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে।

আরবী 'ফরজ' (অবশ্য পালনীয়) থেকে ফরায়েজী শব্দের উৎপত্তি। যারা ফরজ পালন করেন তাঁরাই ফরায়েজী। অবশ্য হাজী শরিয়তুল্লাহ যে ফরজের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ফরজের অনুসারীদেরকেই শুধু ফরায়েজী বলা হয়ে থাকে। তিনি যে ফরজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা ছিল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি অবশ্য পালনীয় (ফরজ) মৌলনীতি। অবশ্য পালনীয় বিষয় গুলি ছিল ঈমান বা আল্লাহর একত্বে ও রেসালতে বিশ্বাস, নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত।

হাজী শরিয়তুল্লাহ ৮ বছর বয়সে তাঁর পিতা আব্দুল জলিল মৃত্যুবরণ করেন। কোলকাতাও হুগলীতে শিক্ষা লাভের পর আঠারো বছর বয়সে (১৭৯৯ সালে) তিনি তার শিক্ষক বাশারত আলীর সঙ্গে হজ্ব করার উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। আরবে থাকাকালীন সময়ে তিনি মুহম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহাবের সংস্কার আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন এবং এর আদর্শ দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হন। ১৮১৮ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। দ্বিতীয়বার তিনি হজ্ব পালনের জন্য মক্কা গমন করেন এবং ১৮২০ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে ইসলাম প্রচারকার্যে এবং সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনিও ওয়াহাবীদের মতো বিশ্বাস করতেন বিদেশী বিধর্মীদের শাসিত রাজ্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে না। এই বিকাশ কেবল ইসলামী রাষ্ট্রে সম্ভব। তা ছাড়া সে সময়ে ইসলামের সাম্যবাদী আদর্শের মধ্যেও সৃষ্টি হয়ে ছিল বৈষম্যের দেয়াল। ইসলামে শ্রেণীভেদের কোন স্থান না থাকলেও এ অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আশরাফ ও আতরাফ নামে দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। হাজী শরিয়তুল্লাহর সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজকে অনাচার মুক্ত করা এবং শ্রেণী বৈষম্য দূর করে ইসলামী সাম্যবাদের ভিত্তিতে এ সমাজকে বৈষম্য থেকে মুক্তি দেয়া।

এ অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান ছিল হিন্দু অথবা বৌদ্ধ ধর্ম থেকে আগত। ধর্মান্তরীত হওয়ার পরেও এরা পূর্ব ধর্মের আচার অনুষ্ঠান সংস্কৃতি বর্জন করে নাই। জন্ম মৃত্যু বিবাহ অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে বাঙালী মুসলমান পূর্ব ধর্মের অসংখ্য অমুসলিম আচার অনুষ্ঠান পালন করাটা স্বাভাবিক নিয়ম বলে ধরে নেয়। বৃটিশ শাসন কালে বিধর্মী আচার অনুষ্ঠান পালনের প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পায়। হাজী শরিয়তুল্লাহ এ সমাজেরই একজন ছিলেন। মক্কা যাওয়ার আগে এই সমস্ত অনৈসলামিক রীতিনীতিতে তিনিও অভ্যস্ত ছিলেন এবং এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেননি। মক্কায় ওয়াহাবী সংস্কারের পরিবেশে দীর্ঘকাল অবস্থান করে ইসলামী ধর্মীয় সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন এবং তিনি বাঙালী মুসলমান সমাজের মধ্যকার কুসংস্কার দূর করার জন্য সচেষ্ট হন। তিনি ইসলাম বিরোধী অনুষ্ঠান কার্যাবলী মাহপাপ বলে ঘোষণা করেন এবং এই ধরনের পাপকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করেন। যেমন শেরক : কবর পূজা, পীর পূজা, সেজদা দেওয়া প্রভৃতি এই পাপের অন্তর্গত। অপরটি বে-দাত : ইসলামাননুমুদিত নতুন আচার অনুষ্ঠান। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে গাজী কালুর প্রশস্তি গাওয়া, পঞ্চপীর, পীর বদর, খাজা খিজিরের দোহাই দেওয়া, ভেলা ভাসানো, জারীগান গাওয়া, জন্মের পর ছটি পালন করা, মহররমে শোক করা, পীরের দরগায় ওরস, মানত ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ্য যে হাজী শরিয়তুল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত ফরায়েজী আন্দোলন শুধু মাত্র ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ছিল। তার ধর্ম প্রচার বা সংস্কার প্রয়াসের পেছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেনি। তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' বলে ঘোষণা করলেও দারুল ইসলামে পরিণত করার কোন রাজনৈতিক ইচ্ছা ব্যক্ত করেননি বা বিদেশী বিধর্মী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন ফতোয়া জারী করেননি। বরং তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সতর্ক দৃষ্টির কারণে কোন ধরনের দাঙ্গা হাঙ্গামাও সংগঠিত হতে পারেনি। তিনি বিধর্মী বিজাতীয় শাসিত দেশে জুম্মা এবং দুই ঈদের নামাজ বর্জনের জন্য মুসলমান সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এই বিধর্মী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তিনি মূলতঃ ধর্মীয় নেতা ছিলেন ঘটনা চক্রে তাঁর উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পিত হলেও তা তিনি শুধু সংস্কার আর প্রতিরোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাঁর প্রচারিত ইসলামী সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আতরাফ শ্রেণীর জনসাধারণ দলে দলে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হতে

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। বাংলার শোষিত নির্যাতীত দরিদ্র রায়ত, কৃষক, তাঁতী, তেলি সম্প্রদায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করে। তাঁর সহজ সরল ধর্মমত এবং সংস্কার প্রয়াস দেশবাসীর মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তার সংস্কার কার্যে সাফল্য সম্পর্কে বলতে যেয়ে জেমস ওয়াইজ লিখেছেন : "...শরিয়তুল্লাহ যে পূর্ববঙ্গের জলভূমি অঞ্চলে বহু দেবদেবী অধ্যুষিত হিন্দু ধর্মের সহিত দীর্ঘকালের সংযোগ হইতে উদ্ভূত অসংখ্য প্রকারের কুসংস্কার ও বিকৃতি হইতে মুসলমান জনসাধারণকে মুক্ত করিবার জন্য প্রথম প্রচার আরম্ভ করিয়া ছিলেন তাহা অবশ্যই বিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি যে নির্বিকার ও নিরুৎসাহ কৃষক জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে পারিয়া ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে অসাধারণ ঘটনা। ইহার জন্য প্রয়োজন ছিল এক জন বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিশীল প্রচারকের এবং এ বিষয়ে আর কেহই শরিয়তুল্লাহ অপেক্ষা সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই।"[৬২]

শরিয়তুল্লাহর উপর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আস্তা ও বিশ্বাস সম্পর্কে বলতে যেয়ে জেমস ওয়াইজ লিখিয়েছেন : "তাহার নিষ্কলঙ্ক ও আদর্শ জীবন দেশের সকল মানুষের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তাঁহারা তাহাকে বিপদে পরামর্শদাতা ও দুঃখ দুর্দশায় সান্ত্বনাদানকারী পিতার ন্যায় সম্মান করিত।"[৬৩]

তার এই অভূতপূর্ব সাফল্য নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে। শোষক জমিদার শ্রেণী এই ঐক্যকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেয়ার চেষ্টা করে। কেননা কৃষক নিম্নবিত্তের প্রজাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এবং জমিদার শোষক শ্রেণীর বেশী ভাগ ছিল হিন্দু। জমিদার শ্রেণী মুসলিম প্রজাদের উপর নানা ধরনের অবৈধ কর বসাতেন, বিভিন্ন পূজা পার্বণ হিন্দু ধর্মীয় উৎসবে মুসলিম প্রজারা কর দিতে বাধ্য থাকত। আবার কোন কোন জমিদার মুসলিম ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বাধা প্রদান করতেন। যেমন অনেক জমিদার তার এলাকায় গরু কুরবানী নিষিদ্ধ করে দেন। হাজী শরিয়তুল্লাহ দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে দৃঢ় ভাবে জমিদার শ্রেণীর এই সব অন্যায় আচরণ প্রতিরোধে সচেষ্ট হন। তিনি প্রজাদেরকে অবৈধ কর দেয়া থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেন। ঈদ এবং অন্যান্য উৎসবে মুসলমান সম্প্রদায়কে গরু কুরবানী দিতে উৎসাহিত করেন। এর ফলে মুসলিম প্রজাদের উপর হিন্দু জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারের মাত্রা প্রবল আকার ধারণ করে। যাকে প্রতিরোধ করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। উপরন্তু দেশ জুড়ে দেখা দেয় অনটন। এ অবস্থায় ফরায়েজীরা নুন ভাতের দাবী উত্থাপন করে।[৬৪]

এমনিতে জমিদার শ্রেণী নানা অজুহাতে ফরায়েজী প্রজাদের উপর অত্যাচার চালত তার উপর শরিয়তুল্লাহর নির্দেশ পালনে তাদের উপর নির্যাতন হয়রানী সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ফরায়েজী নেতা শান্তি পূর্ণভাবে সংস্কার এবং ধর্ম প্রচারে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু জমিদারের অত্যাচার থেকে প্রজাসাধারণকে রক্ষার জন্য তিনি লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। তার শিষ্য জালাল উদ্দিন মোল্লার উপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৮৩৯ সালে তার উপর পুলিশের নিষেধাজ্ঞাজারী করা হয়। পরবর্তী বছর তিনি মৃত্যু বরণ করেন।[৬৫]

উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদার শ্রেণী ব্যবসায়ী মহাজন কেউ শরিয়তুল্লাহর নেতৃত্বে নিম্নশ্রেণীর ঐক্যকে সুনজরে দেখে নাই। সুতরাং এটিকে তারা একটি সাম্প্রদায়িক আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকে। অথচ রক্ষণশীল ধনী মুসলমানরাও তার উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ ছিল। হিন্দু মুসলিম জমিদার, ধনী বিত্তবান শ্রেণী কেউ হাজী শরিয়তুল্লাহর সংস্কার আন্দোলন এবং তার ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার কৃষকের এতে যোগদান সহজ ভাবে গ্রহণ করে নাই। বিশেষ করে মুসলমান কৃষকদের ঐক্য হিন্দু জমিদার শ্রেণীর মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। জেমস ওয়াইজ লিখছেন : "এই নূতন ধর্মমত বিস্তার লাভ করিতে এবং ইহা দ্বারা সকল মুসলমান কৃষককে দৃঢ় ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে দেখিয়া জমিদারগণ অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। শীঘ্রই জমিদারদের সহিত বিরোধ দেখা দেয় এবং তাহার ফলে শরিয়তুল্লাহ ঢাকা নয়াবাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়া পুনরায় তাহার জন্মস্থান (ফরিদপুর) ফিরিয়া আসেন।"[৬৬]

হাজী শরিয়তুল্লাহর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে প্রচলিত মুসলিম ধর্মে গোড়া সমর্থক ধনী মুসলমান মোল্লা মৌলবীরাও ক্রুদ্ধ হন। কারণ তিনি প্রচলিত মুসলমান ধর্মের মৌলিক সংস্কার সাধন করে নিম্ন বিত্তের মুসলিম জনসাধারণকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হন। তাছাড়া ধর্মীয় শোষণ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য তিনি মোল্লা মৌলবীদের দ্বারা উৎপীড়িত কৃষক কারিগর দরিদ্র মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় তৎপর ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু অত্যাচার মূলক ধর্মীয় নিয়ম বাতিল করেন। তিনি পীর মুরিদ ইত্যাদি শব্দের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। এর পরিবর্তে ওস্তাদ (শিক্ষক) সাগরেদ (শিক্ষার্থী বা ছাত্র) শব্দ ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেন।

বস্তুত তিনি ইসলামের সাম্যবাদের ভিত্তিতে একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়ে ছিলেন। যেখানে অন্যায় অবিচার উৎপীড়ন থাকবে না। মানুষ সাম্যের ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত করবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সমাজ মানব সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সে সমাজে শ্রেণী বিভক্তী ও শোষণ উৎপীড়নের অস্তিত্ব থাকে না। মানব সাম্যবাদে

Dhaka University Institutional Repository

তার এই দৃঢ় বিশ্বাস আস্থা তার চিন্তাধারাকে এক নতুন তাৎপর্য দান করে।[৬৭] রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তিনি যেমন ইসলামী শাসন পদ্ধতি কায়েমের পক্ষপাতী ছিলেন, তেমন মানব সাম্যবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের কাঠামো নির্মাণে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বাঙালী মুসলমান সমাজে বিদ্যমান অসঙ্গতি ও ব্যাধিগুলি নির্ভয়ে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এ সম্পর্কে সৈয়দ মকসুদ আলী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন : "এদিক থেকে প্রাচীন হেলেনিষ্টিক চিন্তাবিদ যেনো ও ঋসিপাসের চিন্তাধারার সঙ্গে তার চিন্তাধারা তুলনীয়, কারণ তাঁরা উভয়ে মানুষের ব্যক্তিক সত্তার মর্যাদার পূর্ণ স্বীকৃতি দান করেন। তাছাড়া হাজী শরিয়তুল্লাহর কৃতিত্ব এই যে তিনি জনসাধারণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। কোন বিদেশী লেখক এই অভিমত পোষণ করেন যে হাজী শরিয়তুল্লাহ যেহেতু ধর্মের পতাকাতলে আন্দোলন পরিচালনা করেন সে কারণে তিনি সাম্প্রদায়িক ও সেক্টারিয়ান মানসিকতা মুক্ত হতে পারেননি।"[৬৮]

একথা সত্য যে হাজী শরিয়াতুল্লাহ ধর্মীয় নেতা ছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের মুসলিম কৃষক শ্রেণীর মধ্যে যেমন নবচেতনার সূত্রপাত করেন তেমন তাদের মধ্যে ধর্মীয় স্বাতন্ত্রবোধ জাগিয়ে দিয়ে ভিন্ন ধর্মের প্রভাব থেকে তাদের রক্ষার পথ বাতলে দেন। দরিদ্র মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল গভীর। যা পরবর্তী সময়ে তার পুত্র দুদুমিয়া ওরফে মহসিনউদ্দীন এই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ফরায়েজী আন্দোলনকে বিপ্লবী রূপ দিতে সক্ষম হন। এটি একাধারে একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে পাশাপাশি কৃষক শ্রেণীর শোষণ মুক্তি সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। যার ফলে এ অন্দোলনের চরিত্র শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। অর্থনৈতিক শোষণে বিপর্যস্ত বাংলার কৃষক ফরায়েজী আন্দোলনের মাধ্যমে শোষণ বিরোধী প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। হাজার হাজার কৃষক জমিদার, নীলকর সাহেবদের অত্যাচার নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য ফরায়েজী আন্দোলনে যোগদান করে। কৃষকদের উপর তাঁর প্রভাব এতো অধিক ছিল যে তৎকালিন এক পুলিশ কমিশনার তার রিপোর্টে লিখেছেন যে, দুদু মিয়া ছিলেন প্রচন্ড প্রভাবশালী ব্যক্তি, ৮০ হাজার শিষ্য তার নির্দেশ অনুসারে যে কোন কাজ করতে সব সময় প্রস্তুত।[৬৯]

দুদু মিয়া ১৮১৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ফরায়েজী সম্প্রদায়ের ওস্তাদ বা গুরু হিসেবে মনোনীত হন। হাজী শরিয়তুল্লাহর বেঁচে থাকাকালীন অবস্থায় তার সতর্কতা এবং শান্তি প্রিয় নীতির কারণে কৃষক প্রজা ও জমিদার শ্রেণীর মধ্যকার অসন্তোষ দাঙ্গা হাঙ্গামায় রূপনিতে পারেনি। তার মৃত্যুর সঙ্গে নানা স্থানে শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ যার নেতৃত্বে ছিলেন দুদু মিয়া। তিনি তার পিতার মাতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও বেশ কিছু সংশোধন করেন। পিতার মত বিশাল ব্যক্তিত্ব, শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত না হলেও তিনি অভূতপূর্ব সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কৃষকদের মধ্যে তিনি এতো জনপ্রিয় ছিলেন যে, সরকার তাকে গ্রেফতার করতে সাহস পেত না। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করলেও সাক্ষীর অভাবে তিনি রেহাই পেয়ে যেতেন।

ফরায়েজীদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে দৃঢ় এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি নিজে লাঠি চালনা শিক্ষালাভ করেন। তার পিতার আমলের লাঠিয়াল জালাল উদ্দিন মোল্লাকে সেনাপতি নিয়োগ করে এক সুদক্ষ লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনীর গঠনের উদ্দেশ্য ছিল জমিদার শ্রেণী যারা অবৈধ কর আরোপ করে তাদের প্রতিরোধ করা। অপরদিকে নীলকরদের অত্যাচারের মোকাবেলা করা। এখানে উল্লেখ্য যে ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি মুসলিম প্রধান আঞ্চল গুলোর জমি নীলচাষের জন্য ছিল উৎকৃষ্ট। সুতরাং এ অঞ্চলে নীলকরগণের অত্যাচারের পরিমানও ছিল দুঃসহ। তার উপর জমিদার শ্রেণী নীলকরদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফরায়েজী কৃষকদের উপর উৎপীড়ন অত্যাচার চালাত। দুদু মিয়া তার কৃষক বাহিনী নিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁকে দমন করার জন্য তার বিরুদ্ধে খুন, সন্ত্রাস, রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়।[৭০] কিন্তু বিচার কালে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও তার বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র চলতে থাকে।

দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন একদিকে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন অপর দিকে ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়।[৭১] ভূমি মালিকানা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ছিল পরিষ্কার। তাঁর মতে বিশ্বের মালিক ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ সুতরাং পার্থিব জগতের ভূসম্পত্তিসহ সকল প্রকার সম্পত্তি ও সম্পদের মালিক ও আল্লাহ।[৭২] উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিকেও তিনি অবৈধ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেন। সুতরাং তাঁর মতে কর বা খাজনার দাবীদার কোন ব্যক্তি হতে পারে না। কর বা খাজনা দিতে হলে আল্লার পথেই দিতে হবে। তৎকালীন রায়তদের জমিদারকে, যে তেইশ প্রকার কর ও খাজনা দিতে বাধ্য করা হতো দুদু মিয়া তাকে বেআইনী এবং নীতিবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। তিনি মনে করতেন প্রজা নির্যাতন প্রজাকে শোষণ শুধু অন্যায় নয় পাপও। মানুষ মাত্রই আল্লার দান, জোতদার বা জমিদারের প্রজা নয়। তাই জমিদারগণকে যাতে অবৈধ ভূমি কর দিতে না হয় সে জন্য তিনি কৃষকদের সরকারী খাসমহলে

Dhaka University Institutional Repository

বসবাস করার নির্দেশ প্রদান করেন।[৭৩]

দুদু মিয়া সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিলেন তার চিন্তা ভাবনা ও ছিল সহজ সরল। ভূমি সংক্রান্ত চিন্তায় তার সরল চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। যদিও তার এই চিন্তার সাথে বৃটিশ চিন্তাবিদ জন লকের সম্পত্তি তত্ত্বের কিছুটা মিলের আভাস পাওয়া যায়।[৭৪]

ধর্মীয় সংস্কার, অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি কৃষকগণকে এক সুশৃঙ্খল সামাজিক ধর্মীয় জীবন দিতে চেয়ে ছিলেন। শোষক শ্রেণীর অত্যাচার তাকে টেনে নেয় রক্তাক্ত আন্দোলনের পথে। তিনি কখনও কোম্পানীর শাসন উৎখাতের কথা ভাবেননি। এ. আর মল্লিকের ভাষায় : "...Nowhere do we come across any intention expressed by him that he wanted or ever aimed at the establishment of political power by the Muslims in place of the British."[৭৫]

তবুও দুদু মিয়ার নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে স্বাধীন সরকার গঠন করা হয়েছিল। কৃষক প্রজাসাধারণকে নিয়ে স্বাধীন সরকারের একটি সেনা বাহিনীও (লাঠিয়াল বাহিনী) গঠন করা হয়েছিল।[৭৬]

যে সরকারের শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলাকে কতগুলি হলকা বা এলাকায় বিভক্ত করা হয়। তিন থেকে পাঁচ শত পরিবার নিয়ে একএকটি হলকা গঠন করা হয়ে ছিল। হলকার প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয়া হয় প্রধান খলিফার প্রতিনিধিকে। ন্যায় বিচারের স্বার্থে তিনি বিচার কার্য পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েত প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন। প্রধান খলিফা, যাঁর দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের সার্বিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, সকল নাগরিক যাতে সাম্যের ভিত্তিতে জীবন যাপন করতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখা এবং জাতিধর্ম নিবিশেষে আইনের ভিত্তিতে দেশবাসীর মামলা মোকদ্দমার বিচার কার্য পরিচালনা করা।[৭৭] তাছাড়া বিস্তৃত অঞ্চলের জনগণের কাছ থেকে কর আদায় প্রভৃতি কার্য, ফরায়েজী আন্দোলনকে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণ বৈপ্লবিক রূপদান করেছিল।[৭৮] ফলে ধর্মীয় সমাজ নিয়ে সৃষ্ট আন্দোলন রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়ে ছিল। এর ধর্মীয় চরিত্রে ব্যাপকতা থাকা সত্ত্বেও হিন্দু কৃষকদের এক বৃহৎ অংশকে এই আন্দোলনের মধ্যে টেনে এনে আংশিক হিন্দু মুসলিম ঐক্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন।[৭৯]

ফরায়েজী আন্দোলন বাংলার বাইরে বিস্তৃতি লাভ না করলেও স্থানীয় ভাবে এর প্রভাব ছিল ব্যাপক, নির্জীব নির্যাতিত কৃষক সমাজের মধ্যে তার আদর্শ সুদূরপ্রসারী ফল বয়ে নিয়ে এসেছিল।[৮০] ধর্মীয় স্বতন্ত্রবোধ জাগ্রতকারী কৃষক সমাজের এই আন্দোলন ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির পেছনে বিশাল ভূমিকা রেখে ছিল। কেননা সাতচল্লিশের যে জাতীয়তাবাদী চেতনা এই উপমহাদেশের ইতিহাসের ধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছিল তার পেছনে পূর্ব বাংলার কৃষকদের মুখ্য ভূমিকা ছিল সন্দেহ নেই। সুতরাং ওয়াহাবী আন্দোলনের মত বিশাল ক্ষেত্র এবং বিস্তৃত না থাকলেও বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলন মুসলিম স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের বীজ বপনে নিসন্দেহে অবদান রেখে ছিল।

এভাবেই নবজাগরণ এবং ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বাংলা তথা ভারতবর্ষকে দুটি জাতিতে বিভক্ত করার প্রাথমিক দায়িত্বটুকু স্বার্থকভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে পালন করেন। এ কথা বাস্তব সত্য যে, হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের মধ্যে ধর্মের একটি দেয়াল সব সময়ে ছিল। যার ফলে দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বাঁধা নিষেধের কারণে পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন বা এক সাথে আহার বিহার করা সম্ভব ছিল না তবে বহুকাল একত্রে বসবাসের ফলে পরস্পরের মধ্যকার সামাজিক স্বাতন্ত্রবোধ অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে ছিল। বৃটিশ ভারতে এই স্বাতন্ত্রবোধ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং ক্রমে তা তীব্র হতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল মনোভাব ও বৃদ্ধিপায়। এর পেছনে বৃটিশ অনুসৃত বিভেদনীতির পরোক্ষ ভূমিকা থাকলেও হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের ভূমিকা কোন অংশে কম ছিল না। মুসলিম সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় স্বতন্ত্রবোধ সম্পর্কে প্রথম থেকে সচেতন হতে বাধ্য হয়েছিল। এই সচেতনতা মুসলিম সম্প্রদায় অর্জন করেছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার কারণে। রাজ্যচ্যুত সিংহাসন চ্যুত মুসলমান সমাজের উপর নেমে আসা বৃটিশ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক লাঞ্ছনার কারণেই বাঙালী মুসলমান বৃটিশ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বাংলার ক্রমাগত কৃষক বিদ্রোহ এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। মুসলমান ধর্মীয় নেতারা বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষকে দুশমনের দেশ বলে অবিহিত করে অসহযোগিতার ডাক দেন। এর ফলে বৃটিশ সহযোগী শক্তি তোষামদকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছ থেকেও তারা দূরে সরে যেতে থাকে। একই ভাবে তারা ইংরেজদের মতো তাদেরকেও সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। ফলে শত শত বছর পাশাপশি বসবাস করেও পরস্পরের মধ্যে দৃঢ় সন্দেহ অবিশ্বাস আর ঘৃণার দেয়াল সৃষ্টি হতে থাকে।

হিন্দু মুসলিম পরস্পরের মধ্যকার এই দূরত্ব তীব্র হয়েছিল, হিন্দু নবজাগরণ ও মুসলিম সংস্কার আন্দোনের মধ্য দিয়ে। দুটি আন্দোলন পাশাপাশি চললেও দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়নি। দুটি আন্দোলনের কোনটিই ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় চেতনার জন্ম দিতে পারেনি। এর প্রথম কারণ আন্দোলনের নেতৃত্ব যাঁদের হাতে ছিল তারা কেউ ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে ছিলেন না। উনিশ শতকের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ধর্মচিন্তা জাতি চিন্তার উর্দ্ধে স্থান দিয়ে ছিলেন। তাঁরা নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থকেই জাতীয় স্বার্থ বলে ধরে নিয়েছেন। ফলে জাতীয় উন্নতি জাতীয় মুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

বলতে তাঁরা নিজ নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উন্নতি ও মুক্তিকেই বুঝেছেন। যে কারণে নবজাগরণ আন্দোলনের মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব তাদের নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু সমাজের ভালমন্দ নিয়ে ভেবেছেন। এমনকি এ আন্দোলনের পরবর্তী রক্ষণশীল নেতৃত্ব ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণেও দ্বিধা করেননি। সাহিত্যে যে জাগরণের ঢেউ দেখা দিয়েছিল তাতেও লেখকবৃন্দ মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছেন। তাঁদের ধারণায় পরাধীন দেশে ইংরেজ নয় মুসলমানরাই তাদের শত্রু এবং এই শত্রু হাত থেকে হিন্দু ধর্ম রক্ষার জন্যই তাঁরা সর্ব ভারতীয় হিন্দু জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

অপর দিকে মুসলিম ধর্মীয় নেতারা হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য শুরু করেন ওয়াহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলন। যদিও তাঁদের আন্দোলন ইংরেজ বিরোধীও ছিল, তবে তাঁরা আন্দোলন শুরু করেছিলেন নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে হিন্দু আচার অনুষ্ঠান হিন্দু প্রভাব মুক্ত করতে। এর ফলে বাঙালী মুসলমান তীব্রভাবে এবং ক্রমাগত হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠতে থাকে। বৃটিশ ভারতেই বাঙালী মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে ইসলাম ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের প্রতি মনোযোগী হয়। তাছাড়া এই সংস্কার আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেলে নেতৃত্বহীন বাঙালী মুসলমানদের ভাগ্য একদল ধর্মান্ধ মোল্লা মৌলবীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। যারা, একদিকে ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে 'ফতোয়া' জারী করেন অপরদিকে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ বাংলা ভাষার বিরুদ্ধেও জিহাদ ঘোষণা করেন। তাছাড়া এরা বাংলার কৃষ্টি সভ্যতার সাথে সম্পর্কহীন এক ধরনের 'জগাখিচুড়ি ভাষা ও তমুদ্দন' এর সৃষ্টি করেন। ফলে হিন্দু সাহিত্যিকদের মানসিকতা এবং মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের 'ফতোয়া' দুইয়ের কারণেই বাঙালী মুসলমান বাংলা ভাষা সাহিত্যে যে নবজাগরণের ধারা সৃষ্টি হয় তাতে অংশ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ঐ সময়ের পরিবেশ চিন্তাধারা কোনটাই হিন্দু মুসলিম ঐক্য বা তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক তো ছিলই না বরং সম্পর্কের অবনতির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক সৃষ্ট আন্দোলন সমূহ ধর্মনিরপেক্ষতা অর্জন এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়বাদী চেতনা বিস্তারে ব্যর্থ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কৃষক সমাজ এই আন্দোলনের বাইরে ছিল। কেননা তৎকালীন ওয়াহাবী ফরায়েজীসহ সকল কৃষক আন্দোলন পরিচালিত হয়ে ছিল শাসক শ্রেণী এবং তাদের সহায়ক শক্তি জমিদার অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে। নবজাগরণ আন্দোলনের সৃষ্টি এবং এর কেন্দ্র বিন্দু ছিল জমিদার অভিজাত শ্রেণী থেকে উদ্ভুত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। এমনকি হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্ন বর্ণের দরিদ্র কৃষক প্রজারাও নবজাগরণের আন্দোলনের প্রভাব মুক্ত ছিল। এরাও শ্রেণী দ্বন্দ্বের কারণে নিজ সম্প্রদায়ের অভিজাত শ্রেণীর পরিচালিত আন্দোলনে যুক্ত হয়নি। তাছাড়া নবজাগরণ আন্দোলনের নেতারাও কৃষক বিদ্রোহকে ভাল নজরে দেখেননি। যখন বাংলার কৃষক হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য জমিদার নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে লড়ছে, তখন নেতারা নীলকর সাহেবদের পক্ষে নীলচাষের উপকার সম্পর্কে মত ব্যক্ত করছেন। পক্ষ নিচ্ছেন জমিদার অভিজাত শ্রেণীর, নীলকরদের। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছেন ইংরেজ শাসকদের।

নবজাগরণ আন্দোলনের নেতারা কৃষক সমাজের কথা ভাবেননি তাদের দলেটানার কথা কল্পনাও আসেনি। হিন্দু জমিদার শ্রেণীতো বটেই মুসলিম অভিজাত জমিদার শ্রেণী পর্যন্ত ওয়াহাবী ফরায়েজী আন্দোলনের তীব্র বিরোধীতা করেছে। সুতরাং শ্রেণী স্বার্থের কারণেও অভিজাত শ্রেণী এবং কৃষক শ্রেণীর সংগঠিত দুই আন্দোলনের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় নাই। তাছাড়া রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও ছিল ভিন্নমুখী। কৃষক সমাজ বৃটিশ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ছিল অপর পক্ষে নবজাগরণ আন্দোলনের নেতারা ছিল বৃটিশ এর সহযোগী শক্তি। এ সমস্ত কারণেই নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন সত্যিকার অর্থে জাতীয় আন্দোলন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। তবে ধর্মীয় রক্ষণশীল মনোভাব বিস্তারে উভয় আন্দোলনই স্বার্থক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এই মনোভাবই পরবর্তীতে হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্বের মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। এই সাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সংগঠনকে আশ্রয় করে বিকাশিত হতে থাকে এবং পূর্ণতাও লাভ করে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১।	সৈয়দ আমীরুল ইসলাম,	ঃ	বাংলাদেশের বণিক পুঁজি ও মধ্যবিত্ত: উৎপত্তির পটভূমি: প্রবন্ধ আজকের কাগজ '২৮ অক্টোবর '১৯৯২।
২।	রংগলাল সেন,	ঃ	বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস পৃষ্ঠা ৪৯।
৩।	Mukunda Rama,	ঃ	Kavikankan Chandi; P.86.
৪।	N.K Sinha,	ঃ	The Economic History of Bengal: from plassy to the permanent settement vol-II chapter I P 20.
৫।	রংগলাল সেন	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪৯।
৬।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৪৯-৫০।
৭।	আধুনিক কালের ব্যবসায়ী বণিক শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সৈয়দ আমীরুল ইসলাম তার প্রবন্ধে লিখেছেন : "সতের আঠার শতকের দিকে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে এমন একদল মানুষের সৃষ্টি হচ্ছিল যারা এর উন্নতি ও স্বার্থের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে। বিদেশী ব্যবসায়ীরা এসে প্রথমে নিশ্চয়ই এদেশী ব্যবসায়ীদের সাথেই ব্যবসার জন্য সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং এদের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয় সারাদেশে। সতের শতকের শেষ নাগাদ ইউরোপের প্রায় প্রতিটি ব্যবসায়িক কোম্পানী বাংলা অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এদের সাথে ব্যবসার খাতিরে এদেশের বণিক-ব্যবসায়ী-মুৎসুদ্দি-আমলা-কর্মচারী সকলের কমবেশী সম্পর্ক গড়ে ওঠে পরস্পর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে। পলাশী যুদ্ধের অনেক আগেই উমিচাঁদ, গোপীনাথ শেঠ, রামকৃষ্ণ শেঠ, শোভারাম বসাক, লক্ষ্মীকান্ত প্রমুখ ব্যবসায়ী কোম্পানীর দাদন ও দালালি করে বিখ্যাত হন। দস্তক নিয়ে কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীর সঙ্গে দেশী কর্মচারীরাও সমান তালে দুর্নীতির মাধ্যমে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে। আর এভাবেই তাদের স্বার্থের সাথে কোম্পানীর স্বার্থ অভিন্ন হয়ে যায়।" সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, বাংলাদেশের বণিক পুঁজি ও মধ্যবিত্ত: উৎপত্তির পটভূমি প্রবন্ধ: আজকের কাগজ ৩০ অক্টোবর ১৯৯২।		
৮।	সৈয়দ আমীরুল ইসলাম,	ঃ	পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ৩০ অক্টোবর সংখ্যা ১৯৯২।
৯।	আতিউর রহমান, লেলিন আজাদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩১।
১০।	H. Sharp,	ঃ	Selections from the Educational Records, pt. I, 1781-1839, P 116.
১১।	উপমহাদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য গঠিত বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড ১৯৫৪ সালের ১৯ জুলাই তারিখে যে এডুকেশন্যাল ডেসপ্যাচ প্রণয়ন করেন। তাতে শাসক শাসিতদের মধ্যে একটি মধ্যস্থতাকারী ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী সৃষ্টি স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। চার্লস উড এর ডেসপ্যাচে সম্ভাব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। এদের একাংশ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবে। অপর অংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ আহরণে নিষ্ঠার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। এই নীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে তথাকথিত যে আধুনিক শিক্ষার সুযোগ দেয়া হয়, তাতে একটি কেরানী শ্রেণী গড়ে ওঠে। যদিও এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ছিল সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসার নয় এবং উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা নয়। বরং মধ্যম শিক্ষিত কেরানীকুলের সৃষ্টি। তবে উক্ত শিক্ষানীতি প্রণীত হওয়ার প্রায় বিশ বছরের মধ্যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় বহুসংখ্যক স্কুল, কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ফলে প্রচুরসংখ্যক ভারতীয়; বিশেষ করে বাংলার ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার হারও আগের তুলনায় বেড়ে যায়। আতিউর রহমান লেনিন আজাদ, ভাষা আন্দোলন অর্থনৈতিক পটভূমি পৃষ্ঠা ৩১-৩২।		
১২।	এম, এম আকাশ,	ঃ	ভাষা আন্দোলন শ্রেণী ভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রণতা সমূহ পৃষ্ঠা ১৫।
১৩।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৪।	উইলিয়াম হান্টার	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৬৪।
১৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৬৪।
১৬।	এম এম, আকাশ,	ঃ	পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩।
১৭।	আতিউর রহমান, লেলিন আজাদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৫১-৫২।
১৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৫২।
১৯।	এম, এম, আকাশ,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৩-১৪।
২০।	সুপ্রকাশ রায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৮৭।
২১।	মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৭১।
২২।	সৈয়দ মকসুদ আলী,	ঃ	রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপহাদেশ পৃষ্ঠা ৪৩।
২৩।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩২, ৩৩।
২৪।	রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মীয় সমন্বয় চিন্তায় তিনটি ভিন্নমুখী ধারার প্রবাহকে একদিকে পরিচালিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় অভিতাভ মুখার্জীর মতে এ তিনটি ধারা হচ্ছে : 'গ্রীকো ইসলামী ধারা, বৈদান্তিক ধারা এবং পাশ্চাত্য উদারবাদী ধারা।' রামমোহন প্রথম ধারা থেকে এরিস্টটলের যুক্তিবাদ, ইসলামের একেশ্বরবাদ এবং মানব সাম্যের আদর্শ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ধারা থেকে গ্রহণ করন বেদান্ত দর্শনের বিশেষ করে শংকরের অদ্বৈতবাদ এবং তৃতীয় ধারা থেকে যুক্তিবাদ প্রয়োগবাদ ও উদারবাদ। সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার পেছনে এই তিনটি ধারাই তাঁর চিন্তাজগতে সমভাবে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। এ কারণেই তিনি হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতা, মূর্তিপূজা, সতীদাহ বা সহমরণ প্রথার উচ্ছেদের জন্য অক্লান্ত প্রচারকার্য চালান। তাছাড়াও তিনি হিন্দু ধর্মের বর্ণপ্রথার ঘোর বিরোধীতা করেন।তাঁর মতে, হিন্দু সমাজে প্রচলিতবর্ণভেদ প্রথার কারণে সমাজ বহুবা বিভক্ত, এ জন্য কোন বৃহত্তর সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রশ্নে হিন্দু সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম। **Amitabha Mukherjee; Reform and Regeneration in Bengal** P. 140.।		
২৫।	নরহরি কবিরাজ,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭৬।
২৬।	'দুরবীণ' পত্রিকার সম্পাদকীয়	ঃ	১৮৬৯ সালের ১৪ জুলাই সংখ্যা।
২৭।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৯।
২৮।	সৈয়দ মকসুদ আলী,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪৪।
২৯।	ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সদস্যরা রামমোহনের চিন্তাধারার অনুসারী হলেও অনেক ক্ষেত্রেই রামমোহনের সঙ্গে তাদের মিল ছিল না। যেমন এরা ভারতে বৃটিশ উপনিবেশ সমর্থন করেনি। কৃষক প্রজার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তাছাড়া রামমোহ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের চিন্তাধারার সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে নূতন চিন্তাধারার জন্ম দেন। অপর পক্ষে ডিরোজিওর অনুসারীরা প্রাচ্যচিন্তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে এবং পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী ও বৈপ্লবিক চিন্তার দৃঢ় সমর্থক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। সরল চট্টোপাধ্যায়, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ পৃষ্ঠা ৩১।		
৩০।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩০।
৩১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩০।
৩২।	মুহাম্মদ আবদুর রহিম, ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৮১-৩৮২।
৩৩।	সৈয়দ মকসুদ আলী	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৬।
৩৫।	মুহাম্মদ আবদুর রহিম, ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৭৫।
৩৬।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৬।
৩৭।	সৈয়দ মকসুদ আলী,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৩।
৩৮।	এম, এ, রহিম,	ঃ	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) পৃষ্ঠা ৮৩।
৩৯।	সংক্ষিপ্ত ইসলাম বিশ্বকোষ	ঃ	১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৭৮।
৪০।	শাহ ওয়ালীউল্লাহ দিল্লির এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল আবু আল ফায়্যাদ আহমদ কতুব আল দীন, পিতার নাম আবদুর রহিম। যিনি আওরাঙ্গজেবের সময় ইসলামী আইনবেত্তা হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পিতার শিক্ষাধীন থেকে শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি প্রায় দুইশত গ্রন্থ রচনা করেন এবং ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে তার গভীর পাণ্ডিত্যের কারণে তাকে অনেকেই ইমাম গায্যালীর সমতুল্য ভাবতেন। সৈয়দ মকসুদ আলী রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ পৃষ্ঠা ১৭।		
৪১।	A. C. Banerjee,	ঃ	Two Nations P. 59.
৪২।	সৈয়দ মকসুদ আলী,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৩-২৪।
৪৩।	P. N. Chopra,	ঃ	Indian Muslims in Freedom struggle P. 3-4.
৪৪।	তিতুমিরের (মীর নিসার আলী) জন্ম হয় ১৭৮২ সালে চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে। তিনি মক্কায় হজ্বব্রত পালনকালে ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভীর মতাদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর ধর্ম প্রচারও সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে ওয়াহাবী আন্দোলনেরর সূত্রপাত ঘটে। সৈয়দ মকসুদ আলী রাজনীতি ও রাষ্টচিন্তায় উপমহাদেশ পৃষ্ঠা ২৬-২৬।		
৪৫।	Jhorton,	ঃ	History of India Vo I V. P. 179-183.
৪৬।	Okenelly,	ঃ	The wahabis in India P. 100-101.
৪৭।	W. W. Hunter	ঃ	The Indian Muslmans P. 103.
৪৮।	উইলিয়াম হাণ্টার	ঃ	পৃষ্ঠা ১০২-১০৩।
৪৯।	Report by Mr, Dampier Commissioner of police for Bengal	ঃ	(উৎস ঃ হান্টার ঐ পৃষ্ঠা ১০৩)।
৫০।	Wilfred Cantwell Smith.	ঃ	Modern Islam in India P. 189.
৫১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৮৯।
৫২।	উইলিয়াম হাণ্টার,	ঃ	পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৬।
৫৩।	Wilfred Cantwell Smith.	ঃ	পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৯-৯০।
৫৪।	সুপ্রকাশ রায়,	ঃ	পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬৯।
৫৫।	W. W. Hunter,	ঃ	পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩।
৫৬।	বিহারীলাল সরকার,	ঃ	তিতুমীর পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫
৫৭।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৪৮।
৫৮।	গোপাল হালদার,	ঃ	সংস্কৃতির রূপান্তর পৃষ্ঠা ২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

৫৯।	মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ,	ঃ	আমাদের মুক্তি সংগ্রাম পৃষ্ঠা ১৭৬।
৬০।	Dr.Muin-UD-Din Ahmed	ঃ	History of the Faridi Movement P. 72
৬১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৭২-৭৩।
৬২।	Dr. James Wise	ঃ	Article on sariyatulla and the Farazis (Journal of the Royal, Asiatic society of Bengal, Part III for 1894)
৬৩।	ঐ	ঃ	ঐ
৬৪।	অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম কতৃক, (ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রদত্ত তথ্য।	ঃ	উদ্ধৃত: সৈয়দ মকসুদ আলী পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৫।
৬৫।	এম, এ, রহিম,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮৫।
৬৬।	Fridpur D.G. P. 39.	ঃ	(তথ্য গ্রহণ সুপ্রকাম রায় পৃষ্ঠা ২৯৩)।
৬৭।	সৈয়দ মকসুদ আলী,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৭।
৬৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩৭।
৬৯।	নরহরি কবিরাজ,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮২।
৭০।	সৈয়দ মকসুদ আলী,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪১।
৭১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৪১।
৭২।	A.R. Mallick,	ঃ	British Policy and the Muslims in Bengal P. 84
৭৩।	সৈয়দ মকসুদ আলী,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪০।
৭৪।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৪২।
৭৫।	A. R. Mallick,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮৭।
৭৬।	সুপ্রকাম রায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৯৯।
৭৭।	সৈয়দ মকসুদ আলী,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৯।
৭৮।	সুপ্রকাশ রায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৯৯।
৭৯।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২৯৯।
৮০।	সৈয়দ মকসুদ আলী,	ঃ	পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ

বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার পর কোম্পানীর কার্যকলাপ ক্রমশ বাংলার জনগণের জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে আসতে থাকে। এ দুর্ভাগ্যের কারণ কোম্পানীর অনুসৃত নীতি, যে নীতির ফলে এমন এক আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠে, তা যেমন ছিল এদেশের জনগণের সার্বিক স্বার্থের পরিপন্থী তেমন ছিল অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সামঞ্জস্যহীন কাঠামো থেকে উদ্ভূত শ্রেণীসমূহ পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়। এমনিতে এ অঞ্চলের বর্ণবৈষম্য প্রথা, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সামাজিক সংস্কার রীতিনীতির বৈষম্যের ফলে সমাজ জুড়ে অনৈক্যের একটি অদৃশ্য দেয়াল তৈরি হয়েছিল। তার উপর বিদেশী স্বার্থে সৃষ্ট কাঠামো থেকে উদ্ভূত শ্রেণী বিন্যাস সামাজিক অসঙ্গতি আর বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করেনি বরং সৃষ্টি করেছে চরম অনৈক্য। যে কারণে যখন ইউরোপে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটেছে সৃষ্টি হয়েছে দৃঢ় জাতীয় ঐক্য, দেশে দেশে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজের নিম্নশ্রেণী কৃষক শ্রমিক দরিদ্র জনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘুরিয়ে দিয়েছে ইতিহাসের চাকা, তখন বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণী এবং কৃষক সমাজ স্ব স্ব শ্রেণীস্বার্থ নিয়ে দুই মেরুতে অবস্তান করেছে ব্যস্ত রয়েছে পরস্পরের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংঘাতে। ধর্মীয় সম্প্রদায় ভিত্তিক সংস্কার আন্দোলন এই সংঘাতকে করেছে আরো তীব্র।

এ উপমহাদেশের ইতিহাসে আরেক বিস্ময়কর ঘটনা শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে সমাজে দুইটি সম্প্রদায়ের শ্রেণীগত বিন্যাসে সময়ের তারতম্য। এই তারতম্যের কারণে প্রাগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে অগ্রসরমান মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাত অবসম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়, এই সংঘাত শেষ পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধায় পরিণত হয়। যদিও রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই বাধা অতিক্রমের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। তবু শেষ পরিণতিতে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কর্মকান্ডই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রচার এবং প্রসার ঘটায়। সমাজে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্রবোধ, বৃটিশ বিভেদ নীতি, রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বর্তমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে পশ্চাদপদ মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতারা উপস্থিত করেন দ্বিজাতিতত্ত্ব; ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক রূপ, হিন্দু মুসলিম দুটি জাতি যে তত্ত্বের মূল ভিত্তি। যার বাস্তবায়ন ঘটে এদেশ বিভক্ত করার মাধ্যমে। এভাবেই সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগ, বুর্জোয়া সংগঠন কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে এবং এ দুটি সংগঠনের রাজনৈতিক কার্যক্রমকে আশ্রয় করে এ অঞ্চলে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের চিন্তার উদ্ভব বিকাশ এবং পরিণতি।

সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বাংলায় আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সংগঠনের বিকাশ ঘটতে থাকে। বাঙালী মানসে রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। রাজনৈতিক কর্মকান্ড ক্রমাগত জাতীয়তাবাদী চেতনা উদ্ভবের সহায়ক শক্তি হিসাবে পরিণত হতে থাকে। ১৮৩০ সালের পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভূত জমিদার শ্রেণী রাজনৈতিক নেতৃত্বদানে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।[১] এদের দ্বারাই বাংলায় আধুনিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত শতকের প্রথম ভাগে সামাজিক এবং কৃষক আন্দোলনের ফলে কোম্পানী নিষ্কর ভূমির উপর কর ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৮৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গ ভাষা প্রকাশিকা' নামে একটি সভা যে সভা ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ নির্দেশক।[২] কিছুদিনের মধ্যে জমিদার শ্রেণী তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভূম্যাধিকারী সমাজ বা 'জমিদারী এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৮ সালে যার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'Bengal Landholders Society' এই প্রতিষ্ঠানটি উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।[৩] এ অঞ্চলের রাজনৈতিক আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এই সংগঠন প্রাথমিক পর্যায়ে যে ভূমিকা রেখেছিল তার অবদান অস্বীকার করার উপায় নাই। সংগঠনটি সদস্যদের মধ্যে দেশের প্রতি কৌতুহলী মনোভাব গড়ে তুলতে বাস্তব ভূমিকা পালন করে। এর সদস্য হতে হলে যে সকল বৈশিষ্ট থাকা প্রয়োজন ছিল দেশের স্বার্থের প্রতি কৌতুহলী হওয়াটা ছিল তার মধ্যে অন্যতম। 'ল্যান্ডহোল্ডার্স

Dhaka University Institutional Repository

সোসাইটি'কে প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে ধরে নেয়া যায়।[৪] প্রথম থেকেইসংগঠনটির ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে সংকীর্ণ জাতি বিভেদ বা আঞ্চলিকতা মুক্ত উদার নীতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ঐ সময়কার রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিকাশের প্রেক্ষিত বিচারে সন্দেহ নাই যে, 'ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি' যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়েছে। যদিও এই সোসাইটি জমিদার ও জমির মালিকের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি তার ঘোষণা পত্রে অন্যতম বলে বিবেচনা করেছে। তবু সমিতির বিশিষ্ট নেতা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভূমি মালিকের স্বার্থের পাশাপাশি রায়তের অধিকার রক্ষার বিষয়টি ও উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তিনি সমিতির মাধ্যমে ভারতবাসীর নিয়মতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন।[৫] তা সত্ত্বেও রাজনীতি সচেতন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে দ্বারকানাথ ঠাকুর সমিতির রাজনৈতিক কার্যকলাপের সীমাবদ্ধতায় তৃপ্ত ছিলেন না। তিনি ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। ১৮৩৯ সালে তিনি রামমোহন রায়ের বন্ধু এ্যাডাম ইংল্যান্ডের উদারনৈতিক নেতা জর্জ টমসন কর্তৃক ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত 'British India Society' নামক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই যোগাযোগের ফলে তিনি ভারতীয় জনগণের সমস্যা সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সক্ষম হন। এতে পুলিশ বিচার রাজস্ব ও ভূমিসংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্কারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৬]

দ্বারকানাথ ঠাকুরের আগ্রহে জর্জ টমসন ১৮৪২ সালের শেষের দিকে ভারতে আগমন করেন। প্রখ্যাত বক্তা টমসন কোলকাতায় যে সমস্ত বক্তৃতা দেন তার মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক উৎসাহ সৃষ্টিতে সক্ষম হন। ১৮৪৩ সালে তাঁর উৎসাহ ও পরামর্শে 'Bengal British India Society' প্রতিষ্ঠিত হয়। সোসাইটির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল সকল শ্রেণীর দেশবাসীর মঙ্গল সাধন এবং সকলের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা।[৭] সমিতির আরো উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ ভারতের জনগণের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং দেশের আইন ও সম্পদগুলি সম্পর্কে সম্যকরূপ অনুসন্ধান করা।[৮] এই সোসাইটির কর্মকর্তাগণ চেয়েছিলেন এটিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সভায় পরিণত করতে। শুধুমাত্র জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য এই সভাকে জমিদার সভা না করে, সর্বশ্রেণীর প্রজার জন্য ন্যায্য অধিকার ও দাবী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এটিকে একটি রাজনৈতিক সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই এদের লক্ষ্য ছিল। এ কারণেই দেখা যায় এ সমাজ সর্বপ্রথম ভারতে জনমত গঠনের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা টমসনের মতে: "জনমত সৃষ্টি করতে না পারলে বৃটিশ সরকার কখনও ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার আশা আকাংখা প্রতিষ্ঠার এবং শাসনতান্ত্রিক দোষত্রুটি সংশোধনের প্রতি নজর দিবে না।"[৯]

এই নুতন রাজনৈতিক সমাজের প্রয়াসের ফলেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ প্রথা এবং অন্য কয়েকটি শাসন সংস্কার সম্ভবপর হয়েছিল। 'ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি' ও 'বেঙ্গল বৃটিশ-ইন্ডিয়া সোসাইটির' নেতৃবৃন্দের কর্মধারার মধ্যে রক্ষণশীল এবং রাজভক্তির প্রতিফলন ঘটলেও এঁরা কিছু কিছু প্রগতিশীল দাবী উত্থাপন করতে সক্ষম হন। যেমন জুরী ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে পৃথককরণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচনের অবসান ইত্যাদি। এই সংগঠনগুলির রাজনৈতিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা ছিল। ব্যাপক আকারে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারে ব্যর্থ হলেও তৎকালীন সময়ের মাপকাঠিতে উভয় ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে ছিল যুগোপযোগী।

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া এবং শিক্ষিত সমাজের রাজনৈতিক চেতনা এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো যে, ১৮৪৯ সাল থেকে একটি সুসংগঠিত এবং কার্যকরী রাজনৈতিক সমিতির তীব্র অভাব অনুভব হতে লাগল।[১০]

এই অবস্থায় ভারতবাসীর নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দিলে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ১৮৫১ সালে কোলকাতায় 'বৃটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বোক্ত 'Landholders Society' এবং 'Bengal British India Society সম্ভবতঃ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে 'British India Association' এর সঙ্গে যোগদান করে।

এই এ্যাসোসিয়েশনে জমিদার ও অভিজাত পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যদের সমাবেশ ঘটে। পূর্বেকার সংগঠনগুলিতে ভূমির মালিক ও জমিদার শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল একচেটিয়া এই সংগঠনের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রাধান্য শুরু হয়।[১১] সমিতির অভ্যন্তরে অভিজাত জমিদার শ্রেণীর প্রাধান্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সমিতি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে ব্যর্থ হয়। জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার প্রতি সমিতির বিশেষ নজর ছিল। অথচ 'বৃটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন' প্রধানতঃ ছিল শিক্ষিত, অভিজাত শ্রেণীর মিলন ক্ষেত্র।[১২] জমিদারদের শ্রেণী স্বার্থের কারণে এর কার্যক্রম একটি বিশেষ গন্ডির মধ্যে এসে থেমে যায়। তবু জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ৩৪ বৎসর আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক চেতনা যে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে এই চেতনা রাজনৈতিক আন্দোলন এবং জাতীয় চেতনা বিকাশে

Dhaka University Institutional Repository

একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ করে ১৮৫২ সালে সমিতি কর্তৃক বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকট ভারতের বিবিধ সমস্যা এবং শাসন সংস্কার সম্বলিত দীর্ঘ স্মারক পত্রটি এদেশের জাতীয় চেতনা বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে আছে। এই পত্রে প্রশাসন ক্ষমতার সঙ্গে আইনসভার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয়। এতে বৃটিশ ভারতে আইনসভাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির আইন সভার মতো পৃথকীকরণের দাবী পেশ করা হয় এবং ভারতের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আইনসভা গঠনের দাবী জানান হয়।[১৩] তাছাড়া উক্ত পত্রে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার দাবী করা হয়। এ স্মারকলিপিতে ভারত ও ইংল্যান্ডে একই সঙ্গে সর্বোচ্চ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের দাবীও করা হয়।

সমিতি ভারতীয় জনগণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে স্মারকপত্র প্রেরণ করেই দায়িত্ব সমাধা করেনি। ভারতীয় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় এবং ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বৃটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন' পূর্বেকার সমিতিগুলোর তুলনায় জনমতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এজন্য সমিতি কর্তৃক ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলি ছিল গণভিত্তিক অর্থাৎ বৃটিশ ভারতের প্রশাসনযন্ত্রকে সুদক্ষ করা, ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতি সাধন করা আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করে সর্বসাধারণের স্বার্থে ও কল্যাণে প্রয়োগ করা।[১৪] সমিতি রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর উপর প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য কলকাতা ও মফস্বল শহরগুলোতে জনসভার আয়োজন করে। এছাড়া জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সংহতি স্থাপনের জন্য সমিতি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৮৫৩ সালের চার্টার আইনকে কেন্দ্র করে সমিতি তুমুল আন্দোলন শুরু করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঘোষিত নীতি অনুসারে আইনের চোখে সকল মানুষ সমান, সুতরাং এই নীতি অনুসারে আইনসভায় অংশগ্রহণ থেকে ভারতবাসীকে বঞ্চিত করা বেআইনী এবং নিতান্ত গর্হিত কাজ। এ কারণে সমিতি আন্দোলনের মাধ্যমে আইনসভায় অধিক সংখ্যক ভারতীয় সদস্য মনোনয়নের দাবী উত্থাপন করে। তাছাড়া ভারতীয় যুবকদের সুবিধার জন্য ইংল্যান্ডে এবং ভারতে যুগ্মভাবে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের জন্য দাবী করে এবং জনমত সংগ্রহের লক্ষ্যে ভারতীয় আইনসভায় আনীত বিলগুলির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। সমিতির এই ধরনের প্রচেষ্টা সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনা বিস্তার প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অপরদিকে পরাধীন দেশের জনসাধারণকে সাহায্য করে অধিকার সচেতন নাগরিককে পরিণত হতে। সমিতির যতই সীমাবদ্ধতা থাকুক না কেন ভারতের রাজনৈতিক চেতনা এবং জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এ কারণেই দেখা যায় যে, যে কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা দানা বেঁধে উঠেছিল এবং পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল, সেই কংগ্রেসের প্রথম কুড়ি বছরের কার্যক্রম উক্ত সমিতির চিন্তাভাবনা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল।

১৮৫৭ সালে সংগঠিত মহাবিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভূমিকা দুর্ভাগ্যজনক হলেও এর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর মতো তাদেরকেও মর্মাহত করে। বিপ্লবীদের প্রতি সভ্য ইংরেজ শাসকবর্গের বর্বর আচরণ, বিচারের নামে প্রহসন করে নির্বিচারে ভারতবাসীদের হত্যার ফলে উক্ত শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজ প্রীতিতে ভাটা পড়ে। মোহমুক্তি ঘটে ইংরেজ শাসকশ্রেণীর তথাকাথিত ভারত দরদী ভূমিকার প্রতি। কেননা স্বল্প সময়ের মধ্যে এরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে শাসকবর্গের সকল কার্যকলাপ বৃটিশ স্বার্থে এবং ভারতীয়দের স্বার্থের পরিপন্থী। ১৮৫৭ সালের পর সরকার বৃটিশ পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আমদানী শুল্ক উঠিয়ে দিয়ে ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করে। ফলে একদিকে দেশীয় শিল্পের অগ্রগতির পথ ব্যাহত হয় অপরদিকে দেশী পুঁজি সৃষ্টির দ্বাররুদ্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া এদেশের সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি তাদের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পেতে থাকে। সরকারের এই সমস্ত আচরণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একদিকে যেমন হতাশ করে অপরদিকে সরকারের প্রতি বিতশ্রদ্ধ করে তোলে। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ শাসকদের ভারতবাসীর প্রতি আচরণের প্রত্যক্ষ ফল দাঁড়ায় এই যে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে বিকাশ উন্মুখ জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্রমশ সরকার বিরোধী রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে।[১৫] ১৮৬৪ সাল থেকে বাঙালী যুবকদের অনেকে 'Indian civil service' পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হতে থাকেন। অনেক যুবক উচ্চ শিক্ষার্থে ও আইন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য ইংল্যান্ডে গমন করেন। সেখানে বৃটিশ শাসন পদ্ধতি এবং নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। ফলে অনেকেই তৎকালীন প্রসিদ্ধ উদারনৈতিক চিন্তাবিদদের ভাবধারায় প্রভাবিত হন এবং তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। এরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে উপমহাদেশের জনসাধারণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কতখানি বঞ্চিত এবং অনুন্নত। সুতরাং মাতৃভূমির উন্নতি করতে হলে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার এবং স্বায়ত্তশাসন অপরিহার্য। ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে বক্তব্য পেশ করতে থাকেন। ১৮৬৭

Dhaka University Institutional Repository

সালে ব্যারিষ্টার উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, ১৮৭৩ সালে আনন্দমোহন বসু ইংল্যান্ডে বক্তৃতাকালে ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। একই বিষয়কে সমর্থন জানিয়ে ১৮৭৪ সালে কৃষ্ণদাস পাল 'Hindu Patriot' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন।

আনন্দমোহন বসু দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর ছাত্রদের মধ্যে ভারতের ঐক্য এবং উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি মধ্যবিত্ত সমাজের জন্য একটি রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ আলোচনা চালান। এদের মধ্যে শিশির কুমার ঘোষ উদ্যোগী হয়ে ১৮৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'ইন্ডিয়া লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৬ সালের জুলাই মাসে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও আনন্দমোহন বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'India Association' বা ভারত সভা নামে সংগঠনটি। এর উদ্দেশ্য ছিল, জনমত গঠন এবং রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্বভারতীয় ঐক্যস্থাপন।[১৬]

'ইন্ডিয়া লীগ' ও 'ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন' দুইটি সংগঠনই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রথমোক্ত সংগঠনটির স্থায়িত্ব স্বল্পকালীন হলেও উপমহাদেশের জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে 'ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনে'র মূল লক্ষ্যই ছিল জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা এবং ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষা করা। বৃটিশ বিভেদনীতি, নবজাগরণ আন্দোলন এবং মুসলিম সমাজের সংস্কার আন্দোলনের ফলে হিন্দু মুসলিম উভয় শ্রেণী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দুই শ্রেণীর মধ্যে ক্রমশ সৃষ্টি হতে থাকে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের চেতনা। সাম্প্রদায়িক চেতনার অগ্রগতি রুদ্ধ করার জন্য 'ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনে'র নেতৃবৃন্দ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে রাখতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। এর বাস্তব পদক্ষেপ হিসেবে সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে নবাব মোহাম্মদ আলীকে সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী তাঁর প্রচারিত জাতীয়তাবাদ ছিল সর্বভারতীয় এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমৃদ্ধ। তিনি ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এ কারণে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন: "আইস আমরা পুরাতন কলহ, বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির দুঃখ ঘুচাইবার জন্য একযোগে একত্রে অগ্রসর হই।"[১৭]

অসাম্প্রদায়িক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সংগঠনের মাধ্যমে এই চেতনার বিকাশে আন্তরিক ছিলেন সন্দেহ নাই। এ কারণে ইতিহাসে তিনি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। এখানে উল্লেখ্য নবজাগরণ আন্দোলনের ফলে যে ধর্ম ভিত্তিক উগ্রহিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তীতে সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে অধিক সংখ্যক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদারচিত্ত ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ, জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনায় এক ব্যাপক পরিবর্তনের আভাস নিয়ে আসে। উনিশ শতকের শেষার্ধ ছিল এই পরিবর্তীত জাতীয়তাবাদী চিন্তার সূচনালগ্ন।

ভারত সভার পত্তনের বছরই এক আদেশ বলে বৃটিশ সরকার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ বছরে নিয়ে আসে। ভারতীয়দের স্বার্থহানিকর এই ষড়যন্ত্রমূলক আদেশ দেশবাসীর মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সুরেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত বিধিকে ইস্যু করে ভারতব্যাপী এক মহাআন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তার ব্যাপক প্রয়াস সর্বত্র প্রবল গণজোয়ারের সৃষ্টি করে। সারা ভারতব্যাপী তাঁর এই সাফল্য তাঁকে সর্বভারতীয় নেতায় পরিণত করে।[১৮] উপরোক্ত আন্দোলন চলাকালীন সরকার Vernacular press Act, Arms act ইত্যাদি আইন পাশ করে, যা শুধু ভারতীয়দের স্বার্থের পরিপন্থী নয় অপমানজনকও।[১৯] সরকারের এই সকল পদক্ষেপ গণআন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে দেয় এবং ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের গতি ত্বরান্বিত করে। 'ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন' এই সকল আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এই সকর প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে জনমত সরকার বিরোধী রূপ নিতে থাকে দ্রুত গতিতে এবং জাতীয় চেতনার দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে। এ, বি, এম, মাহমুদের মতে: "বস্তুতঃ সেক্রেটারী অব ষ্টেট লর্ড সল্‌সবেরীর নীতির পরোক্ষ ফল হিসাবে ভারতে জাতীয়তাবাদ আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যাহার ফলে ক্রমে তাহারা স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করিল। ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারী কর্মচারীদের দৌরাত্ম্য কমাইয়া দেশীয় সদস্যদের ক্ষমতা বৃদ্ধির আবেদন করে।"[২০]

এভাবেই সরকারী দমননীতির ফলে ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা দৃঢ় হতে থাকে এবং স্বায়ত্তশাসন লাভের আকাংখার জন্ম হতে থাকে। সে সময়ে জাতিগত বৈষম্যমূলক আচরণ বৃটিশ শাসনের প্রধান নীতি হওয়ার ফলে বৃটিশ ও ভারতীয়দের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। এই অবস্থা সম্পর্কে জওহরলাল নেহরু

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন: "সেই সময় ভারত দুইটি জগতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—একটি হইল বৃটিশ শাসক শ্রেণীর জগৎ এবং অপরটি অগণিত ভারতবাসীর জগৎ। ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ছাড়া কিছুই ছিল না।"[২১]

যদিও বাংলার কৃষক সমাজ, নিম্নবিত্তের জনগোষ্ঠী এবং শাসক শ্রেণীর মধ্যে দুই জগতে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার মনোভাব কোম্পানীর শাসনের সূচনা লগ্ন থেকেই শুরু হয়েছিল। উঁচু মহল অর্থাৎ অভিজাত, বিত্তবান শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে শাসকবর্গের প্রতি ঘৃণার মনোভাব সঞ্চার হতে সময় লেগেছে একশত বছরের বেশী। ফলে একদেশের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও ভারতের উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন চিন্তাভাবনা ও মানসিকতা নিয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন জগতে বাস করত। সামাজিক অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় দ্বন্দ্বের কারণে এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর চিন্তার সমন্বয় ঘটেনি, ফলে জাতীয় ঐক্য ব্যাহত হয়েছে। ঐক্যহীন পরিস্থিতি জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি, জাতীয়তাবাদী চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুতে এনে দিয়েছে বন্ধাত্ব। জাতির অগ্রগতি হয়ে পড়েছে স্থবির। বাংলা তথা ভারতবর্ষ স্থবিরতার অভিশাপে অভিশপ্ত হয়েছিল যুগ যুগ ধরে। যা কিছু অগ্রগতি হয়েছে সবই হয়েছে পরের স্বার্থে পরের প্রয়োজনে, এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে বা তাদের স্বার্থে নয়। এর মূল কারণই ছিল জাতীয় চেতনার অভাব, সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যের অভাব, জাতীয়তাবোধের অভাব। জওহরলাল নেহরু অগ্রগতির প্রেরণার উৎস হিসেবে জাতীয়তাবোধের ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন: "এখনও দেখতে পাওয়া যায় যে যা কিছু কোন জাতিকে অগ্রসর হতে প্রেরণা দেয় তার মধ্যে জাতীয়তাবোধ অন্যতম। এই এক-জাতীয়তার চারিদিকে জমে ওঠে প্রীতির অনুভূতি, নানারূপ জাতীয় প্রথা ও সংস্কার এবং একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে সমস্ত জাতির জীবনকে এক সূত্রে গাঁথার ইচ্ছা।"[২২]

শতবর্ষ ধরে এই ইচ্ছার দারুণ অভাব ছিল এ ভূখন্ডে। রাজনীতিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি এই ইচ্ছাকে ক্রমাগত উস্কে দিতে থাকে। নানান ইস্যুকে কেন্দ্র করে বার বার এই এক সুত্রে গাঁথবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন উদার চিত্ত রাজনীতিবিদগণ। ১৮৮৩ সালের ইলবার্ট বিল ইস্যু এমনি এক ইস্যু যেটিকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবোধ জাতীয় চেতনার তীব্র প্রকাশ ঘটে সমগ্র ভারতব্যাপী। উদারনৈতিক ভাইসরয় রর্ড রিপণের আদেশক্রমে তার আইন সদস্য সিরিল ইলবার্ট বিচার বিভাগের বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় বিচারকগণের ক্ষমতার সমতাবিধান করে এক বিল প্রস্তুত করেন। ভারতে অবস্থিত সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী, উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ন সহ সকল ইংরেজ বিলটির তুমুল বিরোধীতা করে এবং ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের বৈষম্য বজায় রাখতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার বিলটি সংশোধন করতে বাধ্য হয়। এ সংশোধনের ফলে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শুধু ইংরেজ সরকার নয়, সমগ্র বৃটিশ জাতির প্রতিই ভারতীয়রা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে।[২৩] ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা প্রবাহ বয়ে যায় তাতে ভারতে অবস্থিত ইংরেজদের ভারতবাসীর প্রতি যে মনোভাব তা নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। ইংরেজদের এই মনোভাব সম্পর্কে ভারত সরকারের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব সেটল্ কার বলেছেন: "সামান্য বাংলার অধিবাসী চা-কর কিংবা নীল করের সহকারী থেকে আরম্ভ করে প্রাদেশিক রাজধানীর খ্যাতনামা সংবাদপত্র সম্পাদক, প্রাদেশিক প্রধান রাজকর্মচারী থেকে আরম্ভ করে সিংহাসন অধিরূঢ় রাজপ্রতিনিধি পর্যন্ত উচু-নীচু সকল ইংরেজ মনে মনে এই বিশ্বাস পোষণ করে আসছেন যে তাঁরা এমন একটা জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছেন যে জাতি ভগবৎ-নির্দেশেই অপর জাতিকে বশ্যতাধীনে আনবে ও শাসন করবে। এই আইন পাশ করার ফলে ইংরেজদের সেই সযত্নপোষিত ধারণা বিষম আঘাত লাভ করল।"[২৪]

ইংরেজদের এই আত্ম অহমিকাবোধ জাতি বিদ্বেষ শিক্ষিত ভারতবাসীকে একদিকে মর্মাহত করে অপরদিকে আত্মসচেতন করে তোলে। আপাত দৃষ্টিতে ইলবার্ট বিলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও একে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তাতে ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয় চেতনা বোধ এবং জাতীয় ঐক্য দৃঢ় হয়।

'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' প্রথম থেকেই জাতীয় ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন গঠনে সোচ্চার ছিল।[২৫] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এ্যাসোসিয়েশন ছিল তৎকালীন সময়ে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মধ্যবিত্তের প্রাধান্য এবং নেতৃত্ব থাকার কারণেই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা এর পক্ষে সম্ভব ছিল। কেননা এটি সর্বসাধারণের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দিতে দ্বিধা করেনি। সে কারণে দেখা যায় যে নেতৃবৃন্দ কৃষি সংস্কার এবং কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনেও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ১৮৮১ সালে 'রেন্ট বিলের' ওপর এ্যাসোসিয়েশনের স্মারকলিপি এবং বাংলাদেশের জেলায় জেলায় 'রেন্ট ইউনিয়ন' নামে কৃষক সংগঠনটি এর প্রমাণ বহন করে।[২৬] এই উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সংগঠনটির আরেকটি অম্লান কীর্তি হলো ১৮৮৩ সালে কোলকাতায় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স আহ্বান। এতে ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধি যোগদান করে। উক্ত সম্মেলনের সভাপতি আনন্দমোহন বসু সভাপতির ভাষণে সম্মেলনকে 'ভারতের

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পার্লামেন্ট' বলে আখ্যায়িত করেন।[২৭] এ কনফারেন্সের ফলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে কোলকাতায় জাতীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে মুসলমানদের মধ্যে থেকে 'Central National Mohamedan Association' এর প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার আমীর আলী যোগদান করেন। উক্ত অধিবেশনে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। যেমন; সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সংস্কার, বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক্করণ ইত্যাদি।[২৮]

উনিশ শতকের শেষার্ধে যখন জাতীয়তাবাদী চিন্তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে, রাজনৈতিক-স্বার্থ-আকাংখায় উদ্দীপ্ত সর্বভারতীয় ঐক্যবোধের উদ্গম লক্ষ্য করা যায় তখন ইংরেজ সরকার জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে প্রথম দফা আপোষের পথ অবলম্বন করে। ১৮৮০ সালে লিবারেল পার্টি ক্ষমতায় এসে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করে। এই বোঝাপড়ার ফলে ভারতীয়রা নির্বাচিত পরিষদের মাধ্যমে ভারতীয় মিউনিসিপ্যালিটিগুলি পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার লাভ করে। কিন্তু ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে এই আপোষের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস গঠনের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সাথে দ্বিতীয় দফা আপোষ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।[২৯] ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান রাজনৈতিক দাবীসমূহ ছিল 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবগুলোর মার্জিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পথ প্রদর্শক 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স' হলেও এই কনফারেন্সের সাফল্যের পেছনে 'বৃটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন' এবং 'সেন্ট্রল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশনের' অবদান কনফারেন্স আহ্বানকারী 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের' চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।[৩০]

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল জাতীয় ঐক্যবোধ। যে বোধ বাংলা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে। সারা ভারতের জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনা রাজনৈতিক চেতনা সর্বোপরি সর্বভারতীয় জাতীয় ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠার পেছনে নেতৃত্ব ছিল বাংলার রাজনীতি সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর। নেহরু বাঙালীর এই ভূমিকা সম্পর্কে বলতে যেয়ে বলেছেন, 'বাংলাদেশের নেতারা সমগ্র রাজনৈতিক ভারতের নেতারূপে প্রতিভাত হয়েছিল।'[৩১] শুধু তাই নয় রাজনীতি সচেতন এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধকারী সংগঠন সমূহের জন্ম ও হয়েছিল বাংলায় সে জন্যই সরল চট্টোপাধ্যায় তার গ্রন্থে লিখেছেন: "জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। উনিশ শতকে রামমোহন রায়ের চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় যার সূত্রপাত সেই ধারার সুস্থিত পরিণতি ঘটে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে। ১৮৩৮ সাল থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সংগঠনগুলি জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল।"[৩২]

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে রাজনৈতিক সমিতি বিকাশে বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণী এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল তারই সফল রূপ হচ্ছে জাতীয় কংগ্রেস। মূলতঃ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের সুসংগঠিত প্রকাশ ঘটে। অথচ, অনেক ঐতিহাসিক বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা এ্যালান অক্টভিয়ান হিউমকে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির সকল কৃতিত্ব প্রদান করেছেন এবং তার এই রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার পেছনে ভারতের প্রতি তার দরদের কথাও বলেছেন। অবসরপ্রাপ্ত এই ইংরেজ প্রশাসক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা না করলেও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতীয় জনগনের স্বার্থে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক গড়ে তোলা সুবিশাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতা প্রমাণ করে যে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনার কতখানি প্রসার ঘটেছিল। বাংলার শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠণের প্রচেষ্টা যখন সাফল্যের শেষ ধাপে উপস্থিত তখনই সরকারী উদ্যোগে কংগ্রেস গঠনের আয়োজন শুরু হয়। এভাবেই ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ জাতীয়চেতনাবোধ এবং সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াসকে তৎকালীন সরকার ইংরেজ শাসনের স্বার্থের গন্ডিতে আবদ্ধ রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবেই হিউম ভারতীয়দের জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন, সাময়িকভাবে সরকারী প্রভাবের আওতায় এনে, নিজের উদ্যোগে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করতে সক্ষম হন।[৩৩] হিউমকে 'ভারত দরদী' বলা হলেও আসলে তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে তাঁর স্বজাতির শাসনকাল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্বের প্রতি দরদী। যে মুহূর্তে বিভিন্ন দাবীকে কেন্দ্র করে ভারতব্যাপী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে; হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য দুই সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ আন্তরিক প্রয়াস চালাচ্ছেন; সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে অসাম্প্রদায়িক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিকাশের; তখনই বৃটিশ শাসকবর্গ ভারতে তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থান সম্পর্কে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থানকে দীর্ঘায়িত এবং শংকামুক্ত করার লক্ষ্যে হিউমকে 'ভারত দরদী' সাজিয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতে তারা সর্বকূল

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পায়। তারা মনে করে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে যে প্রবল উত্তেজনা বিরাজ করছে তা হ্রাস করা এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব এবং তাঁদের মতামত সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করা সম্ভব হবে।[৩৪] তাছাড়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখে নিজস্ব স্বার্থ অনুযায়ী প্রবাহিত করা সম্ভব হবে। অপরদিকে ঘন ঘন কৃষক বিদ্রোহে বিব্রত বৃটিশ প্রশাসন ধারণা করে যে, এতে মধ্যবিত্ত পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক শ্রেণীর বিদ্রোহের সমন্বয় প্রয়াসের সম্ভাবনা দূর হবে। কংগ্রেস সৃষ্টিকে বৃটিশ প্রশাসন এ সকল শংকা থেকে মুক্তিলাভের উপায় হিসেবে ধরে নেয়। উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা হিউমের জীবনকার স্যার উইলিয়াম ওয়েডার বার্নের বর্ণনায় এবং হিউমের নিজস্ব বক্তব্যের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে আছে।

ওয়েডার বার্ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পেছনে হিউমের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছেন: "বড়লাট লর্ড লিটনের শাসনকালের শেষভাগে, অর্থাৎ ১৮৭৮ ও ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হিউম সুনিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং বুদ্ধিজীবীদের বিরূপ মনোভাবের ফলস্বরূপে যে ভয়ংকর বিপদ ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও ইংরেজ শাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে হিউম দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু সতর্কতা জ্ঞাপক সংবাদ পাইয়াছিলেন।"[৩৫]

এ সম্পর্কে হিউমের নিজস্ব বক্তব্য ছিল: "বিভিন্ন তথ্য হইতে আমি নিশ্চিত হইয়াছিলাম যে, আমরা একটা ভয়ংকর গণঅভ্যুত্থানের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। বিভিন্ন অঞ্চলের রিপোর্ট ও সংবাদের সাতটি বিরাট খন্ড আমাকে দেখানো হইয়াছিল।...রিপোর্ট ও সংবাদগুলি বিভিন্ন জেলা, মহাকুমা, নগর, শহর ও গ্রাম হইতে প্রেরিত হইয়াছিল।...বহু রিপোর্টে ছিল নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে আলোচনা। এই সকল আলোচনা হইতে দেখা যায়, এই দরিদ্র জনসাধারণ (শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোক) দেশের বর্তমান অবস্থার ফলে একটা কিছু করিবার জন্যই তাহারা প্রস্তুত হইতেছে, দল বাঁধিতেছে।...ইহাও আশংকা করা হইয়াছিল যে, পাতার উপর অসংখ্য জল বিন্দুর মত দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হইয়া কতকগুলি বৃহৎদলে পরিণত হইবে; দেশের সকল দুষ্ট লোক একত্র হইবে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুন্ডা দলগুলি একত্র হইবার পর সরকারের বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষের ফলে ক্ষিপ্ত হইয়া সকলে ঐ সকল দলে যোগদান করিবে; তাহারা বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া খন্ড খন্ড সংঘর্ষগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবে উহাকে একটা জাতীয় অভ্যুত্থানের আকারে পরিচালিত করিবে।"[৩৬]

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কংগ্রেস গঠনের পেছনে কি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। হিউমের বক্তব্যের মধ্যে যাদের 'দুষ্ট লোক' বা 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুন্ডাদল' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তারা ছিল বাংলার কৃষক নিম্নবিত্তের জনগোষ্ঠীর যারা সরকার এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর অত্যাচারে জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে নিঃস্ব দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। বাঁচার তাগিদে হয়ে উঠেছিল মরিয়া, বেছে নিয়েছিল আমৃত্যু সংগ্রামের পথ। এই কৃষক শ্রেণীর এবং নিম্নবিত্তের সর্বসাধারণের ঐক্যের ভয়ে শংকিত ছিল বৃটিশ প্রশাসন। কেননা এদের ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহ জাতীয় অভ্যুত্থানে রূপ নেয়ার আশংকা উড়িয়ে দেয়ার মত ছিল না। নিম্ন শ্রেণীর এই বিক্ষোভ বিদ্রোহকে চরম দমননীতির মাধ্যমে অবদমিত করা গেলেও শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর বৃটিশ বিরোধী মনোভাব এবং ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দমননীতির মাধ্যমে স্তব্ধ করতে গেলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। একদিকে যেমন তাদের নজর ছিল, কৃষক বিদ্রোহের সঙ্গে মধ্য শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী চেতনার যাতে সমন্বয় সাধন না হয়। অপরদিকে মধ্য শ্রেণীর নেতৃত্ব যাতে কৃষক শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়। সুতরাং দমননীতির মাধ্যমে দমন করা হলো সম্ভাব্য কৃষক বিদ্রোহ এবং জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নিজস্ব স্বার্থের প্রয়োজনে প্রবাহিত করার জন্য সৃষ্টি হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেস সৃষ্টি হয়েছিল এমন একটি রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে যখন "জনসাধারণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আর সম্ভাবনা নাই, কেবল তখনই জনসাধারণের গণবিক্ষোভকে শান্তিপূর্ণ ও বৈধ পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে বংশবদ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের, সহায়তায় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান অক্টভিয়ান হিউম বড়লাট লর্ড ডাফরিন কর্তৃক আদিষ্ট হলেন।"[৩৭]

এভাবে অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসক হিউম স্বীয় দেশ জাতির স্বার্থে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠার হানার জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বাংলার সচেতন শিক্ষিত শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড প্রমাণ করে যে, তাদের মধ্যে যে আত্মসচেতনতা জন্ম নিচ্ছিল তা ক্রমশ শ্রেণী স্বার্থ সম্প্রদায়গত স্বার্থকে অতিক্রম করে দেশজাতির স্বার্থ রক্ষার দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এই শিক্ষিত শ্রেণী বৃটিশ নাগরিকদের প্রাপ্ত অধিকার এবং একই দেশ কর্তৃক শাসিত হয়েও ভারতীয় জনগণের প্রাপ্ত নাগরিক অধিকারে বৈষম্য ক্রমাগত উপলব্ধি করতে শুরু করেন। তাঁরা সরকার কর্তৃক জারীকৃত

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিক মৌলিক অধিকার খর্বকারী বিলের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেন। সরকারের এই সব অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং ঠিক এ সময়ে ইংরেজ প্রশাসনের সহযোগিতায় যে উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সৃষ্টি হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৮৮৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন 'জাতীয় কনফারেন্স' দলটি কংগ্রেস যোগ দেয়ার ফলে নবগঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসই হয়ে উঠে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আশা আকাংখার প্রতীক। কংগ্রেসের প্রথম দিককার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ আপোষকামী হলেও জাতীয় উন্নয়নের বিষয়ে তাঁরা হয়ে ওঠেন আপোষহীন। এঁরা জাতীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, কর হ্রাস এবং ভারতে সংগঠিত পুঁজিতান্ত্রিক ঋণদান ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে এবং ঔপনিবেশিক শুল্কনীতির বিপক্ষে ক্রমাগত প্রতিবাদী কর্মসূচী গ্রহণ করতে থাকেন। তাছাড়া কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় শিল্পোন্নয়নের জন্য শিল্প প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হতে থাকে। ফলে কংগ্রেস সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে মধ্যবিত্ত শ্রেণীসহ সকল জাতীয়তাবাদের সংগঠিত করার সংগঠনে পরিণত হয়।[৩৮] এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতের রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বরাজের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কংগ্রেসের সামগ্রিক ইতিহাস হচ্ছে ভারতের জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। এ জন্যই জে, সি, জোহারী বলেছেন: "The biography of the Indian National Congress is virtually the history of the Indian freedom struggle for the simple reason that ever since its formation in 1885, till the advent of indepence in 1947 this organisation sincerely identifed itself with the nation of the Indian people. Great Congressmen became great national leaders, the greatest of them (Gandhiji) became the 'Father of the Nation.' They represented the real will of country's teeming millions, despite the fact that their methods of agitation, their approaches to the national issues and above all, their solutions to the problems before them were different. Gokhale and Tilak, Moti and Jawahar, Nehru and patel, Gandhi and subhas, to take the prominent cases, had different views and different convictions in their own right, but all were committed to the same goal—emancipation of India from foreign colonial subjection."[৩৯]

যদিও কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতারা স্বাধীনতার কথা ভেবে দেখেননি। তবু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর কার্যক্রম ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা দৃঢ়করণ এবং জাতীয়তাবাদী স্বার্থরক্ষার কাজে নিষ্ঠার সাথে পরিচালিত হতে থাকে। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত এই সময়ে কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে নেতৃবৃন্দের উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শন ও পদ্ধতিতে বিশ্বাস এবং তাঁদের আপোষকামী মনোভাব প্রকাশ পায়। প্রথম কুড়ি বছর নেতৃবৃন্দ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা একদিকে যেমন বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্ব কামনা করেছেন, অপরদিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবাসীর জন্য বৃটিশ শাসকদের কাছ থেকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, কংগ্রেসের প্রথম আমল থেকে ভারত বিভক্তি পর্যন্ত পায় সকল নেতৃত্ব ছিল আপোষকামী। এর মূল কারণই ছিল কংগ্রেস কতৃক যে জাতীয়তাবাদের পরিপুষ্ট সাধন করা হয় তার নেতৃত্ব ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে। কংগ্রেস পরিচালিত হয়েছে আপোষকামী বুর্জোয়া চেতনা সমৃদ্ধ জাতীয়তাবাদী আদর্শ দ্বারা। তাই কংগ্রেসের আদি পর্বের নেতারাও আপোষকামী হবেন এটাই স্বাভাবিক। তাঁরা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এবং ধীর গতিতে পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। সরকারের সঙ্গে কোন রূপ সংঘাত ব্যতিত আপোষের মাধ্যমে অধিকার অর্জন ছিল তাঁদের নীতি। এখানে উল্লেখ্য একজন অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা এবং বৃটিশ নাগরিক কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও তাতে জাতীয় নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণের পেছনেও একই নীতি এবং মনোভাব কাজ করেছে। তাছাড়া বৃটিশ শাসকদের সহৃদয়তা উদারতা সততার প্রতি তাদের ছিল সীমাহীন আস্থা। বৃটিশ সরকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারতবাসীর উপকার করবেন। এ বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ ছিল না।

এ কারণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার যখন দশ বছর চলছে তখনও বিশ্বাস করতেন : "ইংল্যান্ড থেকে যুগান্তকারী ঘোষণা নিশ্চয়ই আসবে যার ফলে আমাদের মানুষেরা ভোটাধিকার পাবে আমরা সেই দিনের দিকে তাকিয়ে আছি যখন শুধু নৈতিক পুনরুজ্জীবনই নয়, আমাদের মানুষেরা রাজনৈতিক ভোটাকিার পেয়ে তাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারবে।"[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

তবে নেতৃবৃন্দের বৃটিশ শাসনের প্রতি এই বিশ্বাস আর মোহভঙ্গ হতে খুব বেশী সময় লাগেনি। ১৮৯৮ সালে দাদাভাই নৌরোজী বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, মহারাণীর ঘোষণাগুলিকে তাঁর মন্ত্রীবর্গ ভারতীয় জনগণের কল্যাণে রূপায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।[৪১] জাতীয় আন্দোলনের দুই দশকের নেতাদের ধারণা ছিল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে প্রশাসনিক সংস্কার আদায় করা যাবে জনমত বিরোধী আইনগুলি সহজে বাতিল করা সম্ভব হবে। যেমনটি হয়েছিল বৃটেনে।

কংগ্রেসের অন্যতম দাবী ছিল প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির সংস্কার, যথাসম্ভব সেগুলিকে নির্বাচনের মাধ্যমে পুনর্গঠন করা। ১৮৯২-এর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্টে কংগ্রেসের দাবীসমূহের প্রতিফলন ঘটেনি। এই আইন সংসদীয় গণতন্ত্র দূরের কথা নামমাত্র নির্বাচন নীতি স্বীকার করেনি। শাসকবর্গ অপছন্দ করেছে কংগ্রেস পরিচালিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে, শংকিত হয়েছে এর সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আদর্শের দ্রুতি বিস্তারের এবং সংহত শক্তি দর্শনে। হিউম ডাফরিনের স্বপ্ন অনুসারে কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হয়নি। প্রথম থেকেই ভারতীয় জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়। কংগ্রেস কর্তৃক প্রশাসনিক সংস্কার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অধিকার দাবী এবং ভারতীয় শিল্পের স্বার্থবিরোধী শুল্কনীতি প্রভৃতির সমালোচনা বৃটিশ শাসকদের মনোপূত হয়নি। কংগ্রেসের এই ধরনের সমালোচনা স্তব্ধ করার লক্ষ্যে ১৮৯৭ সালে ফৌজদারী আইনের সংশোধন এবং ১৮৯৮ সালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য গোপন কমিটি স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। শাসক শ্রেণী কংগ্রেস আন্দোলনকে হেয় করার লক্ষ্যে এর শক্তিকে খাটো করে দেখার প্রবণতার বশবর্তী হয়ে আন্দোলনকে শহুরে শিক্ষিতের 'Microscopic minority'-র আন্দোলন বলে অভিহিত করতে দ্বিধা করেননি। লর্ড কার্জন ১৯০০ সালে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'কংগ্রেস দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে এবং তাঁর মহান আকাংখা হল কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ মৃত্যু ঘটানোর সহায়তা করা।'[৪২] কার্জনের এই মনোভাব প্রকাশ প্রমাণ করে যে কংগ্রেসের মাধ্যমে তাঁদের উদ্দেশ্য হাসিল হয় নাই। সুতরাং যে সংগঠনের অস্তিত্ব এক সময় তাদের কাছে অপরিহার্য ছিল আজ তার ধ্বংস একান্ত কাম্য। কেননা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়েই কংগ্রেস ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রবল গতিবেগ সঞ্চারে সক্ষম হয়েছিল। যে গতিবেগ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে ভেঙ্গেচুড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে এমন শক্তি অর্জনের লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে তৎকালীন সরকারের ধাপে ধাপে পরিবর্তিত নীতিসমূহ সম্পর্কে আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, বদরুদ্দিন উমরের বক্তব্যের আলোকে আলোচনা করতে যেয়ে লিখেছেন যে এর উদ্দেশ্য ছিল: "প্রথমত, নিজেদের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় এমন একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা যার মাধ্যমে তৎকালীন অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যায়। দ্বিতীয়ত, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও শ্রেণী স্বার্থের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল সেই দ্বন্দ্বগুলিকে এমনভবে ব্যবহার করা যাতে ভারতীয় জনগণের পক্ষে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কোনো ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সংগঠিত হওয়া সম্ভব না হয়...। ভারতীয় মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে যে সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রাম সংগঠিত করেছিল তা সর্বভারতীয় চরিত্র অর্জন করেছিল। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংগঠিত না হলেও সর্বভারতীয় একটি রাজনৈতিক দল গঠনকে দু এক বছরের বেশী ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হতো না ফলে কংগ্রেস দ্রুতই যখন ভারতীয় মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়াদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল, পরিণত হল তাদের দাবী দাওয়া আদায়ের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে, তখন বৃটিশ শাসকদের প্রথম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি আংশিকভাবে ব্যর্থ হল। ফলে তারা তাদের দ্বিতীয় লক্ষ্যকেই ভারতের ওপর তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখার প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করল। কংগ্রেসকে বৃটিশ রাজ্যের শাসন শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারে লক্ষ্যটি আংশিকভাবে ব্যর্থ হবার পর ক্রমেই তারা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্বের নীতি গ্রহণ করল।"[৪৩]

সুতরাং কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত অসাম্প্রদায়িক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার অপ্রতিরুদ্ধ গতি প্রতিহত করার জন্যই ইংরেজ ঔপনিবেশিক সরকারকে বিভেদনীতির নয়া কৌশল অবলম্বন করতে হলো যে কৌশলের নাম সাম্প্রদায়িকতা যে কৌশল বাস্তবায়নের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমি আগেই তৈরী করা ছিল।

সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের বিকাশ

সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের উৎস, বৃটিশ বিভেদনীতির পরোক্ষ সূত্রপাত ঘটেছিল কোম্পানীর শাসনকালেই। তবে সচেতনভাবে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে এর কৌশলগত এবং প্রত্যক্ষ প্রয়োগের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে। তখন থেকে ইংরেজরা হিন্দু মুসলিম পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগাতে

Dhaka University Institutional Repository

শুরু করে। যে মুহূর্তে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পাশাপাশি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বতন্ত্র একটি সামাজিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে ঠিক সেই মুহূর্তে হিন্দু মুসলিম প্রশ্নটিতে গুরুত্ব আরোপ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সাম্প্রদায়িকভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চেষ্টা শুরু হয়। যদিও এই বিচ্ছিন্নতাবোধ সমাজে আগে থেকে বিরাজমান ছিল। কেননা আমরা আগে দেখেছি ওয়াহাবী বিদ্রোহ ফরায়েজী আন্দোলন এবং মহা বিদ্রোহের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলিম সমাজ অনেক বেশী রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিল। এই রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে একমাত্র উত্তর ভারতের দেওবন্দকে কেন্দ্র করে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও মুসলমান সমাজের ভিতর তেমন কোনো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি। বিচ্ছিন্নভাবে যাঁরা শিক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে কোনো শ্রেণীগত চরিত্রের প্রকাশ ঘটেনি।[৪৪]

এখানে উল্লেখ্য যে, সে সময় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বলতে মূলতঃ হিন্দু সম্প্রদায় থেকে আগত ব্যক্তিবর্গকেই বুঝাত। হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও অন্যান্যরা যখন জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সারা উপমহাদেশব্যাপী একটি রাজনৈতিক সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত হতে শুরু করেছে, তখনই মুসলিম সমাজের কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে ইংরেজ সরকারের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে উদ্যত হন। এদের মধ্যে উত্তর প্রদেশের সৈয়দ আহমদ খান, বাংলার নবাব আবদুল লতিফ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে এঁদের সঙ্গে যুক্ত হন সৈয়দ আমীর আলী। এই সমস্ত নেতারা যেমন শতাব্দীব্যাপী পরিচালিত ওয়াহাবী আন্দোলনের তীব্র বিরোধীতা করেন তেমন প্রয়োজনে ইংরেজ প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনেও দ্বিধা করেননি।

শতবর্ষব্যাপী ইংরেজ শাসন চলার পর রাজ্যচ্যুত মুসলমান সম্প্রদায় তাদের সমস্ত ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় করে এঁদের নেতৃত্বে ইংরেজ শাসকের সহযোগিতা শুরু করে। বিদেশী শাসনের বাস্তবতাকে স্বীকার করে এ নেতৃত্ব মুসলমান সমাজকে শিক্ষা এবং আধুনিক জগতের পথে টেনে নিয়ে আসার প্রয়াসে ব্রতী হয়। মুসলমানদের মধ্যে ওয়াহাবী আন্দোলনের যে সংস্কার তীব্রভাবে জড়িয়ে ছিল তা থেকে মুক্ত করার জন্য ১৮৭০ সালে কোলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' এক বিশেষ সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, "ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' নহে এবং এখানে শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ধর্মীয় নির্দেশের পরিপন্থী।"[৪৫] নবাব আবদুল লতিফ কর্তৃক ১৮৬৩ সালে 'মোহামেডান লিটারীর সোসাইটি' নামে উক্ত সংগঠন সৃষ্টি হয়েছিল মূলতঃ ইংরেজ শাসকবর্গের সঙ্গে বাঙালী মুসলমান সমাজের হৃদ্যতা স্থাপনের লক্ষ্যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যকার ইংরেজ বিদ্বেষ দূর করার জন্য।[৪৬]

মুসলিম নেতৃবৃন্দের দ্বারা যে আন্দোলনের সূত্রপাত তার লক্ষ্য ছিল শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে সময় ও পরিস্থিতি উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। যাতে করে মুসলমান সম্প্রদায় চাকুরী জীবিকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সমপর্যায়ে উপনীত হতে পারে। এই নেতৃত্ব উনিশ শতকে ষাট ও সত্তরের দশকে বিভিন্ন সময়ে মুসলিম উচ্চবিত্ত এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলে। এ সব সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ সরকারের সহযোগিতা এবং তৎপরিবর্তে মুসলমান সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা আদায় করা। এ সংগঠনগুলোর কোনো কোনোটি আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে আবার কোনো কোনোটি সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে সুবিধা আদায়ের পক্ষপাতী ছিল। সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বাধীন 'ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের স্বার্থ আদায়ের পক্ষপাতী ছিল। এভাবে সুবিধা আদায়ের জন্য প্রয়োজন ছিল সর্বভারতীয় মুসলিম সমাজের ঐক্য এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার। এই উদ্দেশ্যে সংগঠনটির নামের সাথে 'সেন্ট্রাল' শব্দটি যুক্ত করে একে সর্বভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়। সৈয়দ আমীর আলী অবশ্য শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নয় ভারতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্যে ভারতের উন্নতি নিহিত একথা বিশ্বাস করতেন।[৪৭] তবে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের অনেকেই তা বিশ্বাস করতেন না। বিশেষ করে নবাব আদুল লতিফের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল এবং সাম্প্রদায়িক। তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে বৃটিশ সরকার যখন তাদের বিভেদনীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট তখন কোন নেতাই সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে থাকতে পারেননি। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যাইহোক না কেন সৈয়দ আমীর আলী এবং নবাব আবদুল লতিফ বিকাশমান মুসলিম সমাজের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন।[৪৮]

অপরদিকে ভারতের বৃটিশ সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যকার শ্রেণীগত জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ভীত হয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের এই সব হাতে গোনা ব্যক্তিদের হাত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সরকার মুসলিম সমাজের দুরবস্থায় তাদের সহায়ক বন্ধুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নানান কৌশল অবলম্বন করেন। মুসলমানদের আস্থা অর্জনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে ভারতীয় মুসলিম সমাজের দুরবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারণা শুরু করেন। মুসলিম সম্প্রদায় যে হিন্দু সম্প্রদায় থেকে সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে তার চিত্র তুলে ধরা হতে থাকে ইংরেজদের কর্তৃত্বাধীন কাগজসমূহে। তাছাড়া এই প্রচারণায় যে সকল বিশিষ্ট ইংরেজ বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন তাদের মধ্যে উইলিয়াম উইলসন হান্টার, থিওডোর বেকসহ আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষগণ ছিলেন অন্যতম।

মুসলমানদের দুর্দশা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এবং পর্যালোচনা করে হান্টার তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থটি রচনা করেন। মুসলমানদের অবস্থা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেই তিনি ক্ষ্যান্ত হননি, কিভাবে মুসলিম সমাজ এই দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে পারে সে বিষয়ে সরকারের সমীপে কিছু প্রস্তাবও পেশ করেন। তার এই কর্মকান্ডের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে এই ধারণা জন্মাতে সক্ষম হন যে, ইংরেজ সরকারের আনুকূল্যও সাহায্য সহযোগিতার উপরই মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি ও ভাগ্য নির্ভর করছে।[৪৯] এ ধারণার বলে মুসলমান সমাজকে বিশেষ করে তৎকালীন শিক্ষিত মুসলমানদের ভিন্ন পথে পরিচালিত করা যাবে তাতে সরকারের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাস যে অবান্তর নয় শিক্ষিত মুসলমান সমাজের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কেননা থিওডোর বেক আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সৈয়দ আহমদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর প্রভাব বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিমদের সর্বপ্রধান প্রতিনিধি সৈয়দ আহমদ খানকে স্বল্প সময়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদীতে পরিণত করতে সমর্থন হন। থিওডোর বেককে ইংরেজ সরকারই যে এই কাজে নিয়োগ করেছিলেন ঐ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।[৫০] ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ বিকাশের পিছনে এ ইংরেজ ভদ্রলোকের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। থিওডোর বেক কর্তৃক সঠিক ব্যক্তির উপর হিন্দু মুসলিম দুই জাতি তত্ত্বের প্রচার ও প্রয়োগের দায়িত্ব অর্পণ পরবর্তীতে উক্ত তত্ত্বের সাফল্য নিশ্চিত করেছিল। ঐ সময়ে উক্ত কাজের জন্য সৈয়দ আহমদই ছিলেন সঠিক ব্যক্তি। কেননা এক সময়ে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের বাস্তব অবস্থা প্রত্যক্ষকারী, তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব, ক্রমাগত মুসলমান সমাজের স্বার্থের স্বপক্ষে বস্তুনিষ্ঠ প্রচার এবং মুসলিম সমাজের জন্য অধিকার ও সুযোগ সুবিধা আদায়ের নিরলস প্রচেষ্টা তাকে শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় নেতায় পরিণত করেনি, সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্প্রদায়িক নেতাতেও পরিণত করেছিল। তাঁর এই প্রচেষ্টায় তিনি বাংলার নবাব আবদুল লতিফ এবং সৈয়দ আমীর আলীর পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন। এদের নেতত্বে ভারতবর্ষব্যাপী স্বল্প সময়ের মধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচার এবং প্রভাব বিস্তার লাভ করে। মুসলিম নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক অঙ্গনে এ ধরনের ভূমিকা ইংরেজ শাসকবর্গের বিভেদনীতি বাস্তবায়নের পথ উন্মুক্ত করে। একদিকে মুসলিম নেতাদের ইংরেজ সরকারের প্রতি সহযোগিতার নীতি অপরদিকে সরকারের মুসলিম সমাজের প্রতি পক্ষপাতিত্বের নীতি। এই দুই এর সমন্বয়ের ফলে তখন থেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ভিন্নধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এ অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করে—যে ভাবনা শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের ধারণাকে শক্তিশালী করে তোলে।

সৈয়দ আহমদ খান প্রথমদিকে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা বা মুসলিমদের রাজনীতির সাথে যুক্ত হওয়ার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল পশ্চাৎপদ মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বীয় স্বার্থে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত নয়। মুসলমান সমাজের রাজনীতির চেয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাই বেশী প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। তাই স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৮৬৪ সালে 'ট্রানশ্লেসন সোসাইটি' (Translation Society) প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তী সময়ে 'সায়েন্টিফিক সোসাইটি অব আলিগড়' (Scientific Society of Aligarh) নামে পরিচিতি লাভ করে। এরপর ১৮৭৭ সালে আলিগড়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ'। যে কলেজটি কালক্রমে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার এবং রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।[৫১] এই প্রতিষ্ঠানটির প্রভাবকে কেন্দ্র করে বিকশিত হতে থাকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা।

১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি রাজনীতি থেকে বিমুক্ত থাকার নীতি পরিহার করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি 'মোহামেডান এডুকেশনাল কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯০ সালে যার নাম পরিবর্তন করে 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' রাখা হয়। ১৮৮৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধীতা করার উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেন 'ইউনাইটেড পেট্রিয়টিক এ্যাসোসিয়েশন' (United Patriotic Association) ১৮৯৩ সালে তিনি স্থাপন করেন 'মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাসোসিয়েশন' (Mohommedan Angloriental Defence Association) এ সংস্থার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করা।

সৈয়দ আহমদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পেছনে দুধরনের চিন্তা কাজ করছে। একটি হচ্ছে মুসলমান সমাজের মধ্যে বৃটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে তাদের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির পথ তৈরী করা। অপরটি হচ্ছে হিন্দু প্রভাবিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব এবং রাজনীতি থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে মুক্ত রাখা। তাঁর এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং হিন্দু মুসলমান দুই পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতি ও তাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী এই দ্বিজাতিতত্ত্বের (Two nation Theory) বীজ বপন করেন।[৫২]

১৮৮৮ সালে সৈয়দ আহমদ দৃঢ়ভাবে এবং স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, জাতীয় কংগ্রেস ভারতের সকল সম্প্রদায়ের আশা আকাংখার প্রতীক হতে পারে না। এর আগে ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বিখ্যাত লক্ষ্মৌ ভাষণেও তাঁর কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চিন্তার বর্হিপ্রকাশ ঘটে। উক্ত ভাষণে তিনি তিনটি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যথা:

১। ভারতে দুইটি ভিন্ন জাতি বসবাস করে।

২। স্বায়ত্তশাসনের বিকাশ হলে তা মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে, কারণ এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য পাবে।

৩। নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মুসলমানদের বৃটিশ শাসনের প্রতি নির্ভরশীল হতে হবে।[৫৩]

সৈয়দ আহমদের কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকা মুসলমান সমাজকে জাতীয় কংগ্রেস থেকে ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর প্রভাবের কারণেই ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ৭২ জন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন মুসলমান। ১৮৮৬ সাল থেকে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ১৮৯৩ সাল থেকে এ সংখ্যা বেশ কমতে থাকে।[৫৪]

যদিও সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে মুসলিস সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী কিছু ব্যক্তি কংগ্রেস গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগগুলিতে অংশ নিয়েছিলেন এবং অনেকেই উক্ত সংগঠনে যোগদানও করেছিলেন; কেননা আদি পর্বে কংগ্রেস ভারতীয় মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর অগ্রসর অংশের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ছিল। উক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায় নির্বিশেষে কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষভাবে সবার প্রতিনিধিত্ব করেছে।[৫৫]

কংগ্রেস সৃষ্টির কিছুকাল পূর্বেও স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সৈয়দ আহমদ খান দুটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায় যে বক্তব্য রাখেন, তাতে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ১৮৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে গুরুদাসপুরে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন: "Remember that the words Hindu and Mahomedan are only meant for religions distinction otherwise all persons, whether Hindu or Mahomedan or even christians who reside in this country, are all in this particular respect belonging to one and the same nation."[৫৬]

শুধু উপরোক্ত বক্তব্যে নয় ঐ সময়কার অন্যান্য বক্তব্যেও তার জাতি চিন্তার ধর্ম নিরপেক্ষ রূপ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন উক্ত বছর ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোর প্রদত্ত অপর এক বক্তৃতায় তিনি বলেন: "With me it is not so much worth considering that their religions faiths differ, but that we inhabit the same land and are subject to the rule of the same government. There are the grounds upon which I call both the races which inhabit India by the word Hindu by which I mean that thy are the inhabitans of Hindustan."[৫৭]

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যার মনে সর্বভারতীয় জাতি চিন্তা কাজ করেছে, যিনি হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের হিন্দু মুসলিম পৃথকভাবে দেখতেন না, দুই সম্প্রদায়কে যিনি দুটি চোখের মতো বিবেচনা করেছেন, তিনিই পরবর্তীতে তাঁর এই জাতি চিন্তার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন। বলিষ্ঠভাবে প্রচার করেছেন হিন্দু মুসলিম দুই জাতি। তাঁর এই প্রচার এবং কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে পি, এন, চোপরা লিখেছেন: "There is however, no denying that fact that sir syed Ahmed came out openly against the Indian National Congress and he was the fist person who said that the Hindus and the Muslims were two nations."[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ সৈয়দ আহমদই প্রথম প্রকাশ্যে এই দ্বিজাতিতত্ত্বের ঘোষণা দেন। তৎকালীন পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এই ঘোষণার স্বপক্ষে যুক্তি দিতে যেয়ে তিনি বলেছেন : "Is it possible that under these circumstances two Nations—the Mohammedan and the Hindus—Could sit on the same throne and remain equally in power? Most certainly not. It is necessary thet one of them should conquer the other and thrust it down. To hope that both could remain equal is to desire the impossible and inconceivable."[৫৯]

তার পরিবর্তিত মনোভাবের মূল কারণ নিহিত ছিল মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা এবং অবস্থানের মধ্যে। এই পরিস্থিতির শিকার হয়ে সৈয়দ আহমদ খানের মতো নেতাকেও বৃটিশ বিভেদ নীতির ফাঁদে পা দিতে হয়েছিল। বৃটিশ সরকার মুসলমানদের দুর্দশাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে মুসলিম জাতিকে ঠেলে দিয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের পথে। দ্বিজাতিতত্ত্বের চিন্তা তৎকালীন পরিস্থিতিতে বাস্তবসম্মত হলেও সৈয়দ আহমদের এই পরিবর্তিত জাতি চিন্তা মুসলমানদের উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের পথে পরিচালিত করেছিল।

শুধু তিনি নন একই চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ। যখন মুসলমান নেতৃত্ব স্বীয় সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠেছেন, তখনই মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকারের পক্ষপাতিত্ব এবং বিভেদ নীতি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে কাজ করেছিল সন্দেহ নাই। সব স্রোতই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের মোহনায় একত্রিত হয়ে একে করে তুলেছিল শক্তিশালী। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সর্বজনমান্য নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের কংগ্রেসের রাজনীতি এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তার সঙ্গে হিন্দু ধর্মকে যুক্ত করার প্রবল প্রয়াস ও এর পক্ষে প্রচার। কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনা এবং কার্যক্রম ক্রমাগত মুসলিম স্বার্থ বিরোধী হয়ে উঠে। ফলে এ পরিস্থিতিতে খুব কম সংখ্যক মুসলমানের পক্ষে কংগ্রেসে টিকে থাকা সম্ভব ছিল। হিন্দু মুসলিম এক জাতি এই বিশ্বাস ধরে রাখাও ছিল অসম্ভব এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আত্মঘাতী হওয়ার সামিল। এ কারণে সৈয়দ আহমদ মুসলিমদের কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে যুক্ত না হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।[৬০] একদিকে সৈয়দ আহমদের দ্বিজাতিতত্ত্ব। অপরদিকে গঙ্গাধর তিলকের উগ্রধর্মীয় চেতনার রাজনীতি, ভারতীয় জাতীয় চেতনাকে যেভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তাতে সর্বভারতীয় অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ বিকাশের যে সহজ পথ উন্মুক্ত হয়েছিল তা রুদ্ধ হয়ে যায় এবং ভারতবর্ষব্যাপী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আত্মঘাতী অবক্ষয় শুরু হয়।[৬১] জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মকে সম্পৃক্ত করার ফলে রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদ সম্প্রদায়গতভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। নবজাগরণের যুগের উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের মত কংগ্রেসের যুগেও তাঁদের জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা ধর্মীয় গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যেতে থাকে।

সৈয়দ আহমদ এবং গঙ্গাধর তিলক যে রাজনীতি এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তার উদ্ভব ঘটান পরবর্তী প্রজন্মে তা ভারতবর্ষব্যাপী সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করতে থাকে। সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পরও বৃটিশ সরকার মুসলমান সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা বজায় রাখে। শুধু তাই নয় সরকার মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহকে সংহত ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে একনিষ্ঠ সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকে। সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতি রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলাকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে উঠেছিল তার মূলে কুঠার হেনে একে বিভক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং জাতীয়তাবাদকে স্থায়ীরূপ দেয়ার জন্য ভারতবর্ষব্যাপী মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠনেরও পরিকল্পনা করা হয়।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল বৃটিশ ভারতের রাজধানী কোলকাতা। তৎকালীন ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিকাংশ ছিলেন বাঙালী এবং এরা কোলকাতাতেই থাকতেন। সুতরাং সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রতিহত করতে হলে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী এবং অংশগ্রহণকারী বাঙালী মধ্যবিত্তের শক্তি খর্ব করার প্রয়োজন ছিল। এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু হিসেবে স্থির করা হয় মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক অবস্থাকে। কংগ্রেসকে বলা হতো সফল আইনজীবীদের সংগঠন। যে কারণে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রসার ও রাজনীতিতে অগ্রণী এবং সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী আইনজীবীদের আয়ের উৎস বন্ধের ব্যবস্থা করা হয় বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে। কেননা কোলকাতার আইনজীবীদের মক্কেল ছিল প্রধানতঃ পূর্ব বাংলার অধিবাসী। সুতরাং বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে এদের পূর্ববঙ্গীয় মক্কেলরা হাতছাড়া হয়ে যাবে। ফলে শুরু হবে পেশাগত বিপর্যয়।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত স্তর বিন্যাস (১৮৮৫-৮৮)

সাল	১৮৮৫	১৮৮৬	১৮৮৭	১৮৮৮
মোট প্রতিনিধির সংখ্যা	৭২	৪৩৪	৬০৭	১২৪৮
আইনজীবী	৩৯	১৬৬	২০৬	৪৫৫
চিকিৎসক	১	১৬	৮	৪২
সাংবাদিক	১৪	৪০	৪৩	৭৩

সূত্র: ডঃ অনিল শীল: *The Emergence of Indian Nationalism* পৃষ্ঠা ২৫৮

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে কোলকাতার আশেপাশের কয়েকটি জেলা বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে বাংলা প্রদেশ গঠন করা হয়। কোলকাতার কাছের জেলা জলপাইগুড়ি ও মালদহকে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের সাথে যুক্ত করা হলেও দূরের দার্জিলিংকে বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে অবাঙালী জনগোষ্ঠীকে এ প্রদেশের সাথে যুক্ত করা হয়। এভাবে বৃহত্তর বাংলা প্রেসিডেন্সিকে এমনভাবে ভাগ করা হয় যাতে একদিকে বাংলা নাম নিয়েও বাঙালীরা প্রদেশটির সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। অপরদিকে বাংলার জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে চলে যায়। ঢাকা রাজশাহী চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসামের সঙ্গে সংযুক্ত বাংলার মুসলিম প্রধান তিনটি জেলা—সিলেট, গোয়ালপাড়া ও কাছাড়সহ সমগ্র আসামকে নিয়ে গঠন করা হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ।

এভাবে বাংলা বিভাগ কোলকাতা কেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের জন্য ছিল এক অশনি সংকেত। বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে মক্কেল হিসেবে না পাওয়ার ফলে কোলকাতার আইনজীবীদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। শুধু আইন ব্যবসা নয় অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, সংবাদপত্র, সর্বক্ষেত্রে এক সংকটের সূত্রপাত হয়। মোট কথা কোলকাতাকে কেন্দ্র করে যে মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল, যে সমাজ ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্ম দিয়েছিল যে নেতৃত্বের ফলে শক্তিশালী অপ্রতিরোধ্য সরকার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বেধে উঠছিল তাকে ধ্বংস করার জন্যই কোলকাতা কেন্দ্রিক পেশাজীবী শ্রেণীর বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র।

এই ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পেরেই বঙ্গভঙ্গের প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা এর বিরোধীতা করেন। তারা স্পষ্টতই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কোলকাতাকে কেন্দ্র করে যে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে তাকে সুকৌশলে প্রতিহত করার জন্য পূর্ব বাংলাকে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাবার প্রচেষ্টা চলছে। কোলকাতার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ছিল মূলতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত অপরপক্ষে পূর্ববঙ্গীয়দের অধিকাংশ ছিল মুসলমান। ইংরেজ শাসকবর্গের ধারণা ছিল যদি হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি নষ্ট করে দেয়া যায় তাহলে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষকে পদানত করে রাখা সহজ সাধ্য হবে। ইংরেজ সরকার যে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভীত এবং ইংরেজ সরকারের অস্তিত্ব বাঙালীদের দ্বারা বিপন্ন হতে পারে এ ভয় তৎকালীন শাসকবর্গের মনে শংকা হয়ে বিরাজ করছিল। লর্ড কার্জনের ১৯০৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারীতে প্রদত্ত এক বক্তব্যে তা প্রকাশ পায়: "বাঙালীরা যারা নিজেদেরকে একটি জাতি হিসেবে চিন্তা করতে ভালবাসে এবং যারা এমন এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে যেখানে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করে একজন বাঙালী বাবু কোলকাতার গভর্নমেন্ট হাউজে অধিষ্ঠিত হবে, তারা অবশ্যই সেই ধরনের যে কোন ভাঙ্গনের বিরুদ্ধে তিক্ত মনোভাব পোষণ করে যা, তাদের চিৎকারের কাছে নতিস্বীকার করার মত দুর্বল হয়ে পড়লে আমরা আর কখনো বাংলাকে বিভক্ত অথবা ছোট করতে সক্ষম হব না এবং তার দ্বারা আপনারা ভারতের পূর্বদিকে এমন একটি শক্তিকে জমাটবদ্ধ ও কঠিন করবেন, যে শক্তি ইতিমধ্যে অপ্রতিরোধ্য হয়েছে এবং যা ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলার নিশ্চিত উৎস হিসেবে বিরাজ করবে।"[৬২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক সুবিধার প্রশ্নের চেয়ে রাজনৈতিক প্রশ্ন তাদের কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই হিন্দু মুসলিম নেতৃবৃন্দ কার্জনের এই রাজনৈতিক কৌশলের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদী হয়ে উঠেন।

নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁদের মতে এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে, যা ভবিষ্যতের ভারতবর্ষের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, প্যারী মোহন মুখার্জী, অম্বিকাচরণ মজুমদার ও ভুপেন্দ্রনাথ বসু এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন। তাছাড়া তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকাগুলোও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রচারণায় অংশ নেয়। এসব পত্রিকার মধ্যে দি বেঙ্গলী, অমৃত বাজার পত্রিকা, হিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

পেট্রিয়ট, দি নিউ ইন্ডিয়া প্রভৃতি ইংরেজী পত্রিকা ছাড়াও ঢাকা থেকে প্রকাশিত ঢাকা প্রকাশ নামক পত্রিকাটি প্রচারণায় বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে।[৬৩]

এই বিরোধী প্রচারণার এবং বঙ্গবিভাগের বিরোধীতার পেছনে শুধু যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের ভয় কাজ করেনি তার সাথে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রশ্নটি জড়িত ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নটি ছিল বড়। তখনও তাদের মধ্যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলো গুরুত্ব লাভ করেনি। এ কারণেই বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের এক শক্তিশালী অংশ হিন্দু নেতৃবৃন্দের পাশে দাঁড়িয়ে দৃঢ়ভাবে বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা করেছেন। প্রাণপাত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন হিন্দু মুসলিম ঐক্য টিকিয়ে রাখার। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের এই ভূমিকা সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায় সুমিত সরকারের লেখায়: "ঐক্যের অনেক হৃদয় মথিত দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, বিশেষ করে প্রথম দিনগুলিতে এবং সেই আন্দোলন বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান স্বদেশী নেতাকে সামনে নিয়ে এসেছিলো, যাঁরা ছিলেন তাঁদের হিন্দু পক্ষের নেতাদের মতোই সমান দেশপ্রেমিক ও সদিচ্ছা প্রণোদিত, যাঁদেরকে এখন যেভাবে স্মরণ করা হয় তার থেকে অনেক বেশী তাঁরা স্মরণযোগ্য।"[৬৪]

বাংলার তৎকালীন মুসলিম নেতা ইসমাইল হোসেন সিরাজী হিন্দু মুসলিম বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রের বিরোধীতা করে বলেন: "ভারতের হিন্দু মুসলমান এক বৃন্তে দুটি ফুল বা একই দেহের অঙ্গান্তর মাত্র।...ভারতের জীবনীশক্তি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখ সম্পদ এই জাতির একপ্রাণতার উপর নির্ভর করে।"[৬৫]

ব্যারিষ্টার আব্দুর রসুল বলেন: "লর্ড কার্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ আমলা-শাসনের ভিত্তি মজবুত করা এবং তা করতে হলে বাঙালী জাতিকে দমন করতে হবে। যেরূপ ভীতিজনকভাবে তাদের রাজনৈতিক শক্তির ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে তাকে ধ্বংস করতে হবে এবং হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন যেভাবে দৃঢ়তর হচ্ছে তাকে অঙ্কুরেই নস্যাৎ করে দিতে হবে। আসল কথা, লর্ড কার্জন চান একাধিক আইনসভার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার আইন প্রবর্তন করে বাঙালী জাতি সংহতি ও সমরূপতার উপর মরণ ছোবল হানতে।"[৬৬]

বাঙালী মুসলামন নেতাদের মধ্যে আরো অনেকে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আব্দুল হালিম গজনভী, নওয়াব সামসুল হুদা, নওয়াব আব্দুল সোহবান চৌধুরী, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, নওয়াব সিরাজুল ইসলাম, নওয়াব আলী চৌধুরী, মীর মোহাম্মদ প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। এঁদের মধ্যে অনেক স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন।[৬৭]

হিন্দু মুসলিম নেতৃবৃন্দের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ভূমিকায় বৃটিশ বিভেদ নীতির ব্যর্থতার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অবস্থায় কার্জন পূর্ববঙ্গ সফর করেন। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কার্জনের পূর্ববঙ্গ সফর ব্যর্থ হয়নি। এই সফর মুসলমান নেতাদের বঙ্গভঙ্গের প্রতি মনোভাব পাল্টে দেয়। বেশীর ভাগ নেতাই বঙ্গভঙ্গের পক্ষে চলে যান। ঢাকার নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে। তিনি হয়ে উঠেন আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তি। এ আন্দোলনে তিনি পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমর্থন পেয়েছিলেন। ঢাকার নবাব পরিবারের মতো প্রতিক্রিয়াশীল পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আন্দোলনে সর্বসাধারণের সমর্থন পাওয়ার পেছনে মূল কারণ ছিল বাংলার জনগণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী চেয়েছিল কোলকাতার পশ্চাদভূমি হিসেবে শোষিত পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তি। অপরদিকে সলিমুল্লার এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার কারণ ছিল এতে করে ঢাকার নবাবদের প্রতিপত্তি সমৃদ্ধি এবং জনগণের উপর তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এবং বঙ্গভঙ্গ তাঁর কাছে মুসলমানদের হারানো রাজ্য ফিরে পাওয়ার সামিল ছিল।[৬৮] এ কারণেই বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নে পূর্ব বাংলার ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষ এবং নবাব পরিবারের অবস্থান ছিল অভিন্ন।[৬৯]

স্বার্থ ভিন্ন হলেও বাঙালী জনগণ যেমন অবাঙালী নবাবের পিছনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, নবাবও তেমন বাংলা বিভাগের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল হঠাৎ করেই পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গণবিচ্ছিন্ন নবাব বৃটিশ বিভেদনীতির বিশেষ সহযোগী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এই আত্মপ্রকাশের ফলে তাঁর নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্থায়ীভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

শুধু নবাব সলিমুল্লাহ না অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দও ক্রমশ রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে যেতে থাকেন। সৈয়দ আহমদ খান মুসলিমদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইলেও বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আলীগড় কলেজের সেক্রেটারী নবাব মহসিন-

Dhaka University Institutional Repository

উল-মূলক ১৯০১ সালে মোহামেডান রাজনৈতিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করন। এছাড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান রাজনৈতিক উদাসীন্য দূর করার জন্য বিখার-উল-মূলক এবং আরও কয়েকজন নেতা মিলে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠনে উদ্যোগী হন। যার মূলনীতি হচ্ছে যথা: এক, সরকারের নিকট মুসলমান জনগণের মনোভাব উপস্থাপন; দুই, বৃটিশ শাসন অব্যাহত রাখার জন্য প্রচার কার্য পরিচালনা; তিন, কংগ্রেসী আন্দোলন থেকে মুসলমান জনগণকে বিচ্ছিন্ন রাখা।[৭০]

এই রাজনৈতিক প্রবণতার মধ্যেও সৈয়দ আমদের সম্প্রদায়গত জাতীয় চিন্তা কাজ করেছে। তাছাড়া বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় রাজনৈতিক সংস্থা গঠনেও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নবাব সলিমুল্লা ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে মোহামেডান প্রাদেশিক ইউনিয়ন গঠন করেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা বিভাগের সমর্থনে মুসলমান জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করতে তৎপর হয়ে উঠেন। মোহামেডান সাহিত্য সভাও বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন প্রদান করে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তার বাইরেও অর্থাৎ ভারতবর্ষব্যাপী মুসলমানদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ তৎপর হয়ে ওঠেন। এ তৎপরতার অংশ হিসেবে মুসলিম নেতৃবৃন্দ বড়লাট লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সচেষ্ট হন। এ ব্যাপারে আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ অর্কিবল্ড ও সেক্রেটারী মহসিন-উল-মূলক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভারতীয় রাজনীতি এক জটিল মুহূর্তে ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে আগা খাঁর নেতৃত্বে ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট এক মুসলিম প্রতিনিধি দল বড় লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সিমলায় অনুষ্ঠিত এই সাক্ষাতে নেতৃবৃন্দ লর্ড মিন্টোর কাছ থেকে মুসলিস সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতে সক্ষম হন।[৭১] বিচক্ষণ মিন্টো তখনই মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাত প্রদানে সম্মত হন, যখন তিনি নিশ্চিত হন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ধারা বৃটিশ শাসনের স্থায়ীত্বের পক্ষে অনুকূল। সিমলা সাক্ষাৎকার সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে লেডী মিন্টো বলেছেন "ভাইসরয়ের সঙ্গে মুসলমান প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎকার ভারতীয় ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করছে" ভারতের পরবর্তী ইতিহাসে তার এই উক্তি যথার্থতা প্রমাণ করে। সিমলায় মুসলিম প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎকার নিঃসন্দেহে উপমহাদেশের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বড়লাট এই সম্মেলনে মুসলমানদের দেয়া প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলধারা থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করে জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করতে সমর্থ হলেন এবং ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ছড়াতে সহায়তা করলেন। তাছাড়া মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের আশ্বাস ও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচনের নীতি গ্রহণ করার ফলে মুসলমান সম্প্রদায়কে ভারতের একটি স্বতন্ত্র জাতিহিসেবে মর্যাদা দেয়া হলো। এভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি ভারতের কোটি কোটি মুসলমানকে বৃটিশ শাসনের সমর্থকে পরিণত করা হয়।

এই সাক্ষাৎকারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে হিন্দু মুসলিম নেতৃবৃন্দ এমনকি বৃটিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও ভারতীয় রাজনীতিতে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব এবং তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন নিয়ে এতোটা মগ্ন ছিলেন যে এ বিষয়ে তাদের কোন নজরই ছিল না। অপরদিকে নরমপন্থীরা বরং মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবী দাওয়ার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। এমনকি ১৯০৬ সালে ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনেও এই সাক্ষাৎকারের কোন উল্লেখ ছিল না।

সিমলা সম্মেলনের প্রতিশ্রুতির পরেও মুসলিম নেতৃবৃন্দ স্বীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে শংকিত ছিলেন। যে কারণে অতি শীঘ্রই মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি রাজনৈতিক মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। এই প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেই নবাব সলিমুল্লাহর আহ্বানে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। নবগঠিত রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ চারটি মূল লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করে যথা:

১। বৃটিশ সরকারের প্রতি ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের আনুগত্য সুনিশ্চিত করা এবং সরকারী বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে মুসলিমদের মনে কোনরূপ সন্দেহ সৃষ্টি না হতে দেওয়া।

২। মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা করা।

৩। জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব করা।

৪। উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি কোনমতেই ক্ষুণ্ন না করে ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখা। মুসলিম লীগ ঘোষণা করে, ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক মিত্রতা সম্ভব, কিন্তু রাজনৈতিক মিত্রতা স্থাপন সম্ভব নয়।[৭২]

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা শুধু ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ইতিহাসে নয় সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এক যুগান্তকারী ঘটনা। লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুসলমান সমাজের রাজনীতি একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। এই রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে মুসলিম রাজনীতি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত হতে থাকে। তাছাড়া বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে নবাব সলিমুল্লাহর যে রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত তেমন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি সর্বভারতীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর নেতায় পরিণত হন। যে কারণে সামন্ত সমাজের প্রতিভূ অবাঙালী বাঙালীর ভাষা সংস্কৃতির এবং সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কহীন নবাবের পক্ষে সম্ভব হয় বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিপরীতে ইসলামী জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে ভারতবর্ষব্যাপী সংগ্রাম ছড়িয়ে দেয়া। ইংরেজ বিভেদনীতির সক্রিয় সমর্থক নবাবের পক্ষে তাই সম্ভব হয়েছিল আগা খাঁনের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং উত্তর ভারতের ভূমিভিত্তিক অভিজাত শ্রেণীকে পাশ কাটিয়ে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা। যে দল সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদকে পরিণতির দিকে টেনে নিয়া যায়। নবাব সলিমুল্লার সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং তার ভূমিকা সম্পর্কে *ভাষা আন্দোলন অর্থনৈতিক পটভূমি* গ্রন্থে বলা হয়েছে: "বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যখন সারা ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া নেতারা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করল তখন এই নবাবরা পূর্ব বাংলার বাস্তব অর্থনৈতিক কারণগুলিকে তুলে না ধরে উক্ত আন্দোলনের বিরোধীতার জন্য সাম্প্রদায়িক প্রচারণাকেই একমাত্র অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। ইতিপূর্বে বালগঙ্গাধর তিলকের উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের হিন্দু আচরণ রাজনীতিক কার্যকলাপে ব্যবহৃত হতে থাকায় ভারতবর্ষে হিন্দু জনতার মধ্যে বেশ কিছুটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে ওঠে। তার ওপর মুসলমান অভিজাতদেরও এ ধরনের কার্যকলাপের ফলে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং কংগ্রেসের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রসার ঘটেছিল। ইংরেজ শাসকদের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় ও সারা ভারতের সামন্ততান্ত্রিক মুসলমান অভিজাতদের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের মাধ্যমে।"[৭৩]

সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের পরিণতি

সৈয়দ আহমদ খানের প্রচারিত দ্বিজাতিতত্ত্ব এ উপমহাদেশে ইসলামী জাতীয়তাবাদ এবং রাজনীতির একটি সুস্পষ্ট ধারা রচনা করে। সিমলা সম্মেলনের মাধ্যমে এই জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা প্রশাসনিক রূপ লাভের সুযোগ পায় এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র জাতি সত্ত্বার স্বীকৃতি এবং মর্যাদা আদায়ের মাধ্যমে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্বিজাতিতত্ত্ব রাজনৈতিক বাস্তবতা অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। ১৯০৯ সালে মর্লি মিন্টো সংস্কার আইনে, আইন সভায় পৃথকভাবে মুসলিম সদস্য নির্বাচনের অধিকার প্রদত্ত হলে দুই জাতি তত্ত্বের আরেক পর্যায় শুরু হয় যার পরিসমাপ্তি ঘটে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এ অঞ্চলের যে রাজনৈতিক ধারা তা পরিপূর্ণভাবেই দুই জাতি তত্ত্বের চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে প্রচারকৃত এই তত্ত্ব বিশ শতকে প্রতিষ্ঠা লাভের পথে এগিয়ে যায় মুসলিম লীগের কর্মসূচীর মাধ্যমে। প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ছিল অভিজাত শ্রেণীর হাতে, কর্তৃত্বে ছিলেন ঢাকার নবাব। কিন্তু ক্রমাগত এই ধারা পরিবর্তিত হতে থাকে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। এর নেতৃত্ব যেমন চলে যায় বাংলার বাইরে তেমন নেতৃত্বের শ্রেণীগত চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটে। তাছাড়া নীতিগত দিক থেকে অবস্থানের এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়।[৭৪]

১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রদ করার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণ হতাশ হন। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সলিমুল্লাহ সরকারের এ সিদ্ধান্তে সবচেয়ে ক্ষুব্ধ হন। কেননা এ সিদ্ধান্ত তাঁর সঙ্গে কোন রূপ পূর্ব পরামর্শ ছাড়াই ঘোষিত হয়। ফলে বাংলার উচ্চবিত্ত অভিজাত সমাজ যাঁরা বৃটিশ শাসনের সমর্থক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তাঁরা স্ব স্ব অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। অপরদিকে বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব পুনরুজ্জীবিত হয়। যদিও ১৯১০ সাল নাগাদ মুসলিম সমাজের একটি অংশ মুসলমানদের ইংরেজ প্রীতির বিরোধী ছিলেন এবং তাঁরা ভারতের রাজনৈতিক বিকাশের স্বার্থে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার মূল ধারার সঙ্গে মুসলমানদের সম্পৃক্ত থাকাটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে করতেন। এই ধারণায় বিশ্বাসীরা মুসলমানদের আত্মশক্তির আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দেন। বঙ্গভঙ্গ রদ আরব বিশ্বের ইসলামী ভ্রাতৃত্বের (Pan Islamic) আদর্শের প্রভাব, বলকান যুদ্ধে ও তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতি বৃটিশ সরকারের অনুসৃত মুসলিম বিরোধী নীতি—সব মিলেই ভারতীয় মুসলমানগণ যেমন বৃটিশ বিরোধী হয়ে ওঠে তেমন ভারতীয় মুসলমান রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের অবস্থানগত পরিবর্তন সূচিত হয়। এই অবস্থায় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

ঐক্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এভাবেই ভারতীয় মুসলিম সমাজ আত্মশক্তির আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে বৃটিশ শক্তির উপর নির্ভরতা পরিত্যাগ করে। মাওলানা আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ, ডাঃ আনসারি প্রমুখ মুসলিম নেতারা জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। তাছাড়া হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জনগণ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতি হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথ সহজ করে দেয়। ইতিমধ্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতাদের ওপর নেমে আসে সরকারী নির্যাতন। মাওলানা আজাদ ও মুহম্মদ আলী কর্তৃক সম্পাদিত 'আল হিলাল' ও 'কমরেড' নামক পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং বহু জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা নজর বন্দী হন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে সৈয়দ আহমদ প্রবর্তিত হিন্দু বিরোধী এবং বৃটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যের নীতি বহাল রাখা মুসলমান নেতৃবৃন্দের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে এ নীতি অনুসরণকারী লীগ নেতারা এক জটিল রাজনীতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে, মুসলিম লীগ থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। লীগ ত্যাগকারী উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ, আগা খাঁ প্রমুখ। প্রবীণ নেতৃত্বের শূন্যস্থানপূর্ণ হয় মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, মুহম্মদ আলীর মতো তরুণ নেতৃত্বের দ্বারা। তাছাড়া বৃটিশ বিরোধী উলেমা সম্প্রদায়ও মুসলমানদের রাজনৈতিক কর্মধারায় প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। অপরদিকে বিশিষ্ট মুসলিম কবি হালি, শিবলি নোমানি, আল্লামা ইকবাল প্রমুখের কবিতায় বৃটিশ বিরোধী মনোভাব মূর্ত হয়ে ওঠতে থাকে।[৭৫] মুসলিম তরুণ সমাজে এদের কবিতা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ও চরিত্রে যে পরিবর্তন ঘটে তাতে উচ্চবিত্ত অভিজাত শ্রেণীর নেতৃত্বের অবসান হয়। নবপর্যায়ের লীগ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিচালিত একটি সংগঠনে পরিণত হয় এবং এর সাংগঠনিক ভিত্তিও হয় প্রসারিত।

এ পর্যায়ে ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে মুসলিম লীগের অধিবেশনে নূতন সংবিধান এবং স্বায়ত্বশাসনের লক্ষ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অপরদিকে লীগের অনুসৃত পরিবর্তিত নীতি; হিন্দু মুসলিম মিলনের প্রয়াস বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালে বোম্বাইয়ে একই স্থানে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। উক্ত অধিবেশনে গান্ধী ও কংগ্রেসের মদন মোহন মালব্য, সরোজনী নাইডু প্রমুখ নেতারা অংশগ্রহণ করেন।[৭৬] হিন্দু মুসলিম ঐক্য স্থাপনের আরেক পদক্ষেপ হচ্ছে ১৯১৬ সালে গৃহীত সংস্কার প্রস্তাব যা লক্ষ্মৌ চুক্তি নামে খ্যাত। এ ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের পেছনে কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক, পরবর্তীতে দ্বিজাতিতত্ত্বের গোড়া সমর্থক ও বাস্তবায়নকারী নেতা মহম্মদ আলী জিন্নাহর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মৌ চুক্তি মূলতঃ হিন্দু মুসলিম পারস্পরিক স্বার্থ মেনে নেওয়ার চুক্তিও ছিল এবং এর মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেমন এই চুক্তি অনুসারে স্থির করা হয়: প্রতিটি প্রাদেশিক আইন সভাতে মুসলমান সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হবে; কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ সদস্য মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হবে; এর বিনিময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যুগ্মভাবে ভারতীয় কাউন্সিলের বিলুপ্তি ও শাসনতান্ত্রিক দাবী পেশ করতে সম্মত হয়; এবং মুসলিম লীগ কংগ্রেসের 'স্বরাজ' আদর্শ মেনে নেয়।[৭৭]

এই চুক্তির ফলে প্রমাণিত হয় যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধের প্রাচীর অনিবার্য নয়। প্রয়োজনে এরা অভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নিতে পারে। তবে ঐতিহাসিকদের মতে ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ প্রসারের ক্ষেত্রে লক্ষ্মৌ চুক্তি মোটেই সহায়ক ছিল না। বরং কার্যক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার পথ প্রশস্ত করেছে।[৭৮] রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে লক্ষ্মৌ চুক্তির মাধ্যমে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে কিছুটা অগ্রগতি হলেও কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতার সূত্রকে মেনে নিয়ে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে।[৭৯] তাঁর মতে এভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রকৃত ভিত্তি রচনা করা হয়েছিল।[৮০]

মূলতঃ এই চুক্তিতে মুসলমানরা ভিন্ন জাতি এবং তাদের স্বার্থ ভিন্ন এই সত্যকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কংগ্রেসের কাছ থেকে দ্বিজাতিতত্ত্বের পরোক্ষ স্বীকৃতি আদায় করে নেয়া হয়েছে। ভারতীয় রাজনীতির পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে কংগ্রেস মুসলিম লীগের স্বার্থ স্বীকার করে নিয়েই হিন্দু মুসলিম ঐক্যের চেষ্টা করেছে। হিন্দু মুসলমান এভাবেই কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে আশ্রয় করে পরস্পরকে ভিন্ন জাতি হিসেবে গণ্য করেই কৃত্রিম ঐক্যের মাধ্যমে দাবী আদায়ের আন্দোলনে নেমেছে, উভয় একাত্ম হয়ে একক জাতীয় পরিচয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। কৃত্রিম হলেও এই ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এক উত্তাল আন্দোলনের পথ উন্মুক্ত করেছিল। হিন্দু মুসলিম সংহতির উপর ভিত্তি করেই নেতৃবৃন্দ ভারত জুড়ে খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলনও ছিল পরস্পরের স্বার্থ মেনে নেয়ার আন্দোলন। এর মাধ্যমেও কংগ্রেস মুসলমানদের ভিন্ন জাতি এবং তাদের ভিন্ন স্বার্থ মেনে নিয়েছিল। যে স্বার্থের সঙ্গে না ছিল ভারতীয় জনগণের কোন যোগাযোগ না ছিল আর্থ-

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক রাজনৈতিক কোন স্বার্থ জড়িত। তবু তুরস্কের খেলাফত রক্ষার দাবীতে এ অঞ্চলে হিন্দু মুসলিম সারা ভারতব্যাপী তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে।

১৯২০ সালের ৮ জুন এলাহাবাদে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি মিলিত হয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের চারদফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল অবৈতনিক পদ বর্জন বেসামরিক সামরিক ও পুলিশ বাহিনী থেকে পদত্যাগ এবং কর প্রদানে বিরত থাকা ইত্যাদি।

একই বছর কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের তিনটি মূল লক্ষ্যের ব্যাপারে কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটি ঐক্যমত্যে পৌছায়। তখন থেকে মূল অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত এবং হিন্দু মুসলিম সংহতির ভিত্তিতে এই আন্দোলন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে আরেক অধ্যায়ে সূচনা করে। এখানে এ দুই সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের পরস্পরের শর্ত মেনে নেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[৮১]

এখানে উল্লেখ্য যে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের মূল দাবী ছিল স্বরাজ আর খিলাফত কমিটির তুরস্ক সুলতানের অধিকার এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা সংক্রান্ত। পরস্পর এই দাবীগুলো মেনে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নেমেছিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধী যুগের সূচনা হয় এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গণআন্দোলনের মাধ্যমে দাবী আদায়ের রাজনীতিরও সূত্রপাত ঘটে। নিঃসন্দেহে এটি এ অঞ্চলের রাজনীতি এবং জাতীয় আন্দোলনে নব মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়। ১৯২০ সালের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রামে তিনটি গতিধারার সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এক, জাতীয় বিপ্লবাদ। দুই, শ্রমিক কৃষক ও বামপন্থী আন্দোলন। তিন, শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলন। গান্ধীজী পরিচালিত আন্দোলনে শেষোক্ত গতি ধারার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণ অনুসারে গান্ধীর আন্দোলন বিভিন্ন জাতি, ধর্ম গোষ্ঠীর মিলিত এক ঐক্যবদ্ধ সুসংহত আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাদের ধারণা অনুসারে তিনি এক অখন্ড জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের পরিচালক ছিলেন। তৎসত্ত্বেও হিন্দু মুসলিম সংহতির ভিত্তিতে সৃষ্ট এ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সর্বভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। এ ঐক্যের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তা ছিল না একাত্মতাও ছিল না। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিশাল জনগোষ্ঠীর জাতি চেতনার মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি হয়নি। এমনকি তাদের আর্থ-সামাজিক জাতিগত এবং সম্প্রদায়গত ঐক্য ছিল না। যা জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্য অপরিহার্য। আন্দোলনের ফলে যে ঐক্যের জন্ম হয়েছিল তা ছিল দুর্বল। সারা দেশব্যাপী জাতি ধর্মনির্বিশেষে সবাইকে এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র মহাত্মা গান্ধীর সাংগঠনিক শক্তি তাঁর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের কারণে। গান্ধীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মুসলিম জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনকারী দেশপ্রেমী আত্মত্যাগী আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মাওলানা আজাদের মতো নেতারা। যার ফলে খেলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলন দেশব্যাপী অভূতপূর্ব সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। নেতৃত্ব সর্বস্ব এবং ইস্যুভিত্তিক জাতীয় ঐক্য সংহতি, নেতাদের অনুপস্থিতি এবং যে ইস্যুকে ভিত্তি করে আন্দোলন তার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুরই অবসান হয়ে যায়। এ কারণেই দেখা যায় ১৯২২ সালে গান্ধীজী এবং মহম্মদ আলীর গ্রেফতারে আন্দোলনকারীরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাছাড়া তুরস্কের জাতীয়তাবাদীদের বিজয় খিলাফত আন্দোলনকে অর্থহীন করে তোলে। শুধু তাই নয় এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত ঐক্য সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়। শুরু হয় হিন্দু মুসলিম রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। যদিও ১৯২১ সালে দাঙ্গার সূত্রপাত তবে ১৯২৩ সাল থেকে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তরে চলতে থাকে। ১৯২৬ সালে তা ভয়াবহ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই দাঙ্গা প্রমাণ করে হিন্দু মুসলিম সংহতি কতখানি কৃত্রিম ছিল। দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, সুযোগ্য নেতৃত্ব সবই সর্বভারতীয় অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনা বিস্তারে ব্যর্থ হয়। সামান্য স্বার্থের সংঘাতে তীব্র সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ ঘটে। শুধু জনগণ নয় নেতারাও তাদের সম্প্রদায়গত স্বার্থকেই বড় করে দেখেছেন। গান্ধীজী যে হিন্দু মুসলিম সংহতি গড়ে তুলেছিলেন তাও ছিল কংগ্রেসের স্বরাজ আদায়ের লক্ষ্য অর্জনের দাবীকে শক্তিশালী করার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে সঙ্গে রাখা। মতিলাল নেহরু ও অন্যান্য বিশিষ্ট কংগ্রেসের নেতাদের পরামর্শক্রমেই তিনি স্বরাজকে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তাছাড়া এ ঐক্য আন্দোলনের মধ্যদিয়ে গান্ধীজী এবং তার অনুগত সহযোগীবৃন্দ জাতীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায়ই বেশী আগ্রহী ছিলেন।[৮২] সুতরাং এই সংহতিকে ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভাবার কোন কারণ নাই। একথা সত্য যে গান্ধীজী নিজেও কখনও ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করে দেখেননি তার ভাষায়: "Politics bereft of religion one a death-trap because they kill the soul"[৮৩] তাঁর এই বিশ্বাস প্রমাণ করে যে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়তবাদী রাজনীতিতে আস্থাশীল ছিলেন না।[৮৪] মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে জওহরলাল নেহরু বলেছেন: "গান্ধীজী মনে প্রাণে হিন্দু, একান্তভাবেই তিনি ধর্মাশ্রয়ী, কিন্তু তাঁর ধর্মের আচার-বিচার অনুষ্ঠানের কোন স্থান নেই। তার ধর্ম নীতি পন্থী, যে পন্থাকে তিনি বলেছেন সত্য বা প্রেমের পথ।...হিন্দু ধর্মের সার

Dhaka University Institutional Repository

সত্য তিনি মর্মাংগম করেছেন এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর আদর্শ হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মেলে না এরকম শাস্ত্রবাক্য বা লোকাচারকে তিনি স্বীকার করেন না, তাঁর মতে যে সকল বাক্য বা আচার প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্তী যুগে প্রবর্তিত। তিনি বলেছেন, নীতি বিচারে আমি যা সমর্থন করতে পারি না, বুঝতে পারি না এমন আচরণের দাসত্ব আমি করতে প্রস্তুত নই।"[৮৫]

গান্ধীর ধর্ম বিশ্বাস ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল সন্দেহ নেই।[৮৬] তবে তা সর্বভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত করেনি। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে গান্ধীজী খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু যখন এ আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে এবং ইংরেজ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে তোলে তখনই তিনি হঠাৎ করে আন্দোলনের পথ থেকে সরে দাঁড়ান। সমালোচকদের মতে, 'খেলাফত আন্দোলন উপমহাদেশের মুসলিম জাতির মধ্যে যে প্রবল রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করেছিল যার ফলে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের জাগরণের সম্ভাবনা দেখা দেয়, গান্ধী তা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আর একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ মাথা তুলে দাঁড়াক এটা তাঁর কাম্য ছিল না বলেই তিনি খেলাফত আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন'[৮৬] এখানে তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নটি বড় হলেও ভিন্ন ধর্মের প্রশ্নটি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক ধ্যানধারণা প্রধানত ধর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তি মূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে কারণে ইউরোপের রেনেসাঁর যুগ থেকে যে ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়ত রাজনীতির প্রভাব দেখা যায় তাকে তিনি অবজ্ঞার চোখে দেখেছেন। ভারতীয় রাজনীতিকে তিনি ভারতীয় কৃষ্টি ঐতিহ্যের রঙে রঞ্জিত করেছেন। স্বাভাবিক কারণেই ভারতের প্রাচীন কৃষ্টি সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং প্যান ইসলামী আন্দোলনে বিশ্বাসী মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের পক্ষে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন রাজনীতি, জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না।

অপরদিকে তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলীর চিন্তাচেতনার মূল উৎস ছিল ইসলাম ধর্ম। এ কারণে ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়ত রাজনীতিতে তাঁর কোন আস্থা ছিল না। তিনিও মহাত্মা গান্ধীর মত ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করার কথা ভাবেননি। তার মতে: "রাজনীতিকে ধর্মের আওতামুক্ত করার চিন্তাটা ভুল। ধর্ম বলতে গোঁড়া মতবাদ বুঝায় না বা আচার অনুষ্ঠান সর্বস্বও কিছু নয়। আমি মনে করি এর অর্থ জীবন বিশ্লেষণ। আমার কৃষ্টি আছে, রাষ্ট্র ব্যবস্থা আছে এবং জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি আছে এর সামগ্রিক সংশ্লেষণই ইসলাম।"[৮৭]

ধর্মের প্রতি তাঁর ছিল অটল বিশ্বাস আস্থা। যে কারণে তিনি রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের চেয়ে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এই জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বশবর্তী হয়েই তিনি বিশ্বে সকল মুসলমানকে এক জাতি হিসেবে গণ্য করেছেন। প্যান ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই তিনি তুরস্কের খিলাফত সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন। খিলাফতের অস্তিত্ব বিপন্ন দেখে উদগ্রীব হয়েছেন। তার জাতীয়তাবাদী চিন্তা ধর্মীয় চেতনা এবং বিশ্বাস দ্বারা সম্পৃক্ত ছিল বলেই তিনি আধুনিক জাতীয়তাবাদী ধারার তীব্র সমালোচক ছিলেন। তাঁর মতে: "আমরা জাতীয়তাবাদী নই বরং অতি জাতীয়তাবাদী (Supernationalist) এবং একজন মুসলমান হিসাবে আমি বলছি যে, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষ এবং শয়তান তৈরী করেছে জাতি। জাতি বিভক্ত করে আমাদের ধর্ম ঐক্যবদ্ধ করে।"[৮৮]

তার রাজনৈতিক কর্মসূচী এবং চিন্তাভাবনা ইসলামী ঐতিহ্য আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল; যদিও তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাও বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের জন্য ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন এবং হিন্দু মুসলমান অভূত পূর্ব ঐক্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। তবু সম্প্রদায়গত স্বার্থ চিন্তা এবং ইসলামী ভাবধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে সর্বভারতীয় ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হওয়া সম্ভব হয়নি।

খেলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্ট ঐক্য ছিল নেতাদের তৈরী সুতরাং নেতাদের অনুপস্থিতিতে এই সংহতি সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্থ হয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের ফলে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে ব্যাপক রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি হয় তাতে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় স্বীয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থটি তীব্রভাবে অনুভব করতে শেখে। যে অনুভূতি দুই সম্প্রদায়কে ভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। আন্দোলনের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিভেদপন্থী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। বৃটিশ শাসকবর্গ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুর্বল করার জন্য হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় দুটির মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে উঠেন। মুসলিম নেতৃবৃন্দও হিন্দু মুসলিম ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর আস্থা হারান এবং বৃটিশ শক্তির সঙ্গে সংঘাতের পথ পরিহার করে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। এভাবে দুটি সম্প্রদায়ের দুটি শিবিরে বিভক্ত হওয়ার পেছনে হিন্দু ও

Dhaka University Institutional Repository

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ভূমিকা কোন অংশে কম ছিল না। জওহরলাল নেহরু এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেছেন 'অনেক কংগ্রেসকর্মীই জাতীয়তাবাদী মুখোশের আড়ালে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন।'[৮৯]

নেহরুর এই মন্তব্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় মদন মোহন মালব্য, লালা লাজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও এম আর জয়কর প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কার্যক্রমে। মদন মোহন মালব্য কর্তৃক হিন্দু মহাসভা নামক উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক সংগঠনটি নবরূপ লাভ করলে উপরোক্ত নেতারা এর প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯২৩ সালে হিন্দু মহাসভার বাৎসরিক সম্মেলনে নেতারা হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি হিন্দু সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এই সম্মেলনে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য শুদ্ধি আন্দোলনের কথা বলেন। এর ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু নেতাদের প্রতি অনাস্থা অবিশ্বাসের এবং বিদ্বেষ ভাবের জন্ম হওয়াটা স্বাভাবিক। এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ১৯২৩ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে ফজলি হোসেন অনুন্নত অস্পৃশ্য হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯২৪ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ দলের নেতা মতিলাল নেহরুর সঙ্গে মুসলিম জনগোষ্ঠীর নেতা মহম্মদ আলী জিন্নাহর মত বিরোধ দেখা দেয়। ১৯২৫ সালের এপ্রিল ও ডিসেম্বর মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার দুটি অধিবেশনেই লাজপত রায় লক্ষ্ণৌ চুক্তি সমালোচনা করেন এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিদের পরিকল্পনার বিরোধীতা করেন। এদিকে আলীগড়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সভায় সভাপতির ভাষণে আবদুর রহিম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জন্য হিন্দু সম্প্রদায়কে দায়ী করেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রাজকীয় কমিশন গঠন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচিত মন্ডলী নির্ধারণের দাবী জানান।[৯০]

১৯২৬ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতি থেকে সরে আসার ফলে হিন্দু মুসলিম ঐক্য বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত বলিষ্ঠ নেতার অভাব দেখা দিল। চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুতে তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং বাস্তববাদী চিন্তাভাবনার ফসল বেঙ্গল প্যাক্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে নাকচ হয়ে যায়। এভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা কংগ্রেস নেতারা উপেক্ষা করেন। ফলে হিন্দু মুসলমান দুটো ভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়। কংগ্রেস পরিচালিত বৃহত্তর রাজনীতি থেকে মুসলিম লীগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯২৭ সালের মধ্যে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও ১৯২৮ সালে নেহরু রিপোর্টকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আবার ঘোলাটে হয়ে যায়। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে রিপোর্টটি পেশ করা হলে মুসলিম লীগ কর্তৃক এটি প্রত্যাখাত হয়। শুধু মুসলিম লীগ নয় শিখ ও হিন্দু মহাসভা এর বিরোধীতা করে। এমন কি জওহরলাল নেহরু সুভাস চন্দ্র বসু, শ্রীনিবাস আয়েংগার প্রমুখ প্রগতিশীল কংগ্রেস নেতাদের কাছেও এই রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য ছিল না। তবু জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে তাঁরা এর বিরোধীতা করা থেকে বিরত থাকেন। পন্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে প্রণীত রিপোর্টের মূল প্রস্তাবগুলির উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল ভারতের শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি হবে উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলোতে বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিয়ে যৌথ নির্বাচন প্রথা অনুসৃত হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কেবল দশ বছরকাল আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে ইত্যাদি।[৯১]

সাইমন কমিশন বয়কট করাকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমান মিলনের যে একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল নেহরু রিপোর্টে তা হাতছাড়া হয়ে যায়। এই রিপোর্টের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে মহম্মদ আলী জিন্নাহ, মওলানা মহম্মদ আলী ও মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অসন্তুষ্ট হন। উপরোক্ত নেতাগণ ছাড়াও হজরত মোহানী, আজাদ শোভনী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করেন। এটিকে তাঁরা হিন্দু প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বলে উল্লেখ করেন। নেহরু রিপোর্ট একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক সংহতি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয় তেমন বিচ্ছিন্নতাবাদকে আরও প্রকট এবং ব্যাপক করে তোলে। মুসলমান জনগোষ্ঠী এই রিপোর্টে আস্থাশীল না হওয়ায় সাম্প্রদায়িক সংহতির ক্ষেত্রে এক ঘোরতর বিপদ দেখা দেয়। মুসলিম জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ নেহরু রিপোর্টে জিন্নাহ এতখানি ক্ষুব্ধ হন যে, শীঘ্রই তিনি জাতীয়তাবাদী শিবির পরিত্যাগ করে রক্ষণশীল মুসলিম নেতাদের সঙ্গে হাত মেলান, স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য তার বিখ্যাত চৌদ্দ দফা দাবী পেশ করেন। যা ছিল নেহরু রিপোর্টের প্রস্তাবগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত। জিন্নাহ তার চৌদ্দ দফা দাবীর মধ্যে সাংবিধানিক সংস্কারের প্রশ্নে মুসলমানদের ভারতের একটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী ও একটি সম্প্রদায় এই বিষয়টিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে জিন্নাহ কর্তৃক উপস্থাপিত চৌদ্দ দফা দাবীর উল্লেখযোগ্য দিকগুলি ছিল: প্রতিটি আইন সভায় মুসলমান সম্প্রদায়কে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দান; কেন্দ্রীয় আইনসভার এক তৃতীয়াংশ আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ; সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি কার্যকর করা; পাঞ্জাব, বাংলাদেশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানদের

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ন রাখা; মুসলমান সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি শিক্ষা ও সাহিত্যের সংক্ষণ ও উন্নয়ন; কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় এক তৃতীয়াংশ মুসলমান সদস্য নিয়োগ; রাজ্যগুলিতে ও স্থায়ী সংস্থাগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য যথাযোগ্য পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি।[৯২]

চৌদ্দ দফা পেশের পর জিন্নাহর রাজনৈতিক জীবনের মোর ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি ভারতীয় মুসলিমদেরকেও এই ভিন্ন ধারায় সম্পৃক্ত করে তাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীরূপে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। এভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে 'নেহরু রিপোর্ট' এবং 'চৌদ্দ দফায়' হিন্দু মুসলিম ঐক্য এবং ধর্মনিরপেক্ষ সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়; রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাকে তীব্র করে। শতবর্ষব্যাপী যে সম্প্রদায়গত জাতি চিন্তা এ অঞ্চলের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল ক্রমে ক্রমে তা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়। বিংশশতাব্দীর প্রথমার্ধে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে তা তীব্র হয়ে ওঠে। জিন্নাহ নেহরুর প্রস্তাবসমূহ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস মুসলিম লীগের ঐক্যবদ্ধ জোট গঠনের মূল্যবান সুযোগ নষ্ট করে দেয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঘোরতর কংগ্রেস বিরোধী হয়ে ওঠেন। উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হিন্দু মহাসভার ভূমিকা প্রথম থেকে ছিল মারাত্মক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ। মহাসভার অন্যতম নেতা ভাই প্রেমানন্দ সরাসরি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাবাপন্ন বক্তব্য পেশ করতে দ্বিধা করেননি। তাঁর মতে: "হিন্দুস্থান শুধুমাত্র হিন্দুদের মাতৃভূমি। এদেশে অবস্থানকারী মুসলমান খ্রীষ্টান ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী আমাদের অতিথি মাত্র। তাঁরা যতদিন ইচ্ছা এদেশে আমাদের অতিথি হিসেবে বাস করতে পারেন।"[৯৩]

নেতাদের এই ধরনের উস্কানীমূলক বক্তব্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে ভারতীয় রাজনীতি হয়ে উঠে আরও সমস্যাসঙ্কুল আরও জটিল। রাজনীতির এই জটিল মুহূর্তে এবং হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের নাজুক পরিস্থিতিতে প্যান ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী কবি ইকবাল ভারতীয় মুসলমানদের তাত্ত্বিক নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের জাতীয়তাবাদী আদর্শ দৃঢ় করতে সচেষ্ট হন। তিনি ঘোষণা করেন 'Muslim India Constituted a Nation by itself'[৯৪] ১৯০৮ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি প্যান ইসলামী মতবাদের গোড়া সমর্থক ছিলেন।[৯৫] তাঁর জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখক আজিজ আহমদ লিখেছেন: "জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ইকবালে যে মতবাদ ছিল তাতে আর্নষ্ট রেনানের (Ernst Renan) প্রভাব দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে রেনান লিখেছেন যে, একটি জাতি গঠনে ধর্ম ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। ইকবাল ও এই মতে বিশ্বাসী হন এবং ভারতীয় পরিবেশ রেনানের যুক্তি প্রয়োগ করে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের দাবী করেন। এই মানদন্ড অনুযায়ী ভারতের মুসলমানরা একটি পৃথক জাতি।"[৯৬]

এই জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হয়ে ইকবাল ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি ভিন্ন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন এবং কোটি কোটি মুসলমানকে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে উৎসাহিত করেন। ভারতীয় মুসলমানের উপর তার প্রভাব এবং সম্প্রদায়গত জাতীয়তাবাদ প্রচারের সাফল্য সম্পর্কে জওহরলাল নেহরু বলেছেন: "তরুণ মুসলমানদের উপর ঘটনা ছাড়াও একজন ব্যক্তি বিশেষের প্রভাব এসে পড়ে।এই বিশেষ ব্যক্তিটি হলেন স্যার মোহাম্মদ ইকবাল।...মনকে নাড়া দেবার মত জাতীয়তাবাদী ও জনপ্রিয় উর্দু কবিতা লিখে ইকবাল সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন।...মুসলমানদের স্বধর্মবোধ জাগ্রত করার প্রেরণা দিয়েছিলেন তাঁর কাব্যের মধ্যদিয়ে।...এইভাবে তিনি মুসলমানদের চিত্ত হিন্দুদের অপেক্ষা পৃথক একটি খাতে চালনায় সহায়তা করেন।"[৯৭]

শুধু কাব্য নয় রাজনীতিকেও তিনি পৃথক খাতে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুসলমান নেতারা যখন সম্প্রদায়গত নির্বাচনের প্রসঙ্গ নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্কে রত, ইকবাল তখন স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের কথা উত্থাপন করে এ অঞ্চলে মুসিলম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য স্থির করেছেন। ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'All Parties Muslim conference' এ তিনি প্রথম প্রকাশ্যে এ দাবী পেশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল অর্থাৎ পাঞ্জাব উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান একই শাসনতন্ত্রের অধীনে এনে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা প্রয়োজন।[৯৮] এ বক্তব্যের মাধ্যমে ইকবাল দ্বিজাতিতত্ত্বের রাষ্ট্রিক রূপ প্রদান করে উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে এক নব যুগের এবং অধ্যায়ের সূচনা করেন। দুই জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী অন্যকোন নেতা, এমনকি এ তত্ত্বের অন্যতম প্রচারক সৈয়দ আহাদ খানও ধর্মভিত্তিক ভিন্নরাষ্ট্রের কথা ভাবেননি। পরবর্তীকালে প্যান ইসলামী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে ভিন্ন রাষ্ট্রের কথা বলেননি। উগ্র বৃটিশ বিরোধী নেতা মাওলানা মহম্মদ আলী ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার কথা বলতে যেয়ে আগামীদিনের ভারতবর্ষকে 'ইউনাইটেড ষ্টেটস অব ইন্ডিয়া' নামে অভিহিত করেছিলেন।[৯৯] কিন্তু ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাগ্যের এবং সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির শেষ পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আল্লামা

Dhaka University Institutional Repository

ইকবালই। ১৯৩০ সালে তিনি তাঁর মূল পরিকল্পনা সংশোধন করে বাংলাকেও এই স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেন।[১০০]

ইকবালেল স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের চিন্তা জিন্নাহকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। ইকবাল ঠিক সেই সময় তার মতামত ব্যক্ত করেন যখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাগ্য নিয়ে খেলছেন; চরম উদাসীন্য প্রদর্শন করেছেন তাঁদের প্রয়োজন, তাদের স্বার্থের প্রতি। কংগ্রেসের এই মনোভাব এবং হিন্দু মুসলমান ঐক্য সুদূরপরাহত দেখে হতাশ কণ্ঠে জিন্নাহ বলেছিলেন: "আমি এক সময় কংগ্রেসের কাছে কৃপা ভিক্ষা করেছি, সে সময় আমার মধ্যে অহংকার ছিল না—কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম যে ভারতকে সাহায্য করা বা হিন্দুদের মানসিকতা পরিবর্তন করা অথবা মুসলমানগণকে তাদের সংকটাপন্ন অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা আমার সাধ্যাতীত ভারতকে আমি ভালবাসিনি তা নয় কিন্তু আমার মনে হয়েছে আমি অসহায়।"[১০১]

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মুসলিম ভারতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত দাবী সহজে মেনে নেবে না, বিষয়টি জিন্নাহর কাছে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে জিন্নাহ ইকবালের বক্তব্যের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় নিহিত আছে ভেবে তা গ্রহণ করেছিলেন। জিন্নাহ স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে ইকবালের মতবাদের ফলেই মুসলিম লীগ পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের দাবী করে; ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনের প্রস্তাবে যার প্রতিফলন ঘটে।[১০২] লাহোর অধিবেশনের প্রস্তাবে পাকিস্তান শব্দটি ব্যবহার না হলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে উল্লেখ করায় এটি পাকিস্তান প্রস্তাব বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এভাবে ইকবাল পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টায় পরিণত হন।

এভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতে মুসলমান নেতারা বক্তৃতা, বিবৃতি, প্রবন্ধ ও প্রচারের মাধ্যমে প্রকারন্তরে ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র ধর্ম সংস্কৃতি ও এই স্বতন্ত্র জাতীয় সত্ত্বার জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি আদায় করে নেন। জিন্নাহ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন; 'জাতি সম্পর্কিত যে কোন সজ্ঞায় মুসলমানরা একটি জাতি, তাদের স্বদেশ, তাদের ভূখন্ড এবং তাদের রাষ্ট্র অবশ্যই থাকবে।'[১০৩] এভাবেই জিন্নাহ ধর্মভিত্তিক জাতি তত্ত্বকে প্রয়োগ করে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি ও রাষ্ট্রের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী জিন্নাহ দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনৈতিক প্রচার শুরু করেন। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সপক্ষে দ্রুত জনমত গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে সাধারণ আসনে কংগ্রেস এবং সংরক্ষিত মুসলমান আসনে মুসলিম লীগ বিপুলসংখ্যক ভোট পায়। এই নির্বাচনের সাফল্যে মুসলিম লীগ ভারত বিভাগ এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের দাবীতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের তৎকালীন জটিল রাজনৈতিক সমস্যা মোকাবেলার জন্য বৃটিশ সরকার কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ একটার পর একটা বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। প্রতিটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে অমিমাংসিতভাবে। এই অবস্থায় পাকিস্তান প্রশ্নে অটল মুসলিম লীগের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তি তার মত ব্যক্ত করে। পাকিস্তান প্রশ্নে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ভূমিকা সম্পর্কে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইন্ডিয়া ইউন্স ফ্রীডম গ্রন্থে লিখেছেন: "তিনি রাজনৈতিক সমস্যাটিরও একটি নতুন মোড় ঘুরালেন এবং কংগ্রেস মুসলিম লীগ উভয়কেই পাকিস্তানের অনিবার্যাতার বিষয়টি অনুধাবন করানোর জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে ওকালতি শুরু করলেন এবং নির্বাহী কাউন্সিলের কংগ্রেস সদস্যদের মনে এই ধারণার বীজ রোপণ করলেন।"[১০৪]

তবে কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক ভারত বিভক্তির বীজ বপন করার আগেই নেতাদের কেউ কেউ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্তি এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের জাতীয়তাবাদকে মেনে নিয়েছিলেন। মাওলানা আজাদের লেখনিতে তার আভাসও পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই মেনে নেয়া ব্যাপারে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ছিলেন অগ্রগামী। এই বিষয়ে প্যাটেলের ভূমিকা সম্পর্কে আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন: "লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন প্রস্তাব করলেন যে, বর্তমান সমস্যার সমাধান দেশ বিভাগের মাধ্যমেই হতে পারে তখন সর্দার প্যাটেলের মধ্যেই উক্ত ধারণা তাৎক্ষণিক সম্মতি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে লর্ড মাউন্টব্যাটেন দৃশ্যে অবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই সর্দার প্যাটেল শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দেশ বিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন। ...এ কথা বলা হয়তো অন্যায় হবে না যে, বল্লভ ভাই প্যাটেল ভারত বিভাগের স্থপতি ছিলেন।"[১০৫]

Dhaka University Institutional Repository

দুই জাতি তত্ত্বের জাতীয়তাবাদের আদর্শের প্রতি প্যাটেলের মনোভাব ছিল; 'আমরা পছন্দ করি আর নাই করি ভারতবর্ষে দুটো জাতি রয়েছে।'[১০৬] প্যাটেলের এই পরিবর্তিত মনোভাব সম্পর্কে আজাদের গ্রন্থে বলা হয়েছে:

"তিনি (প্যাটেল লেখক) এখন বুঝতে পেরেছেন, হিন্দু ও মুসলমানকে এক জাতিতে একতাবদ্ধ করা যাবে না। এ সত্যকে স্বীকৃতি না দিয়ে আর কোন বিকল্প নেই।...প্যাটেল এখন জিন্নাহর চেয়েও দ্বিজাতিতত্ত্বের বড় সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। জিন্নাহ হয়তো দেশ বিভাগের পতাকা তুলেছিলেন কিন্তু এখন আসল পতাকাবাহী হয়েছেন প্যাটেল।"[১০৭]

শুধু প্যাটেল নন দেশ বিভাগের ঘোরতর বিরোধী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর মনোভাবও পাল্টে যায় এবং তিনি মাওলানা আজাদকে দেশ বিভাগের বিরোধীতা না করার অনুরোধ জানান।[১০৮] মাওলানা আজাদ লিখেছেন; 'যখন সর্দার প্যাটেলও এমন কি জওহরলাল পর্যন্ত দেশ বিভাগের সমর্থক হয়ে উঠেছেন তখন আমার ভরসা রইলেন গান্ধীজী।[১০৯]

কিন্তু তাঁর শেষ ভরসা স্থানটি ও রইল না। তিনি যখন এ বিষয়ে আলোচনার জন্য গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখনকার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: "...জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত পেলাম—তিনি পরিবর্তিত হয়ে গেছেন। তিনি প্রকাশ্য দেশ বিভাগের পক্ষে ছিলেন না, কিন্তু তার বিরুদ্ধে আর সে রকম প্রচন্ডভাবে কথা বলছিলেন না। আমার জন্য আরও আশ্চর্য এবং আঘাতের ব্যাপার ছিল, সর্দার প্যাটেল যে কথাগুলো ইতিমধ্যে বলেছেন সেগুলোরই তিনি পুনরাবৃত্তি করছিলেন।"[১১০]

শুধু আবুল কালাম আজাদ নন সারা ভারতবাসী আশ্চর্য হয়ে দেখল বৃটিশ শাসকবৃন্দ এবং কংগ্রেস নেতারা দ্বিজাতিতত্ত্বের জাতীয়তাবাদের সমর্থক; তারা উপমহাদেশের বিভক্তির পক্ষে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির গতিধারা শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতারাও দ্বিজাতিতত্ত্বের আদর্শ ও চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দুই জাতি তত্ত্বের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আদর্শের শেষ পরিণতি পরিলক্ষিত হয় ভারত বিভক্তির মাধ্যমেই; এই ধর্মাশ্রীত জাতীয়তাবাদের রাষ্ট্রিক রূপ হচ্ছে হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান এবং মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান। নিঃসন্দেহে পাকিস্তান সৃষ্টি, জিন্নাহর রাজনৈতিক কৌশলের সাফল্যের ফসল; রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর সাফল্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কিন্তু তাঁর এই সাফল্য সুদূরপ্রসারী ফল বয়ে আনতে পারেনি। পারেনি এর স্থায়ীত্ব রক্ষা করতে। সাত চল্লিশের ১৪ আগস্টে পাকিস্তান সৃষ্টির বছর পূর্ণ না হতেই পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে; অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে দ্বিজাতিতত্ত্বের পালে ভিন্ন জাতীয়তাবাদের হাওয়া বইতে থাকে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের চব্বিশ বছরের ইতিহাস ছিল এই জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ, বিকাশ এবং সফল পরিণতির গর্বিত কাহিনী।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৩।
২।	মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৭৮।
৩।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৩।
৪।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩৩।
৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩৩।
৬।	মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৭৮-৩৭৯।
৭।	সুপ্রকাশ রায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৭৬-৩৭৭।
৮।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৪।
৯।	মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৭৯।
১০।	একটি সুসংগঠিত এবং কার্যকরী রাজনৈতিক সংগঠনের অভাব অনুভূত হওয়ার পেছনের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ কারণ চিহ্নিত করতে যেয়ে সরল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "প্রথমত, ১৮৫৩ সালে ভারত প্রশাসনের চার্টার আইনের মেয়াদ শেষ হবে। সে জন্য ভারত প্রশাসন সংক্রান্ত সম্ভাব্য আইনকে প্রভাবিত করার জন্য ভারতীয় জনমত গঠন করা দরকার। সে জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বৃটিশ ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়ত, ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়গণের অন্ধ জাতিবিদ্বেষ প্রতিহত করায় রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন। কারণ নিতান্ত সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও ভারতে বৃটিশ প্রশাসন ও জাতিবিদ্বেষ বিরোধী কোনো আন্দোলনের কথা চিন্তা করলে সমগ্র ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়গণ প্রবল বাধার সৃষ্টি করত। ইউরোপীয়গণের জাতিবিদ্বেষ এবং ভারতীয় প্রশাসনে তাদের একচ্ছত্র প্রভাবের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছল।" সরল চট্টোপাধ্যায়, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫।		
১১।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৫।
১২।	মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৮০।
১৩।	সুপ্রকাশ রায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৭৭।
১৪।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৫।
১৫।	মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৮১।
১৬।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩৮৩-৩৮৪।
১৭।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩৮৫।
১৮।	সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয় ছাত্রদের কৃতিত্বে ইংরেজ রক্ষণশীল মহলে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এতে ইংরেজদের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ইংরেজ স্বার্থহানিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য বিধি জারী করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮৭৬ সালে এই বিধি জারী করা হয়। যাতে সিভিল সার্ভিস পরিক্ষার্থীদের বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ বছর করা হয়। এতো অল্প বয়সে ইংল্যান্ডে যেয়ে কোন ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেয়া ছিল দুরূহ ব্যাপার। বিষয়টি ষড়যন্ত্রমূলক অনুধাপক করতে পেরে ভারতীয়রা এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস পৃষ্ঠা ৩৮৫।		

Dhaka University Institutional Repository

১৯।	সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এবং 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের' উদ্যোগে যখন সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত ইস্যুকে কেন্দ্র করে সারা ভারতব্যাপী তুমুল আন্দোলন চলছে তখন ১৮৭৮ সালে লর্ড লিটন ভারতবাসীর স্বার্থ বিরোধী আইন vernacular press Act, Arms Act ও Licence Act পাশ করে। vernacular press Act-এর ফলে যে সকল পত্রিকাগুলো ভারতীয় ভাষায় ভারতীয়দের ক্ষোভ এবং জাতীয় আন্দোলনের সংবাদ পরিবেশন করতো তাদের প্রকাশিত সব কিছুর জন্য প্রাথমিক সেন্সার ব্যবস্থা চালু হয়। Arms Act-এর কারণ ছিল সারা ভারতব্যাপী বিচ্ছিন্নভাবে যে কৃষক বিদ্রোহ চলছিল তা যাতে সরকার বিরোধী রূপ পরিগ্রহ করতে না পারে। এ কারণে আত্মরক্ষার জন্যও ভারতীয়রা অস্ত্র রাখার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ বিদেশীরা এই আইনের আওতার বাইরে ছিল। যা ভারতীয়দের জাতীয় সম্মান ও মর্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন করে। Licence Act-এর মাধ্যমে বিদেশী বস্ত্র সামগ্রীর উপর অধিকাংশ শুল্ক তুলে দেয়া হয়। ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আরেক দফা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতিতেও প্রচন্ড আঘাত লাগে। এভাবে সরকারের একের পর এক গণবিরোধী নীতি পরোক্ষভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সুদৃঢ় হতে সাহায্য করে। আতিউর রহমান লেনিন আজাদ, ভাষা আন্দোলন অর্থনৈতিক পটভূমি পৃষ্ঠা ৩৮।		
২০।	মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পৃষ্ঠা ৩৮৬।
২১।	ঐ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৮৭।
২২।	জওহরলাল নেহরু,	ঃ	ভারত সন্ধানে পৃষ্ঠা ৪৬।
২৩।	আতিউর রহমান, লেনিন আজাদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৮।
২৪।	জওহরলাল নেহরু,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৬১-৩৬২।
২৫।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮৭।
২৬।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৮৭।
২৭।	সুপ্রকাশ রায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৭৭।
২৮।	১৮৮৫ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে যে কয়টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা ছিল ১। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সংস্কার এবং একযোগে ইংল্যান্ড এবং ভারতে পরীক্ষা গ্রহণ; ২। অস্ত্র আইন রহিত করা; ৩। সামরিক এবং সাধারণ প্রশাসন বিভাগে ব্যয়ভার হ্রাস; ৪। বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথককরণ। মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস পৃষ্ঠা ৩৮৮।		
২৯।	আতিউর রহমান লেনিন আজাদ,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৯।
৩০।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮৭।
৩১।	জওহরলাল নেরুহ,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৫৫।
৩২।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮৬।
৩৩।	সুপ্রকাশ রায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৭৭।
৩৪।	আতিউর রহমান, লেনিন আজাদ,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৯।
৩৫।	সুপ্রকাশ রায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৭৮।
৩৬।	Wedder burn,	ঃ	Allan Octavian Hume, Father of Indian National Congress P. 80-81.
৩৭।	সুপ্রকাশ রায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৭৯।
৩৮।	আতিউর রহমান, লেনিন আজাদ,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৯
৩৯।	Pattabhi Sitaramayya's	ঃ	History of the Indian National Congress (1885-1947) P. VII (Preface)
৪০।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯৪।
৪১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

৪২।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৯৫।
৪৩।	আতিউর রহমান, লেনিন আজাদ,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭।
৪৪।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৪০।
৪৫।	কোলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে উত্তর-ভারতের আলেম সমাজের ফতোয়ার বিরুদ্ধে সাওন্দন্দ-কেরামত আলী জৌনপুরী ঘোষণা করেন, ভারত দারুল-ইসলাম। তাঁর ঘোষণায় তিনি বলেন : "দারুল ইসলামে জিহাদ করা কখনও আইনসঙ্গত হতে পারে না। এই উক্তি এতোই পরিচ্ছন্ন যে, এর পেশকতায় কোনো যুক্তি বা নযীরের দরকার করে না। এখন যদিও কোনো বিপথগামী দুর্বৃত্ত ভাগ্যের ফেরে এদেশের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে সে যুদ্ধকে বিদ্রোহ বলে ঘোষণা করা আইনসঙ্গত হবে, আর বিদ্রোহ শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। অতএব এরকম যুদ্ধ হবে বে-আইনী। আর কেউ যদি এরকম বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাহলে মুসলমান প্রজাদের কর্তব্য হবে শাসকদের সাহায্য করা এবং শাসকদের সহযোগিতায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। ফতোয়া-ই-আলমগীরীতে ঠিক এভাবে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" উইলিয়াম হান্টার দি ইন্ডিয়া মুসলমান পৃষ্ঠা ২১৪।		
৪৬।	এম. আর. আখতার মুকুল,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯৬।
৪৭।	বদরুদ্দীন উমর,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫।
৪৮।	আতিউর রহমান, লেনিন আজাদ,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪৬।
৪৯।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৪৭।
৫০।	বদরুদ্দীন উমর,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬৭।
৫১।	প্রনব কুমার চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	আধুনিক ভারত (১ম খন্ড) ১৮৮৫-১৯২০ পৃষ্ঠা ১৪২।
৫২।	সৈয়দ আহমদ খানের চিন্তায় দ্বিজাতিতত্ত্বের চেতনার উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় তার গ্রন্থে ফ্রান্সিস রবিনসনের বক্তব্যের উল্লেখ করে যুক্ত প্রদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশকে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে সৈয়দ আহমদের মতো একজন বিচক্ষন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অকল্যান্ড কলভিন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ইংরেজ প্রশাসকদের বিভেদ নীতি এবং আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষের সাম্প্রদায়িক মনোভাব তার চিন্তার পরিপূরক ছিল। প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক ভারত ১ম খন্ড ১৮৮৫-১৯২০ পৃষ্ঠা ১৪৪।		
৫৩।	প্রনব কুমার চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৪৩।
৫৪।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৪৭।
৫৫।	বদরুদ্দীন উমর,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭১-৭৩।
৫৬।	আনিসুজ্জামান	ঃ	শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতা ১৯৯২ ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১।
৫৭।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২।
৫৮।	P.N. Chopra,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭।
৫৯।	Penderal Moon	ঃ	Divide And Quit P. 11-12.
৬০।	P.N. Chopra,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬।
৬১।	আতিউর রহমান, লেনিন আজাদ,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪০।
৬২।	Sumit Sarkar,	ঃ	The Swadeshi Movement in Bengal P.19-20
৬৩।	সৈয়দ মকসুদ আলী	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮১।
৬৪।	Sumit Sarkar,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫।	মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত,	ঃ	বঙ্গভঙ্গ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ পৃষ্ঠা ৭৩।
৬৬।	১৪ এপ্রিল ১৯০৬-এ বরিশালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ,	ঃ	The Bengalee Culcutta, 15th April, 1906.
৬৭।	সৈয়দ মকসুদ আলী,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮০-৮১।
৬৮।	আতিউর রহমান, লেনিন আজাদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৫০।
৬৯।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৫০।
৭০।	প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৪৬।
৭১।	১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সিমলায় বড়লাট মিন্টোর কাছে যে দাবীপত্র পেশ করেন তার মূল বিষয়গুলি ছিল—সরকারের সামরিক ও বেসামরিক চাকুরীতে মুসলমানদের অধিকসংখ্যক নিয়োগ পৌরসভা ও জেলা পরিষদগুলিতে মুসলমানদের নিয়োগ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি; প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভাগুলিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং একটি পৃথক মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি। প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক ভারত ও ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৪৯।		
৭২।	প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৫২।
৭৩।	আতিউর রহমান, লেনিন আজাদ,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৫০।
৭৪।	প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৫৪।
৭৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৫৪-১৫৫।
৭৬।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৬।
৭৭।	১৯১৬ সালের শেষ দিকে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে প্রসিদ্ধ 'লক্ষ্মৌ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। কংগ্রেস পাঞ্জাব ও মধ্য প্রদেশের মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নেয়। প্রদেশিক আইনসভাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব নিমনরূপভাবে নির্ধারিত হয় : পাঞ্জাব নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যগণের অর্ধেক যুক্তপ্রদেশ " " " " শতকরা ৪০ ভাগ বাংলা " " " " শতকরা ৪০ ভাগ বিহার " " " " শতকরা ২৫ ভাগ মধ্যপ্রদেশ " " " " শতকরা ১৫ ভাগ মাদ্রাজ " " " " শতকরা ১৫ ভাগ বোম্বাই " " " " এক-তৃতীয়াংশ বিপুল রঞ্জন নাথের বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিকাশ গ্রন্থে পৃষ্ঠা ১২২-১২৭ পর্যন্ত বিস্তৃত তথ্য রয়েছে।		
৭৮।	ত্রিপাঠী দে ও বিপলচন্দ্র	ঃ	Freedom Struggle P. 118-119.
৭৯।	R.C. Majumder	ঃ	Struggle for Freedom P. 248.
৮০।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২৪৮।
৮১।	কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটি যে বিষয়গুলোর উপর ঐক্যমত্যে পৌঁছেছিল তা হলো : এক, পাঞ্জাবের অভিযোগ সন্তুষ্টিকরণ। দুই, খিলাফতের প্রতি বৃটিশ তথা মিত্র পক্ষের অন্যায়ের অবসান। তিন, ভারতবাসীকে স্বরাজদান। অপরদিকে খিলাফত কমিটির দাবীগুলো ছিল : এক, খলিফা অর্থাৎ তুরস্কের সুলতানের পার্থিব ও ধর্মীয় অধিকার ও সম্মান রক্ষা করা। দুই, আরব দেশের অন্তর্ভুক্ত পবিত্র স্থানগুলির উপর খলিফার কর্তৃত্ব স্বীকার করা। তিন, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক ভারত ১ম পৃষ্ঠা ২২২-২২৩।		

Dhaka University Institutional Repository

৮২।	প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়	ঃ	আধুনিক ভারত ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ১-৫।
৮৩।	Dr. K.C. Chowdhury	ঃ	Role of Religion in Indian Politics (1990-1925) P. 232-233.
৮৪।	সৈয়দ মকসুদ আলী,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯২।
৮৫।	জওহরলাল নেহরু,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪০৬-৪০৭।
৮৬।	সৈয়দ মকসুদ আলী,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১০২-১০৩।
৮৭।	Round table conference procdings	ঃ	1930-31 P. 96.
৮৮।	ঐ	ঃ	ঐ
৮৯।	জওহরলাল নেহরু,	ঃ	An Auto biography. P. 136
৯০।	প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৮-৪০।
৯১।	বিপুল রঞ্জন নাথ	ঃ	বাংলাদেশের সংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিকাশ পৃষ্ঠা ৪০-৪১।
৯২।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৯।
৯৩।	সৈয়দ মকসুদ আলী,	ঃ	পৃষ্ঠা ১২৮।
৯৪।	Aziz Ahmad,	ঃ	Islamic Mordernism in India and Pakistan P. 161.
৯৫।	অমলেন্দু দে,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬৯।
৯৬।	Aziz Ahmad,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৬১।
৯৭।	জওহরলাল নেহরু	ঃ	ভারত সন্ধানেঃ পৃষ্ঠা ৩৯৩।
৯৮।	অমলেন্দু দে,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬৬।
৯৯।	সৈয়দ মকসুদ আলী,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১২০।
১০০।	ভারত বিভক্তি এবং পরবর্তীতে ইকবালের পরিবর্তিত মনোভাব সম্পর্কে নেহেরু তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন : 'গোড়াতে যদিও ইকবাল পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, মনে হয় তাঁর শেষ বয়সে তিনি এর মধ্যে নিহিত ভ্রম ও অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছিলেন। ইকবালের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা লিখতে গিয়ে এডওয়ার্ড টমসন এরূপ কথার উল্লেখ করেছেন। আলাপ প্রসঙ্গে ইকবাল তাঁকেবলেছিলেন যে মুসলিম লীগ-এর একটি বাৎসরিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে তিনি পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করেছেন সত্য। কিন্তু তার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে পাকিস্তান সমস্ত ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করে মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।' নেহরুর ধারণা ইকবাল পরবর্তীতে যত বদলেছিলেন এবং 'তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে পাকিস্তান পরিকল্পনা কিংবা দ্বিধাবিভক্ত ভারতের কোনো সানঞ্জস্য ছিল না।' নেহরুর মতে; 'শেষ বয়েসে ইকবাল ক্রমেই সমাজতন্ত্রবাদের দিকে বেশী করে ঝুকেছিলেন।।...এমনকি, তাঁর কাব্যেরও মোড় গিয়েছিল ঘুরে।' জওহরলাল নেহরু, ভারত সন্ধানেঃ পৃষ্ঠা ৩৯৪-৩৯৫।		
১০১।	সৈয়দ মকসুদ আলী,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১২৯।
১০২।	অমলেন্দু দে,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭১।
১০৩।	সরল চট্টোপাধ্যায়,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪৪৯।
১০৪।	মাওলানা আবুল কালাম আজাদ,	ঃ	ইন্ডিয়া ইউন্স ফ্রীডম পৃষ্ঠা ২২৪।
১০৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২২৫।
১০৬।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২২৯।
১০৭।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২২৯।
১০৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২৩০।
১০৯।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২৩১।
১১০।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
দেশবিভাগ উত্তর জাতীয়তাবাদী চিন্তা

সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ভাবনার ফসল পাকিস্তান রাষ্ট্রে ১৯৪৮ সাল থেকে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতি চেতনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দুশো বছর বৃটিশ স্বার্থে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোয় বাঙালী হয়েছিল চরম শোষণের শিকার। তার উপর ছিল ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বৃটিশ শোষণ শাসনের নিগড় থেকে মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের ভাগ্য উত্তরণের পথ প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুক্ত করার জন্য বাঙালী মুসলমান ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে সমর্থন দিয়েছিল। যদিও অসাম্প্রদায়িকতাই ছিল বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। দেশ বিভাগ উত্তরকালে নবসৃষ্ট রাষ্ট্রে বাঙালী তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখতে প্রায় স্বীয় ধর্মের কিন্তু ভিন্নভাষী শাসক শোষক শ্রেণী।

বাংলার মুসলিমদের সমর্থন না পেলে পাকিস্তানের জন্ম হতো না। উনিশশ' ছেচল্লিশের নির্বাচনে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে ভারত বিভক্তির পক্ষে ভোট পড়েছিল শতকরা ৫০ ভাগেরও কম।[১] অপরদিকে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোট পড়ছিল শতকরা ৯৮ ভাগ।[২] অথচ বাঙালী মুসলমানের ভোটে যে পাকিস্তানের জন্ম, সেই পাকিস্তানের অংশ বাঙালীর আবাসভূমি পূর্ব বাংলা পরিণত হলো পশ্চিমের শোষণের স্বর্গরাজ্যে।

বাঙালীর ভাষা সাংস্কৃতি ধ্বংসের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শোষণের পথ তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। শুরু থেকেই বাঙালী শাসক শ্রেণীর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে থাকে। আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তা হয় আরও বেগবান। বায়ান্নে হতাশাগ্রস্ত বঞ্চিত বাঙালীর ক্ষোভ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিস্ফোরিত হয়। এদিকে স্বীয় ভাষা সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ধ্বংসের ষড়যন্ত্র রুখতে, রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবীতে পূর্ববঙ্গবাসী একের পর এক আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। আন্দোলনের গতির তীব্রতার সঙ্গে বাঙালী চেতনার প্রকাশ তীব্র হতে থাকে। প্রতিবাদী বাঙালী মানসে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে বাঙালী জাতীয় চেতনার স্ফুরণ ঘটে সে চেতনাকে বুকে ধারণ করে পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী তার ভিন্ন জাতিসত্ত্বার অস্তিত্বের প্রশ্নে হয়ে উঠতে থাকে তীব্রভাবে সচেতন। ধর্মাশ্রিত জাতীয়তাবাদের চিন্তা থেকে সরে এসে তারা ক্রমশ বাংলার আবহমানকালের ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য লালিত অসাম্প্রদায়িক জাতিসত্ত্বা ভিত্তিক আত্মপরিচয়ের দিকে ঝুকে পড়তে থাকে। বাঙালী জাতীয়তাবাদের এই চেতনা তাকে জাতিসত্ত্বা ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে অনুপ্রাণিত করে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বাঙালীর ভাষা সংস্কৃতি ধ্বংসের প্রয়াস বাঙালীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, সবকিছুই তাকে রাষ্ট্রচিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে জাতি চিন্তার পথে ঠেলে দেয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস এই রাষ্ট্রচিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাতি চিন্তার স্ফুরণ ও বিকাশ ইতিহাস—বাঙালী জাতীয়তাবাদের পরিপূর্ণতা লাভের ইতিহাস, যে ইতিহাসের ধারা শেষ পর্যন্ত বাঙালীকে পৌঁছে দেয় মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত রণাঙ্গনে। জন্ম হয় ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক বাঙালী চেনতা সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের।

ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার উন্মেষের পেছনে যে উপাদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে নিঃসন্দেহে তা ছিল বাংলা ভাষা। এবং আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা। এ কারণেই দেখা যায় ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব যেমন বাংলা ভাষা সংস্কৃতির পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে তেমন বাঙালী জাতীয়তাবাদী প্রবণতা সৃষ্টির পেছনে বাঙালীর ভাষা সংস্কৃতির পক্ষের কর্মকান্ড জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনায় গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। ঐতিহাসিক কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার প্রবণতা সৃষ্টির পেছনে যে সকল উপাদান অর্থাৎ বাংলা ভাষা সংস্কৃতি এবং এর পক্ষের কর্মকান্ড বিশেষ অবদান রেখেছে, বর্তমান অধ্যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ঐতিহাসিক প্রবণতা

ভাষা জাতিসত্ত্বার প্রথম শর্ত। ভাষা একটি জাতির জাতীয় চেতনার বাহন। একটি জাতির বিকাশ ভাষাকে কেন্দ্র করেই। আবার ভাষার অগ্রগতির ধারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত জাতিসত্ত্বার বিকাশমান ধারার সঙ্গে। সুতরাং একটি

Dhaka University Institutional Repository

মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন একটি নির্দিষ্ট ভাষা ছাড়া জাতিসত্ত্বা বা জাতীয়তাবাদের চেতনা গড়ে উঠে না, তেমন আবার ভাষার সমৃদ্ধি নির্ভর করে জাতির উৎকর্ষতার মানদন্ডের উপর। আধুনিককালের ভাষা সাহিত্যে বাংলা ভাষার উজ্জ্বল উপস্থিতি এ জাতির উৎকর্ষতার প্রতীক হয়ে আছে। অন্যান্য অনেক জাতির মতো বাঙালী জাতিসত্ত্বার প্রথম শর্ত ও হচ্ছে তার ভাষা এবং তার পরিচয় তার ভাষায়, তার ঐক্য গড়ে উঠেছে তার ভাষাকে কেন্দ্র করে, তার জাতীয়তাবাদের চেতনার উৎস নিহিত রয়েছে তার ভাষা সংস্কৃতির মর্যাদার রক্ষার ইতিহাসে।

যে ভাষার সঙ্গে বাঙালী জাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত সে ভাষা বার বার আক্রান্ত হয়েছে ভিন্নভাষী বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠী দ্বারা। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জাতির অস্তিত্বও বিপন্ন হয়েছে বার বার। প্রাচীনকালে বৌদ্ধ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জাতির মতো বাংলা ভাষা জন্মলগ্নে চরম নিগৃহের শিকারে পরিণত হয়েছে। বৈদিক ভাষা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বিজয়ী শাসক শ্রেণী এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের রোষানলে পতিত হয়েও বাংলা ভাষা তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে মধ্য যুগে সুলতানী আমলে মুসলিম শাসকদের দরবারে নিজস্থান করে নেয় সগৌরবে। ঐ সময়ে বাংলার বিচ্ছিন্ন জনপদগুলি বহিরাগত শাসক কর্তৃক রাজনৈতিক ঐক্য অর্জন করে। ফলে সময়টি সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর একসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার শুভক্ষণ বলে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। এভাবে বাঙালী জাতি চেতনার সংহতির বীজ বপনের শুভ কাজটি ইতিহাসের ঐ অচেতন শক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। একদিকে ভাষা সংস্কৃতির উৎকর্ষতা, অপরদিকে জাতির সংহতি সব মিলে বাঙালী একটি ভাষা ভিত্তিক জাতি হিসেবে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

'ধর্ম যেমন সংস্কৃতি, বিশেষতঃ সাহিত্যের বিকাশের সহায়ক হয়, তেমন ধর্মই শিল্প সৃজন প্রয়াসে নানা দ্বন্দ্বের বা প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে।'[৩] ধর্মের মতো আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ ও ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম এবং প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম একটি জনগোষ্ঠীর জাতীয় চেতনা উদয়ের ক্ষেত্রেও। বাংলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস, বাঙালী জাতির ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করছে। প্রাচীনকালে সেন বংশের বাংলা বিজয় এবং ইতিহাসে সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলাদেশে একক স্বাধীন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।[৪] তবে এ রাজনৈতিক ঐক্য বাঙালীর ভাষা সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে কোনও গুরুত্ব রাখতে পারেনি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের নামে অবদমিত হয়েছে বাঙালী এবং তার ভাষা সাহিত্য। এখানে ধর্ম এবং রাজনৈতিক প্রতিকূলতা উভয় বাংলা ভাষা সাহিত্যে বিকাশের পথে অন্তরায় ছিল। সংস্কৃত হলো আভিজাতদের ভাষা, রাজ পৃষ্ঠপোষকতা পেল সংস্কৃত। বাংলা ভাষা এবং বাঙালী জনগোষ্ঠীর ভাগ্যে আভিজাত্যের মর্যাদা জুটল না। এমনকি লৌকিক সাহিত্য স্রষ্টাদের জন্য সংস্কৃত সাহিত্য চর্চাও ছিল নিষিদ্ধ। বহিরাগত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সমাজে বিশেষ প্রধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়। তাদের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বিশাল বাঙালী জনগোষ্ঠী এবং তাদের ভাষা সাহিত্য কোণঠাসা হয়ে পড়ে। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাট এর আদিবাসী ছিলেন সেন রাজারা।[৫] ধর্ম এবং ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্যের ভিন্নতার কারণে স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা সংস্কৃতির প্রতি কোন রকম আগ্রহ দেখাননি। এ কারণেই সেন আমলে রাজনৈতিক ঐক্য এবং স্বাধীনতা বাঙালী জাতিসত্ত্বা গড়ে ওঠার বিষয়ে বিশেষ কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি।

মধ্যযুগে মুসলিম শাসনকালে শুরু থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত সময়কাল বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বলে চিহ্নিত।[৬] ১২০০ সাল থেকে ১৩৫০ সাল এই দেড়শো বছরে সাহিত্য কর্মের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।[৭] অনেকের ধারণা বিজয়ী মুসলমানরা বিজিত ভিন্নধর্মী জনগোষ্ঠীর সাহিত্য চর্চার প্রতি আদৌ মনোযোগী ছিল না এবং তাদের অত্যাচার উৎপীড়নের কারণে সাহিত্য চর্চা ব্যাহত হয়। এ সম্পর্কে বলা যায় যে, ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার শাসকদের বেশীর ভাগই ছিলেন দিল্লীর অধীনে। দেশজয় করে শাসনকার্য পরিচালনা, বিজয় সংহত করার জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনী—এসব কিছুর জন্যই ছিল অর্থের প্রয়োজন। প্রজানিপীড়ন অর্থ আদায়ের পথে অন্তরায় বিচক্ষণ মুসলিম শাসকরা নিশ্চয়ই তা জানাতেন। খাজনা আদায় না হলে দিল্লীতে অর্থ প্রেরণ ব্যাহত হবে তাও তাদের জানা ছিল। মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের আমলের (১৩৪৫-৪৬) বাংলা সম্পর্কে স্বল্প হলেও যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় জিনিষ পত্রের দাম খুব সস্তা এবং সহজলোভ্য ছিল। জীবন যাত্রা ছিল সরল। তাঁর বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায় যে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের কৃষি কাজ নির্বিঘ্ন ছিল। তিনি মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের মতো এত প্রচুর চাল এবং সস্তা খাদ্যসামগ্রী পৃথিবীর কোথাও দেখেননি। বাংলার প্রাচুর্য এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ তাকে অবাক করেছিল।[৮] এই ধরনের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ প্রজাসাধারণের উদ্বেগহীন মানসিকতার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রমাণ বহন করে। এক্ষেত্রে বিজয়ী শাসনবর্গ কর্তৃক শতাব্দীব্যাপী প্রজা নিপীড়নের ধারণা সম্পর্কে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

Dhaka University Institutional Repository

তবে ঐ সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দেড়শো বছর ধরে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল না। মুসলিম শাসকদের ধর্ম ভাষা সংস্কৃতি কোন কিছুর সঙ্গে স্থানীয় জনগণের যোগ ছিল না। ফলে এদের সঙ্গে শাসক শ্রেণীর যোগসূত্র স্থাপনের জন্যও সময় লেগেছে অনেক। তাও সম্ভব ছিল স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে। বহিরাগত মুসলিম শাসকদের রাজনৈতিক স্থিতি স্থাপন করতে প্রায় এক শতাব্দীকাল পার হয়ে গেছে। বাংলা বিজয়ী ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন মুহম্মদ বখ্‌তীয়ার খলজীর পর থেকে বাংলায় ক্রমাগত চলতে থাকে ষড়যন্ত্র ক্ষমতার লড়াই অন্তর্দ্বন্দ্ব আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ। তাছাড়া ছিল বিদ্রোহী বাংলার শাসকদের দমনের জন্য দিল্লীর সুলতানদের সামরিক অভিযান এই অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বাংলার শাসকরা তাদের সিংহাসন রক্ষা করতে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। ভাষা সাহিত্য তো দূরের কথা প্রজাসাধারণের দিকে নজর দিতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। বখ্‌তীয়ার থেকে ইলিয়াস শাহী বংশের আগ পর্যন্ত বাংলায় যেমন কোন একক ব্যক্তির দীর্ঘকালীন শাসন ছিল না, তেমন কোন বংশ কর্তৃক ধারাবাহিক দীর্ঘকাল শাসনের কোন ইতিহাস নাই। তৎকালীন শাসকদের কেউ কেউ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা কেউ ভোগ করতে পারেননি। ইলিয়াস শাহী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতা সংহত করার পরই জনসাধারণের প্রতি নজর দেয়া মুসলিম শাসকদের পক্ষে সম্ভব হয়। দিল্লীর অধীনে থাকার চেয়ে বাংলায় বাঙালী হয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করাটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। ইলিয়াস শাহী বংশ এবং তৎপরবর্তী সুলতানদের এ বিবেচনাবোধ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা প্রসূত ছিল সন্দেহ নাই। এই দূরদর্শিতার কারণেই বাংলায় মুসলিম শাসন দীর্ঘায়িত হয়েছিল। বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা, বাংলা ভাষা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা বাংলায় সংস্কৃতি ঐতিহ্য ধারণ করে নিজেদেরকে বাঙালী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা, সব কিছুর পেছনে কারণ ছিল রাজনৈতিক স্থায়িত্ব অর্জনের আকাংখা। বশীর আল হেলাল তাঁর গ্রন্থে এর কারণ সম্পর্কে বলেছেন : 'মধ্যযুগে বাংলার সুলতান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁদের সেই উদারতার বিশেষ রকমের মহৎ কোনো কারণ ছিল বলে অনুমান করার যুক্তি নেই। যে কারণে উনিশ শতকের সূচনায় বৃটিশ রাজ বাংলাসহ দেশীয় ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন সেই একই কারণে তাঁরা তা করেছিলেন।'[৯]

দুই যুগের শাসকবর্গের স্থানীয় ভাষা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার পেছনের কারণ এক হলেও উদ্দেশ্যে ভিন্নতা ছিল নিঃসন্দেহে। মুসলিম শাসকদের মূল উদ্দেশ্যে ছিল জনগণের আনুগত্য অর্জনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে দেশ শাসন প্রক্রিয়া চালু রাখা। ভাষা সাহিত্যের উৎকর্ষতার মধ্য দিয়ে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে গড়ে ওঠা সংহতি, তাঁরা ধরে রাখতে চেয়েছিলেন তাঁদের সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে, কিন্তু আধুনিক কালের ইংরেজ শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। শাসন করার জন্য প্রয়োজন হয় জাতীয় ঐক্যের কিন্তু শোষণ নিপীড়নের জন্য প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য সংহতি বিনষ্টের। ইংরেজ শাসকরা এই কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছিলেন।

তবুও ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে বহিরাগত তুর্কী উপকরণ যেমন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও বাঙালী জাতিসত্ত্বা সৃষ্টির প্রধান সংগঠক ছিল তেমন উনিশ শতকেও ইংরেজী উপকরণ ছাড়া জাতীয়তাবাদী আদর্শের উন্মেষ হওয়া সম্ভব ছিল না।[১০] বাংলার ইতিহাসে তাই বহিরাগত উপকরণের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী এবং আঠারো শতকে ইংরেজ এই দুই অনুপ্রবেশ, বাংলার ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি অর্থনীতিও রাজনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল।[১১] উভয় শাসনকালের কাছে বাঙালী তার ভাষা সংস্কৃতির নবজীবন লাভ এবং উৎকর্ষতা ও বিকাশের জন্য ঋণী হয়ে আছে। তবে প্রাচীনকালে যেমন হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বাংলা ভাষার প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতো, মধ্যযুগে, এমনকি আধুনিককালেও মুসলিম মোল্লা শ্রেণী ঐ একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁরা বাংলাকে অমুসলিমদের ভাষা বলে আখ্যায়িত করতে দ্বিধা করেনি। ফলে রাজ পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া সত্ত্বেও বাঙালী মুসলমানের বাংলা ভাষা চর্চায় দ্বিধাদ্বন্দ্বের অভাব ছিল না। ধর্মীয় প্রচারের কারণে তাদের মধ্যে এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, বাংলা হিন্দুদের ভাষা। সুতরাং মুসলমানদের জন্য বাংলা ভাষা চর্চা পাপ। যদিও এদের বাংলায় জন্ম এবং এরা বাংলা ভাষায় কথা বলতেন, তবু এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে বাঙালী মুসলমান ভয়ে ভয়ে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে (অথবা পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগে) বাংলা ভাষা সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।[১২] এই মানসিকতার কারণে তাঁদের লেখায় সংশয় ধর্মীয় পাপবোধের আভাস পরিলক্ষিত হতে থাকে। আবার কেউ কেউ বাঙালী হয়ে জন্মানোটা সহজভাবে মেনে নেননি। তবু যেহেতু বাংলায় জন্ম, বাঙালীরা 'আরবী বচন' বোঝে না, সর্বসাধারণের ভাষা ছিল বাংলা সেহেতু তারা বাংলায় কাব্যচর্চা করতে বাধ্য হয়েছে। বাধ্য হয়ে অনিচ্ছায় বাংলাকে ভাবের বাহন করার দুঃখটুকু তাদের কাব্যে পরিস্ফুট হয়ে আছে। ষোড়শ শতকের কবি সৈয়দ সুলতানের লেখায় আমরা দেখতে পাই এমনি এক অনুভূতির প্রকাশ :

Dhaka University Institutional Repository

কর্ম দোষে বঙ্গেতে বাঙ্গালী উৎপন
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন।
আপনা দীনের বোল একনা বুঝিলা
প্রস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিলা
যে সবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে
পঞ্চালি রচিলুঁ করি আছেত দৃষিতে।
মুনাফিক বোলে মোরে কিতাবেতে পড়ি
কিতাবের কথা দিলুঁ হিন্দুয়ালি করি।
মোহোর মনের ভাব জানে করতারে
যথেক মনের কথা কহিনু কাহারে।[১৩]

ষোড়শ শতকের আরেক কবি মুজাম্মিল বলেছেন :

আরবী ভাষে লোকে না বুঝে কারণ
দেশী ভাষে কইলুঁ তবে পয়ার বচন।
যে বলে বলৌক লোকে করিলু লিখন
ভালে ভাল মন্দে মন্দ না যায়ে খন্ডন।[১৪]

আবার মধ্য যুগেই বাঙালী মুসলমান কবিদের লেখায় সকল ভয়ভীতি উপেক্ষা করে মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে ষোড়শ শতকের কবি সৈয়দ সুলতানের কাব্যেই আবার ভিন্ন সুর দেখতে পাই। সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে দৃঢ় চিত্তে তিনি মাতৃভাষার জয় গেয়েছেন:

যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন
সেই ভাষ হয় তার অমূল্য রতন।[১৫]

বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনতম মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪১০) সকল সংশয় অতিক্রম করে মাতৃভাষায় কাব্য চর্চার সপক্ষে বলেছেন:

নানা কাব্য কথা রসে মজে নরগণ
যার যেই শ্রধাএ সন্তোষ করে মন।
না লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পায়
দুষিব সকল তাক ইহ না জুয়ায়।
শুনিয়া দেখিলুঁ আক্ষি ইহ ভয় মিছা
না হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা।[১৬]

শুরু থেকেই বাংলা ভাষা চর্চায় বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে সকল ধর্মীয় গোড়ামী অতিক্রম করার সাহসী প্রবণতা দেখা গেলেও এর বিপক্ষ শক্তিরও যেমন অভাব ঘটেনি, মাতৃভাষা বিরোধী আচরণে এরা কখনো থেমেও থাকেনি। মধ্যযুগেই একদল মুসলমান ছিল যারা নিজেকে বাঙালী বলে পরিচয় দিতে রাজী ছিল না, বাংলা ভাষার প্রতিও ছিল তাদের অবজ্ঞা। সপ্তদশ শতকের কবি আবদুল হাকিম এদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশ করে তাঁর নূরনামা কাব্যে লিখেছেন:

যেই দেশে সেই বাক্য কহে নরগণ
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবেরগণ।

Dhaka University Institutional Repository

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।
মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি ॥[১৭]

তাঁর এই বক্তব্য থেকে যে মনোভাব প্রকাশ পায় তা হচ্ছে তিনি বিশ্বাস করতেন বংশ পরম্পরায় এদেশের যে ভাষা সংস্কৃতির মধ্যে তিনি লালিত তা তাঁর নিজস্ব সম্পদ। তাঁর ভাষা প্রীতির মধ্যে দিয়ে স্বজাতি বোধ, বাঙালী চেতনা আমাদের চমৎকৃত করে। ভাষার মধ্যে দিয়ে তাঁর জাতি চেতনার প্রকাশ নিঃসন্দেহে গবেষণার বিষয়। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে যে কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে বাঙালী মুসলমানের ভাষাও বাংলা এবং তারা এদেশেরই অধিবাসী। সুলতানী আমলে বাঙালী মুসলমান কবিদের সাহিত্য চর্চার যে ধারাটি প্রবাহমান ছিল, পরবর্তীতে তা সহজভাবে গৃহীত হয়নি। মুসলমানদের এই সমান তালে তাল রেখে চলতে না পারার কারণ সম্পর্কে কাজী মোতাহার হোসেন বলেছেন: 'প্রথমটি মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবহেলা, আর দ্বিতীয়টি ধর্মীয় ভাষা সম্পর্কিত মনে করে উর্দূ ভাষার অহেতুক আকর্ষণ বা মোহ।'[১৮] তাছাড়া তিনি ধর্মীয় ভাষার সঙ্গে যুক্ত ভেবে উর্দূ সম্পর্কে বাঙালী মুসলমানের যে আকর্ষণ ছিল 'পশ্চিমা চতুর লোকেরা এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে।'[১৯] বলে মনে করেন। তাঁর এই ধারণা যে মিথ্যে নয় বাঙালী মুসলমানের এক সময়ের উর্দূ প্রীতিতে তার প্রমাণ রয়েছে।

অপরদিকে ডঃ আনিসুজ্জামান এর কারণ সম্পর্কে বলেছেন: "হোসেন শাহী সুলতানদের মতো মুঘল শাসকেরা কেউ মনে প্রাণে বাঙালী হয়ে ওঠেননি রাজকার্যে নিযুক্ত হয়ে এদেশে যাঁরা অস্থায়ীভাবে এসেছিলেন, বিদেশী সংস্কৃতির ছাপটা তাদের মধ্যে বেশ লক্ষণীয় ছিল। তাছাড়া নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় হিসেবপত্র রাখার বিধি হল ফারসী ভাষায়, তাই সরকারী কর্মচারী ও উচ্চাভিলাষী বাঙালীরা ফারসী শিখতে ও তার চর্চা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার উপর, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর ভারতে উর্দূ ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে এবং আলোচ্য সময়ে আমাদের দেশে তার প্রভাব দেখা দেয়। এই পরিবেশে বহু ফারসী ও হিন্দী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে এবং ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। যদিও চতুর্দশ শতাব্দী থেকে এদেশের শাসন কার্যে ফারসী ভাষার ব্যবহারের ফলে বাংলায় অনেক ফারসী শব্দ গৃহীত হয় এবং বাঙালীরা যথেষ্ট পরিমাণে ফারসী চর্চা করেন। তবু ফারসী ভাষাও সাহিত্যের প্রভাব সর্ব দেশময় ব্যাপ্ত হবার সুযোগ পায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। আর মুঘল দরবারই ছিল এর উৎসমুখ।"[২০]

এছাড়াও ঐ সময়ে ইরানের সফাভি বংশের পতনের ফলে বহু শিয়া জ্ঞানী গুনী ও ধর্মবেত্তা বাংলার শিয়া শাসক বংশের পত্তনকারী মুর্শিদ কুলী খাঁয়ের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হন। এই দেশত্যাগী মুসলমানরা বাংলায় ফারসী ভাষা সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করেন।[২১]

একদিকে উর্দূ ভাষা চর্চার প্রসার অপরদিকে ফারসীর প্রভাব তাছাড়া ধর্মীয় ভাষা আরবীর সর্বক্ষণিক উপস্থিতি তো ছিলই। ফলে বাঙালী মুসলমানের পক্ষে বাংলা ভাষা চর্চার নিজস্ব পথটি বন্ধুর হয়ে উঠতে থাকে। যে ভাষা সাহিত্য একদিন রাজপৃষ্ঠপোষকতা ও হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কবিদের সজীব হাতের ছোঁয়ায় সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল, সুলতানী আমলের অবসানে হস্তদ্বয়ের একটির সজীবতা ম্রিয়মান হয়ে যেতে থাকে। মুসলমান বাঙালী কবিরা যেন নিজদেশ জাতি পরিচয় ভুলে ভীনদেশী মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

মোঘল আমলে বহিরাগত মুসলমান ও স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট শ্রেণী বৈষম্য স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে এক ধরণের হীনমন্যতার জন্ম দেয়। স্থানীয় মুসলমান কবিরা ও এই মনোভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না ফলে মুসলিম সমাজে বিদ্যমান এই আশরাফ-আত্রাফ শ্রেণী বৈষম্য বাংলা ভাষাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই সময় থেকে উর্দূ ক্রমশ আসরাফ শ্রেণী ভাষায় পরিণত হতে থাকে। মুসলমান বাঙালী কবিরাও বাংলা ভাষায় প্রচুর উর্দূ শব্দের ব্যবহার শুরু করেন। তাছাড়া উর্দূর মতো আরবী ফারসী শব্দও মুসলিম কবিদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে যথেচ্ছা প্রবেশ করতে থাকে। কবিদের বিদেশী শব্দের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রয়োগের মতো আত্মঘাতিমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার ফলে মুসলমানদের হাতে বাংলা ভাষা সাহিত্যের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। নবাবী আমলের শেষদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন বাঙালী মুসলমানের জীবনে যেমন এক সম্ভাব্য বিশৃঙ্খল সময়ের ইংগিত বয়ে আনে, তেমন বাংলা ভাষা সাহিত্যের অধঃগতি ত্বরান্বিত করে। সপ্তদশ শতকের শেষ প্রান্তে যে পতন শুরু হয়েছিল

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে তা পতনের শেষ ধাপে এসে উপনীত হয়। নবাবী আমলের পতন, রাজনৈতিক বিপর্যয় বাংলা ভাষা সাহিত্যের জন্য চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিদেশী ইংরেজ বেনিয়াদের শাসন, বিদেশী সস্তা পুঁজির প্রভাব বাংলা ভাষা শৈলীতেও এক রুচিহীন সস্তা আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। এই সময়টি (১৭৬০-১৮৬০) বাংলা সাহিত্যের বিচারে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের অন্তবর্তী ক্রান্তিকাল হিসেবে গণ্য করা হয়।[২২] ঐ সময়ে 'মিশ্র ভাষা রীতির কাব্য' যাকে 'পুঁথি সাহত্যিও' বলা হয়ে থাকে, তাতে বাংলার চেয়ে আরবী ফারসী, উর্দূ এমনকি ইংরেজী শব্দের সংখ্যাধিক ব্যবহার বাংলার নিজস্ব রূপটি হারিয়ে যায়।

বাংলা যেমন বিদেশী পুঁজির প্রভাব বলয়ে থেকে নিজস্ব নিয়মে তার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার হারিয়ে ফেলে তেমন বাংলা ভাষা সাহিত্যের ও নিজস্ব রূপ ঐতিহ্য ধারা বিপর্যস্ত হয়। আবার এই বিপর্যয় ঘটে বাঙালী মুসলমান কবিদের হাতে। সে সময়ে বিপর্যস্ত বাংলা ভাষা সাহিত্যের নমুনা তৎকালীন কবিদের কাব্যে মূর্ত হয়ে আছে। নিম্নে তার কিছু উদ্ধৃত করা হলো।

কেচ্ছার পহেলা আধা শুনিয়া আলম
আখেরী কেচ্ছার তরে করে বড়া গম।[২৩]

উপরোক্ত ছত্রদুটির এগারোটি শব্দের মধ্যে মাত্র চারটি হচ্ছে বাংলা শব্দ। আবার নীচের উদ্ধৃতিতে কোন বাংলা শব্দ নেই:

ভেজ আয় রব মেরে দরুদ ছালাম।
আপনে পিয়ারে নবি পার ভেজ মুদাম।।[২৪]

এই ছিল কোম্পানী আমলের বাংলা ভাষা সাহিত্যের অবস্থা। মধ্যযুগে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে যতটুকু স্বজাতিবোধের জন্ম হয়েছিল; দেশীয় সংস্কৃতির চর্চায় আন্তরিকতা ছিল, ততটুকুও বিনষ্ট হয়ে যায়। বাঙালী মুসলমানের এই শেকড় ছেড়া বিভ্রান্ত যাত্রা চলে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

বিদেশী ইংরেজ শাসকদের বাঙালী জাতির ধর্মীয় স্বাতন্ত্রকে পুঁজি করে তাদের দুটো জাতিতে বিভক্ত করে শাসন শোষণ চালানোই মূল উদ্দেশ্য ছিল। ফলে আধুনিককালে বাংলা ভাষা সাহিত্য চর্চার বিষয়টিও ধর্মীয় গন্ডীতে আবদ্ধ হয়ে দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। যে কারণে দেখা যায় যে মধ্যযুগে বাঙালী মুসলমানদের বাংলা সাহিত্য চর্চার যে ধারাটি বর্তমান ছিল ক্রমাগত তা তার উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে। ইংরেজ আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির যে পরিবর্ত সূচিত হয়েছিল তাতে গ্রামভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে জীবন যাত্রা হয়ে উঠেছিল শহরমুখী। শহরের নগদ অর্থের অধিকারী বেনিয়া শ্রেণী পরিণত হয় সামগ্রিক অর্থনৈতিক সামাজিক এমনকি রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পরিচালকে। যদিও তারা সামনে থেকে দায়িত্ব পালন করেছে আড়ালে ছিল বিদেশী পুঁজি এবং তাঁদের মালিকদের অদৃশ্য অংগুলি নির্দেশ। সমাজের সামগ্রিক কর্মকান্ডের সদৃশ্য পরিচালক বেনিয়া শ্রেণী ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। অপরদিকে বিদেশী শাসকের রাজনৈতিক রোষের শিকার বাঙালী মুসলমানদের হাতে কাঁচা পয়সা ছিল না। নব কাঠামোয় যে শ্রেণী বিন্যাস তাতে হিন্দু মুসলিম কৃষক শ্রেণী সমভাবে শোষিত হলেও বাণিজ্যিক পেশার ঐতিহ্যের এবং বিদেশী শাসকবর্গের প্রতি সহযোগী হওয়ার কারণে, হিন্দু সম্প্রদায় তাদের বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয় (অবশ্য কৃষক এবং নিম্নবর্ণের নিম্নবিত্তের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি)। অপরদিকে বাঙালী মুসলিম সমাজে ব্যবসায়ী ঐতিহ্যের অভাব চরম রক্ষণশীল মনোভাব এবং শাসক বিরোধী ভূমিকার ফলে তারা আধুনিকতার শুভ ফল থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। ফলে হিন্দু মুসলমানের অর্থনৈতিক অবস্থানের দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে যায়। বঞ্চিত বাঙালী মুসলমান বৃটিশ নীতির ফলে অর্থনৈতিকভাবে অনেকদূর পিছিয়ে পড়ে হিন্দু বাঙালী সমাজ থেকে। যখন হিন্দু সমাজ আধুনিক শিক্ষা দীক্ষার পথ বেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন মুসলিম সমাজ মধ্য যুগের অন্ধকারে থেমে আছে। মধ্যযুগে বাঙালী জাতীয় সংহতির মধ্যদিয়ে যে জাতীয়তাবাদের চেতনার স্ফুরণের সম্ভাবনা ছিল তা বিদেশী পুঁজির প্রভাবে ব্যর্থ হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মের মত আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা ভাষা সাহিত্যিকে যেমন প্রভাবিত করে তেমন জাতীয়তাবাদের চেতনা বিকাশের ধারাকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

ইতিহাসের উষাকাল থেকে নানান উপাদানের সমন্বয়ে সন্তর্পণে, সবার অলক্ষে যে বাঙালী জনগোষ্ঠী একটি জাতি হয়ে উঠার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে, গ্রাম সমাজ ভিত্তিক কাঠামো ভাঙ্গার মধ্যদিয়ে। এর ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকেও হিন্দু মুসলমান পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এভাবে মধ্যযুগের কাঠামোয় যে রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক ঐক্য বাঙালীর ইতিহাসে নবযুগের নবচেতনার জন্ম দিয়েছিল, যা আধুনিককালে বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের মাধ্যমে বৃহত্তর রাষ্ট্র গঠন করতে পারত, বৃটিশ পুঁজির হস্তক্ষেপে তা সুদূর পরাহত হয়ে গেল। বিদেশী পুঁজির স্বার্থে বাঙালী চেতনাকে অবলুপ্ত করার জন্য যেমন বাঙালীর অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়া হলো তেমন হিন্দু মুসলিম দুটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা তা ক্রমাগত ঘোষিত হতে লাগল। এই স্বতন্ত্র সত্ত্বার ঘোষণার ফলশ্রুতিতে হিন্দু মুসলমানের চলার পথই শুধু স্বতন্ত্র হলো না, ভাষা সাহিত্য চর্চার ধারাটিও হয়ে গেল ভিন্ন। বিদেশী ইন্ধনে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী সমাজে যে নব জাগরণের সূত্রপাত, ভাষা সাহিত্যকে আশ্রয় করে যে জাতীয়তাবাদের জন্ম তা শেষ পর্যন্ত যেমন হিন্দু নব জাগরণ নামে চিহ্নিত হয় তেমন জাতীয়তাবাদও পরিচিতি লাভ করে হিন্দু জাতীয়তাবাদ হিসেবে। সমগ্র বাংলার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সৃষ্ট এই জাগরণের জোয়ার থেকে বাঙালী মুসলমান বাধ্য হয়েই রইল অনেক দূরে। এমনকি মুসলমানদের পুনর্জাগরণ আন্দোলন মুহূর্তেও হিন্দু মুসলিম পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যায়। এর কারণ সম্পর্কে আনিসুজ্জামান লিখেছেন "মুসলমানের এই পুনর্জাগরণের মুহূর্তে অগ্রসর হিন্দু আর অনগ্রসর মুসলমানদের বাস্তব অবস্থার যে পার্থক্য, তার সঙ্গে উভয় পক্ষের নানা রকম মানসিক কারণ যুক্ত হয়ে তাদের যাত্রা পথ পৃথক করেছিল। যাকে বলা যায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তার বিকাশ ঘটে এ সময়ে। এবং একটি বিশেষ ধর্মের মধ্যে তার প্রকাশ বলে এই আন্দোলন অনেকখানি হিন্দু জাতীয়তাবাদে রূপ নিল। মুসলমানের সঙ্গে তাই এই আন্দোলনের গভীর আত্মিক যোগ স্থাপিত হতে পারল না। রাষ্ট্রিক ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা মুসলমান সমাজে দেখা দিল আরো পরে—তখনো তা স্বাতন্ত্র্যবাদের পথ নিল। উভয় সম্প্রদায়ের অনেকের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমানের একযোগ সম্ভবপর হয়ে উঠল না।"[২৫]

এভাবেই বিদেশী পুঁজির স্বার্থে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভূত শ্রেণী বিন্যাসে, বৈষম্য পরস্পরের মধ্যকার অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব শ্বাসত বাঙালী চেতনাবিকাশে এবং ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু মুসলিম স্বার্থের দ্বন্দ্বে যে চেতনা প্রবাহ ঢাকা পড়ে গেল, তার স্থান দখল করে নিল ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ।

তবু এই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আড়ালে সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সম্ভাবনা। কেননা ধর্মভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশ হয়েছিল শুধুমাত্র একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের একটি শ্রেণীকে নিয়ে। অপরদিকে আরেক সম্প্রদায়ের বাঙালী জনগোষ্ঠী অর্থাৎ বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের যোগ দিয়েছিল, পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে এবং সম্পূর্ণ আর্থ-সামাজিক করণে। যার সঙ্গে না ছিল তার আত্মার যোগ, না ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল। যে কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাঙালী মুসলমানের মধ্যেকার সুপ্ত ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পূনরুত্থান ঘটে এবং ভাষা সংস্কৃতির মধ্যদিয়ে এই উত্থান প্রক্রিয়া দ্রুত হতে থাকে।

ভাষা-সাংস্কৃতিক

382333

বৃটিশ শাসনাধীন পশ্চাৎপদ মুসলমানদের নেতৃত্ব দানকারী প্রায় সকলেই ছিলেন বাংলা ভাষা বিমুখ। এদের মধ্যে সৈয়দ আহমদ খান যিনি ছিলেন উর্দূ ভাষী, নব-আদর্শ প্রচারে তিনি তাঁর মাতৃভাষাকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। উর্দূ ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অপরদিকে বাংলার নবাব আবদুল লতিফ যিনি বাঙালী মুসলমানকে আধুনিকতার পথে টেনে নিয়েছিলেন, তিনি তাঁর মাতৃভাষার প্রতি ছিলেন উদাসীন। তিনি বাঙালী মুসলমানকে দুটো শ্রেণীতে বিভক্তি করে উচ্চ শ্রেণী বা অভিজাতদের জন্য উর্দূ ভাষাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের জন্য তাদের মাতৃভাষা বাংলাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সেই বাংলায় ও যথেষ্ট পরিমাণে আরবী ফারসী শব্দ থাকা বাঞ্ছনীয়।[২৬]

এই ধরণের মাতৃভাষা বিরোধী ভূমিকা এবং মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টির এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি সারা জাতির উপর কি প্রভাব ফেলবে সে সম্পর্কে তৎকালের অনেক নেতার ধারণা ছিল না। এই নীতি বাস্তবায়িত হলে ব্যাপক গণমানুষের থেকে উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং বাঙালী মুসলমানরাও দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে, হয়তো এ বিষয়টি তাঁরা ভেবে দেখেননি।

বাঙালী মুসলমানের নেতৃত্ব ও বাংলার রাজনীতি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন উর্দূভাষী নেতাদের হাতে চলে যাওয়ার ফলে মাতৃভাষা আরেকবার বিপন্ন হয়ে পড়ে। বাঙালীর মুখে ভিন্ন ভাষা তুলে দিয়ে বাঙালীর জাতিসত্ত্বা ধ্বংসের মাধ্যমে তাকে শুধু মুসলমান এই পরিচয়ে দাঁড় করাবার প্রচেষ্টায় মুসলিম নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে এঁদের উত্তরসুরিরা তাদের দায়িত্ব পালনে ছিলেন যথেষ্ট আন্তরিক ও নিবেদিত প্রাণ। বাঙালী মুসলমানদের জন্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের মনেও তাঁর মাতৃভাষা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তাঁদের মাতৃভাষা কি, উর্দূ না বাংলা? এই প্রশ্নে উপর কয়েক দশক ধরে চলতে থাকে তর্কবিতর্ক। উনবিংশ শতকের শেষ প্রান্তে বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্তের উন্মেষপর্ব থেকে এই ভাষা বিতর্কের উৎপত্তি।[২৭] এবং তখন থেকেই এই বিতর্ক পত্রপত্রিকায় স্থান পেতে থাকে। এর মধ্যে বাংলা ভাষা সম্পর্কে বাঙালী মুসলমানের মনোভাবের প্রকাশ ঘটে।

একদল বুদ্ধিজীবী মনে করতেন বাংলা হিন্দুদের ভাষা। আবার একদল বাংলাকে মাতৃভাষার মর্যাদা দিলেও জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকার করতে নারাজ ছিলেন। কেউ কেউ আবার বাংলাকে শুধু মাতৃভাষা নয় জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার মতো সাহসী বক্তব্যও রেখেছেন।

১৯০৩ সালে 'নবনূর' পত্রিকায় বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা, এর বিপক্ষে যে বক্তব্য রাখা হয় তাতে বলা হয়: 'বাঙ্গলা ভাষা হিন্দুগণের ভাষা। হিন্দুগণই যে বঙ্গ সাহিত্য চর্চায় অগ্রণী ও প্রধান হইবেন ইহা কিছুই অস্বাভাবিক নহে।'[২৮] একই পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে যেয়ে বলা হয়: 'বঙ্গ ভাষা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে? যাহারা জোর করিয়া উর্দূকে বঙ্গীয় মুসলমানদের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিতে চান, তাহারা কেবল অসাধ্য সাধনের জন্য প্রয়াস করেন মাত্র।'[২৯]

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উর্দূর প্রতি মনোভাব পাল্টে যেতে থাকে। ১৯১৫ সালে 'আল এসলাম' পত্রিকায় মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও উর্দূ প্রীতির নিন্দা করে বলা হয়: "মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা বাঙ্গালী হইয়া নিজেদের মাতৃভাষা উর্দূ বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কিম্বা 'বাঙ্গালা জানি না ভুলিয়া গিয়াছি', এরূপ বলা-এই মারাত্মক রোগ কেবল এক শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যেই দেখা যায়।"[৩০] কিন্তু নবসৃষ্ট বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যে বাংলা তাঁদের মাতৃভাষা এই ধারণা দৃঢ় হলেও এটিকে তাঁরা জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে তখনও প্রস্তুত ছিলেন না। কেননা জাতি বলতে বাঙালী মুসলমান তখন পর্যন্ত নিজেদেরকে মুসলিম জাতিভুক্ত বলে মনে করতেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মতো বাংলার মুসলমানরাও দ্বিজাতিতত্ত্বের চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তার উপর ছিল অবাঙালী উর্দূভাষী ঢাকার নবাব পরিবারের প্রভাব, বাংলায় তাদের কর্তৃক ইসলামী ভাবধারার সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার প্রবণতা। এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে বাঙালী মুসলমান নিজেদেরকে মুসলিম জাতি বলেই ভাবতে শিখছিল। তাদের নেতৃত্বদানকারী বেশীর ভাগ নেতা, অভিজাত বর্গ ছিলেন উর্দূভাষী। যে কারণে তাদের মধ্যে এমন একটি ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নিয়েছিল যে মুসলমানদের জাতীয় ভাষা উর্দূ। সুতরাং মাতৃভাষা বাংলা হলেও বাঙালী মুসলমানদের জাতীয় ভাষা উর্দূ। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীগণ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে এর আভাস পাওয়া যায়। বাংলাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়ার বিপক্ষে বলতে যেয়ে ১৯১৮ সলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বলেছেন:

"বাঙলার অতিভক্ত কেহ কেহ বাঙালিকে মাত্র মাতৃভাষার আসেন বসাইয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছেন না তাঁহারা বলেন, বাঙলা বাঙালী মুসলমানের কেবল মাতৃভাষা নহে, জাতীয় ভাষা ও বটে....। জাতীয় ভাষা অর্থে বাঙালী মুসলমান জাতির ভাষা ধরিয়া লইলে মুলসমানের বিশ্বানুভূতিকে হত্যা করা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবন নামক পদার্থটি স্বপ্নরাজ্য ছাড়াইয়াও দূরে বহু দূরে চলিয়া যাইবে।"[৩১]

এ বক্তব্যের কারণ হচ্ছে সমসাময়িককালের কোন কোন বুদ্ধিজীবীর চিন্তাভাবনায় বাংলা ভাষাকে বাঙালীর মাতৃভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একে জাতীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহ। এঁদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। ওয়াজেদ আলীর বাংলাকে জাতীয় ভাষা করার বিরোধী বক্তব্যটি আবদুল করিমের বক্তব্যের প্রতিবাদ হিসেবে ছাপা হয়েছিল। যিনি ১৯১৮ সালে আল এসলাম পত্রিকায় বাংলাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে বরণ করার কথা বলেছেন: "মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাষার স্থানে বরণ ব্যতীত কোন জাতি কখনো উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে না।"[৩২]

বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ তাঁদের যুগকে অতিক্রম করে বাংলাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে চাইলেও একে জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতির জন্য বাঙালীর আরও প্রায় তিন দশকের বেশী সময় ব্যয় করতে হয়েছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের মোহমুক্তি না ঘটা পর্যন্ত যেমন বাঙালী মুসলমান বাঙালী আত্মপরিচয় উদঘাটন করতে পারেনি, তেমন পারেনি বাংলাকে জাতীয় ভাষা বলে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে 'উর্দূ ভাষার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম লেখক সম্প্রদায়ই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, প্রথম কলকাতা থেকে তারপর ঢাকা থেকে। বাঙালী অবাঙালী নির্বিশেষে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিলেন উর্দূর সপক্ষে। সমাজের এই মনোভাবের পরিবর্তন আনতে না পারলে ভাষা আন্দোলনের সাফল্য সম্ভব হতো না। লেখক সমাজ এই

Dhaka University Institutional Repository

মনোভাবে পরিবর্তন আনতে সহায়তা করেছিলেন। একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে পূর্ব বাংলার উপর কিরূপ অবিচার হবে এবং তার সংস্কৃতি জীবনে কিরূপ সংকটের সৃষ্টি হবে সেদিকে তারা সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীর সপক্ষে অগ্রগামী ভূমিকা নিয়েছিলেন।...একাধিক্রমে কয়েক মাস ধরে বাংলা ভাষার সপক্ষে তাঁরা লিখেছিলেন: প্রধানতঃ তাদেরই প্রয়াসে শিক্ষিত ও ছাত্র সমাজ বাংলা ভাষার দাবী সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন এবং এভাবেই ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।'[৩৩]

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা এ বিষয়ে দৃঢ়মত পোষণ করতে থাকেন। পাকিস্তান সৃষ্টির আগ মুহূর্ত আবার ভাষা প্রশ্নে বিতর্ক শুরু হয়। এবারের বিতর্কের বিষয় ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জিয়াউদ্দীন আহমদ ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী অনুকরণে ভাবী রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দূ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[৩৪] এর প্রতিবাদ আসে বাঙালী বুদ্ধিজীবী মহল থেকে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেন: "কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দীর অনুকরণে উর্দূ পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাৎগমনই হইবে।...ইংরেজী ভাষার বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে, ইহা পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোনও প্রদেশের অধিবাসীরই মাতৃভাষা নয়। উর্দূর বিপক্ষেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বিভিন্ন, যেমন পুষতু, বেলুচী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী এবং বাংলা; কিন্তু উর্দূ পাকিস্তানের কোনও অঞ্চলেই মাতৃভাষারূপে চালু নয়। যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজী ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয়, তবে উর্দূ ভাষার দাবী বিবেচনা করা কর্তব্য।"[৩৫]

বাস্তবিক পক্ষে উর্দূকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলা হয়েছে এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পরে যে ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ক্রমাগত প্রয়াস চালানো হয়েছে তা আসলে পাকিস্তানের কোন অংশের ভাষা নয়। পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর উর্দূ প্রীতি কারণ সম্পর্কে বলতে যেয়ে বলা হয়েছে "পশ্চিম পাকিস্তানে সামন্তবাদী শক্তি এবং উঠতি বুর্জোয়াদের একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কারোই মাতৃভাষা উর্দূ ছিল না কিন্তু সামন্তবাদী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের তথা শাসকগোষ্ঠীর ভাষা ছিল উর্দূ। অন্যদিকে ভারতবর্ষের মুসলিম শিল্পপতিদেরও ভাষা ছিল উর্দূ। আর এই ভাষার ঐক্যই পরবর্তীকালে তাদের ভিতরে একটি জাতীয়তাবাদী মানসিকতার জন্ম দেয়। অন্যদিকে প্রধান নগরকেন্দ্র সমুদ্রবন্দর এবং অভিজাত সমাজের বাসস্থান পশ্চিম পাকিস্তান হওয়াতে ভারত প্রত্যাগত মোহাজেররা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথেই আতাঁত গড়ে তোলে।"[৩৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কোন অঞ্চলের ভাষা না হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠী এবং তার মিত্রদের ভাষা হওয়ার কারণেই উর্দূ পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। ভারত থেকে আগত উর্দূ ভাষী মহাজের শাসকশ্রেণী তাদের মিত্র আমলা শিল্পপতি পাকিস্তানকে তাদের আবাসস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিল। পাকিস্তানের শাকসগোষ্ঠী ক্ষমতার জোরে মহাজেরদের ভাষা উর্দূকে পাকিস্তানের সমগ্র জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নিম্নের সারণীতে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর একটি শত করা হিসাব প্রদান করা হলো।

পাকিস্তানের মাতৃভাষা সমূহ (শতকরা হিসাব)[৩৭]

ভাষাসমূহ	পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান		পাকিস্তান	
	১৯৫১	১৯৬১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৫১	১৯৬১
বাঙালী	৯৮·১৬	৯৮.৪২	০·০২	০·১১	৫৬·৪০	৫৫.৪৮
পাঞ্জাবী	০·০২	০·০২	৬৭·০৮	৬৬·৩৯	২৮·৫৫	২৯·০২
পস্তু	-	০·০১	৮·১৬	৮·৪৭	৩·৪৮	৩·৭০
সিন্ধি	০·০১	০·০১	১২·৮৫	১২·৫৯	৫·৪৭	৫·৫১
উর্দূ	০·৬৪	০·৬১	৭·০৫	৭·৫৭	৩·৩৭	৩·৬৫
ইংরেজী	০·০১	০·০১	০·০৩	০·০৪	০·০২	০·০২
বেলুচী	-	-	৩·০৪	২·৪৯	১·২৯	১·০৯

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারণী থেকে বুঝা যাচ্ছে যে সংখ্যালগিষ্ঠের ভাষা ছিল উর্দূ, যার শতকরা হার পাকিস্তানের সকল জনগোষ্ঠীর ৩·৩৭ (১৯৫১ সাল অনুযায়ী) ভাগের ভাষা। অপরদিকে বাংলা ছিল শতকরা ৫৬·৪০ (১৯৫১ সাল অনুযায়ী) ভাগের ভাষা। অর্থাৎ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা। জিয়াউদ্দীন এর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকেই বাঙালীর উপর উর্দূ চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর রাষ্ট্রভাষা নিয়ে শুধু বুদ্ধিজীবী সমাজে নয় বিভিন্ন মহলেও তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়। উর্দূর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নটিও সামনে চলে আসে। ঐ সময় তর্কবিকর্তের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে যে বিষয়গুলির অবতারণা হয় গবেষক আবদুল হক তাকে মোট ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন:

এক, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের ভাষা হবে একমাত্র উর্দূ। পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা বাংলা হবে কিনা তা ঠিক করবেন এদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এই ছিল জিন্নাহ ও পাকিস্তান সরকারের নীতি। দুই, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা গবেষক আবদুল হকসহ কয়েকজন লেখক এ দাবী তুলেছিলেন। তিন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা, উর্দূ, ইংরেজী এবং আরবি। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দিলেন এই বক্তব্যের উপস্থাপক। চার, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ও সওগাত পত্রিকার বক্তব্য ছিল—পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী ভাষা (রাষ্ট্রভাষা) এবং আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের ভাষা হওয়া উচিত উর্দূ, উর্দূকে একটা সম্মান দেওয়া উচিত। কিন্তু পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত বাংলা। পাঁচ, পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত উর্দূ এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা। প্রাদেশিক সরকারগণ এ নীতি অনুসরণ করবেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কী নীতি অনুসরণ করবেন, তা বলা হয়নি। ছয়, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা ও উর্দূ। পূর্ব বাংলায় শিক্ষার বাহন হবে বাংলা। বাঙালী উর্দূ শিখবে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীর জন্য। একই প্রয়োজনে পশ্চিম পাকিস্তানীরা শিখবে বাংলা। এই বক্তব্য ছিল তমুদ্দুন মজলিসসহ অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর।[৩৮]

শাসক শ্রেণীর সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দূ হিসাবে চাপিয়ে দেয়ার অভিসন্ধি সম্পর্কে সচেতন বাঙালী প্রথম থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে থাকে। দ্বিজাতিতত্ত্বের জাতীয়তাবাদের জোয়ার তুলে যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয় তার অস্তিত্বের জন্য এই ধর্মীয় জাতীয় চেতনা বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল বাঙালীর ভাষা সংস্কৃতি ধ্বংস করে তার উপর ইসলামের নামে জাতীয় সংহতির দোহাই দিয়ে পশ্চিম অঞ্চলের ভাষা সংস্কৃতি পূর্বের উপর চাপিয়ে দেয়া। অথচ হিন্দু রেঁনেসা অনুকরণে বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবী চেয়েছিল পূর্বাঞ্চলে—অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় তাদের মত করে আরেকটি জাগরণ। যার ফলে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ভাষা-সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্যে নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র একটি ধারার সৃষ্টি হবে। সে স্বতন্ত্র ধারার অর্থ বিজাতীয় ভাষা উর্দূকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ নয় বা বিজাতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে বাঙালীর স্বকীয়তা বর্জন নয়। বরং এ মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত ভাষা-সাংস্কৃতির বিকাশই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। কোন ভাবেই তারা বাঙালী জাতিসত্ত্বার সঙ্গে সম্পৃক্ত ভাষা সংস্কৃতির বিকাশ মেনে নিতে রাজী ছিল না। বাঙালী জাতি সব সময়ই তার স্বতন্ত্রসত্ত্বা সম্পর্কে সচেতন ছিল। এ কারণেই দেখা যায় লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য বাঙালী ভোট দিয়ে ছিল তাতেও ছিল পূর্বাঞ্চলে স্বতন্ত্র বাঙালী রাষ্ট্রের আকাংখা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হওয়া এর লক্ষ্য ছিল না।[৩৯] মুসলিম লীগ প্রধানের বাংলাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি অনেক বাঙালী নেতা সহজভাবে গ্রহণ করেননি।[৪০] ১৯৪৬ সালের ৯ মে তারিখে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম সাংসদের কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের স্টেটস শব্দের এস অক্ষরটি কেটে দেয়ার বিরুদ্ধে কোন কোন বাঙালী প্রতিবাদী হয়ে উঠেন।[৪১] জিন্নাহ সে প্রতিবাদে আমল না দিলেও বাঙালী নেতারা তা ভুলে যাননি। দিল্লী সম্মেলনে জিন্নাহর মনোভাব ছিল বাঙালীর নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রথম সতর্কবাণী।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সচেতনতার ইঙ্গিত ছিল ভাষা সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত পাকিস্তনের দুটি অংশ পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে না ছিল ভাষা সংস্কৃতির মিল, না ছিল প্রাকৃতিক এবং ভৌগলিক পরিবেশে সাদৃশ্য। অবস্থানের দিক থেকে পশ্চিমাংশ ছিল মধ্য প্রাচ্যের কাছাকাছি অপরদিকে পূর্বাংশের অবস্থিতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের নিকটবর্তী। ধর্ম ছাড়া পাকিস্তানের দুটি অংশ সবদিক থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এবং এই রাষ্ট্রে একটি অখন্ড জাতীয়তা গড়ে তোলার ব্যর্থ প্রয়াস চলতে থাকে। একটি নতুন জাতি গড়ে তোলার জন্য যে সকল অভিন্ন উপাদানের প্রয়োজনীয়তা কলা বলা হয়েছে Joseph R strayer-এর ভাষায় ..."those which correspond closely to old political units; those where the experience of living together for many generations within continuing political framework has given the people some sense of indentity; those where the political units concide roughly with a distinct cultural area; and those where there are indigenous institutions, and habits of political thinking that can be connected to forms borrowed from outside".[৪২]

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত পূর্বশর্তগুলোর অভাবে পাকিস্তানের দুই অংশকে নিয়ে একটি জাতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। যেখানে একটি অভিন্ন জাতি গড়ে তোলা অসম্ভব সেখানে অভিন্ন জাতীয় চেতনার জন্ম হতে পারে না। তাছাড়া জাতীয়তাবাদের চেতনা স্বতঃস্ফূর্ত বিষয় এবং এই চেতনা গড়ে ওঠা এবং বিকশিত হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে একটি অখন্ড ভূখন্ডে অবস্থান। জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে সে সংজ্ঞা অনুসারেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে একটি অভিন্ন জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে ওঠা অসম্ভব ছিল। জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেয়ার মত কোন আদর্শ নয়; বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান, সময়ের প্রয়োজনে, অভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বার্থে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরস্পরের প্রতি একাত্মতা অনুভব করে একটি জাতি চেতনায় সম্পৃক্ত হয়ে যে ঐক্য গড়ে তোলে তা থেকে একটি জাতির জন্ম হতে পারে।

শুধুমাত্র একটি উপাদানের (ধর্ম) ঐক্যকে আশ্রয় করে জাতি গড়ে উঠতে পারে না। তাছাড়া পাকিস্তানের শাসকগণের এই জাতি গঠন প্রচেষ্টায় উভয় অংশের জনগণের মধ্যকার ভাবের আদান প্রদান বা ভাষা সংস্কৃতির গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে একটি সমঝোতামূলক জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার প্রবণতা ছিল না। ছিল পূর্ববঙ্গবাসীকে পশ্চিম পাকিস্তানী বানাবার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ বাঙালীকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা সংস্কৃতির শাসন শোষণের নিগড়ে শৃঙ্খলিত করার প্রয়াস।

এর পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল ভাষা সংস্কৃতি নির্ভর বাঙালী জাতিসত্ত্বা ধ্বংস করে বাঙালীর রাজনৈতিক অধিকার হরণ এবং অর্থনৈতিক শোষণ প্রক্রিয়া স্থায়ীকরণ। পশ্চাৎপদ পূর্ব বাংলাকে পশ্চিমা অবাঙালী পুঁজিপতি শ্রেণীর পণ্যের বাজার করার উদ্দেশ্যে তাদের সংগঠন মুসলিম লীগ এবং অবাঙালী আমলা শ্রেণী পূর্ব বাংলায় তাদের স্বার্থ রক্ষার পাহাড়াদারের দায়িত্ব পালন করেছে। এখানে উল্লেখ্য বৃটিশ শাসকবর্গ পাঞ্জাব অধিকার করেছিল শিখদের কাছ থেকে। এ জন্য তারা পাঞ্জাবে শিখদের অবদমিত রাখায় সচেষ্ট থাকে অপরদিকে মুসলমানদের উন্নতিতে সাহায্য করে। যে নীতির কারণে বাংলায় হিন্দু শিক্ষিত সমাজে উত্থান ঘটে সে কারণে পাঞ্জাবে মুসলমানরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের তুলনায় শিক্ষাদীক্ষা চাকুরী সর্বক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যায়। এরাই পরবর্তীতে পাকিস্তানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যদিও 'পাকিস্তানের রাজনৈতিক সামরিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রথমে ছিল ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে হিজরতকারী মোহাজের ও পাকিস্তানের পাঞ্জাবীদের হাতে। পরে পাকিস্তানের সামরিক সদর দফতর রাওয়ালপিন্ডিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হবার পর থেকে ঐ কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ পাঞ্জাবীদের হাতে চলে যায়।'[৪৩]

পাঞ্জাবীরা বাঙালীদের স্বকীয়তা স্বাধীন সত্ত্বা ধ্বংস করে তাকে পাকিস্তানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সব ধরনের আয়োজনে মেতে ওঠে। তার প্রথম আয়োজন হলো সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে এবং বাঙালীর ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে হেয় করা। অথচ বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা এমনকি যারা পাকিস্তান পন্থী ছিলেন তারাও চেয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের ভাষা সংস্কৃতিকে নিজের মতো বিকশিত করতে। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বেই এ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। বাঙালী মুসলমানের মধ্যে যে একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা বিরাজমান ছিল এবং তা রক্ষা করার প্রবণতাও তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল তার আভাস পাওয়া যায় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির উদ্দেশ্য ও কর্ম পরিধির মধ্যে। রেনেসাঁ সোসাইটির নেতা আবুল মনসুর আহমদ ১৯৪৪ সালে রেনেসাঁ সোসাইটির সভায় সভাপতির ভাষণে এ সম্পর্কে বলেন: '...রাজনীতিকের বিচারে পাকিস্তানের অর্থ যাই হোক না কেন, সাহিত্যিকের কাছে তার অর্থ তমদ্দুনী আজাদী; সাংস্কৃতিক স্বরাজ।...রাজনৈতিক আজাদী ছাড়া কোনো জাতি বাঁচতে পারে কিনা সে জবাব পাবেন আপনারা রাষ্ট্র নেতাদের কাছে। আমরা সাহিত্যিকরা এই কথাটাই বলতে পারি যে তমদ্দুনী আজাদী ছাড়া কোনো সাহিত্য বাঁচা তো দূরের কথা—জন্মাতেই পারে না'।[৪৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজ পাকিস্তানের মধ্যে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাবার আশাই করেননি 'তমদ্দুনী আজাদী' ও চেয়েছিলেন। উক্ত বক্তব্যে আরো বলা হয়: 'সংস্কৃতির আইল ভেঙ্গে একই সংস্কৃতির বিশ্বজোড়া মাঠ তৈরি হবে, এ আশা যাঁরা কচ্ছেন, তাঁরা প্রকৃতি আর বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করছেন।...যদি সে চেষ্টা হয় তবে সেটা হবে কালচারাল ফ্যাশিজম বা তমদ্দুনী জুলুমবাজী।'[৪৫] শুধু যে ধর্ম দিয়ে মানুষের জাতীয়তা নির্ণয় করা যায় না এ সম্পর্কে তিনি বলেন: 'ভারতের হিন্দু মুসলমানরা একজাত নয় তাদের সংস্কৃতিও এক নয়। এটা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু হিন্দুরা বা মুসলমানরাই কি এক একটা আস্ত জাতি? অথবা তাদের সংস্কৃতি এক একটা আস্ত কৃষ্টি? তা নয়। আরবী, তুর্কী, পারসী, আফগানীরা এক মুসলমান হয়েও একজাত নয়। ইংরেজ, ফরাসী, ইটালী, জার্মান এক খৃষ্টান হয়েও এক জাতি নয়। এদের ধর্ম এক হলেও তমদ্দুন এক নয়।...ধর্ম থেকেই সংস্কৃতির জন্ম, বীজ থেকেই গাছের জন্ম।...তবু গাছ ও বীজ এক নয়; ধর্ম ও সংস্কৃতিও এক জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীমা ছাপিয়ে উঠতে পারে; কিন্তু তমদ্দুন ভূগোলের সীমা এড়াতে পারে না, বরঞ্চ সে সীমাকে আশ্রয় করে সংস্কৃতির পয়দয়েশ। এইখানেই পূর্ব ও পশ্চিম

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের সরহদ।...এজন্যেই পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দারা ভারতে অন্যান্য জাত থেকে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ধর্মীয় ভ্রাতাদের থেকে একটি স্বতন্ত্র আলাহিদা জাত।'[৪৬]

পূর্ব বাংলার জনগণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণ যে এক অভিন্ন জাতিসত্ত্বা নয় তা তিনি পাকিস্তানের জন্মের আগেই স্পষ্ট ভাষায় বলতে দ্বিধা করেননি। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির শুধু পূর্ব বাংলাকে নিয়ে চিন্তা করেছে, তার বাইরের 'তমদ্দুন' নিয়ে এর কোন মাথা ব্যথা ছিল না। আবুল মনসুর আহমদের বক্তব্যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে। তিনি একই বক্তৃতায় বলেন: "পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি তাই পূর্ব পাকিস্তানেরই রেনেসাঁ আনতে চায়। পূর্ব পাকিস্তান একটি ভৌগোলিক ইউনিট; কিন্তু সাহিত্যিকের চোখে, বিপ্লবীর বিচারে মানুষ ছাড়া ভূগোলের কোন আলাদা সত্ত্বা নেই। তাই রেনেসাঁ সোসাইটি পূর্ব পাকিস্তান বলতে এই ইউনিটের বাসিন্দাদেরকেই বুঝে থাকে। সোসাইটি তাই ভূগোলের নয়, মানুষের রেনেসাঁ আনতে চায়।"[৪৭]

আবুল মনসুর আহমদ যে রেনেসাঁ ঘটাতে চেয়েছিল বাস্তবে তা ঘটেনি। তবে তাঁর বক্তব্যের মধ্যদিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির আগে বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজের ধ্যান ধারণা পূর্ববঙ্গে ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের চিন্তাভাবনা অনুধাবন করা যায়। বাঙালী মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণী পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্র করে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন চেয়েছিলেন এর মাধ্যমে কোলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্যে সংস্কৃতিক আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুক্ত হয়ে নিজস্ব নিয়মে স্বাধীনভাবে স্বীয় মেধার বিকাশ ঘটাতে। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলের চিন্তাভাবনার পরিধিও ছিল পূর্ব বঙ্গকে কেন্দ্র করে। এই মুসলমান লেখকদের মধ্যে দেশ বিভক্তির পূর্বেই এক ধরনের স্বাতন্ত্রবোধ ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক অবস্থার কারণেই তারা নিজেদের নিয়ে স্বতন্ত্র চিন্তা করতে শুরু করেন। এ সম্পর্কে আবদুল হক তার প্রবন্ধে বলেছেন, পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজ যখন আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে তখন তারা হিন্দুদের দ্বারা নানাভাবে উপেক্ষিত হতে থাকে। ফলে এই মুসলমান লেখকদের মধ্যে একটি স্বাতন্ত্রবোধ ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে—যার প্রকাশ ঘটে আরবি-ফারসী-উর্দুসহ বিভিন্ন শব্দ ব্যবহারের মধ্যদিয়ে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানের ইতিহাস উদঘাটিত হলে মুসলমানদের ভিতর এক ধরনের 'গর্ববোধ' সৃষ্টি হয় যা তাদের স্বতন্ত্র চেতনা গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। এই স্বতন্ত্র চেতনাই মুসলমান লেখকদের পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক করে তোলে। তাদের ধারণা ও আশা ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে হিন্দু লেখকদের একাধিপত্য থাকবে না মুসলমানরাই সৃষ্টি করবে বিকশিত সাহিত্য। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই যখন রাষ্ট্রভাষা উর্দূর রব উঠল তখন তাঁদের সামনে নেমে এল হতাশা। কেননা হিন্দু আধিপত্যের হাত থেকে নিস্তার পেতে গিয়ে বাংলা ভাষাকেই নির্বাসন দেবার চক্রান্তকে তারা কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারেননি। এজন্যই তারা এর প্রতিবাদে কলম ধরেছেন। ভাষার প্রশ্নের সাথে তাঁদের লেখায় জড়িত হয়ে পড়ে সরকারী চাকুরী ব্যবসা বাণিজ্যিসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রশ্ন।[৪৮] এভাবে পূর্ববঙ্গের জনগণের জীবনে বাংলা ভাষা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা সমার্থক শব্দে পরিণত হয়। কেননা একটি জাতি যখন ভাষাগতভাবে আক্রান্ত হয় তখন তার সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক তথা সমস্ত দিক থেকেই সে পিছিয়ে পড়ে। বাঙালীকে পিছিয়ে দেয়ার জন্যই পাকিস্তান সরকার প্রথম থেকেই এই ষড়যন্ত্রে হাত দেয়। এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর বলেছেন : ...'তারা (পাকিস্তানী শাসকগণ) মনে করেছিল ভাষাটাকে যদি এখানে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় বা তার জায়গায় যদি উর্দূ চাপানো যায় তাহলে এই যে একটা প্রতিযোগিতা—পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থনীতির ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের একটা সুবিধা থাকবে। এই সুবিধা এখানে করার জন্যই কিন্তু তারা এটা করেছিল।'[৪৯]

এ উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সৃষ্টির পরে বাংলা ভাষা সংস্কৃতির উপর ক্রমাগত বিভিন্নভাবে আক্রমণ চলতে থাকে। যার একমাত্র ফল দাঁড়ায় স্বৈরাচার ও ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাংলা ভাষা এবং বাঙালী সংস্কৃতি রক্ষার বিষয়টি এক হয়ে যাওয়া। তাছাড়া ভারত বিভক্তি পূর্বে বাঙালী মুসলমানের মধ্যে যে, শিল্প সাহিত্য চর্চার শুরু হয়েছিল তাঁদের মধ্যে একদল যেমন ইসলামী ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং একটি স্বতন্ত্র মুসলিম ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্যের ঐতিহ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তেমন ভিন্ন ধারার চিন্তাপ্রসূত একদল বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব হয়েছিল। যাঁরা শুদ্ধ বাংলা চর্চা বাংলা সংস্কৃতি অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাহন ছিলেন; এঁরা মধ্যবিত্ত বা 'পেটি বুর্জোয়া' শ্রেণী। যাঁরা প্রধানত ধনী কৃষকের সন্তান কিছু কিছু ক্ষয়িষ্ণু তালুকদার, শিকদার ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের মধ্যস্বত্বভোগী বংশজাত। এদের শিক্ষা দীক্ষা বাংলা স্কুলে, চাকুরীস্থল মফস্বল শহর। যা ছিল তৎকালীন সময়ে হিন্দু নাগরিক কৃষ্টি ও সমাজ দ্বারা প্রভাবিত। গ্রাম ছেড়ে আসা এই বাঙালী মুসলমানদের অংশটি এই সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এঁরা যেমন রামায়ন মহাভারত ইত্যাদি আখ্যানের সঙ্গে কমবেশী পরিচিতি লাভ করে। তেমন শুদ্ধ বাংলা চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে। বাংলা গান কবিতা উপন্যাস এরা আত্মস্থ করে এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সাহিত্যে আচার অনুষ্ঠান এদের মধ্যে হিন্দুদের প্রভাব অর্থাৎ দেশী ঐতিহ্যের প্রভাব সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরাই মূলতঃ বাংলা সংস্কৃতি এবং অসাম্প্রদায়িকতার ধারক বাহকে পরিণত হয়।'[৫০]

এখানে উল্লেখিত হিন্দু কৃষ্টি বা সংস্কৃতি সাহিত্য মূলতঃ এ অঞ্চলের আবহমানকালের ঐতিহ্য, যা ওয়াহাবী এবং ফরায়াজী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বাঙালী মুসলমান বর্জন করেছিল। পরবর্তীতে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ একটি শ্রেণীর জন্ম হয় তাদের উত্তরসুরীরা এ অঞ্চলে অসাম্প্রদায়িক বাঙালী সংস্কৃতি চেতনার জন্ম দেন। যাকে পাকিস্তানী শাসকবর্গ হিন্দুয়ালী সংস্কৃতি বলে বিদ্রুপ করত এবং হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিল, যা বাঙালীর আত্মমর্যাদায় চরমভাবে আঘাত হানত। এই অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির অগ্রযাত্রায় বাঁধা দেয়ার অর্থ ছিল একে কেন্দ্র করে যাতে কোন জাতীয় চেতনা দানা বেধে উঠতে না পারে। বিশুদ্ধ বাংলা চর্চার অর্থ হচ্ছে আবহমানকালের বাংলা ভাষা সাহিত্য চর্চা এর অর্থ অসাম্প্রদায়িক চেতনার জন্ম, লালন এবং বিকাশ—যার অর্থ বাঙালী জাতি চেতনার উত্থান। অর্থাৎ দ্বিজাতি তত্ত্বের চরম বিরোধী স্রোতের জন্ম। সুতরাং এই স্রোত ঠেকাতে হলে বাংলা ভাষা, বাঙালী ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত চেতনা ঠেকাবার প্রয়োজন ছিল। এজন্য দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষের শক্তি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই বাঙালীর ভাষা সংস্কৃতি বিরোধী এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অপরদিকে বাঙালী তার অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রসার এবং ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয় যে সংঘাত ক্রমে ক্রমে পূর্বকে পশ্চিম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে থাকে। এর সঙ্গে দৃঢ় হতে থাকে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের চেতনা।

রওনক জাহান যথার্থই বলেছেন পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংহতির ব্যর্থতার এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল ভাষা সমস্যা পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের সাধারণ ভাষাগত মিল ছিল না। একে অপরের ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা হলে এটি ছিল একটি প্রদেশের ভাষা, তবু বাঙালীরা প্রায়ই তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রসঙ্গ উথাপনকরত এবং তাদের ভাষার জন্য গর্ববোধ করত—যা ভাষাভিত্তিক জাতীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নিলে ভুল হবে না। বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে আবির্ভূত হওয়ার কারণে পাকিস্তানের শাসকবর্গ বাংলাকে পাকিস্তানের মত মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্য বলে মানতে রাজী ছিল না।[৫১]

অপরদিকে বাংলা বাদ দিয়ে উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করলে বাঙালীর কি অবস্থা হবে এ সম্পর্কে বাস্তব চিন্তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই মোহাম্মদ এনামুল হকের লেখায়। তিনি পাকিস্তান সৃষ্টির তিন মাস পর নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'কৃষ্টি' পত্রিকায় লিখেছেন: "ইহাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্বনাশ ঘটিবে।—উর্দূ বাহিয়া আসিবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মরণ রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু। এই রাষ্ট্রীয় ভাষার সূত্র ধরিয়া শাসন, ব্যবসা, বাণিজ্য, ইত্যাদি সর্ববিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান হইবে উত্তর ভারতীয় ও পশ্চিম পাকিস্তানী উর্দূওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, যেমন ভারত ছিল ইংরেজী রাষ্ট্র ভাষার সূত্রে ইংরেজদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র।"[৫২]

বাঙালীর এই সম্ভাব্য বিপদের চিন্তা সকল সচেতন পূর্ব বঙ্গবাসীর মনেই শংকার সৃষ্টি করেছিল। ফলে শুধু বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সামাজিক সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলো বাংলা ভাষা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার পক্ষে দাঁড়িয়ে ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকে। যে ক্ষেত্র শেষ পর্যন্ত বাঙালী জাতীয়তাবাদের চিন্তাভাবনার প্রবণতা সৃষ্টির পথ প্রশস্ত ও উন্মুক্ত করে।

রাজনৈতিক

বাংলা ভাষাকে প্রথম থেকেই সংঘাত সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে হয়েছে। বিকাশ লাভ করতে হয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বৈরিতা ও বিপত্তির মুখে, যা পৃথিবীর অনেক ভাষার ক্ষেত্রেই তেমন প্রযোজ্য নয়।[৫৩] এমনকি ইংরেজীর সঙ্গে বাংলার ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব এখনও রয়ে গেছে। এমনি অবস্থায় ভাষা নির্মাণের কাজটি যে একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'সাম্প্রতিককালে মার্কসবাদী ও উত্তর আধুনিকতাবাদী চিন্তাবিদ ফ্রেডরিক জেইমসন যাকে বলেছেন সংস্কৃতির রাজনৈতিক কাজ'[৫৪] বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে 'সংস্কৃতির রাজনৈতিক কাজ' প্রথম থেকে শুরু হলেও সুনির্দিষ্টভাবে এটিকে রাজনৈতিক রূপ দেয়ার সাংগঠনিক প্রচেষ্টা শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। বিভাগ উত্তরকালে যা এই অঞ্চলে বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রবণতা সৃষ্টির ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিল। অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনগুলোই মূলতঃ ভাষা সংস্কৃতির আন্দোলনটিকে রাজনৈতিক আন্দোলনমুখী করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতিক আন্দোলনের এই রাজনৈতিক রূপান্তর সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে পাকিস্তান সৃষ্টিলগ্নে বিরাজমান রাজনৈতিক ভাবাদর্শের বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এর ফলে বিভাগ উত্তরকালে ভাবাদর্শের পরিবর্তন, ভাষা সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপান্তর এবং জাতীয়তাবাদ মুখী প্রবণতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হবে।

পাকিস্তান সৃষ্টিকালে এই অঞ্চলে উপস্থিত রাজনৈতিক ভাবাদর্শ বিশ্লেষণপূর্বক অধ্যাপক রংগলাল সেন তিনটি ধারার কথা উল্লেখ করেছেন; এক, মুসলিম জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ বা সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ যার প্রতিনিধিত্ব করতো মুসলিম লীগ। দুই, কিছুটা ধর্ম নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতি যার প্রতিনিধিত্ব করতো জাতীয় কংগ্রেস। তিন, বিপ্লবী সাম্যবাদী ভাবাদর্শ, যার প্রতিনিধিত্ব করতো কমিউনিষ্ট পার্টি।[৫৫]

প্রথমোক্ত দলটি বিভাগ পূর্বকালে ছিল বাংলা ভাষার সমর্থক। অথচ বিভাগ উত্তরকালে পরিণত হলো কট্টর বাংলা ভাষা বিরোধী সংগঠনে। অসাম্প্রদায়িক চেতনার সঙ্গে বাংলা ভাষা সম্পর্কিত হয়ে যাওয়ার কারণেই এদের যাত্রা পথ বদলে যায়। পূর্ববঙ্গের মুসলিম লীগ নেতারা দ্বিজাতিতত্ত্বের সাম্প্রদায়িক চেতনা এবং পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার প্রশ্নে কেন্দ্রের হুকুম ছাড়া একপা এগোবার মতো সাহস রাখতেন না। ফলে সংগঠনটি খুব দ্রুত পূর্ব বাংলায় তার সমর্থন হারাতে থাকে; ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এই গণবিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত হয়। অসাম্প্রদায়িক চেতনার জাগরণের সাথে সাথে এর ব্যর্থতার ইতিহাস তৈরি হতে থাকে। বাঙালী জাতীয়তাবাদ স্ফুরণ বিকাশ ও পরিণতির পথে প্রবল বিরোধী ভূমিকার ফলে এ অঞ্চল থেকে এর অস্তিত্বের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে।

বিভাগ উত্তরকালে মুসলিম লীগ সম্পর্কে এ অঞ্চলের জনগণের ধারণা এবং তার গণবিচ্ছিন্নতার নমুনা নিম্নের সারণীর মাধ্যমে উপস্থিত করা হলো:

১৯৪৭ উত্তর মুসলিম লীগ সম্পর্কে ধারণা

পিতার পেশা	ইতিবাচক	নেতিবাচক	অস্পষ্ট ধারণা	ধর্মান্ধ প্রতিষ্ঠান ধোকাবাজী শোষণের হাতিয়ার	সাম্রাজ্যবাদী দালাল/সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল	গণবিরোধী বুর্জোয়া সংগঠন	দেশের স্বার্থ বিরোধী কাজ ধরদ/ক্ষমতার রাজনীতি করত	মিশ্র রাজনৈতিক দর্শন/দেশের জন্য কিছু করেনি আশা আকাংখা পূরণে ব্যর্থ	মোট
কৃষি	৩	১৫	৬	২	৭	৮	২	১	৪৪
ব্যবসা	২	৯	১	×	১	৪	২	২	২১
চাকুরী	২	১২	৩	১	১২	৫	৬	×	৪১
স্বাধীন পেশা/অন্যান্য	৩	৭	২	×	২	২	১	×	১৭
মোট	১০	৪৩	১২	৩	২২	১৯	১১	৩	১২৩

সূত্র: *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা* ৬ষ্ঠ খন্ড বিশেষ সংখ্যা ১৩৯৫ সাল: পৃষ্ঠা ৮৭।

উপরোক্ত সারণীতে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে দেখা যাচ্ছে মুসলিম লীগের পক্ষে সমর্থক ছিল না বললেই চলে। ১২৩ জনের মধ্যে মাত্র ১০ জন সাতচল্লিশ উত্তর মুসলিম লীগের কর্মকান্ডের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। বাকীরা কোন না কোনভাবে এর বিপক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। মোট কথা বিভাগ উত্তরকালে পূর্ববঙ্গের রাজনীতি সচেতন মানুষ মুসলিম লীগ বিমুখ হয়ে উঠেছিল। এবং তা হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রবণতার প্রস্তুতি পর্বেই।

দ্বিতীয় সংগঠন কংগ্রেস শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করলেও কিছুটা ধর্ম নিরপেক্ষ চেতনায় সম্পৃক্ত ছিল। ভাষা আন্দোলন মুখী প্রবণতায় এর প্রাথমিক ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তার চেয়ে বেশী উল্লেখ করার মতো বিষয় সংগঠনের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষার পক্ষে তাঁর ব্যক্তিগত ভূমিকা।[৫৬] যা এ অঞ্চলের রাজনীতি এবং জাতীয় চেতনার মোর যেমন ঘুরিয়ে দিয়েছিল তেমন ভাষা আন্দোলনমুখী প্রত্যক্ষ রাজনীরিত সূত্রপাত ঘটতেও সাহায্য করেছিল। যেহেতু সংগঠনটি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতো সেহেতু পাকিস্তান সৃষ্টির পরে সদস্যদের ব্যাপক দেশ ত্যাগের ফলে এর দুর্বলতার কারণে বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিকাশের পরবর্তী স্তরগুলোতে এর কোন ভূমিকা ছিল না। তবে এর সদস্যরা যারা পূর্ববঙ্গ রয়ে গেলেন তাঁরা ছিলেন অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতি নিবেদিত প্রাণ।[৫৭]

তৃতীয়টি হচ্ছে কমিউনিষ্ট পার্টি অবিভক্ত ভারতে সংগঠনটি কংগ্রেস মুসলিম লীগের থেকে স্বতন্ত্র ধারার রাজনীতিক আদর্শ অনুসরণ করত। পার্টির দেশ বিভক্তির পরিবর্তে দাবী ছিল ফেডারেল ভারত যার মধ্যে ১৫টি বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির প্রত্যেকের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে।[৫৮] কিন্তু পার্টির দাবী বাস্তবায়িত না হলেও বাস্তবতার কারণে দেশ বিভাগ পার্টিকে মেনে নিতে হয়। বিভাগ উত্তরকালের হঠকারী নীতির

Dhaka University Institutional Repository

ফলে সংগঠনটি একই সঙ্গে গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের রোষানলে পতিত হয়। অখন্ড বাংলায় ২২ হাজার সদস্যের মধ্যে পূর্ব বাংলায় ছিল ১২ হাজার সদস্য।[৫৯] এদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্য থাকায় বিভাগ পরবর্তীকালে দেশ ত্যাগ, তাছাড়া সরকারী নির্যাতনের ফলে আত্মগোপন কারারুদ্ধ ইত্যাদির কারণে পার্টির সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল হয়ে পরে। ১৯৫০ সালের আগে পার্টির ভ্রান্তনীতির পরিবর্তন ঘটেনি।[৬০]

তবুও বিভিন্ন বিভ্রান্তি সত্ত্বেও ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস চলাকালে পূর্ববঙ্গে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে যে প্রাথমিক ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তাতে কমিউনিষ্ট কর্মীরাও অংশগ্রহণ করে।[৬১] অবশ্য ভারত বিভক্তি পরিকল্পনা ঘোষণা হওয়ার পর পার্টির ভবিষ্যৎ কার্যক্রম বিবেচনার জন্য ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি কলকাতায় যে বৈঠকে মিলিত হয়; তাতে ভাষা প্রশ্নে কোন আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলেও সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবেচনার পর ঠিক হয় যে হিন্দী ও উর্দূ যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।[৬২] তৎকালীন কমিউনিষ্ট নেতা শহীদুল্লাহ কায়সার পার্টির এই ধরনের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে বলেছেন: "পার্টি অবশ্য সে সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। আসলে কোলকাতার এই বৈঠকে সি,পি,আই তখন ভাষা প্রশ্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করেনি। ১৯৪৮ এর জানুয়ারী মাসে অবশ্য তারা উপলব্ধি করে যে সমগ্র প্রশ্নটি জাতীয় প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত। সে সময় পূর্ববঙ্গ শাখার একটি জরুরী বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে বাংলা এবং উর্দূ উভয়ই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সেই অনুযায়ী সি, পি, আই কর্মীরা পার্টির অনুমতিক্রমে ১৯৪৮ সালে মার্চ মাসে ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়।...পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা হিসেবে বাংলা প্রচলনের প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য ১৯৪৮ সালে ফজলুল হক হলে একটি বৈঠক ডাকে। সে সময় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্ন ওঠেনি।"[৬৩]

তবে ঐ বৈঠকেই শামসুল আলমকে কনভেনর করে একটি সর্বদলীয় ভাষা কমিটি গঠন করা হয়।[৬৪] এভাবেই কমিউনিষ্ট পার্টি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে থাকে। তাছাড়া পঞ্চাশ সালের পর পার্টির গণবিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য এবং সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য পার্টি ধীরে ধীরে বাংলাদেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ছাত্র যুবকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। রাজনীতিকে অসাম্প্রদায়িক ধারায় প্রবাহিত করার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এবং এদেশের প্রগতিশীল আন্দোলনগুলোতে নানাভাবে সহযোগিতা করতে থাকে। বদরুদ্দীন উমরের ভাষায় পার্টির বিপর্যয় এবং অচল অবস্থা দূর হয়, "১৯৫১ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ সংগঠিত হওয়ার পর। কারণ এই সংগঠনটির মধ্যে বহু কমিউনিষ্ট এবং কমিউনিষ্টদের সাথে সম্পর্কিত রাজনৈতিক কর্মী সমবেত হন ও জনগণের মধ্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্মধারার প্রসার ঘটাতে চেষ্টা করেন। যুবলীগ খুব দ্রুত বিকাশ লাভ করে এক বৎসরের কম সময়ের মধ্যেই পরিণত হয় ছাত্র যুবকদের একটি ব্যাপক গণসংগঠনে।"[৬৪]

ভাষা আন্দোলনে পার্টির সদস্যরা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত পার্টি এই আন্দোলনকে বাম ঘেষা রাজনীতিতে পরিণত করতে সদা সচেষ্ট থাকে। তাছাড়া বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধাপে ধাপে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে বিশেষভাবে সক্রিয় থাকে। সব ধরনের সরকারী নির্যাতন এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পার্টির সদস্যরা এদেশের সকল প্রগতিশীল আন্দোলনে সক্রিয় থাকে। এভাবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের চিন্তাভাবনা যত বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে সমাজতন্ত্র শব্দটিও অসাম্প্রদায়িকতা শব্দটির মতই এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে থাকে।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকলেই সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও এদের বেশীর ভাগই ছিলেন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। নিম্নের সারণীতে তার নমুনা উপস্থিত করা হলো। এখানেও ১২৩ জনের উপর জরিপ কার্য চালানো হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের রাজনৈতিক দর্শন।

আয়ের বিন্যাস	উদার গণতন্ত্র	ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা	সমাজতান্ত্রিক	অন্যান্য	মোট
০.০০-২০০০.০০	৯	১	২৩	-	৩৩
২০০০.০০-৬০০০.০০	৮	৪	২৬	-	৩৮
৬০০০.০০-১৫,০০০.০০	৩	২	১৮	১	২৪
১৫,০০০.০০	৫	১	৪	-	১০
তথ্য পাওয়া যায়নি	৭	-	১১	-	১
মোট=	৩২	৮	৮২	১	১২৩
শতকরা হার	২৬.০২	৬.৫০	৬৬.৬৭	.৮১	১০০

সূত্র: *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা* ৬ষ্ঠ খন্ড ১৩৯৫ সাল পৃষ্ঠা ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

এখানে দেখা যাচ্ছে ১২৩ জনের মধ্যে ৮২ জনই সমাজতন্ত্রের দর্শনে বিশ্বাসী, শতকরা হিসেবে ৬৬·৬৭ ভাগ। ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারীদের রাজনৈতিক পরিচয়েও দেখা যায় এদের বেশীরভাগ বামপন্থী রাজনৈতিক দর্শনের সমর্থক, বা সক্রিয় কর্মী।

বিভাগ পূর্বকালে আরো কিছু সংগঠনের জন্ম হয়েছিল যার সদস্যরা কিছুটা হলেও অসাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনা করতেন এবং বাংলা ভাষা প্রশ্নে ছিলেন আপোষহীন। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যেমন বাংলা ভাষার পক্ষে একটি প্রগতিশীল অংশ ছিল যারা পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকেই স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করতেন এবং নিজস্ব মতামত নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতেন, তেমন রাজনীতিবিদদের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়াও মুসলিম লীগ বিরোধী একটি প্রগতিশীল অংশ ছিল যারা কামরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গণআজাদী লীগ নামে ভিন্ন একটি সংগঠন গড়ে তোলেন।[৬৬] ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে সৃষ্ট সংগঠনটি বাংলা ভাষা প্রশ্নে দৃঢ় মত ব্যক্ত করে। এর ম্যানিফেস্টোতে তার প্রতিফলন ঘটে। এতে বলা হয় "মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করিতে হইবে।...বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।"[৬৭]

পাকিস্তান সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থে যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাতে বাঙালী জাতীয়তাবাদের কয়েকটি লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় ভাষা ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্রচেতনা এবং সে স্বাতন্ত্রের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার তীব্র ইচ্ছা প্রকাশের মধ্যদিয়ে। এ লেখা লেখির মধ্যদিয়ে স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠী হিসেবে বাঙালীর অর্থনৈতিক স্বার্থবোধের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে।[৬৮] গণআজাদী লীগের ম্যানিফেস্টোতেও শুধু ভাষাগত স্বাতন্ত্রের প্রশ্নটি স্থান পায়নি অর্থনৈতিক স্বার্থবোধ ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। সংগঠনটি সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িক মনোভাব মুক্ত না হলেও এর মধ্যে অর্থনৈতিক মুক্তিও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ আগ্রহের প্রকাশ ঘটে।[৬৯] সংগঠনটির বক্তব্যে জনগণের স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। এতে বলা হয়: "দেশের স্বাধীনতা ও জনগণের স্বাধীনতা দুইটি পৃথক জিনিষ। বিদেশী শাসন হইতে একটি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে; কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে সেই দেশবাসীরা স্বাধীনতা পাইল। রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন মূল্যই নাই, যদি স্বাধীনতা জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়ন না করে? কারণ, অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা স্থির করিয়াছি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে থাকিব। এতদুদ্দেশ্যে আমরা দেশবাসীর সম্মুখে আদর্শ ও কর্মসূচী উপস্থিত করিতেছি।"[৭০]

এই ম্যানিফেস্টোতে পূর্ব পাকিস্তানকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা এবং মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভংগী আনয়নের কথাও বলা হয়। ম্যানিফোস্টোতে বক্তব্য এমনভাবে উপস্থিত করা হয় যাতে সহজেই ধারণা হয় যে পূর্ব পাকিস্তান একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।[৭১] এই ধরনের চিন্তা সম্পর্কে গণআজাদী লীগের আহ্বায়ক কমরুদ্দীন আহমদ তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, '১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান জন্ম নেয়ার পূর্বেই তাঁরা লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে চিন্তা করেছেন এবং তার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রীক কাঠামো সেইভাবে রূপায়িত করাকেই গণআজাদীর প্রথম ধাপ বলে বিবেচনা করেছেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার সংকল্প করা হয়েছে এবং অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠন করার আদর্শ দেশে উপস্থিত করা হয়েছে।'[৭২] এখানে উল্লেখ্য যে এই ম্যানিফেস্টোয় মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এবং রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গটি ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিলে পেশ করার জন্য প্রণীত মুসলিম লীগের শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত অন্যতম দাবীগুলোর অনুরূপ। মুসলিম লীগ এবং এর প্রগতিশীল অংশের চিন্তাভাবনাও ছিল পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্র করে এর পেছনের কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই যে তখনো পর্যন্ত মুসলিম লীগ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়নি। কাজেই গণআজাদী লীগের মুখপত্রদের হয়তো ধারণা ছিলো যে পাকিস্তানের দুই অংশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি রাষ্ট্রীয় একক হিসেবে মোটামুটিভাবে গণ্য করা যেতে পারে।[৭৩]

বুদ্ধিজীবী মহলের মধ্যে যেমন বাঙালীর ভাষা সংস্কৃতিগত স্বতন্ত্র চেতনা ও স্বতন্ত্র অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার তীব্র আকাংখা ছিল, তেমন বাঙালী রাজনীতিবিদদের মধ্যেও এ অঞ্চলের জনগণের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে একটি ভাষাভিত্তিক একক রাষ্ট্র গঠনের তীব্রবোধটি স্বাভাবিকভাবে অবস্থান করছিল। এই উভয় শ্রেণীর চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় বিভাগ পূর্বকালে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে এ অঞ্চলে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে জনগণের দেয়া রায়ের (১৯৪৬ সালের নির্বাচন) মধ্যে। এভাবেই পূর্ব বঙ্গে সর্বস্তরের জনগণের ইচ্ছার মধ্যে ভাষা ভিত্তিক ভিন্ন রাষ্ট্র গঠনের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বেই। গণআজাদী লীগের কার্যক্রমের খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। তবে এর মধ্য দিয়ে যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে তা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ভাষা আন্দোলন এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই সংগঠনের উপস্থিতির মধ্যদিয়ে আরো একটি বিষয় বুঝা যায় যে পাকিস্তান সৃষ্টির লগ্নের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক জোয়ারের মধ্যেও যুব সমাজের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিরাজমান ছিল। এই সংগঠনের সদস্যরাই আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। বিশেষ করে কমরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ এবং আরো কয়েকজন।

বিভাগ উত্তরকালে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময়ে সৃষ্ট সংগঠনগুলো ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে। রাজনৈতিক ছাড়াও সামাজিক ধর্মীয় সংস্থা ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে পরোক্ষভাবে বাঙালী জাতীয় চেতনা প্রসারে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। ছাত্র যুব সমাজের যে সচেতন প্রগতিশীল অংশের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের উপস্থিতি বিভাগ পূর্বকালে ছিল পরবর্তীতে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ধারার সঙ্গে যুক্ত ছাত্রদের মধ্যে এদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্টের পর কোলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে উপস্থিত ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে এই অসাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এরা পূর্ব বাংলায় তাঁদের পরবর্তী কর্তব্য স্থির করে পরিবর্তীত পরিস্থিতির কারণে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাকিস্তানে অসাম্প্রদায়িক ধারার রাজনীতি প্রবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।[৭৪] ঐ প্রয়োজনের কথা ভেবেই এদের মধ্যে কয়েকজন কর্মী ঢাকায় উপস্থিত হয়ে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং এদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন।

এদিকে ইতিমধ্যে ঢাকার ছাত্রদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক একটি সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দেয়। একদল সরাসরি অসাম্প্রদায়িক সংগঠনের পক্ষে থাকলেও অপর দল পরিস্থিতির কারণে সাম্প্রদায়িক নামের আড়ালে অসাম্প্রদায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। যে কারণে একটি প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠনটির নাম 'মুসলিম ছাত্র লীগ' রাখার কথা বলা হয়। মুসলিম শব্দটি রাখার কারণ ছিল যাতে বাইরে থেকে এর অসাম্প্রদায়িক রূপটি ধরা না পড়ে এবং কমিউনিষ্ট বলে এর উপর বিরোধী এবং সরকার পক্ষের কোন হামলা না হয়। যদিও এর আগে থেকে ছাত্র ফেডারেশন নামে একটি প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব তখন পর্যন্ত ছিল। তবে কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণে মুসলমান ছাত্ররা সরাসরিভাবে এতে যোগাযোগের পক্ষপাতি ছিল না। ফলে 'মুসলিম ছাত্র লীগের ছায়ায় ভিন্ন আরেকটি অসাম্পদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়াস নেয়া হয়। সম্মেলনের আগের দিন (৩০ আগষ্ট) একটি ঘরোয়া বৈঠকে 'মুসলিম ছাত্র লীগ' এর মুসলিম শব্দটি কেটে দেয়া হয়। ঢাকায় ছাত্রদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক ধারা যে রাজনৈতিক প্রবণতা শুরু হয়েছিল, উপরোক্ত কর্মকান্ড সেই ধারা বজায় রাখার সাহসী পদক্ষেপ সন্দেহ নাই। তবে এই পদক্ষেপটি বাস্তবায়িত করতে আরো কয়েক বছর সময় লাগে।

৩১ আগষ্টে যুব সম্মেলনের নির্ধারিত সভা অনুষ্ঠিত হতে না পারার কারণে সেপ্টেম্বরের ৬, ৭ তারিখ সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ করাহয়। সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুগ লীগ গঠন সম্পর্কিত ছাড়াও ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। পূর্ব বাংলার ছাত্র যুব সমাজ নিজের ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ করে। এ বিষয়ে তাদের চিন্তাধারা সম্মেলনের প্রস্তাবগুলোর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠে। এ সম্মেলনে ভাষা বিষয়ক যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে বলা হয়: 'পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।'[৭৫]

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের পক্ষ থেকে যুব ইস্তেহার নামে অপর একটি ঘোষণাও উক্ত সম্মেলনে গৃহীত হয়। ঘোষণায় বলা হয়: 'নিজের মাতৃভাষায় বিনা খরচে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পাওয়ার মৌলিক অধিকার প্রত্যেক ছেলে মেয়ের রহিয়াছে এবং তাহা তাহাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে।'[৭৬]

ঘোষণাটিতে যেমন সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্প চর্চার বিকাশের সুযোগ এবং সহযোগিতা দাবী করা হয় তেমন সাংস্কৃতিক স্বাধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট দাবী জানান হয়। ইস্তেহারটিতে বলা হয়: 'যুবকদের সকল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার মূলনীতিকে সর্বদা প্রাধান্য দিতে হইবে। যুবকেরা কার্যে যাহাতে উত্তম সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য এবং ছবি উপভোগ করিতে ও বুঝিতে পারে তাহার সুযোগ দিতে হইবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল্যবোধ বাড়াইবার

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য এবং বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয় সুবিধা দান করিতে হইবে। এই প্রয়োজনে যুব কেন্দ্র গড়িয়া উঠা যুব কেন্দ্র এবং যুব সংগঠনকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য দান করিতেই হইবে।'[৭৭] ইস্তেহারটিতে সাংস্কৃতিক স্বাধিকার বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পার্থক্যের স্বীকৃতি সম্পর্কে বলা হয়: 'রাষ্ট্রের অধীনস্থ বিভিন্ন এলাকার পৃথক পৃথক সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশকে সরকার স্বীকার করিয়া নিবেন, জীবন এবং সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলিতে এই সব এলাকার সকল ব্যাপারে স্বায়ত্তশাসন মানিয়া লইতে হইবে।'[৭৮]

যুব সম্মেলনের বক্তব্য থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ভাষা সংস্কৃতির বিষয়ে যুব সমাজের চিন্তাভাবনা ছিল প্রথম থেকেই। উপরোক্ত যুব সমাবেশ ভাষা সংস্কৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে এই স্বতন্ত্র সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবীও করেছে। স্বায়ত্তশাসন ছাড়া কোন অঞ্চলের ভাষা সংস্কৃতি বিকাশ যে সম্ভব নয় বিষয়টি তখন থেকেই তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ১৯৪৭ এর ৩ জুন বৃটিশ বড়লাট কর্তৃক ভারত বিভাগের পরিকল্পনা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কেননা এতে যে লাহোর প্রস্তাবকে উপেক্ষা করা হয় তা চূড়ান্তভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠে।[৭৯] তাছাড়া এর ফলে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই বিতৃষ্ণ একদল বাঙালী মুসলমান তরুণ সংগঠন ছেড়ে ভিন্ন পথে পা বাড়ায়। নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন এই তরুণ সমাজ পূর্ব বাংলার সকল স্বার্থের ব্যাপারে হয়ে ওঠে আপোষহীন। তাদের এই আপোষহীন মনোভাব শুধু বিভিন্ন অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি অধিকার আদায়ের আপোষহীন সংগ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে সামনে চলে আসে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটিও। এভাবে মুসলিম লীগ থেকে বেড়িয়ে আসা তরুণরা ভিন্ন একটি রাজনৈতিক পরিমন্ডল তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এবং ভাষা সংস্কৃতির অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

দেশবিভাগ উত্তরকালে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ধারার নবসংযোগ ছিল পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব লীগ। কমিউনিষ্ট ও হাশিমপন্থী যুবকরা যাঁরা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং গণআজাদী লীগ গঠন করেছিলেন তারাই উক্ত সংগঠনটি গড়ার বিষয়ে উদ্যোগী হন। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটি তীব্র সরকারী নিপীড়ন এবং কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক জাতীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতি গুরুত্ব না দেয়ার কারণে এক বছরের মধ্যে এর বিলুপ্তি ঘটে।[৮০] তবু জনগণের পক্ষে ভাষাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রশ্নে এর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত এক ইস্তেহারে বলা হয়: 'পূর্ব পাকিস্তানের মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর যুবকদের মধ্যে আজ প্রশ্ন জাগিয়াছে গত যুব সম্মেলনে যে গণদাবীর সনদ রচিত হইয়াছিল, যে প্রেরণা ও চেতনা লইয়া যুবকগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, গত এক বছরে তাহার কতটুকু সফলতা লাভ করিয়াছে? আমরা কি পূর্ণ স্বাধীনতা সুখ ও গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইতেছি? না ক্রমেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের পাকে জড়াইয়া পড়িতেছি, দেশবাসীর জীবনে দুঃখ দুর্দশা কমিতেছে না আরো বাড়িয়া চলিয়াছে।"[৮১]

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায় যে সচেতন যুব সমাজের মনে পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছরের মধ্যে স্বাধীনতার স্বার্থকতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কেও প্রশ্ন দানা বেধে উঠেছিল। উক্ত ইস্তেহারে 'গণদাবীর সনদ' হিসেবে যে ১২ দফা কর্মসূচী উপস্থিত করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, বৃহৎ শিল্প, ব্যাংক বীমা কোম্পানী জাতীয়করণ ইত্যাদি। ১২ দফার তিন নম্বর দফায় বলা হয় 'ভাষার ভিত্তিতে স্বয়ং শাসন অধিকার সম্পন্ন প্রদেশ গড়িবার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লইতে হইবে।'[৮২]

আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলনে সংগঠনের কর্মীদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। যুব সংগঠনটির অবলুপ্তির প্রায় তিন বছর পর ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় দফায় যে যুব লীগ গঠন করা হয় তার নাম পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ। 'এই যুব সংগঠনটি গঠন করার পেছনেও অবদান ছিল কমিউনিষ্ট ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক যুব কর্মীদের। নতুনভাবে পূনর্গঠিত যুবলীগও তার পূর্বসূরীর মত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির নিশান সামনে তুলে ধরেছিল। ভাষা আন্দোলনে রেখেছিল এক উজ্জ্বল অবদান। গড়ে তুলেছিল এক শক্তিশালী বিস্তৃত সংগঠন।'[৮৩] ভাষা আন্দোলনের পূর্ব মুহূর্তে ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে যুব লীগের দ্বিতীয় সম্মেলনের রিপোর্টে জানা যায় যে, পূর্ব বাংলার ৮টি জেলায় এর শাখা গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন জেলা ও ঢাকা শহরে অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ ছাত্র এবং যুবকদের একটি সংগঠিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুবলীগ ভাষা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত এবং অপেক্ষমান ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত যুব সমাজে পাকিস্তানে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চরম হতাশার সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

হয়। যুব লীগের ঘোষণা পত্রে তার প্রকাশ লক্ষণীয়। এতে বলা হয়: 'আমরা মধ্যবিত্ত যুব সমাজ স্বপ্ন দেখিয়েছিলাম— পাকিস্তানে আমরা চাকুরী পাইব, ব্যবসা বাণিজ্য বিকাশের সুযোগ পাইব, পাইব উন্নত সংস্কৃতি ও উন্নততর জীবন ধারণের মান। কিন্তু বাস্তবতার নিষ্ঠুর কষাঘাতে সে স্বপ্ন আমাদের ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অভাবের তাড়নায় আমরা জর্জরিত। শহরের বাসস্থানের অভাব আমাদের এক বিরাট সমস্যা। তদুপরি আজ আমরা ১৫ লক্ষের বেশী বেকার এক মুঠো ভাতের জন্য এখানে ওখানে ধর্না দিতেছি, আত্মহত্যা পর্যন্ত করিতেছি।'[৮৪]

যুব সংগঠনটির সদস্যদের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে এই ধরনের হতাশার সঙ্গে যোগ হয় ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার প্রবণতা। ঘোষণাটিতে এ সম্পর্কে বলা হয়: "...সরকার পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মাতৃভাষার দাবীকে উপেক্ষা করিয়া আমাদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করিতেছেন। বিশেষতঃ অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পাকিস্তানের শতকরা ৬২ জনের মাতৃভাষা বাংলা ভাষার দাবীকে উপেক্ষা করিয়া উর্দূ চাপাইতেছে এবং আরবী হরফে বাংলা লিখার উদ্ভট পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার জন্য অজস্র অর্থের অপচয় করিতেছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে উর্দূ ও বাংলা একত্রে রাষ্ট্র ভাষা হইলে পাকিস্তান দুর্বল হইবে না। এবং আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, আরবী হরফে বাংলা লিখার ব্যবস্থাকে আমাদের উপর চাপাইয়া দিলে আমরা দেশের যুবক সমাজ চিরদিনের জন্য অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়া যাইব; আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে।"[৮৫]

তাছাড়া ঘোষণা পত্রে 'আমাদের ঘোষণা ও দাবী' শীর্ষক অংশে প্রত্যেকটি ভাষাভাষী প্রদেশের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবী জানান হয়। এমনকি প্রত্যেকটি উপজাতির কৃষ্টির স্বাধীনতা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অধিকারের কথাও বলা হয় এবং বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী জানানো হয়।

নব সৃষ্ট রাষ্ট্রে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুব সমাজের মধ্যে হতাশা, ক্ষোভ তাদেরকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথ অনুসন্ধানে ব্যপ্রিত করেছিল; তারাই অসাম্প্রদায়িক সংগঠনের মাধ্যমে সেই পথ অতিক্রম করার পক্ষে ভাষা আন্দোলনকে শক্ত হাতিয়ার হিসেবে আক্রে ধরে। ফলে ভাষা আন্দোলন এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ একই পথ ধরে চলতে থাকে। যার সঙ্গে সঙ্গী হয় বাঙালী চেতনার শাশ্বত ধারা।

শুধু যুব সমাজে নয় পাকিস্তান সৃষ্টির স্বল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব বাংলার রাজনীতি অঙ্গনে ভিন্ন হাওয়া বইতে শুরু করে। বাঙালীর স্বার্থ সচেতন নেতারা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিত হতে পারেননি। তাই মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকে বাঙালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ধীরে ধীরে সরে আসেন এবং জনগণের সারিতে এসে দাঁড়াতে থাকেন। তারই উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ১৯৪৯ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ।'[৮৬] এই দলটি সৃষ্টি হয়েছিল মুসলিম লীগের অভ্যন্তরের আবুল হাশিম-সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের সেই অংশ দ্বারা যাঁরা তখনও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরু করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন শামসুল হক ও শেখ মুজিবর রহমান। এদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ থাকলেও মুসলিম লীগের অভিজাত, রক্ষণশীল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এরা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ। লীগের এই বাম ঘেষা (কমিউনিষ্ট নয়, তবে মুসলিম লীগের মধ্যে প্রগতিশীল) তরুণ নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে চরম রক্ষণশীল নাজিমুদ্দীন আকরাম খাঁ গ্রুপের হাত থেকে মুক্ত করা। এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থতাই শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ভিন্ন সংগঠন আওয়ামী মুসলিম লগি অর্থাৎ জনগণের মুসলিম লীগ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে উদ্যোগী করে তোলে। পরবর্তীতে এটিতে বহু বর্ণের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটে। এর মধ্যে তিনটি ভাবাদর্শগত প্রবণতার সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

ক) ধর্মীয় সাম্যবাদী প্রবণতা; এর প্রতিনিধিত্ব করতেন শামসুল হক (আঃমুঃলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন) এবং মওলানা ভাসানী (আঃমুঃলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন)।

খ) পেটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রবণতা; এর প্রতিনিধিত্ব করতেন শেখ মুজিব, মানিক মিঞা, খন্দকার মুশতাক, ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ।

গ) উদার নৈতিক বুর্জোয়া গণতন্ত্র; এর প্রতিনিধিত্ব করতেন আবদুস সামাদ, আতাউর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।[৮৭]

সংগঠনের মধ্যে ভিন্নমুখী ভাবাদর্শের সমাবেশ ঘটলেও মূল নেতৃত্ব ছিল অনভিজাত মধ্য স্তর থেকে আগত ব্যক্তিবর্গের হাতে। মুসলিম লীগের নেতৃত্বের সঙ্গে নব গঠিত সংগঠনের নেতৃত্বের মৌলিক পার্থক্যই হচ্ছে এটি। আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন একজন কৃষক নেতা। সাধারণ সম্পাদক এবং তিনজন সহকারী সম্পাদকই ছিলেন ছাত্রনেতা ও মধ্যস্তরের পরিবার থেকে আগত। তিনজন সহসভাপতির সবাই ছিলেন মফঃস্বল টাউনের মধ্যবিত্ত উকিল। নবগঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনগুলিতে নেতৃত্বের শ্রেণীগত পরিবর্তনও লক্ষ্য করার মতো এবং এভাবেই পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্রমান্বয়ে অভিজাত শ্রেণীর হাত ছাড়া হয়ে যেতে থাকে। নেতারাও সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা বলে তারাও চলে যান সাধারণ মানুষের কাছাকাছি। ফলে এ অঞ্চলে রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ অসম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। ভাষা আন্দোলন থেকে বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিকাশের আন্দোলনের সকল স্তরে

Dhaka University Institutional Repository

এদের উপস্থিতি বাঙালীর সাফল্যের পথকে করতে থাকে প্রশস্ত অপরদিকে অভিজাত, রক্ষণশীলদের হাত থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত নেতৃত্ব ক্রমান্বয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ বুর্জোয়া শ্রেণীর দখলে চলে যেতে থাকে।

সূচনা লগ্ন থেকেই কর্মসূচীর দিক থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল যথেষ্ট অগ্রসর। এর ১২ দফা কর্মসূচীর মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে যাতে দাবী করা হয়েছে, ফেডারেল রাষ্ট্র পাকিস্তানের অধীনে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন, বাংলাকে পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান, পাট শিল্পের জাতীয়করণ, জমিদারী ব্যবস্থা বিনা খেসারতে বাতিল করা ইত্যাদি বিষয়।[৮৮]

নানা কারণে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সংগঠনটির তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেনি। ঐ সালের ২৬ এপ্রিল মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে সাংগঠনিক কমিটির এক সভা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব বাংলার সম্পদ আহরণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রাদেশিক সরকার ও জনগণের কাছে আবেদন করে। এই বৈঠকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে এমনভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয় যাতে করে বৈদেশিক বিষয় দেশরক্ষা ও মুদ্রা ছাড়া অপর সকল বিষয় প্রদেশের অধিকারভুক্ত হতে পারে। তাছাড়া পূর্ব বঙ্গের জনগণের অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলোর প্রতিও দৃষ্টি দেয়া হয়; যে সমস্ত দাবী কেন্দ্র কর্তৃক উপেক্ষিত হয়ে আসছে। একটি প্রস্তাবে দেশে সংবিধান প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণে পাকিস্তান সংবিধান সভার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয় এবং ১৯৫২ সালের মধ্যে সারাদেশে সাধারণ নির্বাচনের দাবী জানিয়ে আরো কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৮৯]

প্রাথমিক পর্যায়ে সংগঠনটি অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ না হলেও সময়ে এটি অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত হয়। সম্ভবতঃ ১৯৫২ সালে ময়মনসিংহ জেলায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে এর মুসলিম বিশেষণটি বাদ দেয়া হয় এবং সংগঠনটি আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। যদিও দলের মধ্যে দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন একটি গ্রুপ বেশ শক্তিশালী ছিল। আওয়ামী লীগ ক্রমে ক্রমে পূর্ব বাংলার শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বেরিয়ে আসা বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা ধারণ করে এর মধ্যকার পেটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রবণতার ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রূপটি ক্রমে ক্রমে জাতীয়তাবাদী আদর্শকে আক্রে ধরে একদিকে পূর্ব বাংলার ন্যায়সঙ্গত অধিকার অর্জন অপরদিকে স্বাধিকার আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে থাকে।

অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়াও কিছু ইসলামপন্থী উগ্র কমিউনিষ্ট বিরোধী সংগঠন ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে এবং আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে তমদ্দুন মজলিশ নামে ধর্মীয় সামাজিক সংগঠনটি ১৯৪৮ সালের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বায়ান্ন এবং তৎপরবর্তী সময়ের আন্দোলনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে ইসলামী ভ্রাতৃ সংঘ নামে ভিন্ন একটি সংগঠন।[৯০]

প্রথম দিকে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি একটি সংকীর্ণ ভাষা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিমন্ডলে ধরে রাখার প্রবণতার কারণে তমদ্দুন মজলিশের বিশেষ কোন রাজনৈতিক বক্তব্য না থাকা সত্ত্বেও ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলায় বাঙালী মুসলমানদের উপযোগী একটি ভাষা সাংস্কৃতির ঐতিহ্য গড়ে তোলা। প্রাথমিকভাবে তমদ্দুন মজলিশ ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে দৃঢ় ভূমিকা নিলেও আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র যত দৃঢ় হতে থাকে সংগঠনটির গুরুত্ব ততই হ্রাস পেতে থাকে। তবে আন্দোলনের সাংগঠনিক দিকটির প্রতি লক্ষ্য রাখার ফলে ভাষা আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক আলোচনা ক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তীর্ণ করার কৃতিত্ব মজলিশের কোন অংশে কম ছিল না।[৯১] অপরদিকে প্রায়ই এর বক্তব্যের মধ্যে সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রভাষা ইত্যাদি প্রশ্নে রাজনৈতিক বক্তব্য চলে আসত। এ কারণেই হয়তো মোহাম্মদ তোয়াহা তার সাক্ষাৎকারে মজলিশকে আধারাজনৈতিক, আধা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ করেছেন।[৯২]

১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর (মতান্তরে ১ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন ছাত্র শিক্ষক কর্তৃক সৃষ্ট এই ইসলামী সাংস্কৃতিক সংগঠনটির গঠনতন্ত্রেই এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে। এতে বলা হয়; কুসংস্কার গতানুগতিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দূর করে সুস্থ ও সুন্দর তমদ্দুন গড়ে তোলা; যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাঙ্গ সুন্দর ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদের দিকে মানব সমাজকে এগিয়ে নেওয়া; মানবীয় মূল্যবোধের উপর সাহিত্য ও শিল্পের মারফত নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা; নিখুঁত চরিত্র গঠন করে গণজীবনে সহায়তা করা।[৯৩]

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম লীগের গোড়ামী সংস্কার থেকে ইসলামকে মুক্ত করে জনগণের কাছাকাছি এনে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এর উদ্দেশ্য ছিল। যার ফলে একটি সুস্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল সৃষ্টি হবে। সংগঠনটি ধর্মঘেষা হলেও ভাষার প্রশ্নে ক্রমে এর কার্যকলাপ রাজনৈতিক আন্দোলনের

Dhaka University Institutional Repository

পথ প্রশস্ত করতে থাকে। মজলিশ ১৫ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দূ'? এই নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই পুস্তিকায় ভাষাবিষয় যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় তা ছিল নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।[৯৪]

প্রস্তাবটিতে বলা হয়:

১। বাংলা ভাষাই হবে: (ক) পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন। (খ) পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা। (গ) পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।

২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দু'টি-উর্দূ ও বাংলা।

৩। (ক) বাংলাই হবে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা একশজনই শিক্ষা করবেন। (খ) উর্দূ হবে দ্বিতীয় ভাষা। যারা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকুরী ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হবেন তারাই শুধু এ ভাষা শিক্ষা করবেন। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৫ হইতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে। মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষা দেওয়া যাবে। (গ) ইংরেজী হবে পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানের কর্মচারী হিসেবে যারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকুরী করবেন বা যারা উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত হবেন তারাই শুধু ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাদের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানের হাজার করা ১ জনের চেয়ে কখনো বেশী হবে না। ঠিক একই নীতি হেসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে ওখানের স্থানীয় ভাষা বা উর্দূ ১ম ভাষা বাংলা ২য় ভাষা আর ইংরেজী তৃতীয় স্থান অধিকার করবে।

৪। শাসনকার্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাততঃ কয়েক বৎসরের জন্য ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসন কার্য চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে।

উক্ত পুস্তিকায় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, ইত্তেহাদ সম্পাদক আবুল মনসুর আহম্মদও বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে বিরোধী শক্তিকে তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টি এক মাসের মধ্যে তাদের বক্তব্যে বিদ্রোহের সুর শোনা যেতে থাকে। কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর লেখনিতে জোর করে বাঙালীর উপর উর্দূ চাপিয়ে দিলে কি হবে তার পরিণতির কথা সে সময়েই সাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করে বলেন: 'বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দূকে বাঙালী হিন্দু মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশী দিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশংকা আছে।'[৯৫]

তমদ্দুন মজলিশ তার প্রকাশিত পুস্তিকায় এই ধরনের সাহসী বক্তব্যের স্থান দিয়ে নিঃসন্দেহে দুঃসাহসীকতার পরিচয় দিয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতে মজলিশের সদস্যদের ভূমিকা ছিল আন্তরিক এবং সাহসিকতাপূর্ণ।

তমদ্দুন মজলিশ ছাড়াও ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে তৎপর হয়ে উঠে। ইসলাম ধর্মের প্রতিপূর্ণ আস্থা রেখেও যে ভাষা আন্দোলনের মতো একটি অসাম্প্রদায়িক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা যায় সংগঠনটির তৎপরতা এর বাস্তব উদাহরণ হয়ে আছে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল এই কয়মাসের মধ্যে উক্ত সংগঠনটি পক্ষ থেকে "ইসলামঃ ভাষা সমস্যা ও আমরা" নামে প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এই পুস্তিকায় বাংলা ভাষার পক্ষে যে সব ধর্মীয় যুক্তি অবতারণা করা হয় তাতে সংগঠনটির বৈশিষ্ট্য সহজেই অনুমান করা যায়। তাছাড়া ভাষার প্রশ্নে এর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। যে কোন উদার মানসিকতা সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীর তুলনায় তাদের চিন্তাভাবনার উদারতা কোন অংশে কম ছিল না। উদারতায় কমতি ছিল না অন্যান্য অসাম্প্রদায়িক সংগঠনের চেয়ে। ধর্মীয় চিন্তাভাবনাকে সামনে রেখে ভাষার প্রসঙ্গে সংগঠনটির দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বেশী প্রগতিশীল এবং বাস্তব চিন্তাপ্রসূত ছিল। সংগঠনটির প্রকাশিত পুস্তিকায় উপস্থাপিত ভাষার পক্ষে যুক্তির কিছু অংশ সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে দেয়া হলো।[৯৬]

(১) মক্কায় হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর উপর ওহী নাজেল হয়েছিল আরবী ভাষায়। যদিও তখন হিব্রু ভাষাই ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ভাষা কিন্তু মাতৃভাষাতেই পবিত্র বাণী উচ্চারিত হওয়াতে মক্কায় ইসলাম প্রচার সুবিধাজনক হয়েছিল। (২) ইংরেজ শাসকবর্গ ফারসী বাতিল করে ইংরেজীকে রাজভাষা হিসেবে চালু করেছিল। তাতে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তখন তারা ইংরেজীকেও মানতে পারেননি, বাংলাকেও তখন তাদের পছন্দ হয়নি। ফলে ফারসীকেও যখন কেড়ে নেয়া হল তখন থেকে তারা এক "ভাষা শূন্য" অবস্থায় পতিত হয়। ঠিক সেই অবস্থায় শরীফ মুসলমানেরা এদেশে উর্দূ চালু করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তার জের হিসেবে ব্যাপক আতরাফ মুসলমান জনগোষ্ঠী নিরক্ষর 'মৎস্যজীবীর' পর্যায়ে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। (৩) সংস্কৃত ভাষা কোন অপবিত্র ভাষা নয়। হিন্দু পৌত্তলিকেরা উচ্চারণ করে বলেই ঐ শব্দাবলী অপবিত্র হতে পারে না। কারণ না সারা পৌত্তলিক আরবীয়রা আরবী

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় কথা বলতো তাই বলে তা অপবিত্র ভাষা ছিল না। ভাষা ভাব প্রকাশের বাহন মাত্র। (৪) যদি সংস্কৃত ভাষা অপবিত্র হয়েও থাকে তাহলে তার থেকে শুধু বাংলাই ঋণ গ্রহণ করেনি, উর্দূ ও ঋণ নিয়েছে। অতএব তাহলে উর্দূও অপবিত্র ভাষায় পরিণত হয়েছে এবং সেটাও তাহলে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। (৫) উর্দূ ভাষাকে বলা হয় ইসলামী ভাবধারার বাহন। কিন্তু উর্দূ ভাষাতে শুধু ইসলামী ভাবধারা নয়, নিরিশ্বরবাদী কমিউনিষ্ট চিন্তাধারাও প্রচারিত হয়ে থাকে। (৬) বাংলা ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বাংলা ভাষার প্রাথমিক বিস্তারের মূলে ছিলেন মুসলমান নৃপতিবৃন্দ, হিন্দুরা নয়। (সুলতান হোসেন শাহের আমল দ্রষ্টব্য)। (৭) ভাবও সংস্কৃতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমের সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা আজ অচল হয়ে গেছে। নজরুল সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিরা তাঁদের রচনায় বহু আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। (৮) বাংলা উর্দূ দুই ভাষাই পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হলে আমরা উভয় ভাষা শিখে পরস্পরকে আরো ভালভাবে জানতে বুঝতে পারবো। ফলে আমাদের দুই প্রদেশের জনগণের ঐক্য ও সমঝোতা আরো ভাল ও দৃঢ় হবে। (৯) ঐক্য (unity) ও সমতা (uniformity) এক কথা নয়। ইসলাম যে ঐক্যের কথা বলে তা হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য (unity in diversity) সমতা বা uniformity নয়। (১০) প্রাকৃতিক দূরত্ব ও ভাষার বিভিন্নতা মেনে নিলেও ঐক্য সম্ভব হয়, তার ভিত্তি হচ্ছে অভিন্ন ইসলামী আদর্শের ভিত্তি।

ধর্মীয় আদর্শ থাকা সত্ত্বেও ইসলামী ভ্রাতৃ সংঘ ভাষার প্রশ্নে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করেছিল; এবং বাংলা ভাষার স্বপক্ষে ধর্মীয় যুক্তি অবতারণা করে যে বক্তব্য উপস্থিত করেছিল তার ফলে দোদুল্যমান ধর্মপ্রাণ বাঙালী মুসলমান তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস চেতনা দৃঢ় রেখেই ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের তাত্ত্বিক ভিত্তি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

এভাবেই বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন এমনকি ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলা ভাষা প্রশ্নে ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব প্রকাশ করে বলেই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। এ অঞ্চলে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ভাষা সাংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক বাঙালী জাতীয় প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হয় বিংশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, তরুণ সমাজের মধ্যকার ভাষাভিত্তিক জাতিসত্ত্বার চিন্তাভাবনা এবং জাতিগতভাবে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের প্রবণতা। যুগ যুগ ধরে কখনো অবচেতনভাবে কখনো সচেতনভাবে গড়ে উঠা জাতিচিন্তা ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতে বাধাপ্রাপ্ত হলেও বাঙালী জাতির জন্মলগ্নের শুভ উৎসবের আয়োজন কখনো থেমে থাকেনি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গড়ে উঠা বাঙালী জাতীয়তাবাদ যা ধর্মের আবরণে পরিপূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে আবহমানকালের বাঙালী চেতনার কোন যোগসূত্র ছিল না। এর সঙ্গে আপামার জনসাধারণের কোন একাত্মতা বোধও অনুপস্থিত ছিল। একাংশ দ্বারা সৃষ্ট জাতীয়তাবাদের কৃত্রিম জোয়ারের ফলে বাঙালী জাতি পরিচয় থেকে বঞ্চিত ভিন্ন সম্প্রদায় স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এই কৃত্রিম জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে আবহমান কালের ধারণকৃত অসাম্প্রদায়িক ভাষাভিত্তিক শাশ্বত বাঙালী চিন্তায় আপ্লুত হতে থাকে। ভাষা সংস্কৃতিক আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপ ছিল এই আবরণ উন্মোচনের বিশাল আয়োজনের প্রথম পদক্ষেপ।

ঊনিশ শতকের বাঙালীর জাতীয়তাবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধর্ম; তেমন বিংশ শতাব্দিতে উদ্ভুত বাঙালী জাতীয়চেতনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা। যে কারণে সকল অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সংগঠনের সংস্কৃতিক রাজনৈতিক সামাজিক তৎপরতা এমনকি ধর্মীয় সংগঠনের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবও বাঙালী জাতীয়তাবাদী চিন্তার পথে সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বিভাগ উত্তরকালে এ অঞ্চলে যতো দ্রুত অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তার ঘটেছে, তত দ্রুত বাঙালী তার আত্মপরিচয় অর্থাৎ বাঙালী সত্ত্বাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে।

অসাম্প্রদায়িক চেতনা বাঙালী জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য বলেই দেখা যায় যে, ইতিহাসে যে সময় ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং উদারতার সময় তখন বাঙালী অগ্রযাত্রা এবং গৌরবের কাল। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বাঙালী জাতির জন্য বয়ে আনে দুঃসময়, সর্বক্ষেত্রে বন্ধাত্ব। যে জাতির ভাষা সংস্কৃতি এবং জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় বৌদ্ধ মুসলিম হিন্দু খৃষ্টান সকলেরই অবদান রয়েছে। সে জাতির মুক্তি প্রগতি ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে হওয়াই স্বাভাবিক। এ কারণে বিভাগ উত্তরকালের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলির অসাম্প্রদায়িক কর্মতৎপরতা পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীকে ঠেলে দিয়েছে অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা উন্মেষের পথে। ফলে ভাষা সংস্কৃতির আন্দোলন পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক আন্দোলনে। ভাষা সংস্কৃতিক আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিণতি লাভ, এর অসাম্প্রদায়িক রূপের বহিঃপ্রকাশ, অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদী চিন্তার উন্মেষের শুভ ইঙ্গিত বই আর কিছু নয়।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১।	আতাউর রহমান, সৈয়দ হাশেমী	ঃ	ভাষা আন্দোলন অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান পৃষ্ঠা ৪৭।
২।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৪৮।
৩।	বশীর আল্ হেলাল	ঃ	ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পৃষ্ঠা ৫৬।
৪।	মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯৪।
৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৯৪।
৬।	হুমায়ুন আজাদ	ঃ	লাল নীল দীপাবলি বাঙলা সাহিত্যের জীবনী পৃষ্ঠা ২৫।
৭।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২৫।
৮।	মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৫।
৯।	বশীর আল হেলাল	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৫৬।
১০।	আসহাবুর রহমান সম্পাদিত	ঃ	বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য প্রবন্ধ পৃষ্ঠা চৌদ্দ (বক্তব্য)।
১১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা চৌদ্দ (বক্তব্য)।
১২।	হুমায়ুন আজাদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬৯।
১৩।	আহমেদ শরীফ	ঃ	বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য পৃষ্ঠা ১৮৭-১৮৯।
১৪।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৮৭-১৮৯।
১৫।	বশীর আল হেলাল	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬০।
১৬।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৬০।
১৭।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৬১।
১৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৮১।
১৯।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৮১।
২০।	আনিসুজ্জামান	ঃ	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ১৭৫৭-১৯১৮ পৃষ্ঠা ১২০-১২১।
২১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১২১।
২২।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১১৫।
২৩।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১১৬।
২৪।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১১৭।
২৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা পাঁচ (অবতরনিকা)।
২৬।	বশীর আল্ হেলাল	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬৩।
২৭।	এম, এম, আকাশ	ঃ	ভাষা আন্দোলন মুখী রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ: ১৯৪৮-৫২ প্রবন্ধ; বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা ৬ষ্ঠ খন্ড বিশেষ সংখ্যা ১৩৯৫ পৃষ্ঠা ৩৮।
২৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩৮।
২৯।	বশীর আল হেলাল	ঃ	পৃষ্ঠা ৭০।
৩০।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৭০।
৩১।	এম, এম, আকাশ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৯।
৩২।	বশীর আল্ হেলাল	ঃ	পৃষ্ঠা ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩।	আবদুল হক	ঃ	ভাষা আন্দোলনের পটভূমি প্রবন্ধঃ বাংলা একাডেমী পত্রিকার ১৩৭৯ সালের মাঘ-চৈত্র সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪৬-৪৮।
৩৪।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতি (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা ১৯।
৩৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৯-২০।
৩৬।	আতিউর রহমান লেলিন আজাদ	ঃ	ভাষা আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার পৃষ্ঠা ৬।
৩৭।	Ministry of Home and kashmir Affairs, home affaris Division, population census of pakistan, 1961 Vol-I Pt. IV Statement-5.3		
৩৮।	আবদুল হক	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪৬-৪৮।
৩৯।	Rounaq Jahan	ঃ	Pakistan Failure in national intergration P-21.
৪০।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২২।
৪১।	আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ	ঃ	একুশের স্মারক গ্রন্থ '৮৮ বাংলা একাডেমী একুশের স্মৃতিচারণ (প্রবন্ধ) পৃষ্ঠা ১৩।
৪২।	Josepdh R. Strayer	ঃ	The Histroical Experience of nation-building in Europe P. 25.
৪৩।	রফিকুল ইসলাম	ঃ	রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রবন্ধঃ আজকের কাগজ, মঙ্গলবার ২ নভেম্বর ১৯৯৩ সাল।
৪৪।	আবুল মনসুর আহমদ	ঃ	বাংলাদেশের কালচার পৃষ্ঠা ১৫১।
৪৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৫১।
৪৬।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৩।
৪৭।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৭০।
৪৮।	আবদুল হক	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪৬-৪৮।
৪৯।	বদরুদ্দীন উমর,	ঃ	ভাষা শ্রেণী ও সমাজ পৃষ্ঠা ৫৭।
৫০।	আতিউর রহমান লেলিন আজাদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬২-৬৩।
৫১।	Rounaq Jahan	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৩।
৫২।	এম, এম, আকাশ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪০। মূল উৎসঃ ডঃ এনামূল হক, কৃষ্টি নারায়ণগঞ্জ, নভেম্বর, ১৯৪৭।
৫৩।	আজফার হোসেন	ঃ	ভাষা আন্দোলন: সংস্কৃতির রাজনৈতিক কাজ প্রবন্ধ, আজকের কাগজ ২১ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ১৯৯৪ সাল।
৫৪।	ঐ	ঃ	ঐ
৫৫।	Rangalal Sen	ঃ	Polititал Elits in Bangladesh P. 78.
৫৬।	১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দূ এবং ইংরেজীর সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবী উত্থাপন করেন। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুলাই এক চিঠিতে তিনি লেখক বদরুদ্দীন উমরকে জানান যে তিনি ব্যক্তিগতভাবেই প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাব তৎকালীন রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। কেননা এই প্রস্তাব বাংলা ভাষার দাবীকে জনগণের দাবীতে পরিণত করতে সক্ষম হয় এবং এর থেকেই ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। বদরুদ্দীন উমর পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৯।		
৫৭।	কংগ্রেস সম্প্রদায় ভিত্তিক সংগঠন ছিল না। তবে সর্বভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রভাবে এর কার্যক্রম হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে চলে যায় এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক হিন্দুস্থানের পক্ষে ছিল। তবে বিভাগ উত্তরকালে পূর্ব বাংলায় এর ভূমিকা ছিল উদার এবং বাঙালীর স্বার্থের পক্ষে।		

Dhaka University Institutional Repository

৫৮।	এম,এম, আকাশ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৫৬।
৫৯।	জ্ঞানচক্রবর্তী	ঃ	ঢাকা জেলার কমিউনিষ্ট পার্টির অতীত যুগ পৃষ্ঠা ১০৪।
৬০।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল (২য় খন্ড) পৃষ্ঠা ২৬৪।
৬১।	জ্ঞান চক্রবর্তী	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৩৫
৬২।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	শহীদুল্লাহ কায়সারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৬৪।
৬৩।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২৬১-২৬২, ২১৫।
৬৪।	শহীদুল্লা কায়সারের মতে আবুল কাশেমকে কনভেনার কর সর্বদলীয় ভাষা কমিটি গঠন করা হয়। তবে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী লেখক বদরুদ্দীন উমরের মতে শামসুল আলমকেই কনভেনার করা হয়েছিল। বদরুদ্দীন উমর পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৬৩।		
৬৫।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ২১৫।
৬৬।	ঐ	ঃ	পূর্বোক্ত ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৭।
৬৭।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৮।
৬৮।	আবদুল হক	ঃ	উদ্ধৃত আতিউর রহমান লেলিন আজাদ ভাষা আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত বিচার পৃষ্ঠা ৭৪।
৬৯।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৮।
৭০।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৭।
৭১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৯।
৭২।	বশীর আল হেলাল	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৬৬।
৭৩।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৯।
৭৪।	পাকিস্তানে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ধারা প্রবর্তনের জন্য সে সময়ে কয়েক জন কর্মী ঢাকায় উপস্থিত হয়ে কমরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক, শেখ মুজিবর রহমান তাজউদ্দিন আহমদ শামসুদ্দীন আহমদ, তসদ্দুক আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল ওদুদ, ও হাজেরা মাহমুদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে একটা সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়। বদরুদ্দীন উমর পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২১।		
৭৫।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৬।
৭৬।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২৬।
৭৭।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২৭।
৭৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২৭।
৭৯।	বশীর আল হেলাল	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৪।
৮০।	এম, এম, আকাশ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৫৫।
৮১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৫৫
৮২।	১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত গণতান্ত্রিক যুবলীগের ইস্তেহারে উল্লেখিত দাবীসমূহ থেকে তৎকালীন যুব সমাজের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। ইস্তেহারের গণদাবীর সনদের বাকী অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উল্লেখ করা হলো : অক্টোবরে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান না করা, ইংরেজ অফিসারদের পেনসন খরচ বহন না করা, ১৯৪৮ সারের মধ্যে পাকিস্তানের পাওনা বুঝে নেয়া; সার্বজনীন ভোটাধিকার; সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার স্বীকার; পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক দেশগুরোর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন; বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, কৃষকদের জমির মালিক করা এবং কৃষকের ঋণ মওকুফ; বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাংক বীমা জাতীয়করণসহ আট ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণ এবং জমিদার ন্যায্য মজুরী প্রদান; বৃহৎ শিল্পে নিয়োজিত বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্তকরণ; বিনা ব্যয়ে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় খরচে স্বাস্থ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা; জনগণকে সামরিক শিক্ষা প্রদান; জনগণের সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা এবং নারী সমাজের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করে নেয়া। এম, এম আকাশ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬২।		

Dhaka University Institutional Repository

৮৩।	বিস্তারিত তথ্য রয়েছে বদরুদ্দীন উমরের পূর্বোক্ত গ্রন্থের ৩য় খন্ডে পৃষ্ঠা ১৫৯-২০৪ পর্যন্ত।		
৮৪।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	পূর্বোক্ত ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ১৭১।
৮৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৭৩।
৮৬।	বশীর আল হেলাল	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৬।
৮৭।	Ranglal sen	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮৩।
৮৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৮৪-৮৮।
৮৯।	বদরুদ্দীন উমর,	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২১২-২১৩।
৯০।	এম, এম, আকাশ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪৭।
৯১।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	পূর্বোক্ত ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৫।
৯২।	বাংলা একাডেমী সম্পাদিত ও প্রকাশিত একুশের সংকলন ১৯৮১: স্মৃতিচারণ	ঃ	পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮।
৯৩।	এম, এম, আকাশ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪৭।
৯৪।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৮।
৯৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩১।
৯৬।	এম, এম, আকাশ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

কেনীয় লেখক নগুগিওয়া থিয়োঙ্গো ভাষাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তবে সে রাজনীতি সংস্কৃতিকে বর্জন করে নয়।[১] বাংলা ভাষাও রাজনীতি নিরপেক্ষ নয়, প্রথম থেকেই বাংলা ভাষার সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে আছে। আবার এ রাজনীতি সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে নয়। নগুগির মত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভাষার ক্ষমতা আছে সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে পরস্পরের জন্য প্রয়োজনীয় করে তোলার। কেননা ভাষা সংস্কৃতিকে বহন করে।[২] এভাবে ভাষা সংস্কৃতি রাজনীতি পরস্পর জড়িত রয়েছে। এ কারণেই যে কোন ভাষা আন্দোলনের স্বরূপ একইভাবে সংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বাংলা ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা পরিস্কার বুঝা যায়। ভাষা আন্দোলনের বীজ যদিও রোপণ করা হয়েছিল সংস্কৃতিকভাবে পরবর্তীতে যা মূলতঃ রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

আবার প্রায় সব আন্দোলনের পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক আকাংখা বর্তমান থাকে। ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ছিল। কেননা ভাষা মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম বলে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে রয়েছে তার নিবিড় যোগাযোগ। ভাষাকে আঘাত করলে তাই পরোক্ষভাবে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ওপর আঘাত করা হয়।[৩] যে কারণে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে অর্থনীতির উপর পরোক্ষ আক্রমণের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের সচেতন জনগণ প্রথম থেকে প্রতিরোধের দেয়াল তুলতে থাকে। যে প্রতিরোধ ক্রমান্বয়ে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। আবার ভাষা সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদ প্রশ্নটি পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রংগলাল সেনের ভাষায় "জাতীয়তাবাদী আন্দালন এবং সংস্কৃতিক আন্দোলন দুটোর মাঝে কোন বিরোধ নেই। এ দুটোর একটা আরেকটার সম্পূরক। কাজেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়েও যারা কথা বলবেন তারাও অপরিহার্যভাবেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষেই কথা বলবেন।"[৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভাষা আন্দোলন শুধু সংকীর্ণ ভাষা সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জনের আন্দোলন ছিল না, জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশের বাহন ছিল। ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন। যার মধ্যদিয়ে শেষ পর্যন্ত বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। একটি নির্দিষ্ট জনপদের জনগোষ্ঠীর সকল স্বার্থবোধের সমচিন্তা অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ভাষা-সংস্কৃতির আকাংখা বাস্তবায়নের উদগ্র বাসনা তাদের ক্রমাগত ধাপে ধাপে একই সংগ্রামী পথের সহযাত্রী করে তোলে। ভাষা আন্দোলনের শক্তিশালী মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাঙালী যেমন তার জাতীয় চেতনার স্ফূরণ ঘটায় তেমন সেখান থেকে জাতীয়তাবাদ বিকাশের পক্ষে অগ্রসর হওয়ার দিক নির্দেশনা লাভ করে।

বাঙালী জাতীয়তাবাদের চিন্তা ভাবনার প্রবণতা সৃষ্টির পেছনে বাংলা ভাষার ভূমিকা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এবং ইতিহাসের অচেতন শক্তির দ্বারা কিভাবে বাঙালী জাতিসত্ত্বা গড়ে উঠছিল তাও আলোচিত হয়েছে। বাংলা ভাষা সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালী জাতিসত্ত্বা গড়ে ওঠার প্রবণতার সূত্রপাত। রংগলাল সেনের মতে 'পাল যুগ থেকেই বাংলার শাসনকে আমরা একটি অভিন্ন জাতিসত্ত্বা গঠনের পর্যায় হিসেবে দেখি।'[৫] যে পর্যায় নানা ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করে আধুনিককালে একটি ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টার মধ্যে বিকশিত হওয়ার পথ খুঁজছিল। সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল ভাষাভিত্তিক একটি রাষ্ট্র গঠন প্রচেষ্টার। যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দু মুসলিম নেতৃবৃন্দের চরম বিরোধীতার মুখে এবং তাঁদের মত পরিবর্তনের ফলে। ১৯৪৭ সলের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতিসত্ত্বা ভিত্তিক অখন্ড বাংলা গঠনের পরিকল্পনায় অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবোধের প্রকাশ ঘটে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশিম, কিরণ শংকর রায় বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৬] এই পরিকল্পনার মধ্যে রাষ্ট্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে। সংক্ষেপে এর বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে এক, বাংলায় মুসলিম লীগ সরকার অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী সরকার বহাল থাকবে; তবে হিন্দু মন্ত্রীদের জায়গায় অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে বাংলার কংগ্রেস মনোনীন ব্যক্তিদের। দুই, বঙ্গদেশ পাকিস্তান বা হিন্দুস্থান কারো সঙ্গে যোগ না দিয়ে অখন্ড স্বাধীন থেকে যাবে। বঙ্গদেশ পাকিস্তান বা হিন্দুস্থানের সঙ্গে যোগ দেবে না স্বাধীন থাকবে, সে প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান করবে সার্বজনীন ভোটের দ্বারা এবং যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত বাংলাদেশের গণপরিষদ। তিন, জনসংখ্যার অনুপাতে নির্দিষ্ট হবে আইনসভার মুসলিম, হিন্দু, তপশিলি এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আসন।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পিত বৃহত্তর বাংলার সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল পুর্নিয়া থেকে আসাম পর্যন্ত। যার ফলে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলা ভাষা ভিত্তিক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকারী হতো।[৮] বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা শরৎ বসু গান্ধীর কাছে এবং সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহর কাছে পেশ করলে উভয়েরই সমর্থন লাভ করে। ২০ মে কংগ্রেস মুসলিম লীগ যুক্ত কমিটির সদস্যরা এর পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।[৯] কিন্তু কংগ্রেস ও হিন্দু নেতারা এর চরম বিরোধীতা শুরু করেন। তার সঙ্গে যোগ দেয় হিন্দু মহাসভা। অপরদিকে মুসলিম লীগ বৃহত্তর বাংলার পক্ষে থাকলেও এর স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্ত্বার বিপক্ষে ছিল। মুসলিম লীগ ছিল অখন্ড বৃহত্তর বাংলার পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষপাতী; সুতরাং লীগ নেতৃবৃন্দও বৃহত্তর স্বাধীন বাংলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।[১০] তাছাড়া নেহরু এবং প্যাটেল বৃহত্তর বাংলার পক্ষে ছিলেন না। এ পরিস্থিতিতে বৃহত্তর বাংলা পরিকল্পনা জিন্নাহ-গান্ধী উভয়েরই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবে সোহরাওয়ার্দী-শরৎ বসুর বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা গঠনের মাধ্যমে বাঙালী জাতিসত্ত্বা ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

অসাম্প্রদায়িক শাশ্বত বাঙালী জাতি চেতনার সচেতন প্রকাশ ঘটে বৃহত্তর বাংলা পরিকল্পনার মধ্যে। বাঙালী জাতিসত্ত্বার চরম বিকাশের মাধ্যমে বাঙালী জাতিসত্ত্বার স্বতন্ত্র স্বীকৃতির সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল এই পরিকল্পনার মধ্যে। এর ফলে সমগ্র বাঙালী জাতি সম্প্রদায় নির্বিশেষে একটি জাতিতে পরিণত হতে পারত এবং তার রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তি ও অর্জিত হতো। শরৎ বসুর ভাষায় 'খন্ডিত বাংলাদেশ বিদেশী শোষকগণের ক্রীড়াক্ষেত্র হইবে।'[১১] সে কারণে তিনি শুধু বৃহত্তর স্বাধীন বাংলার কথা বলেই ক্ষান্ত হননি তাঁর পরিকল্পিত বাংলার ভাবী রাষ্ট্র ব্যবস্থা 'সমাজতান্ত্রিক রিপাব্লিক' হবে বলেও স্বপ্ন দেখেছিলেন।[১২] সুতরাং বাঙালী জাতিসত্ত্বা ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে যেমন অসাম্প্রদায়িক শব্দটি যুক্ত হয়েছিল তেমন সমাজতন্ত্র শব্দটিও অনুল্লেখ থাকেনি। পরবর্তীতে খন্ডিত বাংলার পূর্বাংশে বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ বিকাশের প্রশ্নেও এই দুই আদর্শের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

বৃহত্তর বাংলা গঠনের মাধ্যমে বাঙালী জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও বাঙালীর স্বতন্ত্র সত্ত্বা বিলুপ্ত হয়নি, থেমে থাকেনি স্বাধীনতার আকাংখা। পূর্ববঙ্গের জনগণ তার স্বতন্ত্র জাতি চিন্তা সচেতনভাবে আকড়ে থাকতে চাইল—সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি, রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামের মাধ্যমে। অর্থনৈতিক চরম শোষণই বাঙালীকে এই জাতিসত্ত্বা সম্পর্কে আরো সচেতন করে। ভাষা সংস্কৃতির উপর আক্রমণের মধ্যদিয়ে যে শোষণ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল ভাষা সম্পর্কে তীব্র অনুভূতিপ্রবণ বাঙালী ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সাতচল্লিশের ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টার ব্যর্থতা অনেক শিক্ষিত বাঙালীর মনে দাগ কেটেছিল। তার প্রমাণ বহন করছে নিম্নে উল্লেখিত সারণী দুটো; প্রথমটিতে ১২৩ জনের ৭১ জন বাংলা ভাগের বিপক্ষে ছিলেন। ২৬ জন ছিলেন ভাগের পক্ষে। বাকী ২৬ জনের ধারণা ছিল অস্পষ্ট।[১৩] আবার অনেক উদারমনা ব্যক্তিও হিন্দু মহাজন ও ধনিক শ্রেণীর শোষণ ও বঞ্চনার কারণে প্রত্যক্ষ না হলেও, পরোক্ষভাবে বাংলা বিভাগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ধরে নেয়া যায় এরাও অখন্ড বাংলার পক্ষে ছিলেন। বাস্তব অবস্থারকারণে বিভাগকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এদের মধ্যেও বাঙালী জাতীয়তাবোধ সক্রিয় ছিল সন্দেহ নাই।

১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মূল্যায়ন:

উত্তর	নমুনা সংখ্যা	শতকরা হার
ইতিবাচক ধারণা	২৬	২১.১৩
নেতিবাচক ধারণা	৭১	৫৭.৭২
অস্পষ্ট	২৬	২১.১৪
মোট=	১২৩	১০০

নেতিবাচক উত্তরসমূহ
ক) সঠিক ছিল না
খ) সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত
গ) সাম্প্রদায়িকতার মূল কারণ।

সূত্র: *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা* পৃষ্ঠা ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারণীর উত্তরদাতাদের মূল্যায়ন থেকে এই সিদ্ধান্ত আসা ভুল হবে না যে বাংলা বিভাগকে যাঁরা স্বাভাবিক মনে করেননি, তাঁদের সংখ্যাই ছিল বেশী। নিঃসন্দেহে এরা বাঙালী জাতি চিন্তায় সম্পৃক্ত ছিলেন এদের মধ্যে হিন্দু মুসলিম এই বোধের চেয়ে স্বতন্ত্র বাঙালী জাতি চেতনা গভীরভাবে বিদ্যমান ছিল। তা না হলে অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিকূল পরিবেশ এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের জাতীয়তাবাদের প্রবল বিরুদ্ধ স্রোতের মধ্যে এরা বাঙালী জাতিভিত্তিক অখন্ড বাংলার পক্ষে থেকেছেন। এবং এই বাঙালী জাতীয়তাবোধ পরবর্তীতে নতুনভাবে প্রকাশ পেয়েছে পূর্ব বাংলায়, যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও ছিল অভিন্ন শুধু ভৌগোলিক সীমারেখা ছিল ভিন্ন।

অপর সারণীতে দেখা যাবে যে অর্থনৈতিক অবস্থা কিভাবে এই অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগ সম্পর্কে মূল্যায়ন : (পিতার পেশার ভিত্তিতে)

পিতার পেশা	ইতিবাচক/সঠিক ছিল	ধারণা অস্পষ্ট	সচেতন ছিল না	সচেতন নেতিবাচক/ সঠিক ছিল না	সাম্রাজ্যবাদ ও প্রক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত	সাম্প্রদায়িকতা বঙ্গভঙ্গ রাজনৈতিক হাতিয়ার ছিল	মোট
কৃষি	৪	৭	-	৩১	২	-	৪৪
ব্যবসা	৬	৪	৩	৮	-	-	২১
চাকুরী	১৫	৩	৩	১৬	২	২	৪১
অন্যান্য স্বাধীন পেশা	১	৫	১	৮	২	-	১৭
মোট=	২৬	১৯	৭	৬৩	৬	২	১২৩
শতকরা হারে	২১.১৪	১৫.৪৫	৫.৬৯	৫১.২২	৪.৮৮	১.৬৩	১০০

সূত্র: *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা* পৃষ্ঠা ৮৯

কৃষকদের বেশীরভাগ ছিল বাংলার পক্ষে। পূর্ব বাংলার প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল পাট অথচ বহিঃবিশ্বে পাট চালান দেয়ার প্রধানকেন্দ্র ছিল কোলকাতা। বাংলা ভাগ হলে পূর্ব বাংলার পাট ব্যবসায় বিপর্যয় দেখা দেয়ার সম্ভবনা ছিল। সুতরাং অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে কৃষক শ্রেণী বৃহত্তর বাংলার পক্ষে ছিলেন। অপরদিকে পাট বিক্রি করে পূর্ববঙ্গের কৃষকদের হাতে যে নগদ অর্থ জমা হয়েছিল সে অর্থ তাঁরা তাঁদের সন্তানদের শিক্ষিত করার পেছনে খরচ করতে কার্পণ্য করেনি। অথচ এই কৃষকদের চাকুরীজীবী শিক্ষিত সন্তানরা বাংলাভাগের পক্ষে ছিলেন। কেননা বৃহৎ বাংলায় শিক্ষিত হিন্দু সন্তানদের সঙ্গে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হচ্ছে। তাদের আশা ছিল খন্ডিত বাংলায় তাদের পেশার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। যে কারণে চাকুরীজীবীদের এক বৃহৎ অংশকে দেখা যায় সাম্প্রদায়িকতার কারণে নয় অর্থনৈতিক স্বার্থে বঙ্গভঙ্গের পক্ষ নিতে। এরাই আবার বিভক্ত বাংলায় অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে বিজাতীয় অথচ স্বধর্মের লোকজনের সঙ্গে পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যেয়ে বাঙালীর স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে বাংলা বিভাগের পক্ষে চাকুরীজীবীদের এ অংশটিও অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

খন্ডিত বাংলায় বাঙালী দুর্দশা সম্পর্কে শরৎ বসু ভবিষ্যৎ বাণী যখন পূর্ব বাংলায় সত্যে পরিণত হতে শুরু করে তখন বাঙালী আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের চরিত্র বদলে যায়। এই আন্দোলনের মধ্যে যেমন বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রচ্ছন্ন ইংগিত বর্তমান ছিল, তেমন ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনার দ্বিতীয় প্রয়াসের বীজ ও নীরবে রোপিত হয়েছিল।

শোষণের মাত্রা যত তীব্র হতে থাকে বাঙালীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তত দৃঢ় হয়। প্রকাশ ঘটতে থাকে বাঙালী জাতি চেতনার। সাতচল্লিশই বাংলা ভাষা ধ্বংসের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার মাধ্যমে শোষণ প্রক্রিয়া চালু করার ষড়যন্ত্র বাঙালীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মনিঅর্ডার ফর্ম, ডাকটিকিট এবং মুদ্রায় শুধুমাত্র ইংরেজী এবং উর্দূ ব্যবহৃত হতো।[১৪] দেশের অধিকাংশ লোকের ভাষা বাংলার স্থান এসবের মধ্যে ছিল না। তাছাড়া পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার বিষয় তালিকাতেও বাংলা ভাষা স্থান পায়নি। পাকিস্তানের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান উর্দূকে রাষ্ট্র ভাষা করা, আরবী হরফে বাংলা লেখা ইত্যাদির স্বপক্ষে বক্তব্য বিবৃতি দিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করেন। ঐ সময় তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা বিরোধী নীতির অন্যতম সমর্থক এবং প্রধান মুখপত্র।[১৫] এভাবে বাংলা ভাষা বর্জন এবং বাংলা বিরোধী সরকারী নীতির ফলে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ ও শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট উদ্বেগ এবং বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্ম হতে থাকে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে এর প্রকাশও ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ বছর অক্টোবর মাসে তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।[১৬] পূর্ব বাংলার জনগণের অসন্তোষকে সাংগঠনিকভাবে পরিচালিত করে ভাষার দাবী আদায়ের প্রথম সংগ্রামী পদক্ষেপ মজলিশই গ্রহণ করেছিল। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে বাংলা বিরোধী বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বাঙালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী যেমন প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। তেমন ছাত্র সমাজ প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নেমে পড়ে। শিক্ষা সম্মেলনে প্রস্তাবে বলা হয়: 'এই সম্মেলনে উর্দূকে পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সংবিধান সভার কাছে সুপারিশ করছে। এই সভা আরও প্রস্তাব করছে যে উর্দূকে স্কুলে একটি বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হোক কিন্তু প্রাইমারী স্কুলে কোন্ পর্যায়ে উর্দূ শিক্ষা শুরু করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তের ভার প্রাদেশিক সরকারের হাতে অর্পণ করা হোক স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম কি হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তও প্রাদেশিক সরকার গ্রহণ করবে।'[১৭]

শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমানের বিবৃতি প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল হামিদ এবং হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরীর ভূমিকা পূর্ব বাংলায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। যার তীব্রতা কিছুটা আন্দাজ করা যায় ৫ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত থেকে। এতে উর্দূকে পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা না করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠক চলাকালীন বহুসংখ্যক ছাত্র এবং কয়েকজন শিক্ষক বাংলাকে অবিলম্বে পূর্ব বালার রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী জানান। ঐদিনই তমদ্দুন মজলিশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনাকালে মওলানা আকরাম খাঁ তাদের বলেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষারূপে বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষাকে চাপানোর চেষ্টা করলে পূর্ব পাকিস্তান বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং তিনি নিজে সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবেন।'[১৮]

পরদিন ৬ ডিসেম্বর শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বেলা দুটোর সময় বিশ্ববিদ্যালয় এক সভা অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এটিই ছিল প্রথম সাধারণ ছাত্র সভা। উক্ত সভায় ভাষা সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাছাড়া বক্তাগণ 'বাংলা ভাষাকে সাংস্কৃতিক দাসত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্রের বিষয়ে উল্লেখ করেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের বাঙালীত্বকে খর্ব করার এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য তারা আহ্বান জানান।[১৯]

সভায় বাংলা ভাষার স্বপক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি ছিল:[২০]

এক. বাংলাকে 'পাকিস্তান ডেমিনিয়নের' অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষাও শিক্ষার মাধ্যম করা হোক।

দুই. রাষ্ট্রভাষা এবং 'লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা' নিয়ে যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য আসল সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়া এবং বাংলা ভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

তিন. পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার উর্দূ ভাষার দাবীকে সমর্থন করার জন্যে সভা তাঁদের আচরণের তীব্র নিন্দা করে।

চার. সভা 'মর্নিং নিউজ' এর বাঙালী বিরোধী প্রচারণার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য পত্রিকাটিকে সাবধান করে দেয়।

এই সভায় প্রথম সংশয় মুক্ত হয়ে বাংলা ভাষা সম্পর্কে স্পষ্ট বাস্তব সম্মত ও গণতান্ত্রিক দাবী গ্রহণ করা হয়। এর আগ পর্যন্ত কেবল পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যমরূপেই বাংলার দাবী উপস্থাপিত করা হতো।[২১] তাছাড়া মিছিলে উচ্চারিত শ্লোগান ছিল "উর্দূ জুলুম চলবে না", "পাঞ্জাবী রাজ বরবাদ" ইত্যাদি ধ্বনির মধ্যে পাঞ্জাবী চক্রের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বাঙালী তার রাজনৈতিক সচেতনতারই বর্হিপ্রকাশ ঘটায়। যে কারণে প্রথম থেকেই তারা এ চক্রের হাত থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। সভাশেষে মিছিল করে বিভিন্ন মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয় এবং তাঁদের কাছ থেকে বাংলা ভাষার পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করা হয়। এমনকি প্রাদেশিক মন্ত্রী নুরুল আমীন তাঁদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি বাংলার জন্য সংগ্রাম করবেন এবং ব্যর্থ হলে ইস্তফা দেবেন।[২২] ডিসেম্বরের ১২ তারিখ ছিল আরো একটি সংগ্রামমুখর উত্তপ্ত দিন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে এই সংগ্রাম সম্পর্কে স্বার্থান্বেষী মহল ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। যার ফলে ১২ ডিসেম্বর সরকারী কর্মচারী ও ছাত্রদের উপর হামলা হলে ঢাকা শহরের জনগণ ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দেয়। এবং এর প্রতিকার দাবী করে এক বিশাল মিছিল নিয়ে সেক্রেটারিয়েটের দিকে অগ্রসর হয়। 'এই মিছিলটি শুধু ছাত্র মিছিল ছিলো না। এতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকেরাও বিপুল সংখ্যায় যোগদান করে। বস্তুত বাংলা ভাষার দাবীতে এ জাতীয় মিছিল এই সর্বপ্রথম।'[২৩] মিছিলকারীরা প্রাদেশিক শিক্ষা মন্ত্রী আব্দুল হামিদের বাসভবনে যেয়ে তার কাছে ডাকটিকিট, মনিঅর্ডার ফর্ম ইত্যাদিতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবী

Dhaka University Institutional Repository

জানান। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নেও তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্ক হয়। বাংলাভাষার পক্ষে মিছিলকারীদের ভূমিকার ওখানেই পরিসমাপ্তি ঘটেনি। তারা সেদিন সেক্রেটারিয়েটে প্রবেশ করে মন্ত্রী আব্দুল হামিদ, সৈয়দ আফজল প্রভৃতির কাছ থেকে বাংলা ভাষার দাবী সমর্থন করার এবং এতে ব্যর্থ হলে পদত্যাগ করবেন এই ধরনের একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। তাছাড়া কোন কোন মন্ত্রীকে তারা মিছিলে যেতেও বাধ্য করেন।[২৪] এভাবেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে বাঙালীর সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শিক্ষা সম্মেলনের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বাংলার পক্ষ বিপক্ষ শক্তির মধ্যে সুনির্দিষ্ট বিভাজন রেখা তৈরি হতে থাকে। এতে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয় বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজ যেমন আগেও বাংলার সপক্ষে শক্ত হাতে কলম ধরেছিলেন এখনও তাদের সেই হাত শিথিল হয়নি। বাংলার ছাত্র সমাজও তাদের মধ্যকার অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করে দৃঢ়ভাবে বাংলা ভাষার পক্ষে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে অগ্রসর হতে থাকে। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার কি রাজনৈতিক কি সংস্কৃতিক উভয় অঙ্গনে দুটো শিবির সৃষ্টি হয়। যারা সাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী তারা ইসলামী তমদ্দুন আকড়ে ধরে স্বীয় ঐতিহ্য ভাষাগত ঐতিহ্য অস্বীকার করে ক্রমে ক্রমে গণবিচ্ছিন্ন একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হতে থাকে। পাকিস্তানের চব্বিশ বছর এরা সর্বদা বাঙালীর সকল আকাংখার সামনে দুর্ভেদ্য দেয়াল তুলতে সচেষ্ট ছিল। অপরদিকে যারা অসাম্প্রদায়িক ও উদার মানসিকতা সম্পন্ন তারা বাঙালী জাতীয়তাবাদের আদর্শের পিছনের শক্তিতে পরিণত হতে থাকেন। দিনে দিনে এদের সংখ্যা এবং শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলার জনগণও ক্রমান্বয়ে সকল সংশয় মুক্ত হয়ে এদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে।[২৫]

বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবীতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সাতচল্লিশ সালে শুরু হলেও এটি রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে পরবর্তী বছর। বাংলা ভাষার সপক্ষে আন্দোলনকারীদের উপর নানান ধরনের আক্রমণ নির্যাতন চলতে থাকে। এর ফল দাঁড়ায় উল্টো; এতে বাংলার প্রতি সমর্থন যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে তেমন ছাত্র বুদ্ধিজীবীদের গন্ডি অতিক্রম করে ভাষা প্রশ্নটি অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সামর্থ হয়। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে প্রস্তুতি পর্বের আয়োজন এভাবে চলতে থাকে। গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলা ভাষা প্রশ্নটি উপস্থিত করা হলে বিষয়টি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ঐ সময়ই ভাষা প্রশ্নটি জাতীয় পর্যায়ে তুমুল তর্কবিতর্কের ঝড় তোলে। পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ইংরেজী ও উর্দূর সঙ্গে বাংলা ব্যবহারে দাবীটি নাকচ হয়ে যাওয়ার ফলে ভাষার প্রশ্নটি রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে।[২৬]

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনই ভাষা প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়। কংগ্রেসের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষদে একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যেটি ছিল খসড়া নিয়ন্ত্রণ প্রণালীর ২৯নং ধারা সম্পর্কে উক্ত ধারাটিতে বলা হয়েছিল পরিষদের প্রত্যেক সদস্যদেরকে উর্দূ বা ইংরেজীতে বক্তব্য রাখতে হবে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দূ ও ইংরেজীর সঙ্গে বাংলাকেও পরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব করেন।[২৭] অর্থাৎ বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবী উত্থাপন করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারী উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং তুমুল তর্কবিকর্তের পর প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়।

প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করার পেছনে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের যুক্তি ছিল এটা তাদের জন্য জীবনমরণ সমস্যা। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষাকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রশ্নটি গণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর জন্য জীবনমরণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'এখানে এ প্রশ্নটি তোলাই ভুল হয়েছে। এটা আমাদের জন্যে একটি জীবনমরণ সমস্যা। আমি অত্যন্ত তীব্রভাবে এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধীতা করি এবং আশাকরি যে এ ধরনের একটি সংশোধনী প্রস্তাবকে পরিষদ অগ্রাহ্য করবেন।'[২৮] বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিলে বাঙালীর ভাষা ধ্বংস করে তাকে শোষণের যে জাল পাঞ্জাবী শাসকচক্র বিস্তৃত করেছিল তা গুটিয়ে নিতে হবে। তাছাড়া ভাষাকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন আকাংখা পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। ফলে পূর্বাংশ তাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। সুতরাং নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের জন্যও বাংলা ভাষা প্রশ্নটি ছিল জীবনমরণ সমস্যা। লিয়াকত আলী খানের বক্তব্যের পরবর্তী অংশে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। 'প্রথমে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নির্দোষ বলে আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে মনে হয় পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার দ্বারা ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা হতে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।'[২৯]

সুতরাং বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর কঠোরনীতি অবলম্বন করার চেষ্টা ছিল স্বাভাবিক। শুধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পর্যন্ত সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন এবং বাংলার বিপক্ষে এবং উর্দূর পক্ষে দৃঢ় বক্তব্য রাখেন। তার মতে 'উর্দূই একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে বলে

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ লোকের অভিমত। বাংলাকে সরকারী ভাষা করার কোনই যুক্তি নাই।'[৩০] এভাবে পরিষদে খাজা নাজিমুদ্দীন নিজের মতটিই পূর্ববঙ্গের জনগণের মত বলে চালিয়ে দিয়ে প্রভু ভক্তির অপূর্ব নজীর স্থাপন করেন। পরিষদে মুসলিম লীগের সকল সদস্য বাঙালী অবাঙালী নির্বিশেষে বাংলা ভাষা বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অপরদিকে কংগ্রেসের সকল সদস্য ছিলেন হিন্দু।[৩১] সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয় কংগ্রেস সদস্য কর্তৃক এবং সর্বাত্মক সমর্থনও লাভ করে কংগ্রেস সদস্যদের দ্বারা। ফলে বাংলার প্রশ্নটিকে সাম্প্রদায়িক এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচেষ্টা বলে হেয় করা খুব সহজ হয়ে যায়। যদিও সংশোধনীর পক্ষে কংগ্রেস সদস্যদের যুক্তি ছিল জোড়ালো এবং বাস্তবসম্মত। সংশোধনী প্রস্তাবটির উপস্থাপক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর পক্ষ সমর্থন করে বলেন প্রাদেশিকতার মনোভাব নিয়ে তিনি এ প্রস্তাব করেননি। পাকিস্তানের ছয় কোটি নব্বই লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা চার কোটি চল্লিশ লক্ষ। তাই তিনি এ প্রস্তাব এনেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের কথিত ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। তাই বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।[৩২]

গণপরিষদে কংগ্রেস দলের সেক্রেটারি রাজকুমার চক্রবর্তী প্রস্তাবটির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন: 'উর্দূ পাকিস্তানের কোন প্রদেশেরই কথ্য ভাষা নয়। তা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর তলার কিছুসংখ্যক মানুষের ভাষা। পূর্ব বাংলা এমনিতেই কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, তার উপর এখন তাদের ঘাড়ে একটা ভাষাও আবার চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। একে গণতন্ত্র বলে না। আসলে এ হলো অন্যান্যদের উপর উচ্চ শ্রেণীর আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। বাংলাকে আমরা দুই অংশের সাধারণ ভাষা করার জন্য কোন চাপ দিচ্ছি না। আমরা শুধু চাই পরিষদের সরকারী ভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি। ইংরেজীকে যদি সে মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে বাংলা ভাষাও সে মর্যাদার অধিকারী।'[৩৩]

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলাকে স্বীকার করে নিলে, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বাঙালী এ কথাও স্বীকার করে নিতে হয়। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে নিলে বাঙালীর উপর পাঞ্জাবী চক্রের; পূর্ব বাংলার উপর পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্ব অর্থনৈতিক শোষণ চলে না। সুতরাং বাংলা ভাষার মর্যাদার প্রশ্নটি পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং তার শাসকগোষ্ঠীর জন্য জীবনমরণ সমস্যা হয়েই দেখা দিয়েছিল। যে কারণে বাংলা ভাষার প্রতি এদের মনোভাব ছিল কঠোর এবং অনমনীয়। তবে বাংলার প্রতি এই মনোভাব বাংলার জনগণকে বাংলার পক্ষে আরো দৃঢ় অবস্থান নিতে সাহায্য করে।

পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালীর স্বার্থের প্রতি মুসলিম লীগ সরকারের মনোভাবে পূর্ব বাংলার সচেতন ছাত্র সমাজ, রাজনীতিক, শিক্ষিত মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকার ছাত্রদের ধর্মঘট পালনের মধ্যদিয়ে। পূর্ব বাংলার ছাত্র, বুদ্ধিজীবীসমাজে, সংবাদপত্র সমূহে গণপরিষদে লীগের বাংলা বিরোধী ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ঐ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় গণপরিষদে মুসলিম লীগ দলভুক্ত বাঙালী সদস্যদের আচরণের নিন্দা এবং উর্দূ ভাষী পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যের নিন্দা করা হয়। বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম সরকারী ভাষা করার উদ্দেশ্যে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে অভিনন্দন জানান হয়।[৩৪] এই সভায় পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ দিবস পালনের বিষয়টি উত্থাপিত হয়। ২ মার্চ তারিখে গণপরিষদের সিদ্ধান্ত, মুসলিম লীগের বাংলা ভাষা বিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এবং ভাষা আন্দোলনকে সুষ্ঠু সাংগঠনিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। উক্ত সভায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। গণপরিষদে সরকারী ভাষার তালিকা থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ১১ মার্চ পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে আরেকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এভাবে দেশব্যাপী আন্দোলনের ক্ষেত্র বিস্তার করে ভাষার দাবী যেমন সারা বাংলায় ছড়িয়ে দেয়া হয় তেমন সারা জাতিকে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার পথ উন্মুক্ত হয়।

এ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে চরম সরকারী নির্যাতন দমন নীতি শুরু হলে প্রতিবাদী ছাত্র সমাজ আরো উত্তেজিত হয়। ফলে ধর্মঘট বিক্ষোভ প্রতিবাদ একটানা ১৫ মার্চ পর্যন্ত চলে। ঐদিন পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার সর্বপ্রথম অধিবেশন বিধায় উক্ত দিনটিতে সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কৌশলে ছাত্র আন্দোলন প্রশমিত করার লক্ষ্যে ঐদিনই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে নাজিমুদ্দীন বর্ধমান হাউসে (বর্তমান বাংলা একাডেমী) আলোচনায় বসেন।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত সভায় প্রবল তর্কবিতর্ক এবং ছাত্র সমাজের অনমনীয় মনোভাবের ফলে নাজিমুদ্দীন তাঁদের সব কয়টি দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন এবং উভয় পক্ষ আট দফা চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেন। সর্বসম্মতক্রমে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রটি ছিল নিম্নরূপ:

এক. ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ সাল থেকে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হবে।

দুই. পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করে এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করবেন।

তিন. ১৯৪৮ এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্য যে দিন নির্ধারিত হয়েছে সেদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার এবং তাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দূর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।

চার. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে যে প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজী উঠে যাওয়ার পরই বাংলা তার স্থলে সরকারী ভাষা রূপ স্বীকৃত হবে। এছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হবে বাংলা তবে সাধারণভাবে স্কুল কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হবে।

পাঁচ. আন্দোলনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।

ছয়. সংবাদপত্রের উপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে।

সাত. ২৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে পূর্ব বাংলার যে সব স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে সেখান থেকে তা প্রত্যাহার করা হবে।

আট. সংগ্রাম পরিষদের সাথে আন্দোলনের পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে এ আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।[৩৫]

নাজিমুদ্দীনের ছাত্রদের সঙ্গে এ আপোষ ছিল একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। এর পেছনে কারণ ছিল আন্দোলনকে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে না দেয়া; পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা; পূর্ব বাংলায় জিন্নাহর আসন্ন আগমন উপলক্ষ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত রাখা।

১৫ মার্চে নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে ছাত্রদের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হওয়ার পরও পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশনে হট্টগোল চলতে থাকে। রাজপথেও চলতে থাকে ছাত্র বিক্ষোভ। চুক্তি স্বাক্ষরের পরের দিন একদিকে পরিষদের অভ্যন্তরের অশান্ত পরিবেশ অপরদিকে ছাত্র সভায় আনীত চুক্তিপত্রের সংশোধনী পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ; এ সবই চুক্তির গুরুত্ব কমিয়ে দেয়।[৩৬] আন্দোলন এমন এক পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল যে, নেতৃবৃন্দের পক্ষেও তা তাৎক্ষণিকভাবে থামিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। ছাত্র জনতার ক্ষোভ যেমন ছিল গগণস্পর্শী তেমন তা ছিল নেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ফলে পরের দিন বিক্ষুব্ধ মিছিলকারীদের উপর লাঠিচার্জের এবং পুলিশের নির্যাতনের ফলে ১৭ তারিখেও ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ঐদিন পরিষদের অভ্যন্তরে একজন মুসলিম লীগ সদস্যের পরিষদের কার্যক্রম বাংলা ভাষায় চালানো উচিত। এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে স্পীকার জানান যে, 'ভাষা প্রশ্নটি পরিষদের দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে। তবে তার পূর্বে সদস্যরা নিজের ইচ্ছে মতো যে কোন ভাষায় বক্তৃতা দান করতে পারেন।'[৩৭] পরবর্তী দিন অর্থাৎ ১৮ তারিখে ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত সংগ্রাম কমিটির সভা জিন্নাহর ঢাকায় আগমন উপলক্ষে আন্দোলনের কোন কর্মসূচী দেয়া থেকে বিরত থাকে। কার্যতঃ এভাবেই ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে বাংলা ভাষা এবং বাঙালীর দাবীর প্রতি মুসলিম লীগ সরকারের ভূমিকা, আন্দোলনকারী ছাত্র সমাজের উপর পুলিশী নির্যাতন গ্রেফতার ইত্যাদির ফলে বাঙালী জনমনে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। ছাত্র সমাজের ধারণা ছিল জিন্নাহ হয়তো তাদের প্রতি পুলিশের আচরণ এবং আন্দোলনের সমগ্র দাবীদাওয়ার বিষয়টি নিরপেক্ষ এবং সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখবেন। তারা তাঁর কাছে অন্ততঃ সুবিচার পাবেন। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ঢাকার বুকে পা দিয়ে শুধু ছাত্র সমাজ নয় সমগ্র পূর্ববঙ্গবাসীকে হতাশ করলেন। তাঁর রেসকোর্স ময়দানে দেয়া বক্তব্যই ছিল বাংলার জনগণকে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ করার জন্য যথেষ্ট।

এতে তিনি ভাষা আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের জনগণকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলেন: "আমি একথা আপনাদেরকে বলতে চাই যে, আমাদের মধ্যে নানা বিদেশী এজেন্সীর অর্থ সাহায্যপুষ্ট কিছু লোক আছে যারা আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

সংহতি বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। তাদের উদ্দেশ্য হলো পাকিস্তানকে ধ্বংস করা। আপনারা সাবধান হয়ে চলুন আমি তাই চাই, আমি চাই; আপনারা সতর্ক থাকুন এবং আকর্ষণীয় শ্লোগান ও বুলির দ্বারা বিভ্রান্ত না হন। তারা বলছে যে, পাকিস্তান ও পূর্ব বাঙলা সরকার সর্বতোভাবে আপনাদের ভাষাকে ধ্বংস করতে চায়। মানুষ এর পক্ষে এর থেকে বড় মিথ্যা ভাষণ আর কিছু হতে পারে না। সোজাসুজিভাবে আমি একথা আপনাদেরকে বলতে চাই যে, আপনাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কমিউনিষ্ট এবং বিদেশীদের সাহায্যপ্রাপ্ত এজেন্ট আছে এবং এদের সম্পর্কে সাবধান না হলে আপনারা বিপদগ্রস্ত হবেন। পূর্ব বাঙলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা তারা পরিত্যাগ করেনি এবং এখনো পর্যন্ত সেটাই তাদের লক্ষ্য।"[৩৮]

যে ছাত্র সমাজের প্রত্যক্ষ আন্দোলনে পাকিস্তান সৃষ্টি সেই ছাত্র সমাজ মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে হলেন 'বিদেশীদের সাহায্যপ্রাপ্ত এজেন্ট'। অথচ পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে ১৫ মার্চ ছাত্র সমাজের যে চুক্তি হয়েছিল, তার অষ্টম দফায় 'আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ মুক্তির কথা উল্লেখ করে চুক্তিপত্রে উক্ত দফাটি স্বহস্তে লিখেও দিয়েছিলেন। জিন্নাহর এ ধরনের বক্তব্যের পর অষ্টম দফাটির কোন গুরুত্ব থাকল না। তাঁর বক্তব্যে এটাই তিনি পূর্ববঙ্গবাসীকে বোঝাতে চাইলেন যে ভাষা আন্দোলনকারীরা দেশদ্রোহী, বিদেশী এজেন্ট এবং কমিউনিষ্ট।

তিনি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে যেয়ে বলেন : "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে প্রতিহত করতে না পেরে, পরাজয়ের দ্বারা বাধাগ্রস্ত ও হতাশ হয়ে পাকিস্তানের শত্রুরা এখন পাকিস্তানী মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। প্রাদেশিকতার উস্কানি দানের মাধ্যমেই তাদের এই প্রচেষ্টাকে তারা অব্যাহত রেখেছে। যে পর্যন্ত না এই বিষয়কে আপনারা রাজনীতি থেকে বর্জন করছেন, সে পর্যন্ত আপনারা নিজেদেরকে একটা সত্যিকার জাতি হিসেবে গঠন করতে সক্ষম হবেন না। আমরা বাঙালী বা সিন্ধী বা পাঠান বা পাঞ্জাবী এ কথা বলার প্রয়োজন কি। না, আসলে আমরা সকলেই হলাম মুসলমান।"[৩৯] তিনি ভাষা প্রসঙ্গটিকেও বিভেদ সৃষ্টির কৌশল, বলে অভিহিত করেন। এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে পূর্ব বাংলার ছাত্র জনতার ভূমিকা অস্বীকার করে বলেন-"মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভাষার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আপনাদের প্রধানমন্ত্রীও একটি সদ্য প্রকাশিত বিবৃতিতে যথাযথভাবে একথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সরকার এ দেশের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য রাজনৈতিক অন্তর্ঘাতক অথবা তাদের এজেন্টদের যে কোন চেষ্টাকে কঠিনভাবে দমন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আমি খুশী হয়েছি।"[৪০]

আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে বাধা দমনমূলক সিদ্ধান্তে যদি তিনি খুশী হয়ে থাকেন তবে আগে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার জন্য ও অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন চলাকালে ছাত্র জনতার ওপর পুলিশী নির্যাতন, গ্রেফতার ইত্যাদি কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করায়ও তিনি খুশী হয়েছেন। তাঁর সকল বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে এবং তা হবে উর্দূ। তাঁর ভাষায় : 'একথা আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দূ। অন্য কোন ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু।'[৪১]

অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ঐক্য সংহতি বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলে, ইসলামের নামে, ইসলামী জাতীয়তাবাদের নামে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দূকে চাপিয়ে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করা হয়। একটি ক্ষয়িষ্ণু সাংস্কৃতির ভাষা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয় বিশাল ঐতিহ্য মন্ডিত সমৃদ্ধশালী আধুনিক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর উপর।

রাষ্ট্রপ্রধান এবং পাকিস্তানের অবিসংবাদী নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাষা সম্পর্কে বিবিধ মন্তব্য, ভাষা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ঘনঘন সতর্ক ও সাবধানবাণী উচ্চারণ, তাদেরকে 'অন্তর্ঘাতক', 'রাষ্ট্রের শত্রু', 'দেশদ্রোহী' ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করার দরুন উপস্থিত শ্রুতিমন্ডলির মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আন্দোলনকারীদের প্রতি নাজিমুদ্দীন সরকারের অত্যাচারকে সমর্থন এবং ভবিষ্যতেও তাদের কঠোর শাস্তি দানের কথা ঘোষণায় অনেকেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেননি। তাছাড়া জিন্নাহর একমাত্র উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করার দৃঢ় বক্তব্যের বিরুদ্ধে মৃদু হলেও প্রতিবাদ ধ্বনি শোনা যায়। এই মৃদু প্রতিবাদ প্রবলরূপ ধারণ করে ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জিন্নাহর সম্মানে যে সমাতর্বন উৎসবের আয়োজন করা হয় তাতে 'উর্দূই একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে' এই ঘোষণা দেয়া মাত্র ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই 'না' 'না' বলে চিৎকার করতে থাকেন।[৪২]

জিন্নাহর এই ধরনের বক্তৃতা বিবৃতি উর্দূর প্রতি তার পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, স্বীয়মত জোরপূর্বক অন্যের উপর

Dhaka University Institutional Repository

চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা, ছাত্রদের প্রতি তাঁর কঠোর মনোভাব ছাত্রদের মধ্যে যেমন তার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হয় তেমন পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে তার সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা ছিল তা স্তিমিত হয়ে যায়।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সঙ্গে জিন্নাহ সাক্ষাৎকারটিও সুখকর হয়নি। জিন্নাহ ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনাকলে নাজিমুদ্দীনের সাথে তাদের চুক্তিপত্রটি সম্পূর্ণ অবৈধ বলে অগ্রাহ্য করেন। শুধু তাই নয় তিনি ছাত্রদেরকে বলেন যে, জোরপূর্বক তারা নাজিমুদ্দীনের কাছ থেকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর আদায় করে নিয়েছেন। সুতরাং একতরফা চুক্তিপত্রটি গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীটিও তিনি মানতে অস্বীকার করেন। তার মতে একটির বেশী রাষ্ট্রভাষা থাকলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। উক্ত সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে জিন্নাহর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এতে বলা হয়: "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একমাত্র মুসলমান যুবকদের লইয়া গঠিত এই কর্মপরিষদ মনে করেন যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কারণ প্রথমতঃ তাহারামনে করেন যে, উহা পাকিস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের ভাষা এবং পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র হওয়ায় অধিকাংশ লোকের দাবী মানিয়া লওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিক যুগে কোন কোন রাষ্ট্রে একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত কয়েকটি দেশের নাম করা যায়: বেলজিয়াম (ফ্লেমিং ও ফরাসী ভাষা)। কানাডা (ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা সুইজারল্যান্ড (ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয় ভাষা) দক্ষিণ আফ্রিকা (ইংরেজী ও আফ্রিকানার ভাষা), মিসর (ফরাসী ও আরবী ভাষা) শ্যাম (থাই ও ইংরেজী ভাষা)। এতদ্ব্যতীত সোভিয়েত রাশিয়া ১৭টি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ এই ডেমিনিয়নের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষাই রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার করার পক্ষে উপযুক্ত। কারণ সম্পদের দিক বিবেচনায় এই ভাষাকে পৃথিবীর সপ্তম স্থান দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থতঃ আলাওয়াল, নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, সৈয়দ এমদাদ আলী, ওয়াজেদ আলী, জসিমউদ্দিন ও আরো অনেক মুসলমান কবি ও সাহিত্যিক তাহাদের রচনা সম্ভার দ্বারা এই ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে।

পঞ্চমতঃ বাংলার সুলতান হুসেন শাহ, সংস্কৃত ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও এই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার পর্যায়ে উন্নিত করিয়াছিলেন এবং এই ভাষার শব্দ সম্পদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ পারসিক ও আরবী ভাষা হইতে গৃহীত।

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই যে, যে কোন পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের কয়েকটি মৌলিক অধিকার আছে। কাজেই যে পর্যন্ত না আমাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সে পর্যন্ত বাংলা ভাষার জন্য এই আন্দোলন চালাইয়া যাওয়া হইবে।"[৪৩]

জিন্নাহর ঢাকায় অবস্থানকালে উর্দূ এবং ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পক্ষে বক্তব্য আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ সত্ত্বেও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ তাদের অবস্থান থেকে এক বিন্দু সড়ে দাঁড়াননি। জিন্নাহর কঠোর মনোভাব উপেক্ষা করেও সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ আলোচনাকালে যে স্মারকপত্রটি পেশ করেন তাতে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়, যে পর্যন্ত না তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে সে পর্যন্ত বাংলা ভাষার জন্য এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষা আন্দোলনকারীদের দৃঢ় অঙ্গীকার বাঙালী জাতীয়তাবাদী চিন্তার পথ উন্মুক্ত করতে সাহায্য করে। অপরদিকে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ বাঙালী অবাঙালী মুসলিম লীগ সদস্যদের বাংলা ভাষা ও পূর্ব বাংলার স্বার্থ বিরোধী ভূমিকা, পরবর্তীতে জিন্নাহর একই ধরনের মনোভাবে শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই হতাশ হন। যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পাকিস্তান সৃষ্টি তাদের প্রতি এই অগণতান্ত্রিক, একনায়ক সুলভ আচরণে পূর্ব বাংলার জনগণ সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। দ্বিজাতিতত্ত্বের জাতীয়তাবাদের পক্ষে যে ব্যক্তির সর্বগ্রাসী প্রভাব বলয়ে থেকে বাঙালী পাকিস্তান অর্জনের পক্ষে ছিল সেই নেতার পক্ষপাতমূলক আচরণ, তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদের বাঙালীর স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকা, বাংলার জনগোষ্ঠীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। উর্দূ ও ইংরেজীর সাথে বাংলাকেও জাতীয় পরিষদের সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃত দানে অস্বীকারের ফলে যেমন ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়; তেমন সরকারের মনমানসিকতা ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে। ভাষা আন্দোলনের গতি শেষ পর্যন্ত দ্বিজাতিতত্ত্বের পথ পরিহার করে বাঙালী জাতীয়তাবাদ পথে পূর্ব বঙ্গের জনগোষ্ঠীকে ঠেলে দেয়। সুতরাং বাঙালী জাতীয়তাবাদ উত্থানের পথে মুসলিম লীগের বাংলা বিরোধী ভূমিকার মতো জিন্নাহর ভূমিকাও কম ছিল না। এ কারণে জিন্নাহর ঢাকায় আগমন পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ তার বক্তৃতা বিবৃতি বাঙালী নিজের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। বাঙালীর স্বার্থ বিরোধী মনোভাব বাঙালীকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং পূর্ব বঙ্গের

Dhaka University Institutional Repository

জনগণ দ্রুত দ্বিজাতিতত্ত্বের পথ থেকে সরে আসতে থাকে।

তাছাড়া ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে নাজিমুদ্দীন বাংলা ভাষা প্রশ্নটি যেভাবে উত্থাপন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, সেভাবে তা পরিষদে পেশ করা থেকে বিরত থাকেন। কেননা জিন্নাহর ঢাকা ত্যাগের পর ৩১ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কেন্দ্রের কাছে সুপারিশের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে নাজিমুদ্দীন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের পেশকৃত প্রস্তাবটি ছিল :

(ক) পূর্ব বাঙলা প্রদেশে ইংরেজীর স্থলে বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসেবে গ্রহণ করিতে হইবে; এবং

(খ) পূর্ব বাঙলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হইবে যথাসম্ভব বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ স্কলারদের মাতৃভাষা।[৪৪]

এই প্রস্তাবের উপর নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তাব আনেন কংগ্রেস দলের ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত:

এক, এই পরিষদের অভিমত এই যে :

(ক) বাঙলা পূর্ব বাংলা প্রদেশের সরকারী ভাষারূপে গৃহীত হইবে;

(খ) পূর্ব বাঙলা প্রদেশে ইংরেজীর স্থলে বাংলা প্রবর্তনের জন্য আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে;

(গ) পূর্ব বাঙলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা।

দুই, এই পরিষদ আরও মনে করে যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত এবং

তিন, এই পরিষদ পাকিস্তান সরকারের নিকট সুপারিশ করে যে—

(ক) সর্বপ্রকার নোট ও টাকা পয়সা, টেলিগ্রাফ, পোষ্ট কার্ড, ফর্ম বই ইত্যাদি ডাক সংক্রান্ত, যাবতীয় জিনিষ রেলওয়ে টিকিট এবং পাকিস্তান সরকারের অন্য সর্বপ্রকার সরকারী ও আধাসরকারী ফর্মে অবিলম্বে বাংলা প্রচলন করা হউক;

(খ) কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে এবং সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে যোগদানের জন্য সকল প্রকার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এবং অন্যতম বিষয় হিসেবে বাংলা প্রবর্তন করিতে হইবে, এবং

চার, এই পরিষদ সংবিধান সভার সকল সদস্যকে অনুরোধ জানাইতেছে এবং পূর্ব বাঙলার প্রতিনিধিদের নিকট বিশেষভাবে আবেদন করিতেছে যাহাতে তাঁহারা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।[৪৫]

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তার সংশোধনী প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতার মুখে পর পর আরো সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করতে বাধ্য হন। প্রথমটি মূল প্রস্তাবের উপর আনীত প্রস্তাব নয় বরং নতুন একটি প্রস্তাব এবং এটির বিষয়বস্তু প্রাদেশিক সরকারের আওতার বর্হিভূত বলে সরকার পক্ষের তীব্র বিরোধীতার মুখোমুখি হয়। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং প্রাদেশিক সরকারের এলাকা বর্হিভূত বিষয়ে বলে এর বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অথচ একমাসও হয় নাই প্রধামন্ত্রী স্বয়ং প্রাদেশিক সরকারের এলাকা বর্হিভূত বিষয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা করেছিলেন এবং বাস্তবায়নের জন্য ছাত্রদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবটি প্রথমটির দুই ও চার নম্বর বিষয় বাদ দিয়ে পেশ করা হলেও তা একই ধরনের বিরোধীতার মুখোমুখি হয়। তৃতীয় সংশোধনীটিতে দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবের প্রথম অংশ এক নম্বর বিষয়বস্তুর ক, খ, গ-এর পরের অংশটুকু বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হয়। তবে প্রস্তাবের খ অংশের প্রথমে শুধু 'দুই বৎসরের মধ্যে' শব্দ কয়টি যুক্ত করা হয়। ধীরেন্দ্রনাথ ছাড়াও আরো অনেকে সংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তার মধ্যে আহমদ আলী মৃধা কর্তৃক আনীত নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তাবটি গ্রাহ্য হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় :

(ক) পূর্ব বাঙলা প্রদেশে ইংরেজীর স্থলে বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হইবে; এবং যত শীঘ্র বাস্তব অসুবিধাগুলির দূর করা যায় তত শীঘ্র তাহা কার্যকর করা হইবে।

(খ) পূর্ব বাঙলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হইবে 'যথাসম্ভব' বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ স্কলারদের মাতৃভাষা।[৪৬]

এখানে উল্লেখ্য যে, অধিবেশন চলাকালে নাজিমুদ্দীনকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটির যে বিষয়বস্তুটি প্রাদেশিক সরকারের এলাকা বহির্ভূত বলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, সে বিষয়টিই তিনি প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে। এর জবাবে তিনি পাল্টা পরিষদ সদস্যদের স্মরণ করিতে দেন ২১ ও ২৪ মার্চ তারিখে জিন্নাহর দেয়া বক্তৃতার বিষয়বস্তুকে। এভাবে জিন্নাহর দোহাই দিয়ে তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং ভাষা আন্দোলনকারী পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাসঘাতকতার এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেন।

১৫ মার্চের প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রশ্নে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেলের বক্তব্যের উদাহরণ টানা নাজিমুদ্দীনের দুর্বলতা ও দ্বৈত ভূমিকার প্রমাণ বহন করে। এর ফলে বাঙালীর স্বার্থ রক্ষায় নাজিমুদ্দীন এমনকি কেন্দ্রীয় লীগ সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কেও জনমনে সন্দেহের গভীর ছায়া পড়াটা স্বাভাবিক। এই অবস্থায় পূর্ব বঙ্গবাসীর অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনই ছিল একমাত্র পথ। এরপর থেকে পূর্ব বাংলার সকল আন্দোলনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীটি একটি মুখ্য দাবী হিসেবে গণ্য হতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে যে ক্ষোভ দানা বেধে উঠেছিল, অন্যান্য দাবীকে কেন্দ্র করে তা আরো দৃঢ় এবং সুসংবদ্ধ হতে থাকে।

১৯৪৮ সালে ভাষা ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। যার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। যদিও এইসব অসন্তোষ রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়, তবু এর মধ্যেই পূর্ব বঙ্গবাসীর চিন্তায় বাঙালীর স্বতন্ত্র চেতনার উপস্থিতি দৃঢ় হতে থাকে। কেননা একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ববঙ্গবাসীর সামগ্রিকভাবে বঞ্চিত এবং উপেক্ষিত হওয়ার উপলব্ধি তখন থেকেই মনে স্থান পেতে থাকে। তাছাড়া পাকিস্তানের যাত্রাই শুরু হয়েছিল পূর্ব পশ্চিমের মধ্যকার বৈষম্য নিয়ে। তার উপর শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ তো ছিলই। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যদিয়ে এই আচরণ গোপন থাকেনি। ফলে প্রথম থেকে বাঙালীরা তাদের দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রামের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। এখানে দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা যেমন ছিল পূর্ব বাংলার অধিবাসী, আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধ ছিল এই ভূখন্ডে। পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি কেন্দ্রের উদাসীন্য ও অবহেলার কারণে সরকারী কর্মচারী থেকে পুলিশ বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের পেশাজীবী শ্রেণী ধর্মঘটে নামতে বাধ্য হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা ক্রমাগত ১৮ দিন ধর্মঘট চালিয়ে যায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা তাদের দাবী আদায়ের জন্য অনশন ধর্মঘটের পথ বেছে নেয়। নতুন বিক্রয় কর ধার্যের বিরুদ্ধে জনসাধারণ ও দোকানদাররা ২৬ এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন। সাংবাদিকরা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছাত্র শিক্ষক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন।[৪৭]

পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজের আন্দোলনে অংশ নেয়ার উদ্দেশ্য ছিল এ অংশের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতি অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায় করা যা তারা করেছিল সচেতনভাবে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাত্র সমাজের নিজস্ব দাবী দাওয়ার প্রশ্নও ছিল। তবে বেশী ভাগ সময়ই দেখা গেছে এদের আন্দোলন নিজস্ব চাহিদার গন্ডি পার হয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চাহিদার সঙ্গে একীভূত হয়েছে। ফলে ছাত্রদের আন্দোলন, শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছে পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে। অপরদিকে সে সময়ের পেশাজীবীদের আন্দোলন সম্পূর্ণ নিজস্ব গন্ডির মধ্যে বা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও এর মধ্য থেকে তাঁদের ক্ষোভের যে প্রকাশ, তা নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কিত ছিল। বাঙালী মুসলমান দ্বিজাতিতত্ত্বের পতাকাতলে দাঁড়িয়েছিল শুধু দেশ বিভাগের মধ্যদিয়ে নিজের স্বতন্ত্র সত্ত্বা বজায় রেখে ভাগ্যোন্নয়নের প্রত্যাশী হয়ে। সে প্রত্যাশার পথে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক চক্রের কালো হাতের থাবা তাদের হতাশ করেছিল। ছাত্র সমাজ যেমন ভাষা সংস্কৃতির আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। তেমন সাধারণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক বঞ্চনার স্বীকার হয়ে মুসলিম লীগ সরকারের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজাতিতত্ত্বের জাতীয়তাবাদের পথ পরিহার করে অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে ক্রমাগত বাঙালীর ভাষা সংস্কৃতি নির্ভর জাতীয়তাবাদের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। শিক্ষিত সমাজ এবং পেশাজীবী সমাজ একই লক্ষ্যের দিকে ভিন্ন ভিন্ন পথে অগ্রসর হচ্ছিল। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন এদেরকে একই সারিতে দাঁড় করিয়ে সামনের দিকে অগ্রসরের প্রেরণা যোগায়। তখন থেকে বাঙালীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং ভাষা সংস্কৃতির স্বার্থ একাত্ম হয়ে যায়।

জিন্নাহর পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের পর আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলন আপত দৃষ্টিতে স্তিমিত হয়ে গেলেও তা থেমে থাকেনি। বাংলা ভাষার প্রশ্নটি বার বার নানান প্রসঙ্গে সামনে এসেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম না হলেও বিবৃতি, প্রতিবাদ, স্মারকলিপি প্রদান ইত্যাদি চলতে থাকে। আটচল্লিশের নভেম্বরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এলে ছাত্র সমাজ পুনরায় ভাষা প্রসঙ্গটি তার সামনে উপস্থিত করেন। উর্দূর পাশাপাশি বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্থান দেয়ার জন্য রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ তাঁকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে তাঁকে দেয়া মানপত্রটিতেও ভাষা প্রসঙ্গটি স্থান পায়। বিচক্ষণ লিয়াকত আলী খান ভাষা বিষয় কিছু বলা থেকে বিরত থাকেন। তিনি ছাত্রদের স্মারকলিপিটির যেমন প্রাপ্তি স্বীকার করেননি তেমন মানপত্রের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গেও কোনও জবাব দেননি।

Dhaka University Institutional Repository

এতে শিক্ষিত সমাজের কাছে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে জিন্নাহর অনুসৃতনীতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। নেতাদের এই সব নীতির কারণেই বিক্ষুব্ধ পূর্ব বঙ্গবাসীর মধ্যে ভাষাকে কেন্দ্র করে তাদের মানসিক ঐক্য, জাতিগত একাত্মতাবোধের জন্ম হতে থাকে।

১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানের আমলাচক্র বাংলা ভাষা ধ্বংসের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাদের ষড়যন্ত্র উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং বাংলা ভাষায় আরবী অক্ষর প্রচলনের নামে উর্দূ হরফ প্রচলনের বিষয়টিও ষড়যন্ত্রের অংশে পরিণত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সম্মেলনে পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব ফজলুর রহমান শিক্ষাকে ইসলামী ভাবাদর্শে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রচলনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। বিষয়টি বিশদভাবে তিনি পেশ করেন পরের বছর ৭ ফেব্রুয়ারী পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায়।[৪৮]

কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব যাই হোক না কেন পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, ছাত্রসমাজ তাদের ভাষা এবং স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্রমাগত সাহসী প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। এই প্রয়াসের যোগ্য নমুনা ১৯৪৮ সলের ৩১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি হিসেবে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষণ: 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তারচেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়। এটা একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা তিলক টিকিতে কিং বা টুপি-লুঙ্গি-দাঁড়িতে ঢাকার জোটি নেই।'[৪৯]

যখন বাংলা ভাষার অস্তিত্ব বিপন্ন এবং বাঙালীর স্বতন্ত্র সত্ত্বার উল্লেখ দেশদ্রোহীতার নামান্তর, তখন একজন বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মুখে এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে সাহসী উচ্চারণ। এই উচ্চারণের মধ্যে বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানসে বাঙালী জাতিসত্ত্বার উপস্থিতি এবং এর স্বতন্ত্র সত্ত্বা সম্পর্কে সচেতনতার আভাস বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। এর মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতি চিন্তার বহিঃপ্রকাশ প্রমাণ করে যে সচেতন বুদ্ধিজীবী সমাজে ধর্মের চেয়ে জাতিসত্ত্বার গুরুত্ব ছিল বেশী। অথচ এর আগে বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবী শ্রেণী প্রথমে তাঁদের মনে করতেন মুসলমান তারপর বাঙালী। আবার জাতিসত্ত্বার বিষয়ে নিজেকে মুসিলম জাতিভুক্ত ভাববার মতো বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাই ছিল বেশী (যদিও জাতির সজ্ঞা নির্ণয়ের মাপ কাঠিতে এই ধরনের জাতি চিন্তা ধোপে টেকে না)। ফলে ডঃ শহীদুল্লাহর বক্তব্য তুমুল বিতর্কের ঝড় তোলে। তবু বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজের ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে হলেও সে সময়ই যে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয় চিন্তাভাবনার উদয় হয়েছিল তাও এ অঞ্চলের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলা প্রসঙ্গটির সমাধান হয়ে গিয়েছিল বিশের দশকেই, তবু বাংলা বিরোধী বাংলা বিদ্বেষী ষড়যন্ত্রকারীদের কারণে পঞ্চাশের দশকেও বাঙালীর মাতৃভাষা নিয়ে সাহিত্য চর্চার জন্য বক্তব্য রাখার প্রয়োজন হয়েছে। যে কারণে উক্ত সাহিত্য সভায় ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহকে মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চার পক্ষে কথা বলতে দেখা যায়। তিনি বলেন: 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা স্বাধীন নাগরিক রূপে আজ আমাদের প্রয়োজন সর্ব শাখায় সুসমৃদ্ধ এক সাহিত্য। এই সাহিত্যে আমরা আজাদ পাক-নাগরিক গঠনের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুশীলন চাই। এই সাহিত্য হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়। পৃথিবীর কোন জাতি জাতীয় সাহিত্য ছেড়ে বিদেশী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে প্রশংসী হতে পারেনি। ইসলাম এর ইতিহাসের একেবারে গোড়ার দিকেই পারস্য আরব কর্তৃক বিজিত হয়েছিল, পারস্য আরবের ধর্ম নিয়েছিল, আরবী সাহিত্যেরও চর্চা করেছিল। কিন্তু তার নিজের সাহিত্য ছাড়েনি।'[৫০]

তাছাড়া শহীদুল্লাহ আরবী অথবা রোমান হরফে বাংলা প্রচলনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে যেয়ে বলেন : "স্বাধীনতা পূর্ব বাংলায় কেউ আরবী হরফে, কেউ বা রোমান অক্ষরে বাংলা লিখতে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলার শতকরা ৮৫ জন যে নিরক্ষর, তাদের মধ্যে অক্ষর জ্ঞান বিস্তারের জন্য কি চেষ্টা হচ্ছে? যদি পূর্ব বাংলার বাইরে বাংলাদেশ না থাকতো আর যদি গোটা বাংলাদেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না থাকত, তবে এই অক্ষরের প্রশ্নটি এত সঙ্গীন হত না। আমাদের বাংলা ভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। পাকিস্তান রাষ্ট্র ও মুসলিম জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি। তার উপায় আরবী হরফ নয়; তার উপায় আরবী ভাষা। আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য ভান্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে।"[৫১]

১৯৪৯ সালের ৪ মার্চ তারিখে তমুদ্দুন মজলিশের সাহিত্য শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভায়ও হরফ পরিবর্তনের ষড়যন্ত্রকে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ তীব্রভাবে নিন্দা করেন। এতে বাংলা ভাষায় হরফ নির্ধারণের দায়িত্ব ভাষা বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দেয়ার দাবী জানানো হয়।[৫২]

মার্চ মাসের আর একটি ঘটনা এই অঞ্চলের রাজনৈতিক এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের সহায়ক শক্তি

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে কাজ করেছিল। ঘটনাটির শুরু ৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটের মধ্যদিয়ে। কর্মচারীরা এই ধর্মঘটের সূত্রপাত করলেও পরবর্তীতে এর নেতৃত্ব চলে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পরিষদের হাতে। এই আন্দোলনেও ভাষার বিষয় উপেক্ষিত হয়নি। যে কারণে ১২ মার্চ তারিখে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে পরিষদ ভবনের সঙ্গে ছাত্রদের "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই" "আরবী হরফ চাই না।" ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়।[৫৩] কর্মচারীদের পক্ষ নিয়ে আন্দোলন করার অপরাধে ছাত্রদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করে কর্তৃপক্ষ ২৭ জন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এতে ছাত্র সমাজ আন্দোলনের পরিত্যাগ না করে আন্দোলন তীব্রতা আরো বৃদ্ধি করে। এভাবে ছাত্র সমাজ সাধারণ কর্মচারীদের আন্দোলনে অংশ নিয়ে তারা যেমন সাধারণ সংগ্রামী মানুষের আস্থা অর্জন করে, তেমনি প্রয়োজনে নিঃস্বার্থভাবে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় তাদের পাশে দাঁড়াবার নজির স্থাপন করে। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে আন্দোলনকারী সচেতন ছাত্র সমাজের মেহনতী মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ে আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার ফলে বিভাগ উত্তরকালের আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়।

কোন আন্দোলনই পূর্ণতা লাভ করে না যতক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সমর্থন নিশ্চিন্ত না হয়। এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে ছাত্র সমাজ এই নিশ্চয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। ২৫ এপ্রিল ছাত্র পরিষদের আহূত সাধারণ ধর্মঘটে বৃহত্তর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি, অংশগ্রহণ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যান্য সাধারণ ঘটনা। ঐ দিনই প্রথম ছাত্রদের সঙ্গে বিশাল জনগোষ্ঠীর সত্যিকার অর্থে রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপনের ইতিহাস সৃষ্টি হয়। এভাবে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্র জনতার একাত্ম হয়ে আন্দোলনে অংশ্রহণের শুভ সূচনা হয়। এবং ছাত্রদের ডাকে তাদের নেতৃত্বে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আন্দোলনে অংশগ্রহণের পথ তৈরী হতে থাকে। ভাষা সংস্কৃতির আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র সমাজ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে জনগণের পাশে এসে দাঁড়াতে থাকে। এই পাশাপাশি অবস্থান একাত্তর সাল পর্যন্ত বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের বৃহত্তর পরিসর রচনায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। যে কারণে '৫২ ভাষা আন্দোলন অর্থাৎ বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা ছাত্র জনতার সম্মিলিত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছিল। সর্বশ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের পথে সংগ্রামী যাত্রীতে পরিণত করেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলন চলাকালে ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রশ্নটি পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনেও উত্থাপিত হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক ভাষা সংস্কারের নামে বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রচলনের সুপারিশের প্রতি ১৯৪৯ সালের ২৯ মার্চ পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মনোরঞ্জন ধর শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মন্ত্রী এই ধরণের প্রচেষ্টার কথা অস্বীকার করেন।[৫৪] মন্ত্রীর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন সত্ত্বেও ছাত্র বুদ্ধিজীবী সমাজ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সন্দেহ মুক্ত হতে পারেননি। বাঙালীর ভাষার উপর আরবী বর্ণ চাপিয়ে বাংলা ভাষা সাহিত্য এবং বাঙালী জাতিসত্ত্বা ধ্বংসের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের ভাষা কমিটির তরফ থেকে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেয়া হয়। এতে আরবী হরফ চাপিয়ে দেয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে দিয়ে বলা হয়: "পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত গত বছরের প্রস্তাবটি উর্দূ চাপানোর চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল। ...উর্দূর জন্য সামনের দুয়ার যখন রুদ্ধ তখন আরবী বর্ণমালার জিগীর তুলে পশ্চাৎ দুয়ার দিয়ে উর্দূ প্রবর্তনের চেষ্টা হচ্ছে এবং পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবেও বাংলা ভাষাকে খতম করবার ষড়যন্ত্র চলছে। যখনই আলেম সমাজ আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়েছেন তখনই এরা নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আরবীকে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা করার ব্যাপারেও এদের মুখে কথা নেই।"[৫৫]

বাংলা বর্ণমালা উচ্ছেদ করে আরবী অক্ষর প্রচলনের অসৎ উদ্দেশ্য এবং কুফল সম্পর্কে বিবৃতিতে বলা হয়: "...পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত লোকের হার ১২ থেকে ১৫ জন; কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৫ জনের কম। আরবী বর্ণমালার দোহাই দিয়ে শতকরা এই ১৫ জন শিক্ষিতকে কলমের খোঁচায় অশিক্ষিত পরিণত করবার চেষ্টা চলছে। এমনিভাবে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারও ইংরেজী প্রচলন করে ভারতের আরবী পারসী শিক্ষিত মুসলমানকে কলমের এক খোঁচায় অশিক্ষিতে পরিণত করবার ষড়যন্ত্রে সাফল্যমন্ডিত হয়েছিল। আরবী বর্ণমালা প্রচলিত হলে পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষিতের হার ঠিকই থাকবে পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিতের হার শতকরা ১৫ থেকে নেমে আসবে নগণ্য ভগ্নাংশে। শিক্ষক অভাবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থাতেই অচল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায় সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় অশিক্ষিত বলে পরিগণিত হলে পূর্ব পাকিস্তানের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই বানচাল হয়ে যাবে।"[৫৬]

বাংলা ভাষা ধ্বংসের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দৃঢ় মত পোষণ করে বলা হয়: "তোগলকী প্ল্যানের উদ্যোক্তাদের আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে আরবী বর্ণমালার ধুয়া তুলে গত বছরের ভাষা প্রস্তাবকে নাকচ করার ষড়যন্ত্রকে আমরা কোন মতেই সহ্য করে নেব না।"[৫৭]

এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরাও বাংলা ভাষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ছাত্রছাত্রীরা পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা বিবেচনার বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে বাংলা বর্ণমালা উচ্ছেদ প্রচেষ্টার বিরোধীতা করে এক দীর্ঘ স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। এই স্মারকলিপিতে উপস্থাপিত বক্তব্যে সুষ্ঠু চিন্তাভাবনার প্রকাশ যেমন ঘটেছে তেমন ঐতিহ্যবাহী বাংলা ভাষা সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক দরদেরও প্রকাশ ঘটেছে। এই স্মারকলিপিতে বলা হয়: "আমরা মনে করিতেছি যে, আরবী হরফ প্রণয়ন প্রচেষ্টা দ্বারা পৃথিবীর ৬ষ্ঠ স্থানাধিকারী বিপুল ঐশ্বর্যময়ী ও আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরবের ঐতিহ্যবাহী বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর হামলা করা হইতেছে।...নিঃসন্দেহে বাংলায় আরবী হরফ প্রণয়ন যে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অগ্রগতিকে চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিবে তাহার স্বপক্ষে আমরা নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক ও পক্ষপাতশূন্য যুক্তি উপস্থাপিত করিতেছি:

"পাকিস্তানে শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষাগুলির জন্য আরবী হরফের যে সুপারিশ করিয়াছেন একমাত্র বাংলার উপরই তাহার আঘাত তীব্র এবং ব্যাপকভাবে পড়িবে। পাঞ্জাবী, সিন্ধী ব্রাহুই, বেলুচী পুশতু এবং বাংলা পাকিস্তানের এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র বাংলাই সাহিত্য সম্পর্কে ভাবে ঐশ্বর্যে, প্রকাশ ভঙ্গীর ঔৎকর্ষে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম। অন্যান্যগুলির সাহিত্যে কোন চর্চা নেই এবং বর্তমানে এই মৃতকল্প ভাষাগুলি উর্দূ হরফেই লিখিত হইতেছে। কাজেই হরফ পরিবর্তনের আঘাত পাকিস্তানের সর্বপ্রধান এবং অধিক সংখ্যক লোকের ভাষা বাংলার উপরই পড়িবে। অনভিজ্ঞ এবং মূর্খ লোকেই শুধু বলিতে পারে হরফ পরিবর্তনে ভাষার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।[৫৮]

এই হরফ পরিবর্তনের ফলে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত শ্রেণীর উপর কি ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলবে এবং এর পেছনের উদ্দেশ্য কী সে সম্পর্কে বলতে যেয়ে স্মারকলিপিতে উল্লেখ্য করা হয়: "...বাংলা হরফ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পাক বাংলার শিক্ষিত সমাজকে অশিক্ষিতের শ্রেণীতে পরিণত করার চক্রান্ত সফল হইলে কে তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিবে? এ পর্যন্ত যে লক্ষ লক্ষ পুস্তক বাংলা ভাষায় ছাপা হইয়াছে কে কবে সেগুলিকে আরবী হরফে রূপান্তরিত করিবে? হরফ পরিবর্তনের পশ্চাতে আছে শিক্ষা বিস্তারকে ব্যাহত করিবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।"[৫৯] স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়: "হরফ পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে পাক বাংলার শিক্ষিত সমাজের উপরও ঘৃণিত আঘাত নামিয়া আসিতেছে। হরফ পরিবর্তনের বিশৃংখলার মধ্যে দিশেহারা শিক্ষিত সমাজ শিক্ষিত সমাজ সৃষ্টির অনুপ্রেরণাকে স্থায়ীরূপ দান করিতে পারিবে না। আজাদীর মধ্যদিয়ে লব্ধ পাক-বাংলার নূতন জীবন চেতনাকে যদি হরফ পরিবর্তনের অছিলায় ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। আঞ্চলিক প্রভূত্ব লাভের দূরাকাংখা এমনিভাবে পাকিস্তানের শত্রুতা করিতে যাইতেছে। পাক-বাংলার মনে নূতন পরাধীনতার আশংকাকে কায়েম করিয়া তুলিতেছে।"[৬০]

এছাড়াও স্মারকলিপিতে আরবী হরফ পরিবর্তনের ফলে কি কি অসুবিধা হবে সে বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। স্মারকলিপির শেষাংশে বাংলার পক্ষে দৃঢ় বক্তব্য রাখা হয় : "...বাংলা হরফকে পরিবর্তন করা চলিবে না। পাক বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর কসাইয়ের মত ছুরি চালনা করা চলিবে না। পাক বাংলার তহজীব ও তমদ্দুনকে পাকিস্তানের সামগ্রিক তমদ্দুনের একটি সবল অংশ হিসেবে গড়িয়ে উঠিবার সুযোগ দিতে হইবে। শিক্ষা বিস্তারকে সহজতর করিতে হইবে।"[৬১]

ছাত্র সমাজের বাংলার পক্ষে যুক্তি এবং আরবী হরফ বিরোধীতার সঙ্গে পন্ডিত সমাজের বক্তব্য এবং চিন্তা ভাবনার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তবে পন্ডিত জনদের ভূমিকা শুধু বিবৃতি আর লেখালেখির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদী ভূমিকা শুধু স্মারকলিপির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তারা বিভিন্ন সভা সমিতির এবং স্বাক্ষর সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তারা পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলা বর্ণমালার পক্ষ অবলম্বনের অনুরোধ জানান। অধিকাংশ পরিষদ সদস্য আরবী হরফের বিরুদ্ধে এবং বাংলার পক্ষে সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন। অন্যান্য কলেজের ছাত্রছাত্রীও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে এই আন্দোলনে শরিক হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা সংস্কারে তিনটি প্রধান দিক ছিল যেমন; লিপি সংস্কার, বানান সংস্কার ও ভাষা সংস্কার। এর কোনটিই পূর্ব বাংলার জনগণ সুনজরে দেখেনি। বাংলাভাষা ধ্বংসের লক্ষ্যে রোমান হরফে আরবীর নামে উর্দূ হরফ প্রবর্তনের সকল প্রচেষ্টা প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছে। ১৯৪৯ সালেই বাংলায় রোমান হরফ প্রচলনের বিষয়টি জনমত যাচাইয়ের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী এবং জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ১৯৫০ সালে গঠিত উর্দূ লিপি উপ-কমিটি গঠনের আগে ২ মে তারিখে ভাষা কমিটির এক সভায় বাংলায় রোমান হরফ প্রচলন বিষয়টি বাতিল করে দেয়া হয়।৬২ ঐ বছরই বাংলায় আরবী হরফে প্রচলনের সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অথচ এর আগেই পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির সভাপতি মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর চূড়ান্ত রিপোর্টে বাংলায় আরবী বর্ণমালা প্রচলনের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন। পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির সদস্য ডঃ মোঃ শহীদুল্লাহও বাংলায় আরবী হরফ প্রবর্তনের বিরোধীতা করেন এবং এ প্রসঙ্গে তিনি মওলানা আকরাম খাঁর রিপোর্টে আরবী হরফ প্রচলনের বিষয়টি বিশ বছর পিছিয়ে দেয়ার সুপারিশের কথা ও উল্লেখ করেন।

তাছাড়া ১৯৪৯ সালেই সরকার পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি নামে একটি ব্যাপক শক্তিসম্পন্ন কমিটি গঠন করে। ১৯৫০ সালে এই কমিটি প্রাদেশিক সরকারের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করে। পরবর্তী বছর প্রাদেশিক সরকারের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়। সরকার উক্ত কমিটির সুপারিশগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ না করেই কমিটির মতামতকে উপেক্ষা করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আরবী হরফের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অথচ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটির সভাপতি মওলানা আকরাম খাঁ আরবী হরফে শিশুদের শিক্ষাদানের সরকারী উদ্যোগে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং এর প্রতিবাদে তিনি একটি বিবৃতি প্রদান করেন এবং কমিটির সুপারিশগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। এতে বলা হয়:৬২

(ক) প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত হইবে না। প্রাথমিক পর্যায়ে কেবলমাত্র মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার নীতি সর্বজনস্বীকৃত। এই নীতি ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব জনাব ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছিল। উপরন্তু পাকিস্তানের শিক্ষা সম্বন্ধীয় পরামর্শ বোর্ডও এই নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

(খ) আরবী বর্ণমালা শিক্ষাদান এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে কোরাণ ও দীনিয়াত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা তৃতীয় শ্রেণী হইতে কায়েম করা উচিৎ।

বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন যে, আরবী শিক্ষা দান সম্পর্কীয় সরকারের সম্প্রতিক সিদ্ধান্ত থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, গভীরভাবে বিবেচনার পর গৃহীত কমিটির সুপারিশ সরকার কর্তৃক সরাসরি বাতিল এবং উপরে উল্লেখিত দুইটি অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের নির্দেশকে বরখেলাপ করা হয়েছে।

উপরোক্ত বিবৃতি থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, কট্টর পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও বাংলাভাষার প্রতি সরকারের নগ্ন হামলার বিরোধীতা করতে বাধ্য হয়েছেন। সরকারও প্রয়োজন মতো তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। সুবিধামত না হলে এই সব বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শও কর্ণপাত করেননি। এভাবে সরকারের পূর্ব বাংলার স্বার্থবিরোধী ভূমিকা সর্বক্ষেত্রে নগ্নভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। ফলে জনমনে সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এই সন্দেহ যেমন সচেতন সমাজের মধ্যে স্বীয়ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার মানসিকতা গড়ে তুলতে থাকে তেমন দ্বিজাতীতত্ত্বে বিশ্বাসীদেরকে এই মতবাদের প্রভাববলয় থেকে দূরে ঠেলে দিতে থাকে। এভাবে পরিস্থিতি পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীকে স্বীয় অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং ভাষা সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একই মানসিক চিন্তাভাবনার স্তরে পৌছে দিতে থাকে। এই মানসিক সাম্যই শেষ পর্যন্ত বাঙালী জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার পথ প্রশস্ত করে দেয়।

পূর্ব বাংলায় যখন ভাষা সংস্কৃতি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী করণের নামে বাঙালী জাতিকে ধ্বংস করার বীজ বপনের ষড়যন্ত্র চলছে; যে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী চরম বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে; ঠিক তখনই আরেক ষড়যন্ত্রের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পূর্ব বাংলাবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হয় মূলনীতি নির্ধারক কমিটির রিপোর্টে। ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সংবিধান সভায় কমিটি তাদের অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে।৬৩ সভায় পেশকৃত রিপোর্টে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী যেমন উপেক্ষিত হয় তেমন বাঙালীর সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে উপেক্ষা করে তার রাজনৈতিক অধিকার হরণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়।

ভাষার প্রসঙ্গে পরিস্কারভাবে এখানে উল্লেখ করা হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দূ। তাছাড়া মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশে নগ্নভাবে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য এবং অগণতান্ত্রিক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

সচেতন বুদ্ধিজীবি সমাজে তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ পেতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে 'দৈনিক আজাদের' সম্পাদকীয়তে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলা হয়: "....উচ্চ পরিষদে সব প্রদেশেরই সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে। অর্থাৎ কয়েক লক্ষ অধিবাসীর প্রদেশ বেলুচিস্তানে যত জন প্রতিনিধি উচ্চ পরিষদে থাকিবে চার কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি সংখ্যা সেখানে মাত্র ৩৩ জনই থাকিবে। এর চাইতে অন্যায় ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে আমরা জানি না। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে উচ্চ পরিষদে চিরদিনের জন্য সংখ্যাগুরু পূর্ব পাকিস্তানকে মাত্র এক পঞ্চমাংশ প্রতিনিধির অধিকার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থমূলক কোন প্রস্তাব কস্মিনকালেও গৃহীত হইবে না।"[৬৪]

একই কাগজে অক্টোবরের ২ তারিখে যে সম্পাদকীয় লেখা হয়; তাতে উচ্চ পরিষদ এবং নিম্ন পরিষদ এই দুই পরিষদ রাখার সুপারিশ এর সমালোচনা করা হয়। উচ্চ পরিষদ সব প্রদেশের সমসংখ্যক প্রতিনিধি পূর্ব বাংলার জন্য বিপদজনক হবে। এই আশংকা করে বলা হয়: "...জনসংখ্যার ও গণতান্ত্রিকতার স্বাভাবিক অধিকারে পূর্ব পাকিস্তান একক নিম্ন পরিষদে সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব, সীমান্তে প্রভৃতি দেশের সম্মিলিত আসন সংখ্যার চাইতে বেশী আসন লাভ করিবে। উচ্চ পরিষদে প্রতি প্রদেশের সমান আসন লইয়া সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলে নিম্ন পরিষদের ক্ষমতাকে ইহা অনায়াসেই অর্থহীন ও ব্যর্থ করিয়া ফেলিবে। এইখানেই পূর্ব পাকিস্তানকে জবেহ করিবার সব চাইতে বড় ভয় রহিয়াছে।"[৬৫]

৪ অক্টোবর একই পত্রিকায় উচ্চ পরিষদ প্রসঙ্গ টেনে বলা হয় : "উচ্চ পরিষদের পরিকল্পনা গৃহীত হইলে পূর্ব পাকিস্তান একটি কলোনীতে পরিণত হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তান নিজ দেশে পরবাসীর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে।"[৬৬]

কেন্দ্রের হাতে যে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বলতে যেয়ে বলা হয় যে এতে পূর্ব পাকিস্তানে একেবারে ঠুটো জগন্নাথে পরিণত হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানবাসী তা মেনে নিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না।

মুসলিম লীগের চির সমর্থক এবং মুসলিম লীগের একজন উচ্চতম নেতার পত্রিকাই মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশের এই ধরনের ব্যাপক সমালোচনা করে। এতে অনুমান করা যায় যে, পূর্ববঙ্গে এর কি ব্যাপক এবং তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। দি পাকিস্তান অবজারভারে জনমনে এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়: "The citizen of Dhaka, mostly East Bengalis, were rudely shocked when local dailies carried to them the full text of the Basic principles Committee Report with regard to the future constitution of Pakistan. It came from all walks of life, high officials, professors, teachers, Lawyers, Students, midical men, police personnel etc. Their first reaction was that of bewilderment."[৬৮]

এই রিপোর্টটির সুপারিশ পূর্ব বঙ্গবাসীর মধ্যে এমন তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে যে পূর্ব বঙ্গের সরকারী দলের বিরাট সংখ্যক সদস্যও প্রকাশ্যে এর সমালোচনামুখর হয়ে ওঠেন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় রিপোর্টের সুপারিশের বিরুদ্ধে প্রদেশের জনগণের প্রবল বিরোধীতার কারণে এর সংশোধনের পক্ষে বক্তব্য রাখা হয়।[৬৮]

পূর্ব বাংলায় সর্বত্র মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় বইতে থাকে। ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, এমনকি মুসলিম লীগ পন্থী, জমিয়ত উল ওলামায়ে ইসলাম সমর্থকরা পর্যন্ত এই সুপারিশসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসেন। সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ স্পৃহাকে সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ঢাকার সর্বস্তরের প্রতিনিধিমূলক নাগরিকদের সমন্বয়ে একটি সংগঠন সৃষ্টি করা হয়। যার নাম ছিল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশনের সংগ্রাম কমিটি (Committee of Action for Democratic Federation) সংক্ষেপে এটি ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন নামে পরিচিত। নবগঠিত সংগঠনটি মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনায় সংগ্রাম কমিটির দায়িত্ব পালন করবে। তাছাড়া মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশকৃত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিকল্প শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরীর জন্য 'সংবিধান কমিটি' নামে ভিন্ন একটি কমিটি গঠন করা হয়।

১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে সৃষ্ট সংগঠনটি উক্ত মাসের ১৩ তারিখে আর্মানীটোলা ময়দানে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। এই সভাকে সামনে রেখে একটি ইস্তেহারও প্রকাশ করাহয়। যাতে মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশ সমূহের সমালোচনা করে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানানো হয়।

ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন একটি জাতীয় মহাসম্মেলন আহ্বান করে এবং মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশের পাল্টা একটি শাসনতন্ত্র পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জাতীয় মহাসম্মেলন উপলক্ষ্যে 'জনাব লিয়াকত আলী খান নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জবাব দেবেন কি? এই শিরোনামে একটি ইস্তেহারও প্রণয়ন করা হয়। যাতে শাসনতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নাবলীসহ পূর্ব বাংলার সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে খোলাখুলিভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে জাতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে তিনি মূলনীতি নির্ধারক কমিটির রিপোর্টের প্রধান সুপারিশগুলির সমালোচনা করেন এবং কমিটির সুপারিশসমূহ গণবিরোধী বলে আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করেন। সম্মেলনে 'ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন' কর্তৃক প্রণীত বিকল্প শাসনতান্ত্রিক সুপারিশসমূহ পেশ করা হয়। এতে বাংলা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা এবং নাগরিক মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়। জীবন জীবীকা, শিক্ষা চিকিৎসা ইত্যাদির নিশ্চয়তা বিধানের কথা বলা হয়। আইনের চোখে সকল নাগরিক সমান এবং হেবিয়াস কর্পাস অধিকার খর্ব করার কোন ব্যবস্থা থাকবে না বলে উল্লেখ করা হয়। তাছাড়া কেন্দ্র এবং প্রদেশের ক্ষমতা কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কেও সুপারিশ করা হয়। সুপারিশের কেন্দ্রের ক্ষমতা সীমিত করে প্রদেশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়। এতে আরো বলা হয় দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি ছাড়া সব ক্ষমতা প্রদেশের হাতে থাকবে।[৭০]

১৯৪৭ সাল থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের উপর মুসলিম লীগ সরকারের নির্যাতন চলছিল। তবে এই আন্দোলনের পর থেকে বাঙালীর মনে এই বোধ দৃঢ় হয় যে প্রাদেশিক নয় কেন্দ্রীয় সরকারই তাদের সকল বঞ্চনার জন্য দায়ী। পঞ্চাশের আন্দোলনের পর থেকে পূর্ব বঙ্গবাসীর সকল আন্দোলন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতে থাকে। এভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রদেশের জনমনের রাজনৈতিক সংঘাত পাকিস্তানের ভিত দুর্বল করে দিতে থাকে।

মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গবাসীর মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের চেতনায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সংগঠিত হয়। যা এই অঞ্চলের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদচিহ্ন হয়ে আছে। বিভাগ উত্তরকালে প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক ইস্যুর ভিত্তিতে বাঙালী নিজেদের সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়।[৭১] এবং একই সঙ্গে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ও সূত্রপাত ঘটায়। এ সময়ে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সোচ্চার হয়ে ওঠে। মূলতঃ পূর্ব বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এভাবে বাস্তব রূপ লাভ করে।[৭২] মূলনীতি নির্ধারক কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ এবং গণবিক্ষোভের কারণে সরকার রিপোর্ট সম্পর্কে পরিষদীয় আলোচনা (১১ নভেম্বর ১৯৫০) সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি বিরোধী আন্দোলন স্থিমিত হতে না হতে পূর্ববঙ্গে আরেকটি আন্দোলন দ্রুত গড়ে উঠতে থাকে; বায়ান্নের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। পঞ্চাশের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে জনগণের মধ্যে যে সচেতনতা এবং ঐক্যের জন্ম হয়েছিল তা ভাষা আন্দোলনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বের পর যেমন পেশাজীবী শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ আদায়ের আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তেমন রাজধানীর বাইরে কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে জোতদার, জমিদার, মহাজন ও সরকার বিরোধী তেভাগা আন্দোলন কৃষকবিদ্রোহেরও সূত্রপাত হয়। এসব বিদ্রোহের মধ্যে ময়মনসিংহের হাজং বিদ্রোহ, রাজশাহীর নাচোল অঞ্চলের সাওতাল কৃষক বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য এভাবে শহরের সচেতন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, সমাজ সাধারণ মানুষ থেকে গ্রামের কৃষক পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক আবহাওয়ায় স্বস্তিবোধ করেনি। খাদ্যাভাব দ্রব্যমূল্যে উর্দ্ধগতিতে সাধারণ মানুষ হয়ে পড়ে দিশেহারা। পূর্ব বঙ্গে খাদ্যাভাবের ফলে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি মোকাবেলার জন্য কোন স্থায়ী সমাধানের প্রয়াসও সরকারের তরফ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। এ অবস্থায় গণমনে প্রচন্ড ক্ষোভের সঞ্চার হওয়া ছিল স্বাভাবিক।[৭৩]

তর উপর পূর্ব বাংলার কৃষিপণ্য বিশেষ করে অর্থকরী ফসল পাট, সুপারী, ইত্যাদির বাজারদর হ্রাস পাওয়ার ফলে কৃষককে অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে যুব সম্মেলনে পেশকৃত খসড়া মেনিফেস্টিতেও যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তাতে অর্থকরী ফসলের মূল্য হ্রাস এবং দ্রব্যমূল্যের আধিক্য সংক্রান্ত তখনকার অর্থনৈতিক সংকটের একটি চিত্র পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে এতে বলা হয়: "পূর্ব বঙ্গের তথা পাকিস্তানের অর্থনীতির মেরুদন্ড হইতেছে কৃষি। পাকিস্তানের শতকরা ৯২ জন অধিবাসীই কৃষক। যে পাট তাহারা গড়ে ৩৫ টাকা দরে বিক্রয় করিত তাহা আজ ১২ টাকায়, যে সুপারী গড়ে ৭৫ টাকা দরে বিক্রয় করিত তাহা আজ ১০ টাকা দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। তদুপরি সুপারীর উপর প্রতি মনে ১০% শুল্ক ধার্য হওয়ায় সুপারী বিক্রয়ই হয় না। এভাবে পাকিস্তানের অধিবাসীদের নগদ আয়ের পথ ভীষণভাবে সংকুচিত হইতেছে। অন্য দিকে দৈনন্দিন ব্যবহারের দ্রব্যাদি তাহাদিগকে অগ্নিমূল্যে ক্রয় করিতে হইতেছে।"[৭৪] ..... একদিকে পাট, সুপারী, তামাকের দাম দ্রুত কমিয়া কৃষকের আয় ভয়ানকভাবে হ্রাস পাওয়ায় ও অপরদিকে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের অধিবাসীগণ তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়।"[৭৫]

এখানে পাকিস্তানের অধিবাসীদের কথা বললেও মূল সমস্যা ছিল পূর্ব বাংলার জনসাধারণের। অথচ অর্থনৈতিক মুক্তির আশায় পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। তার উপর সংবাদপত্রের উপর হামলা, কমিউনিষ্ট ঠেকাবার নামে, প্রগতিশীল এবং শ্রমজীবীদের উপর পুলিশী নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিভিন্ন আন্দোলন দমনের নামে গ্রামে-গঞ্জে শহরে সরকারী নিপীড়ন বার বার মানুষকে পরাধীনতার কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রচন্ড ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। এই ক্ষোভ যে কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিস্ফোরণের অপেক্ষায় ছিল। ভাষা আন্দোলন সাধারণ মানুষের বহু প্রতিক্ষিত ইস্যু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

শুধু সাধারণ মানুষ নয় সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যেও এই অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছিল। ইতিপূর্বে তাঁদের ক্ষোভ বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। এই পর্বে তা সম্মিলিতভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। এবং ভাষা সংস্কৃতির প্রশ্নে যেমন তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল তেমন অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্নেও তাঁরা উদাসীন থাকেনি। তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী মনোভাব বিভিন্ন সংঘবদ্ধ কর্মকান্ডে আন্দোলনমুখী প্রবণতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার আগে বুদ্ধিজীবী সমাজের কিছু কিছু ভূমিকা আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতে সহায়ক ছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান, পূর্ববঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ অধ্যাপক সম্মেলন এবং চট্টগ্রামে চারদিনব্যাপী পূর্ব পাকিস্তানে সংস্কৃতিক সম্মেলন।

১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারীর ২৩ তারিখে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর কাছে বুদ্ধিজীবী ক্ষেতমজুর উদ্যোগে একটি স্মারকপত্র পেশ করা হয়। যাতে ঐ বছর ১ এপ্রিল থেকে বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসেবে চালু করার কথা বলা হয়। উক্ত স্মারকপত্রের মূল বক্তব্যের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলো। "পূর্ব বাংলার জনসাধারণ শতকরা একশত ভাগই বাংলা ভাষাভাষী এবং এই ভাষা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। প্রায় ৫ কোটি জনসাধারণ যাহারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই হিন্দু এবং মুসলমানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং পূর্ববঙ্গ সরকার যদি বাংলাকে সরকারী ভাষারূপে এতদিনে গ্রহণ করিয়া লইতেন তবে আরও বহু উন্নতি সাধন করিত।

১৯৪৮ সালে খাজা নাজিমুদ্দীন প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন পূর্ববঙ্গ পরিষদে বিনা বাধায় সর্বসম্মতিক্রমে বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে প্রবর্তন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল কিন্তু তাহা কার্যকর হয় নাই।"[৭৬]

স্মারকলিপি পেশ করার কারণ সম্পর্কে বলতে যেয়ে উপস্থিত বুদ্ধিজীবিরা প্রধানমন্ত্রীকে জানান যে বাংলার জনসাধারণের নিজস্ব ভাষা বাংলাতে সরকারী কাজকর্ম শুরু হলে দেশবাসীর মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে এই জন্যই তাঁরা দেশবাসীর পক্ষ থেকে সরকারের কাছে স্মারকলিপিটি পেশ করছেন।

পূর্ববাংলার সচেতন বুদ্ধিজীবিদের মনে বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা এবং সমৃদ্ধশালী ভাষা হিসেবে রাষ্ট্র ভাষা হওয়ার যোগ্য এই ন্যায়সঙ্গত ধারণা দৃঢ় ছিল। যে কারণে ১৯৪৮ সালে বাংলা পূর্ব বঙ্গের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া সত্ত্বেও তার বাস্তবায়ন না হওয়ায় ক্ষোভ হতাশা তাদের আচ্ছন্ন করেছিল। বাংলা ভাষা সরকারী ভাষা হিসেবে গ্রহণের সঙ্গে অঞ্চলের উন্নতি প্রশ্নটিও তারা সম্পৃক্ত করেছিলেন। সুতরাং বাংলা ভাষা সরকারী ভাষা হওয়া না হওয়ার সঙ্গে এই অঞ্চলের জনগণের সমৃদ্ধি ভাগ্য নির্ভরশীল বলেই বিষয়টি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

ঐ বছর মার্চ মাসে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লা বাংলার পক্ষে দৃঢ় বক্তব্য রাখেন। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার পরিবর্তে 'উর্দূ' চালুর প্রচেষ্টার ফলে পূর্ব বাংলার ছাত্র, শিক্ষক, সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল বক্তব্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন: "শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে পূর্ব বঙ্গের ছাত্রদের উপর বাংলা ভাষা ব্যতীত যদি অন্য কোন ভাষা আরোপ করা হয় তবে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো আমাদের উচিত। এমনকি প্রয়োজন হইলে ইহার বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ করা উচিত। বাংলা ভাষা অবহেলিত হইলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহ করিব। নতুন ভাষা আরোপ করা পূর্ববঙ্গে গণহত্যারই সামিল হইবে।"[৭৭]

একই মাসে চট্টগ্রামে চার দিনব্যাপী এক সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একান্নের এই সম্মেলন পূর্ব বাংলায় একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। সম্মেলনের বক্তাদের বক্তব্যের মধ্যেও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনা, মানবতাবোধ,বাংলার ঐতিহ্যবাহী ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্যের প্রতি গভীর

Dhaka University Institutional Repository

মমত্ববোধের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বেগম সুফিয়া কামাল সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাতে উপরোক্ত মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। তিনি বলেন: "আজ বিশ্ব সাহিত্য তথা আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ঢেউ আমাদের চিত্তেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, এই সবই ভাল কথা। বিশ্বের সঙ্গে, সকল জাতির সঙ্গে পরিচয় যত নিবিড় হবে, ততই আমাদের মনের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূর হবে; ফলে আমাদের সাহিত্য ও হবে সুদূরপ্রসারী ও বহু বিস্তৃত। কিন্তু মানুষ তো ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলে নেই—একটা দেশের মাটিতে তার জন্ম হয়েছে, একটা পরিবেষ্টনের মধ্যে সে লালিত পালিত হয়েছে,—তার দেহ ও মন খোরাক সংগ্রহ করেছে এক বিশেষ ভৌগলিক সংস্থান থেকে। কাজেই সেখানকার ভাষা, সেখানকার সাহিত্য, সেখানকার ঐতিহ্য, তার মনের সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে, অন্তরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে; তাই সেই সবকে বাদ দিয়ে তার মনের কখনো বিকাশ হতে পারে না, মনের ভাবে কোন ফুলই ফুটতে পারে না। এ কে না জানে, মনের বিকাশ ও প্রকাশই হচ্ছে সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতি, তাই আগে দেশের ভাষাকে দেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিকে জানতে হবে,—এক কথায় যে খোরাক গ্রহণ করে মন ও অন্তর বেড়ে উঠে তারি আবিষ্কার করতে হবে। সর্বাগ্রে নিজের অন্তরকে যদি আবিষ্কার করতে পারেন, তবে আন্তর্জাতিক হতে আপনার এতটুকু বেগ পেতে হয় না।"

"...দেশকে ভাল বাসুন, দেশের শিল্প সাহিত্য ও সাংস্কৃতিকে ভাল বাসুন, আজকের দিনে আমার মতে সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক এক কথায় বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিবানদের সামনে এই ভালবাসার মন্ত্র ছাড়া কোন মন্ত্র নেই, এই ভালবাসার শপথ ছাড়া কোন শপথ নেই। দেশের মানুষকে যে ভালবাসতে পারে, একমাত্র সেই বিদেশের মানুষকে ভালবাসতে পারে বিশ্বমৈত্রী বা বিশ্ব মানুষের ভ্রাতৃত্ব একমাত্র তার মুখেই শোভা পায়। নদী যদি একবার তার পানি পথের সন্ধান পায়, তবে তার সামনে গিয়ে পড়তে বেশী আর দেরী লাগে না।"[৭৮]

সাংস্কৃতি সম্মেলনের মূল সভাপতি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ইসলামী সংস্কৃতির নামে যারা দেশীয় সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করতে চায় তাদের স্বরূপ উদঘাটিত করে বলেন: "ঐতিহ্যের পটভূমির সহিত যাহাদের যোগ নাই, তরুলতার ক্ষেত্রে যেমন পরভোজী শব্দ ব্যবহার করা হয়....এখানে ঐ জাতীয় ব্যক্তিদের জন্য তেমন বিশেষণই আরোপ করা চলে। সমাজ জীবনেও দেখিবেন ইহারা পরভোজী। মানবতার সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই জনসাধারণ এর মস্তকে কাঠাল ভাঙ্গিয়া দিনাতিপাত করেন। এই জাতীয় ব্যক্তিদের উপদেশ কোনদিন গ্রহণ করিবেন না।"[৭৯]

সম্মেলনের বক্তব্য থেকে এই সত্যটি প্রকাশিত হয় যে, প্রবল বিরুদ্ধ স্রোতের মধ্যে বাস করেও একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী স্বীয়ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্যের প্রতি কতখানি আন্তরিক ছিলেন। শুধু নিজেদের মধ্যে অতীত গৌরব ধারণ করে ধন্য হননি সর্বসাধারণের প্রতিও উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। বাঙালীর ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক হতে। সম্মেলনে তিনি জাতীয় বিকাশের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন:"ভূলিয়া যাইবেন না, অতীত আমাদের ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শন করে। সেই আলোকে আমাদের বর্তমান নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। এই জন্য ঐতিহ্যের কথা বার বার স্মরণ রাখা দরকার।

ঐতিহ্যহীন কোন কিছু গড়িতে গেলে আপনারা ভুল করিবেন। সাধনা পন্ডশ্রম হইবে মাত্র। অথবা জাতীয় বিকাশের পথরুদ্ধ করিয়া দিবে। এই কথা আমি বার বার স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। কারণ অনেকেই এই সোজা কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। হঠাৎ নূতন কিছু করার প্রয়াস অথবা স্বার্থসিদ্ধি তাহাদের এষণার মূলে থাক না কেন, এমন লোকের সংখ্যা কম নয়। ঐতিহ্য হইতে তাহারা দূরে সরিয়া যাইতে বলে। মনে রাখিবেন, ঐতিহ্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া। জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ পাঠশালের বালক ও জানে—মৃত্যু।"[৮০]

এসব বক্তব্যের মূল সুর বাধা ছিল হঠাৎ করে আবিষ্কৃত তথাকথিত পাকিস্তানী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাঙালীর অতীতকে নতুন করে সামনে তুলে ধরার মধ্যে। বক্তারা বিভিন্ন বক্তব্যে বার বার পরোক্ষভাবে এই সুরটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এভাবেই সম্মেলনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ শাশ্বত বাঙালী জাতি চেতনার নবজাগরণের পথনির্দেশ করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত বিপুল সংখ্যক ছাত্র যুবক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী বক্তব্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। যা পরবর্তীতে এদেরকে পূর্ব বাংলায় গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সাহায্য করে। বাঙালীর ভাষা সংস্কৃতি মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা দ্বারা আচ্ছন্ন না রেখে আপন ঐতিহ্যের

Dhaka University Institutional Repository

গৌরবের উপর দাঁড় করিয়ে চলমান বিশ্বের আধুনিক ধারাটির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বাঙালী এমনি এক জাতি হিসেবে গড়ে উঠার প্রবণতায় ব্যস্ত হয়েওঠে যে বাঙালী তার অতীত ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত হবে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে সমসাময়িক বিশ্বের সঙ্গে সমান তালে। যা ছিল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর কাছে সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত বিষয়। সুতরাং সংঘাত ছিল অনিবার্য। ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সে সংঘাত পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ সংঘাত যেমন ছিল পূর্ব বাংলার সঙ্গে কেন্দ্রের, তেমন ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের জাতীয়তাবাদের আদর্শের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী বাংলা ভাষা নির্ভর শাশ্বত বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনার।

এই পরিস্থিতিতে ভাষা আন্দোলনের পূনর্জাগরণ ঘটে। ১৯৫০ সলের ১১ মার্চ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের নবপর্যায়ে উত্তরণ পথ প্রশস্ত হয়। যদিও প্রতি বছর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছিল, তবে, তা এমন কোন সংগঠিত আন্দোলনে রূপ নিতে পারেনি। ১৯৫১ সালের ১১ মার্চই ব্যাপকভাবে ছাত্র সমাজে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। দিবসটি উপলক্ষে ঢাকার সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্র সভায় আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' নতুনভাবে গঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি প্রদান এবং এছাড়া বাংলাকে অবিলম্বে আদালতের ভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রবর্তন করার দাবী জানানো হয়।

পূর্ব বাংলার অধিকাংশ লোকই উর্দূ ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্রভাষা উর্দূ হলে তাঁদের চাকুরী হারাবার সম্ভাবনা ছিল ষোল আনা। নিম্নের সারণীতে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন পেশার মাধ্যমে উর্দূ ভাষায় দক্ষতা ও অদক্ষতার চিত্র তুলে ধরা হলো:

উত্তরদাতা নিজে এবং তার বন্ধু-বান্ধব ও সমসাময়িকেরা উর্দূ কেমন জানতেন?

পিতার পেশা	উর্দূ জানতেন না	বলতে পারতেন লিখতে পারতেননা	লিখতে ও বলতে পারতেন	মোটামুটি জানতেন	নমুনা সংখ্যা
কৃষি	৩০	৪	২	৮	৪৪
ব্যবসা	১৩	২	৩	৩	২১
চাকুরী	২৬	৬	৪	৫	৪১
স্বাধীন পেশা	৬	২	৭	২	১৭
অন্যান্য					
মোট=	৭৫	১৪	১৬	১৮	১২৩
শতকরা হার	৬০.৯৮	১১.৩৮	১৩.০১	১৪.৬৩	১০০

সূত্র:-বিআইডি এস এর ডঃ আতিউর রহমান পরিচালিত ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধের অধীনে একশো তেইশ জন ভাষা সৈনিকের জরিপলব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রণীত। *ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান* পৃষ্ঠা ৩১।

রাষ্ট্রভাষা উর্দূ হলে এ ভাষায় অজ্ঞ বাঙালী চলমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। উর্দূ না জানার কারণে অযোগ্য বিবেচিত হয়ে বাঙালীরা সরকারী চাকুরী হারাবে। উর্দূ রাষ্ট্রভাষা হলে চাকুরী হারাবার আশংকায় এরা ছিলেন আতংকিত। এই সব সাধারণ কর্মচারীরা বিজাতীয় ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হলে তাদের পেশাগত বিপর্যয় এবং অর্থনৈতিক দূরবস্থার কথা ভেবেছেন বেশী। অথচ সরকারী চাকুরীতে থাকবার দরুণ আন্দোলনে নামতে পারছেননা। এই অবস্থায় তারা তাদের ভাগ্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে ছাত্রদের উপর নির্ভর করেছেন। এ কারণেই দেখা যায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির ফান্ড সংগ্রহের জন্য ছাত্ররা সেক্রেটারীয়েটের গেটে যে অভিযান চালিয়েছিলেন। তাতে তাঁরা আশাতীতভাবে সফল হয়েছিলেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ছাত্র সমাজের এই আন্দোলনের প্রতি সরকারী কর্মচারীদেরও ছিল নীরব সমর্থন।[৮১]

সচেতন সমাজ জানতেন উর্দূ রাষ্ট্রভাষা হলে বাংলাভাষা সাহিত্য ধ্বংস হয়ে যাবে। পূর্ব বাংলার বুকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসবে। বাঙালী পরিণত হবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দাসে। রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

এবং জাতিগতভাবে তাদের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। বৃটিশ শাসনকালে রাষ্ট্রভাষা ফারসীকে বাদ দিয়ে ইংরেজী প্রবর্তনেরকালে বাঙালী মুসলমানের যে দুরবস্থা হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে পাকিস্তানে তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। সুতরাং এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া বাঙালীর বাঁচার আর কোন উপায় নেই।

নিম্নলিখিত সারণী দুটিতে উত্তরদাতাদের দেয়া মন্তব্য থেকেই অনুমান করা যায় উর্দূ রাষ্ট্রভাষা হওয়ার প্রতি বাঙালীর বিরূপ হওয়ার কতখানি বাস্তবসম্মত কারণ ছিল। এর সঙ্গে শুধুই ভাষা সংস্কৃতির প্রশ্নই জড়িত ছিল না। অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদ এবং বাঙালীত্ব ধ্বংস হওয়ার আশংকা ও জড়িত ছিল।

উর্দূ রাষ্ট্রভাষা হলে উত্তরদাতার ব্যক্তিগত কি ক্ষতি হত?[৮২]

পিতার পেশা	ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা ভাবিনি	সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তাম	চাকরী ও ব্যবসা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তাম	ব্যক্তিগতভাবে পিছিয়ে পড়তাম লেখাপড়া শিখতে অসুবিধা হত	প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তাম	বাঙালীত্ব হারাতে হত	উর্দূভাষীরা লাভবান হত	মোট
কৃষি	১২	৬	৬	১১	৬	২	১	৪৪
ব্যবসা	১১	৫	-	১	২	৬	১	২১
চাকুরী	১৬	৩	৬	১০	১	৪	১	৪১
স্বাধীন পেশা	৫	৫	১	৪	১	১	-	১৭
অন্যান্য								
মোট=	৪৪	১৯	১৩	২৬	১০	৮	৩	১২৩
শতকরা হার	৩৫.৭৭	১৫.৪৫	১০.৫৭	২১.১৪	৮.১৩	৬.৫০	২.৪৪	১০০

উর্দূ ভাষা হলে আপনার ব্যক্তিগত কি ক্ষতি হত?[৮৩]

বাসস্থান	ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির কথা ভাবিনি	প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হতো	পারিবারিক ক্ষতি হতো	মোট
গ্রাম	১৫	২১	১৭	৫০
শহর	১৭	২১	১৭	৫৫
গ্রাম+শহর	৫	৮	২	১৫
মোট=	৩৭	৫০	৩৬	১২৩

পূর্ব বাংলার সচেতন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ছাত্র সমাজ কর্তৃক ২৫ মার্চ তারিখে প্রণীত স্মারকপত্রের খসড়াটিতেও এই আশংকা প্রতিফলিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের অফিসে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত স্মারকপত্রটি পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সংবিধান সভার ও পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের কাছে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্মারকপত্রটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নে দেয়া হলো :

"আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি থেকেই পাকিস্তান এসেছে এবং এই নবীন রাষ্ট্র এখনো প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করছে। বস্তুগতভাবে আধিমানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার জন্য এখনো অনেক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে অন্যতম প্রাথমিক বাধা হিসেবে ইংরেজী ভাষার ভয়ংকর চাপ তুলে নিয়ে জনগণের ভাষার জন্য স্থান করতে হবে। কোন স্বাধীন জনগণই অবহেলা করতে পারে না তার মাতৃভাষাকে একমাত্র যা হলো প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত আধিমানসিক গুণাবলীর বিকাশকে সহায়তা করার উপযোগী। একটি বিদেশী ভাষায় প্রভুত্বই হলো নিকৃষ্টতম প্রভুত্ব এবং একটি জনগোষ্ঠীকে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ রাখার পক্ষে সব থেকে উপযোগী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফারসীকে উচ্ছেদ করে বৃটিশরা যখন ইংরেজী প্রবর্তন করেছিলো তখন একথা তারা জানতো।"[৮৪]

ছাত্র সমাজের মধ্যেই এই বোধ তখনই কাজ করছিল যে উর্দূ চাপিয়ে দিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার পাঁয়তারা চলছে। উর্দূ রাষ্ট্রভাষা হলে তার পরিণতি কি হবে এ সম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে স্মারকলিপিতে বলা হয়, অতীতে ইংরেজী চালু হওয়ার ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃতি দিলে একই সমস্যার সৃষ্টি হবে। তাছাড়া বিপুল সংখ্যক উর্দূ নাজানা জনগোষ্ঠী স্বল্পসংখ্যক উর্দূ জানা ব্যক্তি দ্বারা শোষিত হবে। স্বীয় ভাষা থেকে বঞ্চিত মানুষ স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবে। এতে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাবে; বিশেষ করে বাঙালীদের মধ্যে। ফলে জাতির মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনা দেখা দেবে।

স্মারকলিপিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করে ভাষার জন্য সংগ্রামের দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

"সর্বশেষে আমরা পুনরুক্তি করবো তারই যা আমরা বার বার স্পষ্টভাবে বলেছি। যদি পাকিস্তানের একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতো তাহলে সেটা হবে বাংলা যদি তা একাধিক হতে হয় তাহলে বাংলাকে হতে হবে তার মধ্যে অন্যতম। এই সব যুক্তি আমাদের নেতাদের মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করতে কিভাবে ব্যর্থ হয় সেটা উপলব্ধি করতে আমরা অক্ষম। এর মধ্যে কোথাও কোন গন্ডগোল নিশ্চয়ই আছে। অন্যথায় সোনালী আঁশের এই প্রদেশের প্রতি কেন্দ্রের এই অন্যায় ও বিমাতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা দেওয়া মুস্কিল।

...আমরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যারা ভাষার ব্যাপারে প্রাদেশিক নীতির আশু প্রয়োগ দাবী করছি এবং বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করছি তারা বেশ শক্ত লড়াই করেছি এবং শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে প্রস্তুত আছি। আমরা সেইচক্রান্ত উদঘাটন করার শপথ নিয়েছি যার লক্ষ্য হলো পূর্ব বাংলাকে একটি উপনিবেশে পরিণত করা।" বাংলা ভাষার পক্ষে শেষ পর্যন্ত লড়াই করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলা হয়,

"আমরা তাদেরকে এবং জনগণের যে সকল প্রতিনিধি সব কিছু পরিচালনা করছেন তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, প্রদেশে এবং কেন্দ্রে বাংলার দাবী যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শান্ত হবে না।"[৮৫]

এপ্রিল মাসে করাচীতে সারা পাকিস্তান উর্দূ সম্মেলনে মওলানা মহম্মদ আকরাম খাঁ সভাপতির ভাষণে উর্দূর পক্ষে দৃঢ় বক্তব্য রাখেন। ইংরেজী দৈনিক পাকিস্তান অবজারভারে এই বক্তব্যের প্রতিবাদে যে সম্পাদকীয় ছাপা হয় তাতে আশংকা প্রকাশ করা হয় যে পূর্ব বাংলার ৯০% সরকারী কর্মচারী যারা উর্দূ জানেন না তাঁরা তৎক্ষণাৎ চাকরীচ্যুত হবেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হলে তার কি ভয়াবহ পরিণতি পূর্ব বঙ্গবাসীর জীবনে নেমে আসতে পারে সে সম্পর্কে সকলেই সচেতন ছিলেন। সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সমাজ প্রত্যেকেই বাংলা ভাষার পক্ষে অনবরত প্রচারণা চালিয়ে এ অঞ্চলের জনগণকে একটি আন্দোলনমুখী সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। ছাত্র সমাজ সকল ভয়ভীতি বাধা উপেক্ষা করে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে নেমেছিল। আটচল্লিশের আন্দোলনেই তাদের দৃঢ় মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে। একান্নর পর থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে যেমন তারা দ্রুত সংগঠিত হতে থাকে তেমন বেপরোয়া হয়ে উঠতে থাকে। এ সময়ে সংগ্রামী যুব সংগঠন যুবলীগ প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে আরো বেগবান করে তোলে। এই সংগঠনের নেতা কর্মীরা ভাষা আন্দোলনে গৌরবময় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সারা পূর্ব বাংলা যখন রাজনৈতিক অধিকার হরণ অর্থনৈতিক বঞ্চনার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ; রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার পক্ষে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ঠিক সে সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বারুদে অগ্নিসংযোগ করলেন। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারী পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঢাকার অধিবেশনে ঘোষণা করলেন যে, উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।[৮৬] পরদিন ২৭ জানুয়ারী পল্টন ময়দানের জনসভায় জিন্নাহর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। ছাত্র সমাজ 'উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' নাজিমুদ্দীনের এই বক্তব্যে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২৯ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে পোষ্টারিং করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করেন। এতে তিনি ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ছাত্রদের সঙ্গে তার চুক্তিপত্রের কথা উল্লেখ করে বলেন: "২৭ জানুয়ারীর জনসভায় আলহাজ্ব খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর বক্তৃতায় উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে যে ঘোষণা করেছেন, সেটা দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। তিনি সুযোগ মতো ভুলে গেছেন যে, মার্চ ১৯৪৮ এ পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বিগত ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সময়ে তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন যে, তৎকালে এই অংশে তাঁর সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদের কাছে সুপারিশ করবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এখন তাঁর এই বক্তব্য প্রদানের পর লোকে কি এই সিদ্ধান্ত করবে না যে, তিনি সাময়িকভাবে পশ্চাৎপসরণ এবং পরে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার উদ্দেশ্যেই সেই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন?"[৮৭]

পূর্ব বাংলার ছাত্র যুব সমাজ নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যকে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তার বক্তব্যকে পূর্ব বাংলার ভাষা সংস্কৃতির পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করার চক্রান্ত বলে আখ্যায়িত করে অলি আহাদ আন্দোলন শুরুর আহ্বান জানিয়ে বলেন: "আমরা আমাদের সকল ইউনিটকে বিশেষভাবে এবং জনগণকে

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণভাবে আহ্বান জানাচ্ছি যাতে তাঁরা এর নিন্দা করেন। আমরা এই সঙ্গে আবেদন জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির প্রতি যাতে তাঁরা এই প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে।"[৮৮]

শুধু ছাত্র যুব সমাজ নয় নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতায় পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, অঙ্গনের সচেতন কর্মীরাও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে ছাত্র সমাজের সঙ্গে তারাও সংগ্রামে এক সাড়িতে দাঁড়াতে দ্বিধা করেনি। এজন্যই জানুয়ারীর ৩০ তারিখে ছাত্রদের সফল 'প্রতীক' ধর্মঘটের পাশাপাশি ৩১ জানুয়ারী বাংলা ভাষার পক্ষে শক্তিগুলোর সমন্বয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা সম্ভব হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সহসভাপতি কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে এই কমিটি গঠন করা হয়। ৩১ জানুয়ারী সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রথম প্রয়াস বলা যেতে পারে। ভাষা আন্দোলনের জন্য এই প্রয়াস ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাকে আন্দোলনে রূপ দেয়ার জন্য যে সকল প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয় তার উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল; নাজিমুদ্দীন কর্তৃক ১৯৪৮ সালের চুক্তিপত্র লঙ্ঘণের জন্য নিন্দা জ্ঞাপন এবং রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে তার বক্তব্য প্রত্যাহার দাবী, আরবী হরফে বাংলা প্রচলনের সরকারী প্রয়াসের নিন্দা। তাছাড়া বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাবও গৃহীত হয় এবং ৪ ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন প্রদান করা হয়।[৮৯] সভা অবিলম্বে নিরাপত্তা বন্দী শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আটক বন্দীর মুক্তির এবং জননিরাপত্তা আইন প্রত্যাহারের দাবী জানায়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে এবং ছাত্র সমাজের পূর্বের আহ্বান অনুযায়ী ফেব্রুয়ারীর ৪ তারিখে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ঐদিনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে এবং জঙ্গী মিছিলে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" "আরবী হরফ চলবে না" শ্লোগানে শহর প্রকম্পিত করে তোলে। ঐদিন ছাত্রদের সভায় এবং বিকেলে সর্বদলীয় সংগ্রামী সভায় মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিমসহ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির অনেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় ভাষার দাবী সুপতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করা হয়।

কর্মসূচী শুধু ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি প্রদেশের সর্বত্র পালিত হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালিত এবং সংগঠিত করার জন্য ঢাকাসহ সমগ্র প্রদেশে নানা ধরনের তৎপরতা চলতে থাকে। ছাত্ররা ১১ ফেব্রুয়ারী পতাকা দিবস পালন করে। এই উপলক্ষে ১১ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ অর্থ সংগ্রহ এবং অন্যান্য সাংগঠনিক তৎপরতা চালাতে থাকে। এই তৎপরতার ফলে একদিকে যেমন অর্থ সংগ্রহ হয় কিছু নতুন কর্মী ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন তেমন আন্দোলন মুখী প্রচার কার্য ও চলে। মুসলিম লীগ সরকারের দমনমূলক নীতি আন্দোলনকে আরো জোরদার এবং সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করে। সরকারী নির্যাতনের ফলে জনসাধারণের সহানুভূতি আন্দোলনের পক্ষে যেতে থাকে এবং বর্তমান সরকারের স্বৈরাচারী আমলাতান্ত্রিক রূপটি জনসমক্ষে প্রকাশ পেতে থাকে। আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠছে তখনই ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অপরাধে বিরোধী দলীয় পত্রিকা 'পাকিস্তান অবজারভার' এর উপর ১৪ ফেব্রুয়ারী সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।[৯০]

'ছদ্ম ফ্যাসিজম' শিরোনামে ১২ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত সম্পাদকীয়টি নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ হিসেবে দেখানো হয়। যদিও এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে পত্রিকাটির পরিচালক মন্ডলী ও সম্পাদকীয় বোর্ড বিবৃতি প্রদান করেন। এবং যে অংশটুকুর জন্য ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে বলে মনে করা হয় তার প্রতিটি শব্দ প্রত্যাহার করা হয়। তবু সরকার পত্রিকাটির বিরুদ্ধে গৃহীত সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন ঘটাননি। এতে বুঝা যায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং শান্তি ভঙ্গের আশংকা ছিল না। সরকার বিরোধী দলের প্রচার মাধ্যমটি স্তব্ধ করার সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাননি। পত্রিকা বন্ধ করার পেছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছে যুব লীগের ১৭ ফেব্রুয়ারী গৃহীত প্রস্তাবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয় : "দেশের গণআন্দোলনকে বিশেষ কর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে চাপা দেওয়া মতলবে উক্ত আদেশ জারী করা হইয়াছে বলিয়া সভা মনে করে। পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র বিরোধী দলীয় পত্রিকার প্রতি সরকারের এইনীতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরোধী মতবাদ ও প্রেসের স্বাধীন মতামতের উপর তীব্র আঘাত হানিতেছে।"

যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ ও সরকারের এ ধরনের দমননীতিকে দূরভিসন্ধিমূলক বলে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন।[৯১]

বায়ান্নের ফেব্রুয়ারী মাসে কোনো না কোনো ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্য বজায় থাকে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ আন্দোলনকে তীব্র করার জন্য সর্বক্ষণ সচেষ্ট ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা গাজীউল হকের লেখায় এই পরিস্থিতি সমর্থন পাওয়া যায়। "৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রস্তুতির

Dhaka University Institutional Repository

যে সময়টুকু পাই তা ভালোভাবে কাজে লাগাই আমরা। অলি আহাদ সুলতান ইমাদউল্লা এবং আমি ঢাকা শহরের এবং নারায়ণগঞ্জের প্রায় প্রতিটি স্কুল কলেজে ছাত্রদের মধ্যে প্রচারের কাজ চালাই। ফজলুল হক হলের ইষ্ট ১৮নং কক্ষে খবরের কাগজ (অন্য কাগজ জোটানো শক্ত ছিলো) পোষ্টার লিখতাম তা আবার নিজেদের লাগাতে হতো। নাদিরা বেগম মেয়েদের হোষ্টেল থেকে কিছু পোষ্টার লিখিয়েছিলেন।"[৯২]

১৮ ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে অনশনরত শেখ মুজিবুর রহমানের একটি চিঠি গোপনে ছাত্রনেতা গাজীউল হকের হাতে আসে।[৯৩] চিঠিতে শেখ মুজিব ২১ ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বানের পরামর্শ দেন এবং আটচল্লিশের ১৬ মার্চের মতো পরিষদ ভবন ঘেরাও করার আহ্বান জানান। গাজীউল হকের বর্ণনা অনুসারে 'চিঠি পাওয়ার পর ঐদিনই একটি নোটিশ দেয়া হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে ১৯ ফেব্রুয়ারী ছাত্র সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব জিল্লুর রহমান। বক্তৃতা করেন অন্যদের মধ্যে নাদিরা বেগম এবং শামসুল হক চৌধুরী। ১৭জন সদস্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটি গঠন করা হলো। আমাকে আহ্বায়ক করা হলো। পাকিস্তানের জন্মের পর এটিই ছিল প্রথম রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটি।'[৯৪]

২১ ফেব্রুয়ারী সামনে রেখে ভাষা আন্দোলনমুখী তৎপরতা চলাকালে কমিউনিষ্ট পার্টিও এই কর্মকান্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের সময় পার্টির মতামত যেমন ছিল সুস্পষ্ট তেমন ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী এবং পরিচালনাকারী প্রায় সবাই ছিলেন হয় পার্টির সদস্য নয়তো সমর্থক। ছাত্র সমাজ যখন শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে প্রচার কার্য চালাচ্ছে পার্টি তখন সার্কুলারের মাধ্যমে কৃষক মজুর ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে এই বক্তব্য পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। সার্কুলারে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা হয় এবং আন্দোলনের ব্যাপক কর্মভিত্তি গড়ে তোলার জন্য সদস্যদের নির্দেশ প্রদান করা হয়।[৯৫]

এভাবে যখন আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলছে তখনই সরকারী একটি নির্দেশ পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলে। ২০ ফেব্রুয়ারী ছিল পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন শুরুর দিন। ঐদিন থেকে এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী করাহয়।[৯৬]

নির্দেশ জারীর পেছনে যুক্তি দেখাতে যেয়ে পূর্ব বাংলার তৎকালীন চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ বলেন যে, গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে খবর পাওয়া গেছে একুশ তারিখে বিক্ষোভকারীরা পরিষদ ভবন ঘেরাও করবে এবং জোরপূর্বক ভিতরে প্রবেশ করে সদস্যদের উপর হামলা চালাবে। পরিবর্তীত পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য ২০ তারিখে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে। রাজনৈতিক সংগঠনগুলো সাংগঠনিক প্রস্তুতির অভাব বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার সম্ভবনা। তাছাড়া ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন বানচাল হওয়ার আশংকা ইত্যাদি কারণে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে। কিন্তু ছাত্র নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন।[৭৭]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির সভা সিদ্ধান্তহীনভাবে শেষ হলেও ঐদিন মধ্য রাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় ছাত্ররা এক সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। পরদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপস্থিত সাধারণ ছাত্রদের মধ্যেও সংগ্রাম পরিষদের অনুকূলে প্রবল সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। এ পরিস্থিতিতে চরম উত্তেজনার মধ্যে জীবনের পরোয়া না করে বাংলার সাহসী সন্তানেরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গৌরবদীপ্ত নব ইতিহাস রচনার গৌরব অর্জন করেন। বাঙালীর ইহিাসে ২০ ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গে সিদ্ধান্ত যেমন ছিল গুরুত্বপূর্ণ তেমন ২১ ফেব্রুয়ারী এর বাস্তবায়ন ছিল ক্রান্তিকাল এর ইঙ্গিতবহ ঘটনা। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে পূর্ব বঙ্গের ইতিহাস ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশী তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। শুরু হয় ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ; শত শত ছাত্র গ্রেফতার হয়। আহত ছাত্রে হাসপাতাল ভরে যায়। এই পর্যায়ে উপস্থিত জনতা ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারন করে যখন ৩.৩০ মিঃ অনুষ্ঠিতব্য পূর্ববঙ্গ পরিষদের অধিবেশনের সময় ঘনিয়ে আসতে থাকে। পরিষদ ভবন ঘেরাও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য পুলিশের বেষ্টনী অতিক্রম করে ছাত্র জনতা ভবনের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে। এ সময় হঠাৎ করে পুলিশের গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত নিহত হন। ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষের খবরে এমনিতে শহরে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ছাত্র হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ধাক্কায় সারা শহর স্তম্ভিত হয়ে যায়। সেদিন হরতাল ছিল না কিন্তু ঘটনার পর পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল দোকানপাট অফিস আদালত বন্ধ হয়ে যায়। যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। কর্মস্থল পরিত্যাগ করে প্রতিবাদী জনতা রাস্তায় নেমে আসে। সারা শহর বিদ্রোহের রুদ্র মূর্তি ধারণ করে। ছাত্র জনতা সংগ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যদিয়ে একাত্ম হয়ে যায়। মেডিক্যাল কলেজের পথে বিদ্রোহী জনতার ঢল নামে।

পরিষদ ভবনের অভ্যন্তরে সাংসদরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। সরকারী এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের প্রতিবাদী ভূমিকার মুখোমুখী হয়ে স্পীকার শুরু থেকেই অধিবেশন পরিচালনা করতে হিমশিম খেয়ে যান। প্রথম থেকেই পরিস্থিতি তাঁর আয়ত্তের বাইরে ছিল। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন সভাকক্ষে উপস্থিত হন। তাঁর একপেশে বক্তব্যের কারণে অবস্থা আয়ত্তে আনা তো দূরের কথা বরং বিরোধী দলের সদস্যদের শ্লেষোক্তি তীব্র বাদ প্রতিবাদ আরো বৃদ্ধি পায়। এক পর্যায়ে চরম হট্টগোল হৈচৈ শুরু হলে স্পীকার ১৫ মিনিটের জন্য অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলীয় সদস্যরা একযোগে এবং ১২ জন মুসলিম লীগ সদস্য পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন। এতে অধিবেশনের উদ্দেশ্য যেমন ব্যর্থ হয় তেমন স্পীকার নির্ধারিত কার্যক্রম চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হন।[৯৮] সরকারী দলের অন্যান্য সদস্যরাও ইচ্ছার বিরুদ্ধে সভাকক্ষে উপস্থিত থাকতে বাধ্য হন।

সন্ধ্যার মধ্যে রেডিওর মাধ্যমে ছাত্র হত্যার মর্মান্তিক খবর ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র পূর্ব বঙ্গে এর তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রদেশের প্রতিটি জেলায় প্রতিবাদী মিছিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে পূর্ব বঙ্গের প্রতিটি অঞ্চলের সাধারণ মানুষ যুক্ত হয়ে যায়। ফলে আন্দোলন শুধুমাত্র ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি।

কমবেশী প্রতিটি জেলায় এর বিস্তৃতি বি, আই, ডি, এস এর ১২৩ জনের উপর গবেষণামূলক জরিপ থেকেও অনুমান করা যায়। নিম্নে সারণীর মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় ভাষা আন্দোলনকারীদের অংশগ্রহণের প্রমাণ যেমন পাওয়া যায় তেমন কোন্ জেলার ভূমিকা কতখানি ছিল তাও অনুমান করা যায়। নিম্নের সংগৃহীত উপাত্ত থেকে অনুমান করা যায় যে, বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার প্রতিটি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতিটি জেলার জনগণ এর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিল। এই অংশগ্রহণটি ছিল বাঙালীর জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা এর মাধ্যমে ভাষাভিত্তিক যে জাতীয়তাবাদ তার সঙ্গে সমগ্র পূর্ব বঙ্গবাসীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছিল।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের (নমুনা)
পুরোনো জেলাওয়ারী অবস্থান।[৯৯]

	জেলার নাম	নমুনা সংখ্যা	শতকরা হার
১।	ঢাকা	৪৫	৩৬.৫৯
২।	রাজশাহী	১৪	১১.৩৮
৩।	বগুড়া	১১	৮.৯৪
৪।	যশোর	১১	৮.৯৪
৫।	ফরিদপুর	১০	৮.১৩
৬।	চট্টগ্রাম	৭	৫.৬৯
৭।	কুমিল্লা	৬	৪.৮৮
৮।	দিনাজপুর	৫	৪.০৭
৯।	পাবনা	৪	৩.২৫
১০।	রংপুর	৪	৩.২৫
১১।	বরিশাল	২	১.৬৩
১২।	নোয়াখালী	২	১.৬৩
১৩।	পটুয়াখালী	১	.৮১
১৪।	খুলনা	১	.৮১
	মোট	১২৩	১০০

২১ ফেব্রুয়ারী গুলীর প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র শহর অঞ্চলে নয় প্রত্যন্ত এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করা যায় খুলনা জেলার মোড়লগঞ্জ থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামের অনাহারী কৃষকদের কথা। ঢাকায় ছাত্র হত্যার খবরে এতো বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে এই সব কৃষকরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারী কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেয় যে, তারা কাজ করবে না। অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের শহীদের স্মরণে এই নিঃস্ব দরিদ্র জনগণ পর্যন্ত হরতাল পালন করে।[১০০] এ থেকে বুঝা যাচ্ছে ছাত্র হত্যার ঘটনা বাংলার কত গভীরে নাড়া দিয়েছিল। ২২

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারীতে ঢাকার পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে শহরে আসা অগণিত কৃষকদের মিছিল এবং বিক্ষোভ তার দৃষ্টান্ত।[১০১]

ফেব্রুয়ারীর ২১, ২২, ২৩ তিনদিন ঢাকা হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহের নগরী মিছিল বিক্ষোভ প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের নগরী। ২১ তারিখ শুধু বরকত হত্যা করেই গুলি থামেনি ঐদিন আরো অনেক নিহত হন এদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার, আবদুল সালাম প্রমুখ। ২২ তারিখে ও গুলি চললে আহত এবং নিহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ দিন নিহত হন শফিউর রহমান, অহিউল্লাহ আবদুল আওয়ালসহ আরো অনেকে। এই হত্যাযজ্ঞ বাঙালী সহজে গ্রহণ করেনি। ঘটনার পর পর দেখা যায় ব্যাপকসংখ্যক সাধারণ মানুষ কৃষক শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল হয়েছে। সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারী, রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের শিল্পীরা, পরিবহন শ্রমিকরা তাৎক্ষণিকভাবে ধর্মঘটে অংশ নিয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে এই মর্মান্তিক ঘটনার ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। রেলওয়ে পরিবহন শ্রমিকরা ক্রমাগত ৩ দিন ধরে কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকে। ঢাকায় শহীদ মিনার নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণকারী রাজমিস্ত্রী, শ্রমিকরা রাতভর বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছিল।[১০২] মহিলারা মিছিল মিটিং এ যোগদান করে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল। ২২ ফেব্রুয়ারীর জানাজায় ছাত্রদের চেয়ে সাধারণ মানুষের সংখ্যাই ছিল বেশী।[১০৩] এভাবে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের প্রভাব সারা বাংলায় সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। আটচল্লিশের আন্দোলন থেকে বায়ান্নের আন্দোলনের পার্থক্য ছিল এই যে, প্রথমটির প্রভাব শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু বায়ান্নের ব্যাপ্তী সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলন কৃষক, শ্রমিক চাকুরীজীবি ব্যবসায়ী সকল শ্রেণীর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

বায়ান্নের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের উপর জরিপ চালিয়ে দেখা যায় এরা মূলতঃ পুরো সমাজের প্রায় সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যেমন ছিল গ্রামের নিরক্ষর কৃষকের সন্তান তেমন ছিল শহুরে চাকুরীজীবী শিক্ষিত পিতার সন্তান। আবার এদের মধ্যে অনেকের পরিবারের বাসস্থান ছিল গ্রামে। যদিও সংখ্যায় শহরে বসবাসকারীই বেশী ছিল।

আন্দোলনে প্রভাব সম্পর্কে একটি ধারণা। ভাষা আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের ১২৩ জনের মন্তব্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

পিতার পেশা	মোট নমুনা সংখ্যা	প্রভাব পড়েছিল	প্রভাব পড়েনি	ধারণা অস্পষ্ট
কৃষি	৪৪	৩৩	২	৯
চাকুরী	৪১	২৩	৪	১৪
ব্যবসা	২১	১৬	৩	২
অন্যান্য	১৭	১০	১	৬
মোট	১২৩	৮২	১০	৩১

সূত্র: *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা* পৃষ্ঠা ৯২

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের পারিবারিক বাসস্থান সম্পর্কে ১২৩ জনের উপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে শহর গ্রাম বাংলার দুই পরিবেশ থেকেই এরা প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

অংশগ্রহণকারীদের পরিবারের বাসস্থান

পরিবারের অবস্থান	উত্তরদাতারসংখ্যা	শতকরা হার
গ্রাম	৫৯	৪৭.৯৭
শহর	৬৪	৫২.০৩
মোট	১২৩	১০০

সূত্র: *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা* পৃষ্ঠা ৮২

আটচল্লিশ থেকে বায়ান্ন এই সময়ে রাষ্ট্র কাঠামোর প্রশ্নটি সাধারণ মানুষের চিন্তায় এসে যায়। সমগ্র পূর্ব বাংলায় যখন সমাজের উপর থেকে নিম্নস্তরে সর্বত্র চাঁপা অসন্তোষ দ্বিজাতিত্ত্বের জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের কর্মকান্ড ক্রমাগত

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ভাষা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে তখনই প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ছাত্র সমাজ আত্মপরিচয় উদঘাটনের লক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে তাদের চিন্তার সামিল হওয়ার আহ্বান রাখেন। এ জন্য দেখা যায় যে ২১ ফেব্রুয়ারীর ঘটনা প্রবাহ দ্রুত কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। আন্দোলনের নেতৃত্বে মধ্যবিত্ত সমাজের হাতে থাকলেও আন্দোলনের শক্তি যুগিয়ে ছিল এদেশের কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষ। মধ্যবিত্ত সমাজের নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষের যে আস্থা সৃষ্টি হয়েছিল সেই আস্থাই পরবর্তী সময় মধ্যবিত্ত সমাজকে আরো বড় ধরনের আন্দোলনে অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনার সাহস যুগিয়েছিল। এই নেতৃত্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিতে বিশ্বাসী ছিল না। এদের মধ্যে যারা পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়েছিলেন তাঁরা নির্দিষ্ট একটি আকাংখা সামনে রেখে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা দেখতে পান যে তাঁদের আকাংখা বাস্তবায়নের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হচ্ছে। যদিও প্রথম থেকে পশ্চিমা অভিজাত মুসলমান এবং পূর্ববঙ্গের সামন্ত শ্রেণীর পরিকল্পিত এবং শাসিত পাকিস্তানে তারা ছিল বিচ্ছিন্ন। শুরুতে পূর্ব পশ্চিমে বৈষম্য এই বিচ্ছিন্নতাকে আরো প্রকট করে তোলে। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে এরা নিজেদের কখনই একাত্ম করতে পারেননি। পারেননি বলেই এদের মধ্যকার ভিন্ন আদর্শ প্রথম থেকেই দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। নেতৃত্বদানকারী এই সচেতন শ্রেণীর বেশীরভাগই কৃষি নির্ভর পূর্ব বঙ্গের মধ্য ও ধনী কৃষক পরিবারের সন্তান। যাদের মধ্যে কেউ কেউ শহরে এসে লেখাপড়া করছেন। আবার কেউবা এক প্রজন্ম আগে শহরে এসেছিলেন। তাছাড়া ঢাকা ও অন্যান্য শহরে বসবাসকারী উকিল, মুক্তার, ডাক্তার আমলাদের সন্তানরাও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে।

আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী কোন সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্গত (উত্তরদাতাদের নিজস্ব ধারণা থেকে)।

শ্রেণী	সংখ্যা	শতকরা হার
নিম্নবিত্ত	৪৬	৩৭.৪০
মধ্যবিত্ত	৬৮	৫৫.২৮
উচ্চবিত্ত	৫	৪.০৭
ধনী	৪	৩.২৫
মোট	১২৩	১০০

সূত্র: *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা* পৃষ্ঠা ৮১

আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের পিতার পেশা

পিতার পেশা	নমুনা সংখ্যা	শতকরা হার
কৃষি	৪৪	৩৫.৭৭
চাকুরী	৪১	৩৩.৩৩
ব্যবসা	২১	১৭.০৭
অন্যান্য	১৭	১৩.৮৩
মোট	১২৩	১০০

সূত্র: *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা* পৃষ্ঠা ৭৭

এ কারণেই সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের রাজনীতিতে আচ্ছন্ন সমাজে বাস করেও কিছু উৎসাহিত তরুণ রাজনৈতিক কর্মী ভিন্ন ভাবাদর্শের পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ, বাঙালী জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। যে তরুণ সমাজ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, যাদের পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভিত এবং কাঠামোর উপর কোন আস্থা ছিল না তারাই খুব দ্রুত নিজেদেরকে সমসাময়িক রাজনীতি এবং জাতীয়তাবাদের আদর্শের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে জাতীয়তাবাদের পালে নতুন হাওয়া দিতে সক্ষম হয়। আটচল্লিশের সীমিত আন্দোলনকে বায়ান্নে ব্যাপক বিস্তৃতি এবং তীব্র করার পেছনে এই তরুণ সমাজের ভূমিকা ছিল মুখ্য।

২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্র জনতার উপর গুলির প্রতিক্রিয়া ক্ষমতাশীন দলের উপরও চরম বিরূপ প্রভাব ফেলে। এই মর্মান্তিক ঘটনা সমগ্র বাঙালীর হৃদয়ের আবেগ ধর্ম বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে একই সুরে বেজে ওঠে। যে কারণে দেখা যায়

Dhaka University Institutional Repository

আটচল্লিশে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চেয়ে ছাত্ররা যখন মিছিল মিটিং করতো তখন পুরনো ঢাকার কোন কোন এলাকায় তারা মারমুখী আক্রমণের শিকার হতো। কিন্তু বায়ান্নের একুশের ঘটনার পর 'জবানের লড়াইয়ে' এরাও অংশ নেয়।[১০৪] মূলতঃ এই পরিবর্তন প্রামাণ করে যে পূর্ব বাংলার সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাকিস্তান সম্পর্কে যেমন ধারণা পাল্টে যায় তেমন জাতীয়তাবাদী চিন্তার জগতেও এক বিরাট পরিবর্তনের স্রোত বয়ে যায়।

ক্ষমতাশীন মুসলিম লীগ এদেশের জনগণের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। এই ঘটনার ফলে মুসলিম লীগের উপর জনগণের সামান্যতম আস্থাও নষ্ট হয়ে যায়। জনগণ তাদের উপর এতোখানি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে যে স্থানে স্থানে লীগ সদস্যরা যেমন ধিকৃত হতে থাকেন তেমন তাদর প্রকাশ্যে চলাফেরাও বিপদজনক হয়ে পড়ে। লীগের অভ্যন্তরে ও চরম ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই ক্ষোভের কোন আনুষ্ঠানিক বর্হিপ্রকাশ না ঘটলেও নেতা কর্মীদের কর্মকান্ডে তার প্রকাশ ঘটতে থাকে। তাঁরা পূর্ব বঙ্গের সর্বত্র বক্তৃতা বিবৃতি পদত্যাগের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিবাদী মনোভাব প্রকাশ করেন। অনেকে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং এ দাবী ন্যায়সঙ্গত বলে এর পক্ষে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন। মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে যে জোড়াতালির ঐক্য ছিল এই পরিস্থিতিতে তার মধ্যে ফাটলের সৃষ্টি হতে তাকে। শুরু হয় আরো বড় ধরনের ফাটলের ইঙ্গিত দিয়ে পূর্ব বাংলায় লীগের খুরিয়ে খুরিয়ে পথচলা। ভাষা আন্দোলন এভাবেই বাংলার রাজনৈতিক আকাশে এক বিরাট পরিবর্তনের ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে আসে। ফলে বাঙালী শুধু রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃতি নয় প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামে নেমে পড়ে।

ভাষা আন্দোলন ভাষা সংস্কৃতির দাবী আদায়ের আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও এর পরিণতি রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে গড়াতে থাকে। আন্দোলনের প্রথম পর্যায় রাজনৈতিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেই স্তিমিত হয়ে যায়। যদিও এর পেছনে অর্থনৈতিক স্বার্থবোধ ও জড়িত ছিল, কিন্তু সেটা ব্যাপকভাবে তখনও চোখে পড়েনি যেভাবে বায়ান্নের আন্দোলনের সময় চোখে পড়েছিল। সে সময় ভাষা আন্দোলন যেমন পরিপূর্ণ একটি রাজনৈতিক আন্দোলন রূপে আত্মপ্রকাশ করে ছিল তেমন অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাঙালীতার ভাষা সংস্কৃতিকে আক্রে ধরে ছিল এবং ভিন্ন আঙ্গিকে আন্দোলনের রূপান্তর বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্নটিকেও সামনে নিয়ে এসেছিল।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ এই সময়ের মধ্যে বাঙালীর মনে এই উপলব্ধি চলে আসে যে ভাষা ধ্বংসের মাধ্যমে এরা বাঙালী জাতিসত্ত্বাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঙালীকে তার ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত করা। অর্থাৎ পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করা। বিষয়টি সচেতন ছাত্র সমাজের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তাই ভাষা আন্দোলনে ক্ষোভ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করা বাঙালীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা তাদের কাছে সমার্থক বলে বিবেচিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গেলে তাদের পশ্চিম পাকিস্তানের দাসে পরিণত হতে হবে,এই বোধ থেকে তারা হয়ে উঠেছিল বেপরোয়া। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে। এর মর্মান্তিক পরিণতির পথ ধরেই বাঙালী পেয়েছিল তার 'ঘরে ফেরার' ঠিকানা। প্রতিটি বাঙালীর অনুভূতি তখন এক হয়ে গিয়েছিল। এই বর্বরোচিত আক্রমণে সাধারণ মানুষকেও বুঝিয়ে দিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান বাঙালীর স্বার্থ বিরোধী। এই বোধের মধ্যদিয়ে বাঙালী এক ঐক্য চেতনায় সম্পৃক্ত হয়েছিল যা তাদের নিজ ভাষা সংস্কৃতি রক্ষা, অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের প্রেরণা যুগিয়েছিল। এভাবেই একুশের শহীদের রক্তধারা সমগ্র বাঙালী জাতিকে একতাবদ্ধ করে।

বহুযুগ ধরে বাঙালীর একটি জাতি হয়ে গড়ে ওঠার সকল উপাদানে সমৃদ্ধ হলেও জাতীয়তাবাদী চেতনার যে একাত্মতাবোধ তারা তা ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে অর্জন করেছিল। যখন দ্বিজাতিতত্ত্বের জাতীয়তাবাদী চেতনার জোয়ারে বাঙালী মুসলমান ভেসে যাচ্ছি তখনও একদল বুদ্ধিজীবী বাঙালীর ঐতিহ্যের গৌরব গাথাটি প্রাণপন উর্ধ্বে তুলে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে তাঁদেরই জয় সূচিত হয়েছে। অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত সচেতন সমাজ এবং ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার লড়াইয়ে ব্যাপৃত ছাত্র বুদ্ধিজীবী সমাজ বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনে দৃঢ়ভাবে একএ হয়, যার ফলে পরবর্তীতে বাঙালী তার জীবন-মরণ উত্থান-পতন একই সূত্রে গ্রথিত বলে ভাবতে শুরু করে। এক কথায় এরূপ ঐক্যবোধ, সমগ্র জাতির মানসিক চিন্তার সঙ্গে মিশে যাওয়াই হচ্ছে জাতীয়তাবোধ। বাঙালী ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই বোধ অর্জন করে। তাই ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে শাশ্বত বাঙালী চেতনার উন্মেষ ঘটে। যে চেতনা এ অঞ্চলের বাঙালী জাতির পরবর্তী ইতিহাস রচনায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১।	আজফার হোসেন	ঃ	ভাষা আন্দোলন: সংস্কৃতির রাজনৈতিক কাজ: প্রবন্ধ- আজকের কাগজ একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ১৯৯৪।
২।	ঐ	ঃ	ঐ
৩।	আতিউর রহমান লেলিন আজাদ	ঃ	ভাষা আন্দোলন আর্থ-সামাজিক পটভূমি একটি তাত্ত্বিক সন্ধানে বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা পৃষ্ঠা ২৪-২৫।
৪।	রংগলাল সেন কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মশালায় রাখা বক্তব্য থেকে নেয়া। লিখিতভাবে প্রকাশিত হয় ১৩৯৫ সালের বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা নামক গবেষণা পত্রিকায় পৃষ্ঠা ১৩৭।		
৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৩৮।
৬।	বশীর আল হেলাল	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৬।
৭।	রফিকুল ইসলাম	ঃ	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পৃষ্ঠা ৩৩০।
৮।	বশীর আল হেলাল	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৭।
৯।	রফিকুল ইসলাম	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৪।
১০।	বশীর আল হেলাল	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৭।
১১।	দৈনিক আজাদ ৯ জুন ১৯৪৭ সাল।		
১২।	দৈনিজ আজাদ ২৪ মে ১৯৪৭ সাল।		
১৩।	আতিউর রহমান সৈয়দ হাশেমী	ঃ	ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান: একটি জরিপ (প্রবন্ধ) বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা পৃষ্ঠা ৮৭।
১৪।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৫১।
১৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৫১।
১৬।	সংগ্রাম পরিষদের প্রতিষ্ঠার সময় নিয়ে বিতর্ক আছে। বিস্তারিত তথ্য রয়েছে বশীর আল-হেলালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস গ্রন্থে পৃষ্ঠা ২০২।		
১৭।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৬।
১৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩২-৩৩।
১৯।	ডিসেম্বরের ৬ তারিখে শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুপুর দুটোর সময় যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে অংশগ্রহণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রবৃন্দ। এই বিশাল সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাশেম। সভায় যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে মুনীর চৌধুরী, আবদুর রহমান, কল্যাণ দাশ গুপ্ত, এ. কে. এম আহসান, এস. আহমদ অন্যতম। বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৩।		
২০।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৪।
২১।	বশীর আল্ হেলাল	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৯২।
২২।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৪।
২৩।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩৭।
২৪।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৩৮।
২৫।	বশীর আল হেলাল	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২০৭।
২৬।	রফিকুল ইসলাম	ঃ	একুশের প্রবন্ধ '৮৯ বাংলা একাডেমী পৃষ্ঠা ১২১।
২৭।	বশীর আল্ হেলাল	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২০৯-১০।
২৮।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

২৯।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা-৬০।
৩০।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২১০।
৩১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৬০।
৩২।	**বশীর আল হেলাল**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২১০।
৩৩।	**বদরুদ্দীন উমর**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬০।
৩৪।	ফেব্রুয়ারীর ২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ছাত্র ধর্মঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং স্কুলের ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করে মিছিলেন যোগদান করে। বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাশেম। এতে বক্তৃতা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দীন আহমদ, ফজলুল হক হল ইউনিয়নের সহ সভাপতি সম্পাদক তোয়াহা এবং অধ্যাপক আবুল কাসেম। বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলা ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৬৭।		
৩৫।	**বদরুদ্দীন উমর**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬।
৩৬।	১৫ মার্চ নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি পত্রটি ১৬ মার্চ ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় কিছু কিছু স্থানে সংশোধন করা হয়। ঐ দিনই দুপুরে শেখ মুজিবর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ ছাত্র সভায় সংশোধনী প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি ছিল এক, ঢাকা এবং অন্যান্য জেলায় পুলিশী বাড়াবাড়ি সম্পর্কে তদন্তের জন্য সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত এবং সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করতে হবে। দুই, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের সুপারিশ করে প্রস্তাব গ্রহণের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য পূর্ব বাংলা পরিষদের অধিবেশন চলাকালে একটি বিশেষ দিন নির্ধারণ করতে হবে। তিন, সংবিধান সভা কর্তৃক তাঁরা উপরোক্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করাতে অসমর্থ হলে সংবিধান সভার এবং পূর্ব বাংলা মন্ত্রীসভার সদস্যদেরকে পদত্যাগ করতে হবে। বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলা ভাষা আন্দোলন ও তৎককালীন রাজনীতি ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৯২-৯৩।		
৩৭।	**বদরুদ্দীন উমর**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯৬।
৩৮।	Quaid-I-Azam Mohammad Ali Jinnah's **Speechs as Governer General.** Pakistan Publications Karachi P. 85-86.		
৩৯।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮।
৪০।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৮৯।
৪১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৮৯।
৪২।	**বদরুদ্দীন উমর**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১১০।
৪৩।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১১৪।
৪৪।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১২৭।
৪৫।	১৯৪৮ সালের ৬ এপ্রিল পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক পেশকৃত তৃতীয় এবং শেষ সংশোধনী প্রস্তাবটি নিম্নরূপ : "১। এই পরিষদের অভিমত এই যে— (ক) বাংলা পূর্ব বাঙলা প্রদেশের সরকারী ভাষারূপে গৃহীত হইবে। (খ) দুই বৎসরের মধ্যে পূর্ব বাঙলা প্রদেশে ইংরেজীর স্থলে বাংলা প্রবর্তনের জন্য আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (গ) পূর্ব বাঙলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা।" বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১২৮-১৩১।		
৪৬।	**বদরুদ্দীন উমর**	ঃ	পৃষ্ঠা ১৫৮।
৪৭।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৬১-১৬৩।
৪৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২৫৬-২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪৯।	দৈনিক আজাদ ১ জানুয়ারী ১৯৪৯।		
৫০।	**মুহম্মদ সফিউল্লাহ সম্পাদিত**	ঃ	শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৪৫।
৫১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৪৫।
৫২।	সৈনিক ১ জানুয়ারী ১৯৪৯ সাল।		
৫৩।	নওবেলাল ১৭ মার্চ ১৯৪৯ সাল।		
৫৪।	নওবেলাল ৭ এপ্রিল ১৯৪৯ সাল।		
৫৫।	সৈনিক ৮ এপ্রিল ১৯৪৯ সাল।		
৫৬।	সৈনিক ৮ এপ্রিল ১৯৪৯ সাল।		
৫৭।	সৈনিক ৮ এপ্রিল ১৯৪৯ সাল।		
৫৮।	স্মারকলিপিটির পূর্ণ বিবরণ সৈনিক পত্রিকার ১৯৪৯ সালের ২২ এপ্রিল ছাপা হয়। তাছাড়া বদরুদ্দীন উমরের পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনও তৎকালীন রাজনীতি গ্রন্থের ২য় খন্ডে পৃষ্ঠা ২৬২-২৬৪ এর বিবরণ আছে।		
৫৯।	**বদরুদ্দীন উমর**	ঃ	পৃষ্ঠা ২৬২।
৬০।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২৬৩।
৬১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২৬৪।
৬২।	**বশীর আল্ হেলাল**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬২৮।
৬৩।	**বদরুদ্দীন উমর**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৭১।
৬৪।	মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশ এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং আন্দোলন সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে বদরুদ্দীন উমরের পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি গ্রন্থের ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৮০-৪১৬।		
৬৫।	দৈনিক আজাদ ১৯৫০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয়।		
৬৬।	দৈনিক আজাদ ১৯৫০ সালের ২ অক্টোবর সংখ্যার সম্পাদকীয়।		
৬৭।	দৈনিক আজাদ ১৯৫০ সালের ৪ অক্টোবর সংখ্যা।		
৬৮।	**G. W. Choudhury**	ঃ	**Constitutional Development in Pakistan.** P. 72.
৬৯।	**Moudud Ahmed**	ঃ	**Bangladesh : Constitutional Quest For Autonomy** P. 21.
৭০।	ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন কর্তৃক প্রণীত বিকল্প শাসনতান্ত্রিক সুপারিশসমূহের বিবরণ রয়েছে বদরুদ্দীন উমরের পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৪০০-৪০৪।		
৭১।	**Moudud Ahmed**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৮।
৭২।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২০।
৭৩।	দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির দশ বছরের তুলনামূলক তালিকা ১৯৪৯ সালের ২৫ জুন ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ফরিয়াদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তালিকার অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলো:		
	দ্রব্যসমূহ	**১৯৩৮ সালের বাজার দর**	**১৯৪৮ সালেরবাজার দর**
	চাউল (উৎকৃষ্ট)	মণ ৪৲-৫৲	(কনট্রোল) মণ ২১৲
	ডাইল	সের	সের
	কয়লা	মণ	(কনট্রোল) মণ
	একজোড়া শাড়ী (সাধারণ)	২৷৷০-৩৲	১৪৲-১৬৲
	লুঙ্গি (সাধারণ)	২৲-২৷৷০	১টা ৭৲-৮৲
	ধুতি (সাধারণ)	২৲	১৪৲-১৬৲
৭৪।	**বদরুদ্দীন উমর**	ঃ	পূর্বোক্ত ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫।	পাকিস্তানের তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর পার্লামেন্টে প্রদত্ত বক্তব্য থেকে দ্রব্যমূল্যের গড়পড়তা মূল্য উপস্থিত করা হলো: ১৯৩৯ সালের দ্রব্যের গড়পড়তা মূল্য ছিল ১০০ ১৯৪৮ সালের দ্রব্যের গড়পড়তা মূল্য ছিল ৩৭৪ ১৯৪৯ সালের দ্রব্যের গড়পড়তা মূল্য ছিল ২১৪ সূত্র : বদরুদ্দীন উমর পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৭২		
৭৬।	১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারীর ২৩ তারিখে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকপত্র প্রদানকালে যে সব বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন; ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইব্রাহিম খান, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ।		
৭৭।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	পূর্বোক্তপৃষ্ঠা ১০২।
৭৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৮৯-৯১।
৭৯।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৯১।
৮০।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৯০-৯১।
৮১।	ভাষা আন্দোলন পুনর্জাগরণের পেছনে যে ঘটনা তৎকালীন ছাত্রনেতা আবদুল মতিনকে উৎসাহিত করেছিল তা থেকে অনুমান করা যায় ভাষা আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষেরও সমর্থন ছিল। উক্ত ঘটনার বর্ণনা আবদুল মতিনের ভাষায় তুলে দেয়া হলো: "১৯৫০ এর কথা আমি ফজলুল হক হলের পশ্চিম দক্ষিণ পার্শ্বের ব্যারাকে একটি চা-এর দোকানে বসেছি। আমার পাশে টুলে বসা সেক্রেটারিয়েটের দু'জন কর্মচারীর কথোপকথন আমার কানে ভেসে আসে তাঁরা একজন আরেকজনকে বলছেন 'ছাত্রদের আন্দোলন থেমে গেলো, বাংলা আর রাষ্ট্রভাষা হচ্ছে না' উর্দূ রাষ্ট্রভাষা হয়ে যাবে। আমরা উর্দূ পড়তে লিখতে পারি না। উর্দূ রাষ্ট্রভাষা হলে আমাদের কতই না অসুবিধা হবে। কি আর করি। আমরা চাকুরী করে খাই। আমরা কি করে আন্দোলন করি? আন্দোলনে গেলে সরকার আমাদের চাকুরী খাবে। আন্দোলনে নামা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। ছাত্ররা ছিল আশা ভরসা। তারাও ঠান্ডা হয়ে গেলো। একথাগুলো আমার পছন্দ হলো। কথাগুলো একেবারে বাস্তব সত্য। সমকালীন সমাজের জনমতের প্রতিধ্বনি।" আবদুল মতিন (স্মৃতিচারণ), একুশের স্মারকগ্রন্থ '৮৭ পৃষ্ঠা ১১০, বাংলা একাডেমী।		
৮২।	বি, আই, ডি, এস এর পরিচালিত ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের, আর্থ-সামাজিক অবস্থান শীর্ষক গবেষণা কর্মের অধীনে ১২৩ জন ভাষা সৈনিকের জরিপলব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রণীত। আতিউর রহমান ও সৈয়দ হাশেমী ভাষা আন্দোলন অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান পৃষ্ঠা ৩০।		
৮৩।	বি, আই, ডি, এস পরিচালিত গবেষণা কর্মের অধীনে ১২৩জন ভাষা সৈনিকের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত। এম, এম, আকাশ। ভাষা আন্দোলনমুখী রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা বিশেষ সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪২।		
৮৪।	বদরুদ্দীন উমর	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৩২-১৩৩।
৮৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৩৫-১৩৬।
৮৬।	রফিকুল ইসলাম	ঃ	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পৃষ্ঠা ৫০।
৮৭।	Pakistan Observer	ঃ	30.1.52.
৮৮।	ঐ	ঃ	ঐ।
৮৯।	১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারী সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সময় ঢাকার প্রায় সব রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলো ছিলো; পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, তমুদ্দুন মজলিশ, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ, পূর্ব পাকিস্তান মোহাজের সমিতি। এই সব সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও ঢাকার কিছু নেতৃস্থানীয় নাগরিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী উক্ত সভার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের ঢাকার পল্টন ময়দানের দেয়া বক্তব্যের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এই পরিষদ গঠন করা হয়। বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনও তৎকালীন রাজনীতি ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ২২২-২২৫।		

Dhaka University Institutional Repository

৯০।	**বদরুদ্দীন উমর**	ঃ	পূর্বোক্ত ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৩৫।
৯১।	যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ তার বিবৃতিতে সরকারী প্রেস নোটের সমালোচনা করে বলেন 'সরকারী প্রেসনোট গত দুই বছর ধরিয়া পাকিস্তান অবজারভার এর "রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের" উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সরকার কর্তৃক পত্রিকাখানি রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ শুরু করার সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বন না করার কি কারণ থাকিতে পারে? তাহা হইলে কি এতদিন সরকার ঘুমাইতেছিলেন।....রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও দমননীতির পিছনে নানা দুরভিসন্ধি রহিয়াছে।' বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ২৩৬-২৩৭।		
৯২।	**গাজীউল হক**	ঃ	পঞ্চাশ দশকে আমরা (প্রবন্ধ) বিচিত্রা ২১ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ১৯৮৪।
৯৩।	ঐ	ঃ	ঝড়ের পূর্ব রাত: তার আগের দুটো দিন (প্রবন্ধ) সংবাদ ২১ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ১৯৯০।
৯৪।	গাজীউল হকের পূর্বোক্ত লেখা অনুযায়ী ১৯ ফেব্রুয়ারী ছাত্র সভায় সভাপতিত্ব করেন জিল্লুর রহমান। বদরুদ্দীন উমর তার পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২৪১ পৃষ্ঠায় বলেছেন মুখলেছুর রহমান সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।		
৯৫।	**বদরুদ্দীন উমর**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৫০।
৯৬।	ঢাকার নবনিযুক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিম্নলিখিত আদেশের মাধ্যমে ১৪৪ ধারা জারী করেন : 'যেহেতু এটা দেখা যাচ্ছে যে, জনগণের একটি অংশ ঢাকা শহরে জনসভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করার চেষ্টা করছে এবং যেহেতু আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি যে, সেই ধরনের শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ মিছিল জনসাধারণের জীবনে শান্তি ও শৃংখলা ভঙ্গ করতে পারে। তাই আমি এস, এইচ, কোরেশী সি, এস, পি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা, পি, আর, এস, সি,র ১৪৪ ধারা অনুযায়ী কোতওয়ালী, সূত্রাপুর, লালবাগ, রমনা, তেজগাঁও পুলিশ স্টেশন নিয়ে গঠিত ঢাকা শহরের সমগ্র এলাকায় আমার লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ থেকে তিরিশ দিনের জন্য সেই ধরনের সকল জনসভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি।' বদরুদ্দীন উমর পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ২৫২-২৫৩।		
৯৭।	১৪৪ ধারা জারীর ফলে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় ছাত্র নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে তা প্রকাশ পায়। অলি আহাদ তার বক্তব্যে বলেন: 'বিনা অজুহাতে আমাদের পুনঃ পুনঃ ঘোষিত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে বানচাল করিবার অসদুদ্দেশ্যেই সরকার ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছে। অতএব ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া সরকারকে সমুচিত জবাব দিব আবদুল মতিন একই মনোভাব প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। যখনই কোন আসল আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখা দেবে তখনই ১৪৪ ধারা জারী করা হবে। এবং এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার কাছে আমরা যদি নতিস্বীকার করি তাহলে কোন আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।' ছাত্র নেতৃবৃন্দের দৃঢ় মনোভাবের ফলে ২১ ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা সম্ভব হয়। বদরুদ্দীন উমর পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ২৫৬-২৫৭।		
৯৮।	**বশীর আল্ হেলাল**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৩৮।
৯৯।	পুরোনো চৌদ্দটি জেলার অধিবাসীদের ভাষা আন্দোলনে অশগ্রহণের শতকরা হিসাব। আতিউর রহমান সৈয়দ হাশেমী, ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান: একট জরিপ, প্রবন্ধ : বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা পৃষ্ঠা ৭৫।		
১০০।	খুলনার দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামের অনাহারী কৃষকদের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের নমুনা সম্পর্কে উক্ত গ্রামে রিলিফের কাজে নিয়োজিত জনাব কিউ, কিউ, এস জহুরের (কাসেম আলী) বর্ণনায় তুলে ধরা হলো: 'পরদিন অথবা ২-১ দিন পরে ৮ মাইল দূরে এক গন্ডগ্রামে টেস্ট রিলিফের কাজ তদারক করতে গেলাম। কাজেকর্মে কেউ নেই। জিজ্ঞাস করে জানতে পারলাম মহাদুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অশিক্ষিত কাঙ্গালরা বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের মর্মবেদনায় হরতাল পালন করছে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পরও জানতে পারলাম না কেবা কারা এই হরতালের ডাক দিয়েছেন। রেডিও মারফৎ খবরটা গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়বে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু আজ পাড়াগায়ে ছয় কি আট আনা পয়সা পাওয়া রিলিফের খালকাটা কোদাল মারা কোন মতে দিন গুজরানকারী ক্ষেতমজুর গরীব কৃষক ঢাকার শহীদানের জন্য হরতাল পালন করবে তাতে খুবই বিস্মিত হলাম। অচেতন মনে কিছুটা চেতনা সঞ্চারিত হলো। মনটাও ক্ষুব্ধ হলো।' বদরুদ্দীন উমর পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৫৭।		

Dhaka University Institutional Repository

১০১।	**বদউদ্দীন উমর**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৫৭।
১০২।	**আতিউর রহমান** **সৈয়দ হাশামী**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯২।
১০৩।	**বদরুদ্দীন উমর**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩২৫।
১০৪।	বদরুদ্দীন উমর কর্তৃক ডিসেম্বর ১৯৮৮ তারিখে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় দেয়া বক্তব্য (বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা নামক গবেষণামূলক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা পৃষ্ঠা ১৩১ প্রকাশিত)।		
১০৫।	১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর ক্রমাগত পরিবহন ধর্মঘট চলাকালে ম্যাজিস্ট্রেট কোরেশীর সঙ্গে পরিবহন মালিকদের সভা হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের হুমকির মুখে অশিক্ষিত মালিকদের জবাব ছিল 'এতো দিনতো জবানের লড়াইয়ের মধ্যে আছিলাম না কিন্তু এহন যহন দেশেই আমরা বিদেশী হইছি তহন আর কি করা।' পরিবহন মালিক সমিতি সদস্যদের বক্তব্য প্রমাণ করে যে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষও বুঝতে পেরেছিল তারা স্বদেশে বিদেশী এবং পাকিস্তানীরা তাদের আপনজন নয়। বদরুদ্দীন উমর ও সাধারণ মানুষের এই পরিবর্তনের কথা বলেছেন। তিনি বলেন '৪৮ সালে যারা ভাষা আন্দোলনকারীদের পেটাতো ৫২ সালে তারা বেরিয়ে পুলিশকে তাড়া করেছে। এ যে পার্থক্যটা সেটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ।' বদরুদ্দীন উমর পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৬৮।		

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের রাজনৈতিক ধারা

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে জাতীয় চেতনার স্ফুরণ ঘটে; পরবর্তীতে এই চেতনা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। আন্দোলনের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে উজ্জীবিত হতে থাকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের চিন্তা ভাবনা; দৃঢ় হতে থাকে বাঙালীর জাতিগত একাত্মতাবোধ। বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের ফলে বাঙালীর জন্য যে বঞ্চনার ইতিহাস রচিত হচ্ছিল; স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের পথ ধরে এই বঞ্চনাকে প্রতিহত করার জন্য ক্রমন্বয়ে এ অঞ্চলের জনগণ নিজেকে সংহত করতে শুরু করে। গড়ে তুলতে শুরু করে বাঙালীর স্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের দেয়াল। তাদের যাত্রা শুরু হয় রক্তস্নাত পথে। এই পথ ধরেই বিকাশ লাভ করে বাঙালী জাতীয়তাবাদ চেতনার।

১৯৪৭ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যেই ভাষা সাংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই রাজনৈতিক আন্দোলনের আদর্শ যেমন হয়ে ওঠে বাঙালী জাতীয়তাবাদ, তেমন অর্থনৈতিক বঞ্চনা পরিণত হয় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত অর্থনৈতিক বৈষম্য পরিণত হয় বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিকাশের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে।

ঊনিশশ বায়ান্নের ২১ ফেব্রুয়ারী ছিল পূর্ব বাংলার গণচেতনার প্রথম সুসংগঠিত সফল গণঅভ্যুত্থান; পরবর্তীকালে শাসকচক্রের বিরুদ্ধে স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এর পর থেকে বাঙালী আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিপদক্ষেপে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে তাকে। যার প্রতিফলন ঘটে পরবর্তী বছর ডিসেম্বরে যুক্তফ্রন্ট গঠনের মধ্যদিয়ে। এখানে উল্লেখ্য সরকার বিরোধী শক্তির এ ঐক্যের পেছনে তরুণ ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ছাত্ররাই প্রথম ঐক্যের লক্ষ্যে 'হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী এক হও' শ্লোগান উত্থাপন করে। তার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ইউনিয়নের নির্বাচনে ছাত্ররা 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে।[১] তাদের ঐক্যের পেছনে যেমন একুশের চেতনা কাজ করেছে তেমন সেই চেতনায় প্রভাবিত হয়ে তারা রাজনৈতিক সংগঠন গুলোকে এক করতে সক্ষম হয়েছে। ছাত্ররা প্রথমে নিজেদের মধ্যে ঐক্য মোর্চ গঠন করে; পরবর্তীতে তারা রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করে। এই পন্থায় সম্মিলিতভাবে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া তখন থেকেই এই অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। বাঙালী জাতীয় চেতনা বিকাশের স্তরে স্তরে এই বিশেষ প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। যুক্তফ্রন্ট ছিল এই প্রক্রিয়ার প্রথম সফল পদক্ষেপ।

১৯৫১ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হওয়ার পর পাকিস্তানের সকল ক্ষমতা মূলতঃ পাঞ্জাবী চক্রের হাতে চলে যায়। দুর্নীতি অর্থনৈতিক বৈষম্য অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর সেনাবাহিনীর প্রবল প্রভাব গণতন্ত্রকামী পূর্ববঙ্গবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৩ সালে নাজিমউদ্দিনকে বরখাস্ত করে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে সেই পদে নিযুক্ত করেন।ঐ সময় নেপথ্য থেকে পাকিস্তানের পরবর্তী ভাগ্যবিধাতা আইয়ুব খান দেশের রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ফলে সর্বক্ষেত্রে বাঙালী হতে থাকে অধিকার থেকে বঞ্চিত। অপরদিকে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ তার চরম প্রতিক্রিয়াশীল নীতির জন্য দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। বাংলার জনগণের মধ্যে যখন কেন্দ্রীয় শাসকচক্র এবং প্রাদেশিক লীগ সরকারের বিরুদ্ধে চরম তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্ম হচ্ছে, ঠিক তখনই মুসলিম লীগ ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা প্রদান করে। এই পটভূমিতে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট গঠন সম্পর্কে তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন: "জনতা একদিনের জন্যও মুসলিম লীগ সরকারকে বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না। তাই তারা সমস্ত লীগ বিরোধী দলগুলির সমন্বয় মুসলিম লীগকে পূর্ব বাংলার মাটি হতে উৎখাত করার জন্য একটি 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করাবার আওয়াজ তুলেছিল। এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতেই জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান পুর্ব পাক আওয়ামী লীগ ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর তারিখে ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক কাউন্সিল অধিবেশনে লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট করে নির্বাচনে মুসলিম লীগ জুলুমশাহী মোকাবেলা করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।"[২]

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের প্রতীক ছিল নৌকা—যা পরবর্তীতে বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতীকে পরিণত হয়। এর নির্বাচনী ইস্তেহার ২১ দফা ছিল বাঙালীর মুক্তির সনদ। এতে বাঙালীর অধিকার সচেতনতার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ইস্তেহারে বলা হয় বাংলা হবে পাকিস্তানের অন্যতম একটি রাষ্ট্রভাষা; বর্ধমান ভবনকে প্রথমে ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলাভাষা ও সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করা; ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীর শহীদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন; দিনটি 'শহীদ দিবস' এবং ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা। পূর্ব বাংলার স্বাধিকার প্রসঙ্গে বলা হয় ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং মুদ্রা ব্যবস্থা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে পূর্ববঙ্গের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। তাছাড়া পাট শিল্পকে জাতীয়করণ, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুকরণসহ আরো অন্যান্য বিষয়ও এতে উল্লেখ করা হয়।[৩]

২১ দফা বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, স্বল্প সময়ের মধ্যে বাঙালী কতখানি আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিল এবং নিজ অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আপোষহীন সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছিল। ২১ দফা ছিল বাঙালীর জাতীয় চিন্তা সংহত করার প্রথম রাজনৈতিক দলিল, বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম কর্মসূচী এবং ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম সোপান। এই কর্মসূচী সমগ্র বাঙালী জাতির মধ্যে যেমন ব্যাপক সাড়া জাগায় তেমন তা সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন লাভ করে। এর ব্যাপকতা সম্পর্কে মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন: "The manifesto, therefore, was very broadly-based and was primarily the programme of the Bengali nationalist movement. It was designed not only to express the interests of the Bengali nationalist bourgeoisie but also to receive the support of the other strata of the population of East Bengal."[৪]

২১ দফার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় 'ব্যালট বাক্সে বিপ্লব' সংগঠিত হয়। এর ফলে ক্ষমতাশীন মুসলিম লীগ, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনসহ সকল প্রাদেশিক মন্ত্রী পরাজয় বরণ করেন। ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ মাত্র নয়টি আসন লাভ করে। ২ মার্চ সরকারীভাবে প্রকাশিত নির্বাচনী ফলাফলে আসন সংখ্যার যে নমুনা পাওয়া যায় তা ছিল নিম্নরূপ:[৫]

সাধারণ আসন	অমুসলিম
কংগ্রেস	২৪
তফশিলী ফেডারেশন	২৯
সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট	৯
কমিউনিষ্ট	৫
গণতন্ত্রী দল	২
বৌদ্ধ	২
খৃষ্টান	১
মোট	৭২
	মুসলিম আসন
যুক্তফ্রন্ট	২২২
মুসলিম লীগ	৯
স্বতন্ত্র	৫
খেলাফতে রব্বানী	১
মোট	২৩৭
সর্বমোট আসন	৩০৯

১৯৫৪ সালের নির্বাচন প্রধানতঃ স্বায়ত্তশাসনের দাবীর ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি 'পরবর্তীতে পূর্ব বাংলার ছাত্র জনতার জীবন বাজি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'[৬] বাঙালীর স্বাধিকার অর্জনের ইতিহাসে এই নির্বাচনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম; কেননা এই নির্বাচনের মধ্যদিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ বাঙালী হিসেবে আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দৃঢ় ঘোষণা দিতে সক্ষম হয়েছিল। দ্বিজাতিতত্ত্বের জাতীয়তাবাদের পরাজয় এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিজয় সূচিত হয়েছিল। ক্ষমতাশীন শাসকগোষ্ঠী বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলেই বাঙালীর এই অভূতপূর্ব বিজয় নস্যাৎ করার গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট, মন্ত্রীসভা গঠন করেও সরকার ৫৭ দিনের বেশী ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। বাঙালী জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং গণতন্ত্রের বিজয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ভীত ও সন্ত্রস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আমলারা মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক এবং তার মন্ত্রীসভাকে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজে লিপ্ত হয়। সরকারী মদদ পেয়ে স্বার্থবাদী মহল পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শিল্প অঞ্চলে বাঙালী এবং অবাঙালীর মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়।[৭] অথচ অভিযোগ করা হয় যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে কমিউনিষ্টরা এই দাঙ্গা বাধিয়েছে।[৮] ইতিমধ্যে কোলকাতায় দেয়া মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের এক বিবৃতির অপব্যাখ্যা করে শাসকগোষ্ঠী যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে মেতে ওঠে। এরা ২১ দফা কর্মসূচী সম্পর্কেও ছিল স্পর্শকাতর। এভাবে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের স্বার্থসিদ্ধির বিভিন্ন অজুহাত খুঁজতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ফজলুল হককে করাচীতে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি ২১ দফা এবং অন্যান্য বিষয়ে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হন। গবেষক শ্যামলী ঘোষ তাঁর গবেষণা গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন:

"Haq was summoned to Karachi where he refused a general rounding up of the communists. It was also reported that during the same visit Haq had repeatedly pointed out the short-term nature of the twenty-one point programme of the UF as compared to the ultimate long-term objective of independence for East Pakistan."[৯]

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী ইস্তেহার, যার উপর পূর্ব বাংলার সর্বসাধারণের রায় ঘোষিত হয়েছিল, সরকার তা সুনজরে দেখেনি। অবশেষে নানান মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ৩০ মে ১৯৫৪ সাল ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। 'তারা অনুগত পাকিস্তানী, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা তারা চান না, এই মর্মে সকলে এক যুক্ত বিবৃতি'[১০] দিয়েও যুক্তফ্রন্ট সরকার পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বাস অর্জন করতে অসমর্থ হয়। ফজলুল হক তাঁর সহকারীদের নিয়ে ঢাকায় ফেরার আগেই পূর্ব বাংলায় ৯২-ক ধারা বলে গভর্ণর শাসনের প্রবর্তন করা হয়। কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা সচিব ইস্কান্দার মীর্জা গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমানসহ বহু নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হন। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ১৬ জুন এক বেতার ভাষণে ফজলুল হককে 'দেশদ্রোহী' বলে ঘোষণা করেন। বৃদ্ধ জননেতা স্বীয় বাসভবনে নজরবন্দী হন। নবনিযুক্ত গভর্ণর ইস্কান্দার মীর্জা বিদেশে অবস্থানরত বাঙালী নেতা ভাসানীকে গুলি করে হত্যার হুমকি দিতেও দ্বিধা করেননি। এভাবেই পূর্ব বাংলার জনগণের রায়ে নির্বাচিত সরকারের উপর কেন্দ্রের ক্রুদ্ধ আক্রোশ বর্ষিত হতে থাকে। বাংলার জনগণ তাদের রায়ে নির্বাচিত সরকারের পরিণতিতে যত না হতাশ হন তার চেয়ে বেশি হতাশ হন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর আচরণে। ফলে হতাশাগ্রস্ত ক্ষুব্ধ পূর্ব বঙ্গবাসীর সঙ্গে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর দূরত্ব আরো বেড়ে যায়।

উন্নত ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্যের অধিকারী রাজনীতি সচেতন বাঙালী জাতিকে প্রথম থেকে পাকিস্তানী শাসকচক্র অবিশ্বাস করে আসছিল। '৫৪ এর নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ বাঙালীর শক্তিতে শংঙ্কিত শাসকগোষ্ঠী পুরোমাত্রায় তাদের অবিশ্বাস করতে থাকে। এদের অনেকেরই ধারণা ছিল অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যে কারণে শোষণ বঞ্চনার মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ব বাংলার সম্পদ অর্থ যত সম্ভব আত্মসাৎ করে পশ্চিম পাকিস্তানকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপক কর্মকান্ড শুরু হয়ে যায়। পূর্ব বাংলার প্রতিটি ন্যায্য প্রাপ্তি এবং অধিকারের উপর আঘাত আসতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা বাঙালী নেতাদের অজানা ছিল না। এ সম্পর্কে ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খানের বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য:[১১]

আমি খুবই বিশ্বস্ত সূত্রে এবং সর্বোচ্চ মহল থেকে জানতে পেরেছি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস, পূর্ব বঙ্গ শেষ অবধি আর পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে না। তাঁরা বলে থাকেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে আর একটি ফার্দিংও খরচ করা ফলপ্রসূ নয়। এ ধরনের ব্যয় হচ্ছে নর্দমায় ফেলে দেয়ার মতো। এদের হুবহু কথাবার্তা হচ্ছে, "পূর্ব বাংলায় টাকা ব্যয় করার অর্থ নর্দমায় নিক্ষেপ করা কারণ পূর্ব বাংলা আমলাদের সঙ্গে থাকবে না।"[১১]

আতাউর রহমান বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে যেয়ে পরিষদে আরো বলেন: "...এখানকার বাজার এবং অন্যান্য এলাকায় যেয়ে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি তাদের পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবসা করার জন্য বলেছি। কিন্তু তাদের জবাব হচ্ছে 'বাততো ঠিক হ্যায়। মগর মাশরেকি পাকিস্তান আগর আলাহিদা হো যায়ে তো?' (এটা বেশ উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান যদি আলাদা হয়ে যায়?)।"[১২]

পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী এবং ব্যবসায়ী শিল্পপতি শ্রেণী পূর্ব বাংলায় তাদের স্বার্থ সম্পর্কে কি পরিমাণ সতর্ক ছিল এবং এ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা কি ধারণা পোষণ করত এ হলো তার একটি উদাহরণ। এই ধারণার ফলেই হয়তো এরা পূর্ব বাংলা সম্পর্কে ছিল উদাসীন। যার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে চরম বৈষম্য এবং সংঘাতের। তার উপর পূর্ব বঙ্গের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ক্ষমতার আকাংখা সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের ফলে বাঙালীর বঞ্চনার পথ আরো প্রশস্ত হয়। ইতিমধ্যে ক্ষমতাচ্যুত রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলে যুক্তফ্রন্ট

Dhaka University Institutional Repository

ভেঙ্গে যায়। বাংলার নির্বাচিত নেতাদের ক্ষমতার জন্য দরকষাকষি পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থবাদী মহলের পূর্বাঞ্চলের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে ভীতি দূর করতে সাহায্য করে। তারা বুঝতে পারেন যে নেতাদের তারা যতখানি ভয় পেয়েছিলেন তাঁরা ততখানি বিপদজনক নন। বরং এদের ক্ষমতায় নিলে তাদের স্বার্থ উদ্ধারের কাজ সহজ হয়ে যাবে। প্রতিনিধিত্বহীন মুসলিম লীগের মাধ্যমে যে সব কাজ করতে তারা সক্ষম হয়নি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সহজেই সে সব কাজ করিয়ে নিতে সক্ষম হবেন।[১৩] নেতারাও নির্বাচনকালে জনগণকে দেয়া তাঁদের প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হন। ফলে এই সময়টিতে স্বায়ত্তশাসন এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রক্রিয়া মারাত্মক ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারে ক্ষমতা হারাবার পর থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্থবির হয়ে পড়ে।[১৪]

১৯৫৫ সালের ২১ জুন পূর্ব বঙ্গের ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যদের ভোটে দ্বিতীয় গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বিস্মিত করে যে নির্বাচনী ফল প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় কে, এস, পির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট থেকে ষোলজন; আওয়ামী লীগ থেকে বারজন; কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে একজন; মুসলিম লীগ থেকে একজন; জাতীয় কংগ্রেস থেকে চারজন; ইউ, পি, পি থেকে দুইজন; তফশিলী ফেডারেশন থেকে তিনজন এবং স্বতন্ত্র থেকে একজন নির্বাচিত হন।[১৫]

১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রাক্কালে সম্পাদিত হয় পূর্ববঙ্গের স্বার্থ বিরোধী মারী চুক্তি। মারীতে গোপনে সম্পাদিত এই চুক্তির মাধ্যমে বাঙালীর স্বার্থ এবং পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উপর চরম আঘাত আসে। আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান গণপরিষদে খসড়া শাসনতান্ত্রিক বিল সম্পর্কিত বিকর্তের সময় বাঙালীর স্বার্থ বিরোধী চুক্তির নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রকাশ করেন।[১৬]

(১) পূর্ব বঙ্গীয় সদস্যরা সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে নেবে।
(২) পূর্ব বঙ্গীয় সদস্যরা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে ভেঙ্গে এক ইউনিট করার প্রচেষ্টা সমর্থন করবে।
(৩) পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যরা যুক্ত নির্বাচন সমর্থন করবে।
(৪) পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যরা 'স্বায়ত্তশাসন' সমর্থন করবে।
(৫) একইসঙ্গে উর্দূ এবং বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার বিষয়টি পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যরা মেনে নেবে।

একই ইউনিট প্রথা, সংখ্যাসাম্যনীতি, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করা ইত্যাদি প্রশ্নগুলো মীমাংসিত বিষয় হলেও স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মূল প্রশ্নটি থেকে যায় অমীমাংসিত।[১৭] যখন শুধু পূর্ব বাংলায় নয় পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলো প্রদেশের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন চলছিল তখন কোন কোন নেতার গণবিরোধী ভূমিকায় জনগণ ক্ষুব্ধ হয়। মওদুদ আহমদের মতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের লৌহ দৃঢ় আন্দোলন যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং একক পাকিস্তান কাঠামোর অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সমঝোতামূলক ও কার্যকর শাসনতান্ত্রিক অংশীদারীত্ব সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া সুদূরপরাহত হয়ে পড়ে। এভাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক এলিটদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ২১ দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে উজ্জীবিত স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন নিক্ষিপ্ত হয় হতাশার আবর্তে।[১৮]

এ সময়ে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের ফল আশানুরূপ হয় নাই। তবে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বাঙালী রাজনৈতিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, দ্বিতীয় গণপরিষদে বাংলার স্বার্থবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন। পরিষদের বাইরে বাঙালীর স্বার্থ বিরোধী ১৯৫৬ সালে গৃহীত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং তাঁর অনুগামী কিছু দক্ষিণপন্থী নেতার মত যাই হোক না কেন সামগ্রিকভাবে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই স্বায়ত্তশাসনের দাবী আদায়ের সংগ্রামে অবিচল ছিল।[১৯]

১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে যে শাসনতন্ত্র রচনা করা হয় তাতে এক ইউনিট ও সংখ্যা সাম্য নীতি গৃহীত এবং পূর্ব বাংলাকে সরকারীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত করা হয়।[২০] সংখ্যা সাম্য নীতি গ্রহণের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। যেখানে পূর্ব বাংলার শতকরা জনসংখ্যা ৫৬% এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪৪% সেখানে দুই অংশের আসন সংখ্যা ৫০% করে ভাগাভাগির ফলে নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পূর্ববঙ্গের জনগণই। অপরদিকে ৫০% ভাগ আসন লাভের ফলে লাভবান হয় পশ্চিমাংশের জনগণ। শুধু তাই নয় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পূর্ব বাংলার বাংলা নাম বাতিল করে বাঙালীর পরিচয় মুছে ফেলার পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা সাম্যনীতির ভিত্তিতে নির্বাচিত ৮০ সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদে আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালী জাতীয়তার প্রশ্ন তুলে বলেন: "...মাননীয় স্পীকার, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে, ওরা "পূর্ব বাংলা" নামটি বদলিয়ে "পূর্ব পাকিস্তান" করতে চাচ্ছে। অথচ আমরা বার বার এই দাবীই করেছি যে, এখন তার নাম শুধু "বেঙ্গল" (বাংলা) করা হোক। "বেঙ্গল" (বাংলা) শব্দের একটা ইতিহাস রয়েছে—এর নিজস্ব ঐতিহ্য বিদ্যমান। আপনারা নাম বদলাতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে জনসাধারণের মতামত নিতেই হবে। যদি আপনারা এই নাম বদলাতে চান, তা'হলে আমাদের বাংলায় ফিরে যেয়ে জনগণকে জিজ্ঞেস করতে হবে তাঁরা এ ধরনের পরিবর্তন মেনে নেবে কিনা।"[২১]

'৫৬ সংবিধানে পূর্ব বঙ্গের নাম পূর্ব পাকিস্তান করার বিরুদ্ধে শেখ মুজিবই প্রথম প্রতিবাদ করেন এবং বাংলা নামের সঙ্গে বাঙালী জাতীয়তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর মতে একটি দেশের নাম বদল করে দেয়া গণপরিষদের এখতিয়ারভুক্ত নয়। উক্ত অধিবেশনে তিনি বাঙালী জাতীয়তার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন গণতন্ত্র এসব প্রসঙ্গ নিয়েও বক্তব্য রাখেন।[২২]

ইতিমধ্যে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আওয়ামী মুসলিম লীগ 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে শুধু আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে। এই পরিবর্তনের ফলে আওয়ামী লীগ একটি অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত হয়। অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগঠনটিকে যে অসাম্প্রদায়িক রূপ দেয়ার প্রয়োজন ছিল আওয়ামী লীগ তা অর্জন করে। এরপর থেকে আওয়ামী লীগের উত্তরণ শুরু হয় অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদের পথ ধরে। ফলে '৫৬ সালের সংবিধান আওয়ামী লীগের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা উক্ত সংবিধানে পাকিস্তানকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং সংবিধানকে অভিহিত করা হয় ইসলামী শাসনতন্ত্র বলে।[২৩]

স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে ১৯৫৬ সলের সংবিধানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃতি ছিল ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের প্রায় অনুরূপ। মূল বিষয়গুলো ক্ষেত্র বিশেষে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে ফেডারেল সরকারে হাতে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল। অর্থ সংকুলান ও রাজস্বের উৎসের ক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের আইনের বন্টন প্রথা পুরোপুরি বহাল রাখা হয়। অর্থাৎ ফেডারেল সরকারের হাতে বেশীর ভাগ ক্ষমতা কেন্দ্রীয়ভূত করে প্রাদেশিক সরকারকে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল রেখে প্রদেশকে একরকম ভিক্ষুকে পরিণত করা হয়। প্রদেশগুলোর হাতে ছেড়ে দেয়া হয় কিছু ছোট খাতের আয়ের উৎস। অপরদিকে ২১ দফা কর্মসূচীতে লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা পররাষ্ট্র দফতর এবং মুদ্রা ব্যবস্থা এই তিন বিষয় কেন্দ্রের হাতে সংরক্ষিত রাখার দাবী জানানো হয়েছিল। বাস্তবে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সংসদীয় পদ্ধতির আবরণে একটি ফেডারেল রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয় যাতে রাষ্ট্রের পুরো আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। যা সারা পাকিস্তানব্যাপী উত্থাপিত স্বায়ত্তশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণের জন্য গণদাবীর বিরোধী।[২৪]

এরপর থেকে বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিরোধী এবং গণবিরোধী '৫৬ সালের সংবিধানের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বাঙালী জাতীয়তাবাদ এই জনপদ থেকে ধুঁয়ে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রবল প্রতিরোধের পথ ধরেই ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন। বাঙালী জাতীয়তাবাদের চেতনা ছিল স্বায়ত্তশাসনের পেছনের মূল চালিকাশক্তি।

আওয়ামী লীগের অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ বাঙালী জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাঙালীর পৃথক জাতিসত্ত্বা রক্ষার আকাংখা থেকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সূচনা। আবার এই আন্দোলনের ভেতর দিয়েই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বাঙালী জাতীয়তাবাদী আদর্শের মূল উপাদানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার অসাম্প্রদায়িক চেতনা। যেটি আওয়ামী লীগ ধর্মীয় গোড়ামীর রাজনীতির যুগে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সাহস বাঙালী জাতিকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমৃদ্ধ করে পাকিস্তানী ধর্মীয় রাজনীতি থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে বাঙালী জাতীয়তাবাদের আদর্শ দ্রুত বিকাশ লাভ করতে থাকে। ১৯৫৫ সালের পর থেকেই শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ব্যাপক গণভিত্তিক সংগঠনে পরিণত হয় এবং ধাপে ধাপে স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কখনো কৌশলে কখনো রাজপথের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়।[২৫]

এই সংগ্রামী পথ অতিক্রম করতে আওয়ামী লীগকে অনেক মাসুল দিতে হয়েছে মুখোমুখি হতে হয়েছে অনেক অপ্রীতিকর প্রতিকূল পরিস্থিতির। '৫৭ সালের জানুয়ারী মাস থেকেই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পররাষ্ট্রনীতি, ২১ দফা বাস্তবায়ন প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মধ্যে ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে দেখা দেয়।[২৬] ফেব্রুয়ারীতে ঘটে যার বিস্ফোরণ। ৭ ও ৮ জানুয়ারী মওলানা ভাসানী কাগমারীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন

Dhaka University Institutional Repository

আহ্বান করেন।[২৭] কাউন্সিল অধিবেশনের প্রথম দিনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, পার্টি কর্তৃক প্রস্তাবিত যে কোন সামরিক মৈত্রী বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত।[২৮] সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ চালানোর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে ভাসানী যে বক্তব্য রাখেন তা এই অঞ্চলের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যেমন গভীর প্রভাব ফেলেছিল তেমন বাঙালীর ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনার ইঙ্গিতও ছিল। ফলে বক্তব্যটি একাধারে পূর্ববঙ্গবাসীকে যেমন আলোড়িত করে তেমন তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে। ভাসানী তার ঐতিহাসিক ভাষণে পূর্ব বাংলার স্বার্থের প্রতি আপোষহীন মনোভাব প্রদর্শন করেন। পূর্ব বাংলা শোষণের পরিনাম উল্লেখপূর্বক পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীকে হুশিয়ার করে বলেন: "তোমরা যদি পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ অব্যাহত রাখতে চাও, যদি তোমরা পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী মেনে না নাও, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতাশীন গোষ্ঠীর কাছে আমার একটা বক্তব্যই আছে তাহলো আসসালামু আলাইকুম—তোমরা তোমাদের পথে যাও, আমাদের পথ আমরা বেছে নেব।"[২৯]

কাগমারী সম্মেলনেই আওয়াম লীগের মধ্যে অবস্থানরত বামপন্থীরা সোহরাওয়ার্দী পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মওলানা যখন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির কথা বলছেন, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করছেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী তখন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছেন এবং শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হয়েছে বলে বক্তব্য রাখছেন। এমনকি কেন্দ্র কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক নীতিমালা স্বাক্ষরিত সামরিক চুক্তির পক্ষে ও দৃঢ় অবস্থান নিতে তিনি দ্বিধা করেননি।[৩০] এই দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে আওয়ামী লীগে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। ঐ বছর ১৭ মার্চ ভাসানী আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন এবং জুলাই মাসে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে নূতন দল গঠন করেন। ভাঙ্গনের পেছনে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার হাত ছিল বলে সন্দেহ করা হলেও নবগঠিত দলটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এক ইউনিট বাতিল স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে অটল থাকে।[৩১] ভাসানীর আওয়ামী লীগ ত্যাগ নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। জাতীয়তাবাদী শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব ভাঙ্গন একদিকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের আন্দোলন পিছিয়ে যায়। অন্যদিকে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনও দুই শিবিরে দুটো ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। ফলে সার্বিকভাবে বাঙালীর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। তবুও এরি মধ্যে আওয়ামী লীগ তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে আন্দোলনকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে সচেষ্ট থাকে। ক্রমান্বয়ে আওয়ামী লীগ যেমন বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিতে থাকে তেমন শেখ মুজিবুর রহমান সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ক্রমশ এই আন্দোলনের নেতা হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্বীয় স্থান দখল করে নিতে থাকেন।

ভাসানী মুজিব দুই শিবিরে অবস্থানের ফলে পূর্ব বাংলার স্বার্থ আদায়ের সংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়লেও একেবারে থেমে যায়নি। কিন্তু এই সংগ্রাম সাময়িকভাবে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় যখন পাকিস্তানের উদীয়মান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সূচনা লগ্নেই ধ্বংস করা হয়। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করে সামরিক আইন জারী করেন। পথ করে দেন পাকিস্তানের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়ক আইয়ুব খানকে প্রকাশ্যে আসার। কেননা ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান ইস্কান্দার মীর্জাকে সরিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। তার এই ক্ষমতা দখলকে তিনি রক্তপাতহীন বিপ্লব বলে উল্লেখ করেন।[৩২] এর আগে সামরিক আইন জারীর সঙ্গে সঙ্গে শাসনতন্ত্র মন্ত্রীসভা বাতিল ঘোষিত হয় এবং সকল রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়।[৩৩] পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানের (১৯৫৬) প্রথম সামরিক আইন ঘোষণার মুহূর্তে মৃত্যু ঘটে। পূর্ব বাংলার অদম্য জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থানকে পর্যুদস্ত করার জন্য বেআইনী কাজকর্ম প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল। তবে প্রথম গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার পর থেকে বেআইনী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে তাকে। যা শেষে সামরিক আইনে পর্যন্ত গড়ায়। সামরিক আইনের মাধ্যমে আইয়ুন খানের পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ক্ষমতা দখল এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তার অগণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়া পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে চরম বৈষম্য নীতি অবলম্বন, বাঙালী বিদ্বেষ ইত্যাদির ফলে পাকিস্তানের রাজনীতি ভিন্ন খাতে বইতে থাকে। পূর্ব বাংলার প্রতি তার চরম শোষণ এবং দমননীতি বাঙালীকে বেপরোয়া হতে বাধ্য করে। আইয়ুব আমলে বাঙালীর প্রতি নির্যাতন নিপীড়ন যতো বৃদ্ধি পেতে থাকে তত দ্রুত বাঙালী জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ ঘটতে থাকে। তার নেয়া বাঙালী বিরোধী, পূর্ব বঙ্গের স্বার্থ বিরোধী এক একটি পদক্ষেপ বাঙালীকে তার লক্ষ্যের প্রতি এক এক ধাপ এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে বাঙালী জাতি এবং একটি ভাষাভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে আইয়ুব শাসনকাল বাঙালীর ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ কাল। ঐ সময়ই পূর্ব বাংলার জনগণ পরিপূর্ণভাবে নিজেদের বাঙালী ভাবতে শেখে। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত বঙ্গদেশ নিজের যথার্থ ঠিকানা বলে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকে; এই ভাবনা চিন্তা আর ঘোষণার মধ্য দিয়ে ঘটে বাঙালী জাতীয়তাবাদের চরম বিকাশ। যাত্রা শুরু হয় স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতার পথে।

Dhaka University Institutional Repository

আইয়ুব খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। দুই দিনের মধ্যে মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমানসহ ছয়শত নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। নাগরিক মৌলিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়। দুর্নীতি দমন বিভাগের ইন্সপেক্টর পদের যে কোন অফিসার ওয়ারেন্ট ছাড়াই যে কাউকে গ্রেফতারের অধিকার লাভ করেন। তাছাড়া পুলিশের প্রতি নির্দেশ ছিল যত বেশীসংখ্যক কমিউনিষ্ট গ্রেফতার হবে পাকিস্তানের জন্য ততই মঙ্গল।[৩৪] এখানে উল্লেখ্য যে পাকিস্তানী স্বার্থবাদী মহল কমিউনিষ্ট বলতে শুধু পার্টির সদস্যদের বুঝতো না, বরং যারাই বাংলা ভাষা সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্যের এবং পূর্ব বাংলা ও বাঙালীর স্বার্থের পক্ষে ছিল তাদেরকেও বুঝতো। সুতরাং এই নির্দেশ থেকে অনুমান করা যায় যে এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ধ্বংস করা। আইয়ুব খানের সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য থেকেও তা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন যে পরিস্থিতির উন্নতি হলেই মার্শাল ল উঠিয়ে নেয়া হবে। তার ভাষায় আওয়ামী লীগ যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা ঝেটিয়ে সাফ করতে কতোটা সময় লাগে তা বলা যায় না।[৩৫] অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হওয়ার সকল দোষ তিনি জাতীয়বাদী শক্তি আওয়ামী লীগের ওপর চাপিয়ে দেন।

এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফফর খানসহ দুশ নেতা কর্মী গ্রেফতার হন। মার্শাল ল জারী করার পর পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী গণতন্ত্রপন্থী তিন হাজার সরকারী কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়। এদের মধ্যে দুই হাজারই ছিল বাঙালী অফিসার ও কর্মচারী।[৩৬] ১৯৫৪ সাল থেকেই আইয়ুন খান ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পাকিস্তান থেকে গণতন্ত্রের নাম নিশানা মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রেও তখন থেকে লিপ্ত ছিলেন। অতীতের ষড়যন্ত্রের নীল নকশা অনুযায়ী তিনি ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে থাকেন। পূর্ণ ক্ষমতা দখলের আগে জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালান। দোকানদার ব্যবসায়ীদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সফল হন তারপর জনগণকে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশ্বাস প্রদান করে তার স্বীয় কার্যসিদ্ধির পথে অগ্রসর হন। তার উচ্চাকাংখা চরিতার্থের প্রথম শিকার হন রাজনীতিবিদরা। ১৯৫৯ সালের ৭ আগষ্ট পোডো (Public office Disqualification order) জারী করা হয়।[৩৭] এতে বলা হয় কোন মন্ত্রী বা নেতা যদি মার্শাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতারও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য বিশেষ ট্রাইবুন্যালের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। তবে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও অর্ডিনেন্সের আওতা থেকে রেহাই পাননি।[৩৮]

দেশে কোন সংবিধান না থাকায় একই দিনে আরো একটি অর্ডিনেন্স প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার নং ১৩ হিসেবে জারী করা হয়। এই অর্ডিনেন্স এবডো (Elective Bodies Disqualification Order) নামে পরিচিত। যার আওতায় রয়েছে তদন্তের পর বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে কথিত দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগ উত্থাপন করে চিঠি দেয়া। যাঁরা অভিযোগ স্বীকার করবেন, তাদের পরবর্তী পাঁচ বছর কোন ধরনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না। এই সব অর্ডিনেন্সের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনপ্রিয় গণসমর্থিত রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা থেকে দূরে রেখে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়া। জনগণকে বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জনগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার এবং প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার পথ পরিষ্কার করা। এই পরিকল্পনা সুনিপুণভাবে মার্শাল ল জারীর আগেই তৈরী করা হয়েছিল। প্রমাণস্বরূপ ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক সরকারী ফরমানের উল্লেখ করা যায় এতে বলা হয়: 'The following persons of East Pakistan have been vetted for action under the EBDO, out of 19 persons submitted in the list except those who stand disqualified.'[৩৯]

এতে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয় তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের পক্ষের।

এদিকে ক্ষমতায় আসার পর জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল যে সব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তাতে জনগণের ধারণা জন্মে ছিল যে প্রকৃত পক্ষে তিনি জনদরদী এবং তার দ্বারা দুর্নীতি এবং তাদের বহুবিধ সমস্যা দূর হবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে তার উল্টোটা। একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি চলতে থাকে অপ্রতিহত গতিতে। মৌলিক অধিকার স্থগিত এবং রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে থাকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। তখন ক্ষমতার রাজনীতিতে বাঙালী কোন ভূমিকা না থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ ব্যবসায়ী শ্রেণী কর্তৃক পূর্ব বাংলার উপর শোষণের প্রক্রিয়া এক চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয়। তাছাড়া আইয়ুব খানের 'প্রবৃদ্ধি মুখী অর্থনীতি' ধনীকে আরো ধনী এবং দরিদ্রকে আরো দরিদ্র করে তোলে। যার ফলে বঞ্চিত পূর্ব বাংলা আরো বঞ্চিত হতে থাকে এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার বিদ্যমান বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। আইয়ুবী শাসনকালের 'কালো

Dhaka University Institutional Repository

দশকের' মধ্যে দেশে বিখ্যাত '২২ পরিবারের' এর উন্মেষ ঘটে। এদের নিয়ন্ত্রণে ছিল দেশের ৮০% ভাগ ব্যাংক ব্যবসা, ৯০% ভাগ বীমা ব্যবসা এবং ৬০% ভাগ শিল্প সম্পদ। এই ২২ পরিবারের সবাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী।[৪০]

সমগ্র পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় তখন এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজমান। সকল রাজনৈতিক নেতারা কারারুদ্ধ অথবা 'এবডো'র আওতায় অথবা পলাতক। সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ। ঠিক সে সময় আইয়ুব খানের 'রক্তপাতহীন' বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকীতে তিনি জনগণের কাছে উপস্থিত হন তাঁর 'মৌলিক গণতন্ত্রের' বার্তা নিয়ে। তার মতে স্বল্প শিক্ষিত পাকিস্তানীরা পাশ্চাত্যের সংসদীয় গণতন্ত্রের অনুপযোগী। যে কারণে তিনি তার পরিকল্পিত মৌলিক গণতন্ত্রের ফরমুলা উপস্থিত করেছেন যা সর্বসাধারণের জন্য উপযোগী এবং তাদের অংশগ্রহণ সহজতর করবে।[৪১] এদেশ থেকে দুর্নীতি দূর করার দায়িত্ব নিয়ে যিনি জনগণের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন এ ব্যবস্থার মাধ্যমি তিনি ক্ষমতার রাজনীতিতে চরম দুর্নীতির পথ খুলে দেন। তার এই মৌলিক গণতন্ত্রের ফরমুলা প্রথমেই প্রশ্নের মুখোমুখি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাজের। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাঞ্জাবী মঞ্জুর কাদের মৌলিক গণতন্ত্রের পক্ষে প্রচারের জন্য পূর্ব বাংলা সফরের এক পর্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র সমাজ তাকে আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রশ্ন বাণে জর্জরিত করে তোলে। মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ছাত্ররা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের প্রচন্ড বিক্ষোভের মুখে মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন ত্যাগ করতে বাধ্য হন।৪২ এর আগে ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী হাঁ ও না ভোট গ্রহণের মাধ্যমে আইয়ুব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর ক্ষমতা আইনসিদ্ধ করে নেন।[৪৩] কোন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন এই নির্বাচনী প্রহসন তাকে পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নেরও ক্ষমতা প্রদান করে।[৪৪] এদিকে সামরিক শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ন্যাপ আওয়ামী লীগকে তাদের পূর্ব সংঘাত বৈরীতা পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করে। আইয়ুব খানের ব্যক্তি স্বাধীনতাহীন শাসনকালকে মোকাবেলা করার জন্য জাতীয়তাবাদী শক্তি আবার তাদের অবস্থান সংহত করতে তৎপর হয়ে ওঠে।

বেআইনী ঘোষিত কমিউনিষ্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগ '৬১ সালের শেষের দিকে আন্দোলনের পথ নির্ধারণের জন্য কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে ছাত্ররা প্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটাবে। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই আন্দোলন সারাদেশে বিস্তৃত করবে। আন্দোলনের রূপরেখা এবং কর্মসূচীও প্রণীত হয় কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক[৪৫] এতে সন্নিবেশিত হয় : পাকিস্তানের কেন্দ্র ও প্রদেশে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠন; পূর্ব বঙ্গের জন্য স্বায়ত্তশাসন;পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রথা বাতিল করে সেখানকার জাতিসমূহের জন্য স্বায়ত্তশাসন; রাজবন্দীদের মুক্তি; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা; শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি; কৃষকের খাজনা ট্যাক্স হ্রাস এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অবলম্বন শীর্ষক নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন।[৪৬]

এই বৈঠকে শেখ মুজিব স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব পেশ করেন। কমিউনিষ্ট পার্টি এবং সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে শেষ পর্যন্ত মুজিব উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। পূর্ব বাংলায় সামরিক শাসন বিরোধী তৎপরতা প্রকৃত পক্ষে শুরু হয় ১৯৬১ সলে। তবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা এবং গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টার সূত্রপাত ১৯৬২ সালে থেকে। ঐ বছর ২৪ জানুয়ারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দলমত নির্বিশেষে একটি আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থির সিদ্ধান্তে আসেন। আন্দোলন শুরুর পদক্ষেপ সম্পর্কে বলা হয় যে, সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের রাজধানী করাচী থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং গণতন্ত্রের দাবীতে বিবৃতি দিয়ে এর সূত্রপাত ঘটাবেন।[৪৭] বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা সরকারের কাছে গোপন থাকেনি। ফলে ৩০ জানুয়ারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হতে না হতে বিদেশী অর্থানুকূল্যে দেশ ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এই অভিযোগে সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়।[৪৮]

এই ঘটনায় পূর্ব বাংলার ছাত্র জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আইয়ুবী আমলে এটাই ছিল পূর্ব বাংলায় প্রথম প্রকাশ্যে বিক্ষোভ এবং আইয়ুব আমলে ছাত্র আন্দোলনের প্রথম পর্যায়।[৪৯] আইয়ুন খান ছাত্র জনতার মারমুখী আন্দোলন দমন করার জন্য জননিরাপত্তা অর্ডিনেন্স বলে অধিকাংশ নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।[৫০]

এই বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক অবস্থায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তার পূর্ব পরিকল্পিত শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন।[৫১] তার প্রণীত শাসনতন্ত্র ছিল গণবিরোধী। এর মাধ্যমে বাঙালীর এতোকালের স্বায়ত্তশাসন আকাংখা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়। এমনকি প্রত্যক্ষ ভোটের অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নেয়া হয়। নবপ্রণীত শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য গুলো ছিল; সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। দেশের সর্বময় কর্তা প্রেসিডেন্ট। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রে এবং প্রদেশে এক

Dhaka University Institutional Repository

কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ থাকবে; তাদের ক্ষমতা হবে অত্যন্ত সীমিত। অপরদিকে আইন পরিষদের উপর প্রেসিডেন্টের সীমাহীন ক্ষমতা দেয়া হলো। এই শাসনতন্ত্রে জনগণের প্রতি পূর্ণ অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয়। এতে জনগণকে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। পরিবর্তে পরোক্ষ নির্বাচনের প্রথা চালু করা হয়। ৮০,০০০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। এই মৌলিক গণতন্ত্রীরা ছিল আইয়ুব খানের দুর্নীতির সহায়ক শক্তি। এদের হাতে রেখেই তিনি দশ বছর নির্বাচনের নামে প্রহসন করে দেশে স্বৈরশাসন চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই শাসনতন্ত্রে বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। তাছাড়া সেনাবাহিনীর উপর সর্বময় কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য রাজধানী করাচী থেকে সরিয়ে প্রধান সামরিক ঘাটি রাওয়ালপিন্ডির কাছে ইসলামাবাদে করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৫২]

নবপ্রণীত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুরু হয় পূর্ব বাংলায় দ্বিতীয় পর্যায়ে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন।[৫৩] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছত্রারা ২৪ মার্চ তিন দফা দাবীর ভিত্তিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে। ছাত্র সমাজের তিন দফা দাবী ছিল: নতুন শাসনতন্ত্র বাতিল; দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব সহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি।[৫৪]

এই পরিস্থিতির মধ্যে আইয়ুব খান ২৮ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদের নির্বাচন এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।[৫৫] এই নির্বাচন প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী শক্তি বর্জন করলেও যারা প্রতিক্রিয়াশীল এবং গণবিরোধী তারা অংশগ্রহণ করে। এই গণবিরোধী চক্র পাকিস্তানের শেষ দিন পর্যন্ত গণবিচ্ছিন্ন ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। নির্বাচন উত্তরকালে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জারীকৃত অডিনেন্সের মাধ্যমে সামরিক শাসন রহিত হলেও রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধই থেকে যায়। ভয় ছিল রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরু হলে হয়তো প্রবল গণআন্দোলনের চাপে আইয়ুব খানকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হতে পারে। যে কারণে ৬২ সালের মে মাসের ১০ তারিখে "The Political Organisation (Prohibition of unregulated Activitis) ordinance of 1962" নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়। এতে বলা হয় আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের আগ পর্যন্ত দেশে সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ থাকবে।[৫৬]

এতো নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে সচেষ্ট থাকেন। সব বাধা নিষেধ উপেক্ষা করে পূর্ব বাংলার নয়জন বিশিষ্ট নেতা ২৫ জুন সংবাদপত্রে এক জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। যা নয় নেতার বিবৃতি হিসেবে সারাদেশে হতাশাগ্রস্ত জনগণের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। কেননা এই বিবৃতির মধ্যে জনগণের আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটেছিল। এতে বলা হয়;[৫৭] 'সত্যিকার গণপ্রতিনিধি ছাড়া কোন ব্যক্তি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার অধিকারী নয়। জনগণই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। তাদের ইচ্ছানুযায়ী সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে।'

তাঁরা তাঁদের বিবৃতিতে আরো বলেন শাসনতন্ত্রে জাতির ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধির প্রতিফলন অবশ্যই থাকতে হবে। এবং চাপানো শাসনতন্ত্র জনগণের সমর্থন লাভ করতে পারে না। আন্তঃসার শূন্য, জনমত উপেক্ষিত জনগণের প্রতি আস্থাহীন আট কোটির পরিবর্তে মাত্র আশি হাজারের ভোটাধিকার সম্বলিত শাসনতন্ত্র আমূল পরিবর্তন ছাড়া বাস্তবায়নের অনুপযোগী। তাছাড়া প্রেসিডেন্টসিয়াল পদ্ধতির চেয়ে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী পার্লামেন্টারী পদ্ধতির পক্ষপাতি এবং অভ্যস্ত। তারা পূর্ব পশ্চিমের চরম বৈষম্যের কারণ নির্দেশ করে বলেন জনগণের সঠিক প্রতিনিধিত্বের অভাব এবং পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সত্যিকার অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত বলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ সরকারের উপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাতিল করে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার পথে সকল অন্তরায় দূর করার আহ্বান জানান। পরিশেষে তারা যতশীঘ্র সম্ভব একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে সকল বিতর্ক বন্ধ করে দেশকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান।[৫৮]

নয় নেতার বিবৃতি সরকার ও প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেও জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনার জন্ম দেয়। এই বক্তব্যের পক্ষে নেতৃবৃন্দ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে জনসভার মাধ্যমে দেশবাসীকে আন্দোলনে আহ্বান করেন। সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন, সভায় তাদের ব্যাপক উপস্থিতি গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদী শক্তির মধ্যে প্রবল আশার সঞ্চার করে। নব পর্যায়ে আন্দোলনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিলে সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ৩০ জুন পরিষদে রাজনৈতিক দল গঠন এবং রাজনীতিকদের সম্পর্কে 'Political Partis Bill (1962)' নমে একটি বিল উত্থাপিত হয়। যাতে বলা হয় দেশে ইসলামের আদর্শ ও পাকিস্তানের স্বার্থ ও সংহতি

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী কোন রাজনৈতিক দল থাকবে না, তাছাড়া 'এবডো' ও 'পোডো' আইনে অযোগ্য ঘোষিত রাজনীতিবিদরা কোন দল গঠন করতে পারবেন না।[৫৯]

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত বিলের পরোয়া না করে জুলাই মাসের ৮ তারিখে এক জনসভার আয়োজন করেন। নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত বিলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং নবপ্রণীত শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করে তা পুড়িয়ে ফেলার আহ্বান জানান।[৬০] আগষ্ট মাসের প্রবল আন্দোলনের মুখে কারারুদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী মুক্তিলাভ করেন। তিনি ঢাকা বিমান বন্দরে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন 'আমিও নয় নেতার সামিল আমার নম্বর দশ।'[৬১] নয় নেতার দেয়া বিবৃতির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপর থেকে তিনি পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে সফর করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা প্রচার করতে থাকেন। তাঁর উপস্থিতি তার আহ্বান সর্বস্তরের গণমনে বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়।[৬২]

ভাষা আন্দোলনে যে ছাত্র সমাজের মধ্যে বাঙালী জাতীয়তাবাদের চিন্তাভাবনার স্ফুরণ ঘটেছিল সেই প্রজন্ম বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভাবধারা সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিল নিষ্ঠার সঙ্গে। এদের মধ্যকার প্রগতিশীল নেতৃত্ব যেমন সকল আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে রাজনীতি এবং জাতি চিন্তাকে ধর্মের নিগড় থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসে, তেমন এই প্রজন্মের হাতেই আবার ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। মূল কথা বাঙালী জাতীয়তাবাদের চেতনার প্রকাশ ঘটে এদের মধ্যে এবং এরাই মূল নেতৃত্ব দেয়। এরাই আবার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামনে চলে আসে। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে হয়ে ওঠে অনমনীয় এবং দৃঢ়। এমনকি পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রবীণ প্রগতিশীলরা পর্যন্ত এদের মুক্ত চিন্তা উদারতা আধুনিকতা এবং ভিন্ন পথে দ্রুত চলার সঙ্গে তাল রাখাতে না পেড়ে পিছে পড়ে জান। অনেকে তাদের নেতৃত্বের হাতে নিজেদের সঁপে দিতে বাধ্য হন। পাকিস্তানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছাত্র সমাজ উল্কার বেগে একস্থান থেকে আরেক স্থানে ছুটে গিয়ে আন্দোলনের গতিধারাকে দ্রুত একটি বিশেষ লক্ষ্যে ধাবিত করেছে। তার সঙ্গে টেনে নিয়ে গেছে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকেও। ফলে প্রবীণ নেতারা পর্যন্ত সেই স্রোতে গা ভাসাতে বাধ্য হয়েছেন। যারা পারেননি তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গণবিচ্ছিন্ন নেতায় পরিণত হয়েছেন। ধাবমান এই নবীন নেতৃত্বের প্রথম লক্ষ্য ছিল স্বায়ত্তশাসন। পরবর্তীতে বাঙালী জাতিসত্ত্বাভিত্তিক রাষ্ট্র। এদের সংগ্রামী পথে মূল আদর্শ ছিল বাঙালী চেতনা; বাঙালী জাতীয়তাবাদ। বাঙালী জাতীয় চেতনা বিকাশ পরিণতির প্রতিটি স্তরে এই নবীনদের ভূমিকা ছিল সক্রিয় এবং নিবেদিত প্রাণ।

সকল আন্দোলনের পথিকৃৎ সচেতন ছাত্র সমাজ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনেও ছিল অগ্রগামী। সামরিক আইন জারীর পর থেকে জনগণের স্বাধিকার আকাংখা এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা আঘাত প্রাপ্ত হয়। এই আঘাত কাটিয়ে উঠে নেতৃবৃন্দও ছাত্র সমাজ প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণও তাদের কর্তব্য স্থির করতে ভুল করেননি। বিস্ফোরণ উন্মুখ জনতার ক্ষোভ '৬২ সালে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আন্দোলন শিক্ষা সম্পর্কিত হলেও জনতা ছাত্রদের সঙ্গে একান্ত হয়ে তাদের ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটায়। আইয়ুবী শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার ছাত্র জনতার ক্ষোভের ভয়াবহ প্রকাশে প্রবল প্রভাবশালী সেনানায়কের ক্ষমতার দম্ভ কেঁপে ওঠে। শিক্ষা সম্পর্কিত এই আন্দোলন পরিচালিত হয় ছাত্র সমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত শিক্ষানীতি ক্ষেত্রে শরিফ কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে। এই কমিশনের সুপারিশে পরোক্ষভাবে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজের সকল আন্দোলনের সুফলগুলো কেড়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বাংলা ভাষা ধ্বংসের একটি ষড়যন্ত্রের আভাসও এর মধ্যে ছিল। ছাত্র সমাজের কাছে এটি জাতিসত্ত্বার উপর আঘাতের সামিল। শিক্ষার্থীদের ধিক্কার প্রাপ্ত কমিশনের সুপারিশসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত করলে ছাত্রদের ক্ষোভের কারণ সহজে অনুমান করা সম্ভব হবে। সংক্ষিপ্ত সুপারিশ সমূহ নিম্নরূপ:[৬৩]

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ডিগ্রী স্তর পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা বাধ্যতামূলক; উর্দূকে জনগণের ভাষায় পরিণত করতে হবে এবং উর্দূ ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে; পাকিস্তানের জন্য অভিন্ন বর্ণমালার সুপারিশ করতে যেয়ে আরবী ভাষার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এছাড়া এতে আরো বলা হয় 'আমরা মনে করি যে, একদিকে উর্দূ ও বাংলা বর্ণমালাসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন করা উচিত এবং অপরদিকে রোমান বর্ণমালায় এমন একটি আকারের উদ্ভব ও মান নির্ধারণ করা উচিত যাহা পাকিস্তানী ভাষাসমূহকে অক্ষরান্তর করার উপযোগী হইবে।'

শিল্পে মূলধন বিনিয়োগকে যে নজরে দেখা হয় শিক্ষা বর্ধিত অর্থ ব্যয়কে সেই নজরে দেখাটা যুক্তিসংগত বলে উল্লেখ করা হয়। অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে অবাস্তব কল্পনা বলে উপেক্ষা করা হয়।[৬৪] শরিফ কমিশনের আরো

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিষয় যা সাধারণ ছাত্রদের মধ্যেও বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা হলো স্নাতক ডিগ্রী কোর্সকে সম্প্রসারণ করে তিন বৎসর করার সুপারিশ।[৬৫]

পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজের কাছে শরিফ কমিশনের রিপোর্ট সবদিক থেকে তাদের স্বার্থ বিরোধী অগণতান্ত্রিক হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। এমনিতে ছাত্র সমাজে ১৯৬২ সালের গণবিরোধী শাসনতন্ত্র, নেতাদের গ্রেফতার, ছাত্র নির্যাতন ইত্যাদির ফলে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছিল। যে কারণে ছাত্ররা যে কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। শরিফ কমিশনের গণবিরোধী সুপারিশ ছিল সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার এক বিরাট সুযোগ। ছাত্রদের সরকার বিরোধী মানসিকতার জন্য আন্দোলনে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছিল স্বাভাবিক। আগষ্ট মাসে ১৫ তারিখ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত নয় দশ বছর বয়সী স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন মিছিল মিটিং এ অংশ নিতে থাকে। সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলতে থাকে অবিরাম ধর্মঘট। আন্দোলন চরম পর্যায়ে উপনীত হয় ১৭ সেপ্টেম্বর হরতালের কর্মসূচী পালনকালে। ঐদিন বেলা ৯টার মধ্যে যেমন ছাত্র জনতার উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় তেমন চলে চরম পুলিশী নির্যাতন। শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল যেমন বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সীমাবদ্ধ থাকেনি তেমন তা ছাত্রদের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকেনি। ছড়িয়ে পড়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। পুলিশ চরম নির্যাতমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, গুলিতে নিহত হয় শ্রমজীবি বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ কিশোর যুবকবৃন্দ। এই নির্মম হত্যাকান্ডে জনতার রোষ অগ্নিশিখার মতো সারা শহরে বিস্তৃতি লাভ করে। ছাত্র জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘাত সংঘর্ষে প্রায় ২৫০ জন আহত হয়। ঐ দিনের বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা ৯৫ জন ছিল শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ। ছাত্র নেতাদের মতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুড়িগঙ্গার ওপর থেকে নৌকোর মাঝিরা পর্যন্ত বৈঠা হাতে মিছিল করেছে। এভাবে জনতার রোষ বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের মতো সমগ্র নগরীকে এক বিদ্রোহের নগরীতে পরিণত করে। ঐ সময় কৃষকরা লাঙ্গল কাঁধে ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। আইয়ুব খানের চার বছর শাসনকালের মধ্যে এমন ঘটনা সরকারের কাছে ছিল অচিন্তনীয়। স্বার্থবাদী মহল তীব্র গণঅসন্তোষের বর্হিপ্রকাশে এতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে দ্রুত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শরিফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত করার ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। '৬১ সালের শেষের দিকে ছাত্র সমাজ যে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিল, বাষট্টি সালের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা সারা জাতির চেতনায় এক নাড়া দিয়ে যেতে সক্ষম হয়। '৫২র ভাষা আন্দোলন এ দেশবাসীর মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম দেয়। ৬২-র ছাত্র আন্দোলনে তা অংকুরিত হয়ে জাতীয় চেতনার সঙ্গে প্রগতিশীলতার স্ফুরণ ঘটায়।[৬৬]

৬২-র ছাত্র আন্দোলন এ অঞ্চলের গণতান্ত্রিক এবং বাঙালীর জাতীয়তাবাদ বিকাশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিভাগ উত্তরকালে জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতিতে ছাত্র সমাজ নিজেদের যুক্ত করেছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বাষট্টি সনেও সামরিক আইন জারীর পর পূর্ব বাংলায় গণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যে স্তবিরতার সৃষ্টি হয়েছিল তা ভাঙ্গতেও এগিয়ে এসেছিল নির্ভীক ছাত্র সমাজ। তাদের এই সাহসী পদক্ষেপ গণআন্দোলনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ছাত্রদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদী ভূমিকা প্রমাণ করেছে যে, ঐক্য এবং নেতৃত্বের দৃঢ়তা থাকলে সামরিক শাসনের নিগড়ে থেকে আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। ৬২-র প্রথম পর্যায়ে আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক। মূল দাবীগুলো ছিল জাতীয় রাজনীতির আওতাভুক্ত। আন্দোলন শহরগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এটি একটি জাতীয় রাজনৈতিক রূপ নেয়। সাধারণ মানুষের সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হয়। আবার ৬২-র দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন ছিল শরিফ-কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে। বিষয়টি শিক্ষা সম্পর্কিত বলে সর্বস্তরের ছাত্রদের কাছে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার আহ্বান সাধারণ ছাত্রদের মধ্যেও সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়—যারা ছিল মেহনতী মানুষ, কৃষক শ্রেণী থেকে মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত সমাজের সকল স্তরের প্রতিনিধি। ফলে আন্দোলনের ব্যাপকতা শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এবং এটি রূপ নেয় ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক গণআন্দোলনে। সুতরাং বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দেশবাসী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এটিকে একটি গণআন্দোলনে পরিণত করেছে যে আন্দোলনের প্রভাব বৈশিষ্ট্য অম্লান ছিল আইয়ুব এর পতনকাল পর্যন্ত। এখানে মনে রাখা দরকার যে, আইয়ুবের পতনের পেছনে ছিল ছাত্র রাজনীতি এবং যাদের মূল আদর্শ ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদ, মূল দাবী ছিল স্বায়ত্তশাসন গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র।

বাষট্টি সালের ছাত্র জনতার আইয়ুব বিরোধী প্রথম বিদ্রোহের তীব্রতা কমে এলেও, আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার প্রভাব অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে। চীন ভারত যুদ্ধ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করে। এদেশের কমিউনিষ্টদের এক অংশ ভারত অপর অংশ চীনকে সমর্থন দিলে কমিউনিষ্ট শক্তির

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী শক্তিও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। যেহেতু পাকিস্তান চীনের সার্থক ছিল সেহেতু চীন সমর্থক কমিউনিষ্ট দলটি আইয়ুব সমর্থক হয়ে যায়।[৬৭] এই পরিবর্তন স্বায়ত্তশাসন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিরূপ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে আরো দুর্বল করার লক্ষে এবং আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ব্যর্থ করার জন্য 'পলিটিক্যাল পার্টিজ অ্যাক্ট' পাশ করা হয়। যার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়।[৬৮] সচেতন রাজনীতিবিদরা আইয়ুবের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পেরে দেশের দুই অংশে দুই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পশ্চিমাংশের জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয় বলে সেখানে 'রিভাইবাল' এবং পূর্ববঙ্গের জনগণ রাজনীতি সচেতন বলে 'ননরিভাইবাল' নীতি গ্রহণ করা হয়। এই নীতির ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে কাউন্সিল মুসলিম লীগ জামাত-ই-ইসলাম, নেজামে-ই-ইসলাম, পুনরুজ্জীবিত হয়। অপরদিকে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেকার ঐক্য ধরে রাখার জন্য 'ননরিভাইবাল' নীতির মাধ্যমে একটি প্লাট ফরমে থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী লাহোরে বিরোধী দলীয় মোর্চা গঠনের কথা ঘোষণা করেন। এন, ডি, এফ বা 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, গঠন করার ফলে এবং সোহরাওয়ার্দীর সমর্থনের অভাবে, শেখ মুজিবের প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগের পুনর্জ্জীবনের উদ্যোগ শুরুতেই ব্যাহত হয়। প্রকৃত গণতন্ত্র অর্জনের লড়াইয়ে যার যার পার্টির মেনিফেস্টোর প্রচার এবং পার্টির পুনর্জ্জীবন বাদ দিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনের কথা সোহরাওয়ার্দী সবাইকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে বাম থেকে ডানপন্থী সবাই এই মোর্চায় সমর্থন যুগিয়ে ছিলেন।[৬৯] কিন্তু এতে মওলানা ভাসানীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতির অভাব এবং '৬৩ সনে ঐক্য মোর্চার উদ্যোক্তা সোহরাওয়ার্দীর অসুস্থতাজনিত কারণে বিদেশ গমনে, কার্যক্রম বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। ৫ ডিসেম্বর গণতন্ত্রের অতন্দ্রপ্রহরী এবং সর্বজন গ্রাহ্য নেতা সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু স্বাধিকার আন্দোলনে ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। আরেক দফা বিপর্যস্ত হয় জাতীয়তাবাদী শক্তির অগ্রযাত্রা। এন, ডি, এফ নেতৃত্বের অভাবে দুর্বল হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ঐক্যে ফাটল ধরে।

সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুর পর থেকে পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আরেক অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনে শেখ মুজিবের ভূমিকা, পরবর্তীতে তাঁর নেতৃত্ব এই অধ্যায় রচনায় বিরাট ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে। তার নেতৃত্বে বিকাশমান বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনে শেখ মুজিব সংগঠনের ভিতরে এবং বাইরে প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েও তাঁর লক্ষ্য বাস্তবায়নে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগ এবং সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগের মধ্যে তফাৎ ছিল। যেমন ছিল উভয় নেতার নেতৃত্বের এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। ফলে সোহরাওয়ার্দীর পরে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব মূলতঃ পূর্ব বাংলার স্বার্থরক্ষার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে থাকে। নবপর্যায়ে আওয়ামী লীগ যেহেতু বাঙালীর স্বার্থ সামনে রেখে অগ্রসর হতে থাকে ফলে তার জনপ্রিয়তাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সংগঠনটির পক্ষে বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিকাশ ধারার নেতৃত্ব প্রদানও সহজতর হয়ে যায়।

সোহরাওয়ার্দী ছিলেন একজন জাতীয় নেতা এবং পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন অবধি আওয়ামী লীগের আন্দোলন প্রধানতঃ বাঙালীর স্বার্থমুখী হলেও তা ছিল একটি জাতি হিসেবে পাকিস্তানের উন্নতি করার লক্ষ্যে পরিচালিত। এ ক্ষেত্রে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি একটি শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির ভিত্তিতে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যেকার রাজনৈতিক সংযোগ ধরে রাখতে পারতেন।[৭০] তিনি ছিলেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র; উভয় অংশের জনগণের কাছে তিনি ছিলেন পরিচিত। তার মৃত্যুতে সেই যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়।[৭১] ফলে তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান ভিত্তিক আন্দোলনে ভাটা পড়ে। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জাতীয় পর্যায়ে নেতা হলেও তার ভূমিকা সব সময় পরিচ্ছন্ন ছিল না। ফলে পূর্ব বাংলার রাজনীতি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ক্রমশ পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বাঙালীর স্বার্থভিত্তিক আন্দোলনে পরিণত হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জাতীয়তাবাদের পক্ষে আন্দোলন দ্রুত বিকাশ এবং পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই বিষয়ে শেখ মুজিবের ভূমিকা তার চিন্তা-ভাবনা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে তিনি বাঙালী জাতিভিত্তিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপনে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি ১৯৬৩ সালে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে বিশ্বাসী সংগঠনের সদস্যদের বলেন যতদিন পর্যন্ত আমার নেতা সোহরাওয়ার্দী জীবিত রয়েছেন ততদিন পর্যন্ত আমি এককভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য দাবী উত্থাপন করতে পারব না। আমাদের অবশ্যই চিন্তা করতে হবে অখন্ড পাকিস্তানের ভিত্তিতে[৭২] এবং তিনি আরো বলেন 'আওয়ামী লীগ একটি শাসনতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। কাজেই শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই আমাদের দাবী আদায় করা হবে। আমি স্বায়ত্তশাসন এর পক্ষে থাকতে পারি, কিন্তু স্বাধীনতার পক্ষে নয়।'[৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

অথচ পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই তার চিন্তা ছিল স্বাধীন পূর্ব বাংলার পক্ষে। শেখ মুজিব পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেও প্রথম থেকেই তিনি মুসলিম লীগের এবং পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর স্বরূপ উদঘাটনে দূরদৃষ্টিতার পরিচয় দিয়ে ছিলেন। তারই প্রতিফলন ঘটেছিল ইসলামিয়া কলেজের সিরাজউদ্দৌলা হলে অনুষ্ঠিত একটি কক্ষের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন বৃটিশ সরকার কর্তৃক পাকিস্তান সৃষ্টি ঘোষণার পর পর এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উক্ত বৈঠকে তিনি পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ বিরোধী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র যুবক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৭৪] কেননা মুসলিম লীগ ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করলেও জনগণের প্রয়োজন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি। যেটি মুসলিম লীগের নেতৃত্বে বাঙালীর পক্ষে অর্জন করা সম্ভব ছিল না। বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে তিনি উক্ত সভায় বলেন:[৭৫]

"স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে যেতে হবে, কেননা আমার আশংকা হচ্ছে, এ স্বাধীনতা সত্যিকার স্বাধীনতা নয়। হয়তো বাংলার মাটিতে নতুন করে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। মুসলিম লগিের বুর্জোয়া মনোবৃত্তি ও পশ্চিমা প্রাধান্য থেকে আমার এই আশংকা হচ্ছে।"

পরবর্তীতে বাংলার মাটিতে পা রেখেই তিনি মুসলিম লীগের বাংলা ও বাঙালী স্বার্থবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। রাজনৈতিক কৌশলগত প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের কথা প্রকাশ্যে বললেও বাঙালী জাতিসত্ত্বা ভিত্তি স্বাধীন বাংলার চিন্তা থেকে তিনি বিচ্যুত হন নাই। ষাটের দশকের প্রথমার্ধে ইষ্ট বেঙ্গল লিবারেশন পার্টি নামে একটি সশস্ত্র দল গঠিত হয়। এই পার্টির দর্শন ছিল বাঙালী একটি আলাদা জাতি এবং লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করা। এ দলের কর্মীরা অস্ত্র অর্থ সাহায্যের আশায় গোপনে ভারত সফর করে। সেখান থেকে পোষ্টার প্রচারপত্র ছাপিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন বার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে থাকে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙলী জাতিসত্ত্বা ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে বিশ্বাসী এই সংগঠনটি সম্পর্কে জননেতা ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতবৃন্দ অবগত ছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব এ সম্পর্কে শুধু অবগতই ছিলেন না এই দলের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল এবং তিনি অর্থ সাহায্যও প্রদান করতেন।[৭৬] এই দলের কার্যক্রম সরকারী নির্যাতন নিপীড়নের কারণে বেশী দিন টিকে না থাকলেও শেখ মুজিবের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তাঁর বাঙালী জাতিসত্ত্বা ভিত্তিক স্বাধীন বাংলা চিন্তার প্রতি আগ্রহের প্রকাশ উপেক্ষা করার মত নয়।

একষট্টি সালে আইয়ুব শাসনের চরম দুর্দিনেও তিনি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কথা ভেবেছেন। উক্ত সালের শেষার্ধে আওয়ামী লীগের সঙ্গে বেআইনী ঘোষিত কমিউনিষ্ট পার্টি কয়েক দফা গোপন বৈঠক হয়।[৭৭] সভায় সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী, তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) এবং কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে মনি সিংহ ও খোকা রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের রূপ ও কর্মসূচী প্রণয়নকালে শেখ মুজিব কর্মসূচীতে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবীকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। সভায় তিনি বলেন, 'ওদের সাথে আমাদের আর থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে; আন্দোলনের প্রোগ্রামে ঐ দাবী রাখতে হবে।'[৭৮]

এই দাবী সম্পর্কে কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক চিঠিতে জানা যায় যে, পার্টি এই দাবীর মধ্যে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রশ্নটি নিহিত আছে বলে মনে করে। ভবিষ্যতে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের সম্ভাবনা মেনে নিলেও তৎকালীন সময়ে দাবীটি অপরিপক্ক অসময়োচিত এবং হঠকারী বিবেচনায় তা অগ্রাহ্য করা হয়। পার্টি মনে করে স্বাধীন পূর্ব বাংলার দাবী উত্থাপনকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকে, স্বাধীনতা কামীদের এ দাবী থেকে বিরত রেখে তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করতে হবে। বুঝাতে হবে যে এই পথেই সত্যিকার আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।[৭৯]

পার্টির গোপন দলিলে আরো বলা হয়: 'এই রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা যত বৃদ্ধি পাইবে এবং জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আন্দোলন যত জোরদার হইবে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তিও তত দুর্বল হইয়া পড়িবে। এই অবস্থায় বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি বিশেষতঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মত দুইটি পৃথক অঞ্চল নিয়া একটি মাত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং ভবিষ্যতে পাকিস্তান রাষ্ট্র একাধিক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িতে পারে।'[৮০]

এই সব চিঠি এবং গোপন দলিল থেকে যেমন পার্টির তৎকালীন চিন্তার আভাস পাওয়া যায় তেমন অনুমান করা যায় যে ১৯৫৯ সাল থেকেই পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিকশিত হচ্ছিল জাতিসত্ত্বাভিত্তিক স্বাধীনতার চিন্তা। শেখ মুজিব এদের একজন ছিলেন যাঁর চিন্তায় স্বাধীনতা আরো আগে স্থান পেয়েছিল। অবস্থার প্রেক্ষিতে অন্যান্যদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়ে এমনকি তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর বিরোধীতার

Dhaka University Institutional Repository

কারণে, তিনি সময়ের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করেন। তবে অগ্রসর হতে থাকেন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এর পথে, যে পথ ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা স্বাধীনতা অর্জনের পথ। যা অর্জনের জন্য প্রথমই প্রয়োজন ছিল হৃদ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার।

পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম বৈঠকেই যে রাজনৈতিক দাবীগুলি প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয় তা ছিল: দেশে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন; আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব; পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিকভাবে শক্তিশালী করা; পাকিস্তানের নৌবাহিনীর সদর দফতর চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করা; এবং রাজবন্দীদের মুক্তি।[৮১]

১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসের এ সভার পর ৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক কাউন্সিল অধিবেশন হয়। এতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সহকর্মীদের প্রতি যে আহ্বান জানান তা কর্মীদের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাওয়ার শপথ নিতে অনুপ্রাণিত করে। শেখ মুজিব তাঁর আহ্বানে বলেন: "...যতদিন না এদেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করতে পারব, যতদিন না দেশকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে পারব, যতদিন না সমাজ থেকে শোষণের মূলোৎপাটন হবে, যতদিন না দেশের প্রত্যেক নাগরিক দলমত ধর্ম নির্বিশেষে অর্থনৈতিক মুক্তি ও আর্থিক প্রাচুর্যের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে যতদিন না শ্রেণী বিশেষের অত্যাচার থেকে সমগ্র দেশ ও জাতিকে মুক্তি দেয়া যাবে, ততদিন আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। ন্যায় আমাদের নীতি, আমাদের আদর্শ। জয় আমাদের অনিবার্য।"[৮২]

১৯৬৪ সালের জুন মাসে জনগণকে জানানো হয় যে ১৯৬৫ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জুন মাসে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভায় ১১-দফা দাবী প্রণয়ন করা হয়। এই দুঃসাহসিক দাবীগুলি তখন গুরুত্ব না পেলেও পরবর্তীতে ৬-দফা হিসেবে প্রণীত এই দাবীগুলো সারাদেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে ঝড় তোলে, আতংক সৃষ্টি হয় শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে। '৬৪ সালে আওয়ামী লীগ এ ১১-দফা নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় নামে। দাবীগুলো ছিল নিম্নরূপ:[৮৩]

(১) ফেডারেশন অব পাকিস্তান নামে সত্যিকার অর্থে ফেডারেল পদ্ধতির প্রণয়ন।

(২) বয়স্কদের ভোটাধিকার এর ভিত্তিতে গণতন্ত্র কায়েম ও যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সামরিক বাহিনীসহ সকল সরকারি উচ্চ পদে মেধা অনুসারে বাঙালীদের নিয়োগ।

(৪) পাকিস্তানের উভয় অংশে বৃহৎ শিল্প কারখানা জাতীয়করণ।

(৫) মোহাজেরদের জন্য সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন কর্মসূচী প্রণয়ন।

(৬) ফেডারেশনে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ সাধনে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচী প্রণয়ন।

(৭) পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন কায়েমের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থাসহ পৃথক অর্থনীতি প্রণয়ন।

(৮) পূর্ব পাকিস্তানসহ পাকিস্তানের সকল প্রদেশের জন্য পৃথক বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন।

(৯) বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবনিকাশ ও আয় ব্যয়ের পূর্ণ অধিকার প্রদেশের হাতে ন্যস্তকরণ।

(১০) পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর সদর দফতর প্রতিষ্ঠাসহ দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে মিলিশিয়া বাহিনী গঠন।

(১১) ছাত্রদের দাবীদাওয়াসহ শ্রমিক কৃষকদের ন্যায্য দাবীসমূহ পূরণ।

উপরোক্ত দাবীগুলো থেকে অনুমান করা যায় যে পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগ কিভাবে বাঙালীর স্বতন্ত্র সত্ত্বা স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার ব্যাপারে সচেতন ছিল। ১৯৬৪ সালের ১৩ জুলাই অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের জনসভায় প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে উপস্থিত করা হয়। তাছাড়া পূর্ব বাংলার ভাষা সংস্কৃতির উপর হামলার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়।[৮৪] এ সময় গণমনে চরম সরকার বিরোধী মনোভাব বিরাজ করছিল। মওলানা ভাসানীও কৌশলে আইয়ুব বিরোধী বক্তব্য রাখেন। তিনি লাহোরে বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন:[৮৫]

"আমরা অবশ্যই আইয়ুবকে সমর্থন করতে পারি, যদি তিনি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন। বিশেষ করে সিয়াটো-সেন্টো চুক্তি বাতিল করেন। দিতে হবে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র। দিতে হবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা।"

১৯৬৫ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ উদ্দেশ্যে তারা Combined opposition party সংক্ষেপে Cop নামে নির্বাচনী জোট গঠন করে। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে জোটের থেকে মনোনয়ন দেয়া হয়। গণজোয়ার ছিল ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে। তবু মৌলিক গণতন্ত্র সিষ্টেমে নির্বাচন প্রথায় জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগটুকু আইয়ুব প্রবর্তিত মৌলিক

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্রীরা পুরো মাত্রায় গ্রহণ করেছিলেন। তারা ফাতেমা জিন্নাহর কথা বলে ভোট নিয়ে আইয়ুবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। আইয়ুবের কেনা মৌলিক গণতন্ত্রীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং নির্বাচনের সময় প্রশাসনযন্ত্রের অপব্যবহার দুর্নীতি এবং অসাধুতা গণতন্ত্রকামী জনগণের জন্য বয়ে আনে চরম ব্যর্থতা ও হতাশা।[৮৬]

নির্বাচন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত বিরোধী দলীয় জোটের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। জাতীয় ভিত্তিতে দেশের আপামর জনসাধারণকে একটি ইস্যুর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার এটিই ছিল সর্বশেষ প্রচেষ্টা। কিন্তু স্বয়ং সংবিধানের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে তা প্রত্যাশিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়। এই পরাজয়ে জনমনে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে নেমে আসে চরম হতাশা। কেননা এই নির্বাচনকেই তারা মনে করেছিল জাতীয় পর্যায়ে অংশ গ্রহণের সর্বশেষ শাসনতান্ত্রিক সুযোগ।[৮৭] এই ব্যর্থতা থেকে পূর্ব বাংলার শুধু নেতৃবৃন্দ নয় শিক্ষিত জনসমাজ উপলব্ধি করতে পেরে ছিলেন যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং বাঙালীর অধিকার অর্জন ও স্বার্থরক্ষা সম্ভব নয়।

এ পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো ক্রমশ আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। ফাতেমা জিন্নাহর অনুকূলে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সময় শেখ মুজিব জনগণের মধ্যে আইয়ুবের শাসনতন্ত্র ও সরকার বিরোধী মনোভাব এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৮৮]

ইতিমধ্যে বাংলার সম্পদ শোষণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং দেশের দুই অংশের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্য সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্তানের অনেক অর্থনীতিবিদ এ অবস্থায় পাকিস্তানে দুই অর্থনীতির তত্ত্ব বাস্তবায়িত করার প্রস্তাব রাখা শুরু করেন। পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে বাঙালীদের মধ্যকার জাতীয়তাবাদী শক্তি দৃঢ় হতে থাকে। বিগত রাজনৈতিক নির্বাচনের প্রেক্ষিতে জাতীয় সংহতির আকাংখা হতে থাকে জোরদার। এই সময় অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নটি পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে আলোচিত হতে থাকে। প্রতিটি বাঙালী মধ্যবিত্তের কাছে বৈষম্যমূলক আচরণ ছিল আলোচনা ও ক্ষোভের প্রধান বিষয়বস্তু।

প্রাদেশিক ক্যাডারভুক্ত (ই, পি, সি, এস) বাঙালী অফিসার কেরানী, শিক্ষক, আইনজীবি, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী সকলেই ছিলেন এই আলোচনার অংশীদার। বাঙালী সি, এস, পি এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ইতিমধ্যে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে স্বায়ত্তশাসনের দাবী তাদের ত্বরিত লাভের সুযোগ সৃষ্টির অনুকূলে রয়েছে। স্বায়ত্তশাসন জোরদার হওয়ার অর্থ ছিল তাদের ত্বরিত প্রমোশন, বেতনবৃদ্ধি, ব্যবসায়ের লাইসেন্স এবং বরাদ্দ বৃদ্ধি। কাজেই আন্দোলন পরিচালনাকারী ছাত্র শ্রমিক ও রাজননীতিবিদরা আইয়ুবের শাসনামলে উদ্ভূত উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছ থেকে প্রাথমিক সমর্থন লাভ করতে থাকে।[৮৯] সব কিছু ছাপিয়ে অর্থনৈতিক স্বার্থটি বড় হয়ে দেখা দেয় এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক অধিকার অর্জন। ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যেমন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তি নির্ভর হয়ে পড়ে তেমন জনসাধারণও তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য জাতীয়তাবাদী শক্তিকেই একমাত্র শক্তি বলে বিবেচনা করতে থাকে। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নটি বাঙালীর স্বাতন্ত্রবোধ ও জাতীয় চিন্তা গভীরভাবে প্রভাবিত করে এর চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধাবিত করতে সাহায্য করে।

বৈষম্য:

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই দুই অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ বৈষম্যের জন্য বৃটিশ নীতি ও হিন্দু সমাজকে দায়ী করে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পার পেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। কেননা দেশ বিভাগের পরও বৈষম্য ক্রমেই বাড়তে থাকে। পাকিস্তানের নেতৃত্ব ছিল মুসলিম লীগের হাতে এরা প্রায় সকলেই বাস করতেন পশ্চিম পাকিস্তানে। বিভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তুদের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং শিল্পপতি বণিক শ্রেণী এরাও বসতি স্থাপন করে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে।[৯০] তাছাড়া বৃটিশ এর যে বিভেদ নীতি বাঙালী মুসলমানের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়ে ছিল একই নীতি পাঞ্জাবী মুসলমানের ভাগ্য খুলে দিয়েছিল শিখদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া পাঞ্জাবকে বশে রাখার জন্য পাঞ্জাবী মুলমান বৃটিশ মদদ পেয়ে পরিণত হয়েছিল তাদের পরম আস্থাভাজন সম্প্রদায়ে। বৃটিশ আস্থাভাজন পাঞ্জাবী মুসলিম আই, সি, এস, সামরিক আমলা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা ছিল বাঙালী বিদ্বেষী। এবং পাকিস্তানে প্রথম থেকেই তারা এই মনোভাব পোষণে দ্বিধা করেনি।

যে বাঙালী মুসলমান পাকিস্তান অর্জনের জন্য প্রাণপণ লড়াই করেছিল, তারাই পাঞ্জাবী শাসকচক্রের কাছে স্বীয় অধিকার, ন্যায্য হিস্যার প্রশ্ন তুলে 'দেশদ্রোহী', 'ধর্মদ্রোহী', 'পাকিস্তানের শত্রু' বলে নির্যাতিত হতে থাকে। এখানে দুই অংশের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় অধিকার আদায় এবং দেয়ার মধ্যে। ফলে অধিকার আদায় এবং দেয়ার মধ্যে জন্ম হতে

Dhaka University Institutional Repository

লাগল সংঘাতের। অর্থনৈতিক শোষণ বৈষম্যকে কেন্দ্র করে তা চরমে পৌঁছে। যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শোষণ অসাম্প্রদায়িক বাঙালী মুসলমানকেও সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের উপর আস্থাশীল হতে বাধ্য করে। তাদেরই আবার একই কারণে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের পথে এসে দাঁড়াতে হলো। সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ ভারত বিভক্ত করে জন্ম দিয়েছিল দুটি রাষ্ট্র ভারতও পাকিস্তানের। অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ পাকিস্তান খন্ডিত করার লক্ষ্যে দিনে দিনে শক্তিশালী হতে থাকে। এই শক্তি সঞ্চয়ের মূল ভিত্তিই হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণ।

শিল্প-বাণিজ্য কৃষি ক্ষেত্রে

কোলকাতা শহরের পশ্চাৎ ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত পূর্ব বাংলার যাত্রা শুরু হয়েছিল নামেমাত্র কয়েকটি শিল্প-কারখানা নিয়ে। যার মধ্যে ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই ছিল বেশী। স্বাধীনতার চার বছর পরও তার সংখ্যার খুব বেশী তারতম্য হয়নি। উদাহরণ হিসেবে ১৯৫১ সালের অর্থনৈতিক জরিপে পূর্ব বাংলায় অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা সারণী আকারে উপস্থাপন করা হলো।

১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

শিল্পের নাম		অবস্থান					শক্তি ব্যবহারের ধরণ					প্রতিদিন	
		ঢাকা	চট্টগ্রাম	খুলনা	অন্যান্য	মোট	বিদ্যুৎ	তৈল	ষ্টিম	ষ্টিম + বিদ্যুৎ	অন্যান্য	তথ্য পাওয়া যায় না	শ্রমিক সংখ্যা
১।	ম্যাচ শিল্প	৪	০	২	৩	৯	৬	২	-	-	-	১	১,৬৫৪
২।	তুলা হাত বুনন শিল্প	৮	২	২	২	১৪	৪	১	৩	৪	-	২	১১,৫৪১
৩।	চিনি শিল্প	১	০	০	১০	১১	১	-	২	৩	-	৫	২,৫৫৮
৪।	বিদ্যুৎ	১	১	১	১৫	১৮	২	১০	১	-	২	৩	৫৬৭
৫।	তুলা শিমিং ও প্রেসিং শিল্প	১	৪	-	-	৫	১	১	১	-	১	১	৯৫*
৬।	মুদ্রণ শিল্প	৯	-	-	-	৯	৮	-	-	-	১	০	৯৫০
৭।	পাটকল	২	১	-	-	৩	৩	-	-	-	-	০	৫,০০০
৮।	পাট বেলিং প্রেসিং শিল্প	১৮	২	-	২৭	৪৭	২	২৮	১০	১	৬	০	১১,৩৬০১৯
৯।	ধান কল	৩	৩	২	৩৯	৪৭	১	-	৪২	-	৪	০	১৫৬৩
১০।	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ	৮	৯	২	১৭	৩৬	১৪	৬	২	৫	৮	১	২০,৮৭৯
১১।	কাঁচের ফ্যাক্টরী	৫	১	-	-	৬	৩	১	২	-	-	০	১,৩২৯
১২।	তেলের কল	২	৬	-	৭	১৫	-	৪	৬	২	৩	০	১,০৫০
১৩।	ট্যানারি	২	-	-	-	২	-	১	-	১	-	০	২৬১
১৪।	হোসিয়ারী	১	১	-	৫	৭	৬	১	-	-	-	০	১১৫
১৫।	পাঁচ মিশালী	৫	৫	-	৪	১৪	৪	৫	৩	-	২	০	১,০৫০
১৬।	চা শিল্প	-	-	-	৯০**	৯০	৪	৩২	২২	-	-	৩২	৫,৯৮৬

* একটি তথ্য নেই
** সবগুলিই সিলেট

সূত্র: আতিউর রহমান: লেলিন আজাদ *ভাষা আন্দোলন: অর্থনৈতিক পটভূমি* পৃষ্ঠা ১৭৩।

বিভাগ উত্তরকালে পশ্চাৎপদ অনুন্নত পূর্ব বাংলার জন্য প্রয়োজন ছিল ব্যাপক সহযোগিতার। যে সহযোগিতা পূর্ব বাংলার শিল্পক্ষেত্রে ক্ষতি পুষিয়ে দিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করে দিতে পারত। কিন্তু বাস্তবে অবাঙালী ২২ পরিবারের হাতে জিম্মি কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে তাদের স্বার্থে পূর্ব বাংলায় যে কটি শিল্প ছিল তার উৎপাদনও বৃদ্ধি নাহয়ে হ্রাস পেতে থাকে। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদন ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে। শুরুতে পূর্ব বাংলার কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ বেশী হলেও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তা চরমভাবে হ্রাস পায়। অথচ অতীতকাল থেকেই

Dhaka University Institutional Repository

এই শিল্পে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশ ছিল সামাজিকভাবে অধিকতর দক্ষ।[৯১] বস্ত্র শিল্পে পশ্চিম পাকিস্তানকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার বস্ত্র শিল্পের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়।

দেশ বিভাগের সময় শিল্পক্ষেত্রে পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে বৈষম্যের পরিমাণ ব্যাপক না হলেও পরবর্তীতে কেন্দ্রের নীতির কারণে পূর্ব বাংলা ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে। দেশ বিভাগকালে পাকিস্তানে অবস্থিত শিল্পের পরিমাণ নিম্নের সারণীতে উপস্থিত করা হলো :

শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অঞ্চলভিত্তিক অবস্থান[৯২]

১৯৪৫-১৯৪৭

শিল্প প্রতিষ্ঠান	পাকিস্তান সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান সংখা	পূর্ব পাকিস্তান শতকরা হিসাব
পাট প্রেসিং শিল্প	৫১	২৭	৫২.৯
চিনিকল	৯	৫	৫৫.৫
দিয়াশলাই কারখানা	৮	৪	৫০.০
চা কারখানা	১৭১	১০০	৫৮.৪
সিমেন্ট কারখানা	৫	১	২০.০
হোসিয়ারী	২০	৯	৪৫.০
চাল কল	১৬৬	৫৮	৩৪.৯
মোট	৪৩০	২০৪	৪৭.৪

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী কাঁচাপাট উৎপন্ন হয় পূর্ব বাংলায় তৎসত্ত্বেও এখানে কোন পাট কল ছিল না। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধানতম উৎস ছিল পাট। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ (এপ্রিল-মার্চ) এই সময়ে পূর্ব বাংলা সমগ্র পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৫৬ ভাগ আসে পাটের সুবাদে। ১৯৪৮-৪৯ সালে পাকিস্তান রপ্তানির মাধ্যমে অর্জন করে মোট ২১৫ কোটি ৪৪ লক্ষ রুপী যার ১৪৭ লক্ষ রুপীই অর্জন করেছিল পূর্ব বাংলা। এভাবে ১৯৪৮-৫২ সাল এই চার বছর রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে পাকিস্তান অর্জন করে ৮৪৫ কোটি ২ লক্ষ রুপী। এর মধ্যে ৪৬৪ কোটি ২৫ লক্ষ রুপীই অর্জিত হয় পূর্ব বাংলার পাট ও অন্যান্য কাঁচামাল রপ্তানি করে। অথচ এ সময়ে পূর্ব বাংলার জন্য সরকারীভাবে প্রায় কোন জিনিসই আমদানি করা হয় নাই। সরকারী বেসরকারী খাতে যেটুকু আমদানি করা হয়েছিল প্রায় বেশিরভাগই ছিল ভোগ্যপণ্য। আবার বেসরকারী খাতে বৈদেশিক বাণিজ্য সবটুকু দখল করেছিল অবাঙালী ব্যবসায়ীরা। ফলে উক্ত খাতের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের ওপর শোষণের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে।[৯৩]

পূর্ব বাংলার পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে এতো বিপুল অর্থ অর্জিত হলেও এখানে কোন পাট শিল্প কারখানা গড়ে তোলার সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। ১৯৪৮ সালে যখন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয় তখন পাট এবং পাটজাত শিল্প গড়ে তোলার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। অথচ ঐ শিল্পনীতিতে পশ্চিম পাকিস্তান নির্ভর শিল্প কিভাবে গড়ে তোলা যায় তার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। এমনকি যে তেরটি শিল্পে বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানানো হয় এবং সরকারী উদ্যোগে গড়ে ওঠা যে সমস্ত শিল্পের শেয়ার বাজারে বিক্রির ঘোষণা দেয়া হয় তার মধ্যেও পাটের কোন উল্লেখ ছিল না।

বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিল্পের সবগুলি মালিক ছিল অবাঙালী পুঁজিপতিরা। তবে তাও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী অবাঙালী শিল্পপতির উদ্যোগে কয়েকটি পাটকল, কয়েকটি মুদ্রণ শিল্প ছাড়া পূর্ব বাংলায় শিল্পে বিকাশ বলতে কিছুই হয় নাই। এমনকি ভারী শিল্পগুলির মালিকরাও ছিল প্রধানতঃ অবাঙালী। অন্যদিকে পশ্চিম অঞ্চলে ব্যাপক শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শিল্পে গড়ে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৫৫,০৭৪ জন এবং পরবর্তী ৫ বছরে এই সংখ্যা প্রায় বাড়েনি বললে চলে। এই সময়ের মধ্যে মাত্র ৭ হাজার জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গেছে। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৪৮ সালে গড় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১,১৭,৩৫৫ জন এবং এই সময়ের মধ্যে ৬৪ হাজার জনের কর্মসংস্থানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।[৯৪] অতিগভীরে প্রবেশ না করে শুরুতেই বৈষম্যের যে সাধারণ হিসাব পাওয়া যায় তাতেই দুই অঞ্চলে শিল্প বিকাশের দুই ধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যুৎ সরবরাহ অপর্যাপ্ত থাকায় অনেক অবাঙালী শিল্পপতি ইচ্ছা থাকলেও পূর্ব বাংলায় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সাহস পাননি। আবার পুঁজির প্রশ্নে বাঙালীর হাতে শিল্প গড়ে তোলার মত পুঁজি ছিল না। দেশ বিভাগের পর ভারত থেকে যে কজন মুসলমান শিল্পপতি কিছু পুঁজি নিয়ে পাকিস্তানে আসে, তারা পশ্চিম পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। অপরদিকে বাঙালীদের হাতে এমন পুঁজি ছিল না, যা দিয়ে তারা নতুন ও আধুনিক শিল্প গড়ে তুলতে পারে।[৯৫] বৃটিশ আমলে যে সকল সম্পন্ন কৃষক পাটের টাকায় সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল তাদের বেশীর ভাগ অর্থই দেশত্যাগী হিন্দুদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কিনতে ব্যয় হয়ে যায়। ফলে স্থানীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যায়।

কৃষি শিল্প ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায় থেকে যে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসৃতহয় তা যেমন শেকড় পর্যায়ে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তেমন অন্যান্য স্তরেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হতে তাকে। বৈষম্যমূলক নীতির শিকার পূর্ব বাংলার সর্বশ্রেণীর মধ্যে চরম ক্ষোভ আর হতাশার সঞ্চার করে। কৃষি শিল্পে অনুসৃত নীতি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প চাকুরী উন্নয়ন সর্বক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা হতে থাকে চরমভাবে বঞ্চিত। ব্যবসা বাণিজ্য আমদানি রপ্তানি ইত্যাদি সব কিছুর উপর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রাধান্য। বৈদেশিক আমদানির সুযোগ সুবিধা ব্যবসা বাণিজ্য লাইসেন্স সবই দেয়া হতো পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের। বাঙালী ব্যবসায়ীরা এ সুযোগ থেকে নানাভাবে বঞ্চিত হতো। তাছাড়া সকল বৈদেশিক দ্রব্য পশ্চিম পাকিস্তান হয়ে পূর্ব বাংলায় আসত। যে কারণে বাঙালীকে এসব দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করতে হতো। উক্ত মুনাফার অর্থেও লাভবান হতো পশ্চিম পাকিস্তানীরা। এভাবে পূর্ব বাংলার উঠতি ব্যবসায়ী শ্রেণীও মার খেতে থাকে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের হাতে।

ইস্যুকৃত বাণিজ্যিক আমদানি লাইসেন্সের বৈষম্য (মোট শতকরা হিসাব)

সময়	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
১৯৫৭-৫৮	৬৭.০	৩৩.০
১৯৫৮-৫৯	৬৬.৭	৩৩.৩
১৯৫৯-৬০	৬৩.৯	৩৬.১
১৯৬০-৬১	৬০.০	৪০.০
১৯৬১-৬২	৫৪.২	৪৫.৮
১৯৬২-৬৩	৬২.৭	৩৭.২
শতকরা গড় হিসাব	৬২.৫	৩৭.৫

উৎস : P.S. Thomas, Import Licensing and Import Liberation in Pakistan *The Pakistan Development Review*, winter 1966, Table A-6 P. 533.

ইস্যুকৃত শিল্প আমদানি লাইসেন্সের বৈষম্য (মোট শতকরা হিসাব)

সময়	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
১৯৫৭-৫৮	৬৮.০	৩২.০
১৯৫৮-৫৯	৭৬.০	২৪.০
১৯৫৯-৬০	৬৪.৯	৩৫.১
১৯৬০-৬১	৬৭.৭	৩২.৩
১৯৬১-৬২	৬৬.২	৩৩.৮
১৯৬২-৬৩	৭৪.৬	২৫.৪
শতকরা গড় হিসাব	৬৯.০	৩১.০

উৎস : ঐ Table A-6 P. 534.

উপরোক্ত সারণীদ্বয়ের হিসাবের মধ্যে রয়েছে বাঙালীর সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অংশীদারিত্বের হিসাবটিও। অর্থাৎ অনেক বাঙালী অবাঙালীদের সঙ্গে মৌখিকভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। ফলে শতকরা হার হিসেবে উপরোক্ত হিসেবের চেয়ে পূর্ব বাংলার অংশে আরো কম হবে। তাছাড়া বেসরকারী খাতে লাইসেন্স ইস্যু হতো অর্থ

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যেখানে বাঙালীর উপস্থিতি ছিল নগণ্য। কোন বাঙালী এই বিভাগের প্রধান ছিল না। ফলে বাঙালী ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিকভাবে এদের দ্বারা বঞ্চিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে সর্বত্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাধান্য।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল তা পূর্ব বাংলার অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সে সময় আমদানি রপ্তানি ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল তার ফল দাঁড়িয়েছিল আমদানির ক্ষেত্রে চড়া হারে শুল্ক ধার্য করার ফলে অপেক্ষাকৃত শিল্পোন্নত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলায় আমদানির পথ সুগম করা হয়েছিল। পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানে যা রপ্তানি করতো তাতে ওখানে রপ্তানির ফলে সৃষ্টি দায় আংশিক মিটাতো (ষাটের দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত পূর্ব বাংলা থেকে রপ্তানির পরিমাণ ছিল বেশী)। দেশীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো যাতে পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে অপ্রতিযোগী (Non-Competitive) আমদানি পণ্যসমূহ সস্তায় বিক্রি হয়।[৯৬]

এই নীতি বাংলার অর্থনীতিতে কি পরিমাণ বিরূপ প্রভাব পড়েছিল তা দুটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। যেমন চা ছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলার অন্যতম প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য। চায়ের রপ্তানি শুল্ক এমনভাবে ধার্য করা হয়েছিল যাতে রপ্তানিযোগ্য সকল চাই পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানি করতে বাধ্য হয়। কাগজ ছিল সে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য। কাগজের বেলায় মুদ্রার বিনিময়মূল্য নির্ধারণের কারচুপির কারণে অনেক কম দামে পূর্ব বাংলা থেকে কাগজ রপ্তানি হতো। অথচ এর চেয়ে বেশী দামে তখন কাগজ রপ্তানি করা সম্ভব ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিময় হার নির্ধারণ ও অন্যান্য নীতির কারচুপির কারণে সে সময় পূর্ব বাংলা শোষিত হয়েছে। বিদেশে অধিক মূল্যে রপ্তানিযোগ্য পণ্য কম মূল্যে পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানির ফলে একদিকে পূর্ব বাংলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় কমেছে অপরদিকে কৃষক এবং রপ্তানিকারক উভয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কৃষি প্রধান পূর্ব বাংলার সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ছিল অপরিহার্য। অথচ পূর্ব বাংলার সেচ সম্প্রসারণের বিষয়টি মোটেও গুরুত্ব পায়নি। জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সেচ ব্যবস্থার মধ্যে ছিল বিপুল বৈষম্য। তার উপর বিভাগ পরবর্তীকালে পশ্চিম পাকিস্তানের সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মোট ১৬টি প্রকল্পে ১৬৮ কোটি রুপী করচ করা হয়। অপরদিকে অনগ্রসর এবং অধিকসংখ্যক লোকের বসত ভূমি পূর্ব বাংলায় তিনটি প্রকল্পে মোট ৩০.২৩ কোটি রুপী অনুমোদন করা হয়। যার মধ্যে ২০.২৩ কোটি রুপী কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্প ও গঙ্গা কপোতাক্ষ প্রকল্পের কাজ কোনো রকমে শুরু করা হয়। তৃতীয় প্রকল্প তিস্তা বাঁধের জন্য টাকা অনুমোদনের পরিকল্পনা নেওয়া হলেও দীর্ঘ সময় ধরে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় নাই।[৯৭] পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সেচ ব্যবস্থার এই বিপুল বৈষম্য ক্রমান্বয়ে আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সেচকৃত এলাকা-১৯৬৯-৭০

প্রকল্পের নাম	জমির পরিমাণ (হাজার একরে)
ওয়াপদার অধীনস্থ	
গঙ্গা-কপোতাক্ষ	৯০
তিস্তা-ব্যারেজ	৬
উত্তরের টিউবওয়েল প্রকল্প	৬২
উত্তরের লিফট পাম্প প্রকল্প	১০
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা	৯
কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের অধীনস্থ	
গো লিফট পাম্প (১৮,০০০)	৭২০
নলকূপ	২২
কুমিল্লা কো অপারেটিভ	৮
	মোট = ৯২৭
	আবাদী জমির ৪%

উৎস : ডঃ এ, আর, খান প্রণীত *দি ইকনমি অব বাংলাদেশ* পৃষ্ঠা ৪৯।

কৃষি অগ্রগতির জন্য শুধু সেচ ব্যবস্থা নয় আরো প্রয়াজন ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উন্নতবীজ, সার সরবরাহ আধুনিক প্রযুক্তি বিনিয়োগ ইত্যাদির। এসব কোন কিছুর ব্যবস্থায়ই সরকারী পর্যায়ে করা হয় নাই। পূর্ব বাংলার কৃষকরা তাদের

Dhaka University Institutional Repository

ফসলের মূল্য থেকেও ছিল বঞ্চিত। পাটকে কেন্দ্র করে যে খেলা শুরু হয়েছিল তার বাস্তব চিত্র তৎকালীন 'সৈনিক' নামক কাগজের রিপোর্টে প্রকাশ হতে থাকে।সরকারের পাটনীতির কারণে সমস্ত অভ্যন্তরীণ পাট ব্যবসা মধ্যস্বত্ব ভোগীদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে যায়। ফলে ১৯৪৭-৫২ সালে পূর্বে প্রকৃত কৃষকরা মনপ্রতি ৮/১০ টাকার উপরে পাটের দাম পেত না।৯৮ অপরদিকে চালের ব্যবসার উপর অবাঙালী আরতদারদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকায় কৃষককে ৮/১০ টাকা মন দরে পাট বিক্রয় করে ৪০ টাকা মন দরে চাল কিনতে হতো। এভাবে সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি পূর্ব বাংলার শেকড় পর্যায়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলে। এই নীতিতে দিশেহারা কৃষকদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে এর যথার্থ কারণ সম্পর্কে ততখানি সচেতনতা না থাকলেও ভুক্তভোগী কৃষক সমাজ পরবর্তীতে ভাগ্য বিপর্যয়ের মূল কারণ উদঘাটনে সক্ষম হয়। বিভিন্ন সভাসমিতির মাধ্যমে যেমন সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমন বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শোষিত কৃষক সমাজ পাকিস্তানে তাদের ভাগ্যবিপর্যয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে থাকে। পাকিস্তান সৃষ্টি হলে পাট চাষীদের ভাগ্য খুলে যাবে এই ধারণা তাদের উৎফুল্ল করেছিল। কিন্তু ঘটেছিলো উল্টোটা। যা এদেশের কৃষক সমাজ মেনে নেয়নি। যত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে আশাহত শোষিত কৃষক সমাজ ততই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। যার প্রতিফলন দেখা গেছে শুরু থেকে প্রতিটি আন্দোলনে তাদের বিপুল উপস্থিতির মধ্যে। ভাষা আন্দোলন থেকে ষাটের দশকের বৈষম্যমূলক আচরণ ও শোষণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত গণবিদ্রোহে তাদের দেখা গেছে লাঙ্গল কাঁধে দলে দলে আন্দোলনে সামিল হতে। আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক শোষণের শিকার নিগৃহীত কৃষক সমাজ তার বাস্তব অবস্থার কারণেই বাঙালী জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের প্রতিটি ধারায় যুক্ত থেকে আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছে। নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক জাতিসত্ত্বা ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে।

চাকুরী উন্নয়ন ও শিক্ষাক্ষেত্র

কৃষি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়াও পেশাভিত্তিক জীবিকায়ও ছিল বাঙালীর প্রতিদ্বন্দ্বী। শিক্ষিত বাঙালী যুবকের উপযুক্ত ডিগ্রী মেধা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বেসরকারী পদ থেকে ছিল বঞ্চিত। এসব ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে কম মেধা সম্পন্ন লোক নেয়া হতো শুধুমাত্র অবাঙালী বলে। সরকারী চাকুরীতেও ছিল পাহাড় প্রমাণ বৈষম্য। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সি, এস, পি অফিসার নিয়োগ ক্ষেত্রেও বাঙালীরা বৈষম্যের শিকার হয়েছে। বৃটিশ আমলে ভারতীয় আই, সি, এসদের প্রতি যে মনোভাব প্রদর্শন করা হতো পাকিস্তানে বাঙালী সি, এস, পিদের প্রতি একই মনোভাব পোষণ করা হতো। একজন বাঙালী যুবকের সি, এস, পি পাস করা ছিল কঠিন ব্যাপার। পাস করলেও দেখা যেত যে কেন্দ্রীয় সরকারের সকল পদ বৃটিশ আমলের অবাঙালী আই, সি, এস এবং সি,এস, পিরা দখল করে আছে। ফলে কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসেও বাঙালীদের অবস্থা ছিল করুণ। নিম্নের সারণীগুলোতে কেন্দ্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী সি, এস, পি অফিসারদের সংখ্যার শতকরা হিসেব উপস্থিত করা হলো :

পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সি, এস, পিদের প্রতিনিধিত্ব ১৯৪৮-৫৮

সময়	অফিসারের মোট সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান	
		সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
১৯৪৮	১৮	২	১১·১	১৬	৮৮·৯
১৯৪৯	২০	৯	৪৫·০	১১	৫৫·০
১৯৫০	২০	৬	৩০·০	১৪	৭০·০
১৯৫১	১১	৪	৩৬·৪	৭	৬৩·৬
১৯৫২	১৭	৫	২৯·৪	১২	৭০·৬
১৯৫৩	১৩	৩	২৩·১	১০	৭৭·৯
১৯৫৪	২৫	৭	২৮·০	১৮	৭২·০
১৯৫৫	১৭	৫	২৯·৪	১২	৭০·৬
১৯৫৬	২১	১১	৫২·৪	১০	৪৭·৬
১৯৫৭	২০	৭	৩৫·০	১৩	৬৫·০
১৯৫৮	২৪	১০	৪১·৭	১৪	৫৮·৩

সূত্র : রওনক জাহান : *পাকিস্তান ফেইলর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেসন* পৃষ্ঠা ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সি, এস, পিদের প্রতিনিধিত্ব ১৯৫৯-৬৭

সময়	অফিসারের মোট সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান	
		সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
১৯৫৯	২৪	১২	৫০·০	১২	৫০·০
১৯৬০	৩১	১০	৩২·৩	১৯	৬৭·৭
১৯৬১	২৭	১০	৩৭·০	১৭	৬৩·০
১৯৬২	২৭	১২	৪৪·৫	১৫	৫৫·৫
১৯৬৩	৩১	১৩	৪১·৯	১৮	৫৮·১
১৯৬৪	৩৩	১৪	৪২·২	১৯	৫৭·৮
১৯৬৫	৩০	১৫	৫০·০	১৫	৫০·০
১৯৬৬	৩০	১৪	৪৬·৬	১৬	৫৩·৪
১৯৬৭	৩০	১৩	৪৩·৩	১৭	৫৬·৭

সূত্র : *ডন (করাচী)* ১৮ জানুয়ারী, ১৯৫৬ সাল।

১৯৫৫ সালে সিভিল সার্ভিসে উচ্চ পদস্থ কর্মচারী

পদ	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান শতকরা হার
সচিব	-	১৯	-
যুগ্মসচিব	৩	৩৮	৭.৩
উপসচিব	১০	১২৩	৭.৫
নিম্ন সচিব	৩৮	৫১০	৭.০

সূত্র : *ডন (করাচী)* ১৮ জানয়ারী, ১৯৫৬ সাল।

বৈষম্যে শিকার পূর্ব বাংলার যুব সমাজ সেনাবাহিনীর চাকুরী থেকে বঞ্চিত হতে থাকে সুপরিকল্পিত কৌশলের মাধ্যমে। যারা ভাগ্যক্রমে সুযোগ লাভ করে তারা ও গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদ লাভে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসে সেনাবাহিনীর প্রধান তো দূরের কথা কোন বাঙালীর কর্ণেল পদে প্রমোশন পাওয়া ছিল কঠিন। নিম্নে সেনাবাহিনীতে বৈষম্যের নমুনা উপস্থাপন করা হলো ।

সামরিক বাহিনীতে চাকুরীরত অফিসার, ১৯৫৬

পদ	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
জেনারেল	-	৩
মেজর জেনারেল	-	২০
ব্রেগেডিয়ার	-	৩৪
কর্ণেল	১	৪৯
লেফটেন্যান্ট কর্ণেল	২	১৯৮
মেজর	১০	৫৯০
নৌবাহিনীর অফিসার	৭	৫৯৩
বিমান বাহিনী অফিসার	৪০	৬৪০

সূত্র : *ডন (করাচী)* ৯ জানুয়ারী, ১৯৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের মোট আয়ের অধিকাংশ অর্জিত হতো পূর্ব বাংলায় উৎপন্ন পাট রপ্তানীর অর্থে আর তার সিংহভাগ ব্যয় হতো প্রতিরক্ষায়। অথচ পূর্ব বাংলার জনগণকে সেনাবাহিনী চাকুরী থেকে পদে পদে করা হয়েছে বঞ্চিত। সে সময়ের মোট ব্যয় এবং প্রতিরক্ষা ব্যয়ের একটি হিসেব নিম্নে দেয়া হলো :

প্রতিরক্ষা ব্যয় (মিলিয়ন রুপী)

বৎসর	মোট ব্যয়	প্রতিরক্ষা ব্যয়	শতাংশ
১৯৪৯-৫০	৮৫৬	৬২৫	৭৩
১৯৫৯-৬০	১,৮৪৭	১,০৪৪	৫৫
১৯৬৫-৬৬	৪,৪৯৮	২,৮৮৬	৬৪
১৯৬৬-৬৭	৩,৭৭৬	২,২৯৪	৬০

সূত্র : *পাকিস্তান বাজেট* ১৯৬৮-৬৯, অর্থ মন্ত্রণালয়।

অন্যান্য চাকুরীর ক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল সীমাহীন বৈষম্য। তারই উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯৬৬ সালের ১ ডিসেম্বর দৈনিক আজাদের বিবরণ থেকে। এতে পূর্ব দিনের জাতীয় পরিষদে আলোচনায় উল্লেখিত বৈষম্যের কথা বলা হয় ।

চাকুরী ক্ষেত্রে পূর্ব পশ্চিমের বৈষম্য

পদ	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারীয়েট	১৯	৮১
দেশরক্ষা	৮.১	৯১.৯
শিল্প	২৫.৭	৭৪.৩
স্বরাষ্ট্র	২২.৭	৭৭.৪
শিক্ষা	২৭.৩	৭২.৭
তথ্য	২০.১	৭৯.৯
স্বাস্থ্য	১৯	৮১
কৃষি	২১	৭৯
আইন	৩৫	৬৫

সূত্র : *দৈনিক আজাদ* ১ ডিসেম্বর, ১৯৬৬।

পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল এই নীতিতে বিশ্বাসী কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত সামরিক সংগঠন স্থাপন করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। মিলিটারী কলেজ একাডেমী, প্রিক্যাডেট কলেজ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী সবই স্থাপিত হয়েছিল পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের মতো সামরিক বিভাগের সকল সদর দফতরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেশের পশ্চিম অঞ্চলে। কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যালয়সমূহ এবং বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ের অবস্থান ছিল পশ্চিমে। ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান সহ সকল ব্যাংক বীমা, করপোরেশনসমূহ, পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বৈদেশিক দূতাবাস সমূহ ইত্যাদি সব কিছুই প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।[৯৯] ফলে পূর্বের উপর পশ্চিম অংশের কর্তৃত্ব ছিল পাকিস্তানের মতো দৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসনে বিশ্বাসী রাষ্ট্রের পক্ষে সাধারণ ব্যাপার।

তার উপর ১৯৪৭ সালে করাচীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতে ব্যয় হয় ২০০ কোটি টাকা। আইয়ুব আমলে রাজধানী স্থানান্তর করে ইসলামাবাদ তা গড়ে তুলতে ব্যয় হয় আরো ৫০০ কোটি টাকা। অপরদিকে ঢাকায় দ্বিতীয় রাজধানী

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল মাত্র ২ কোটি টাকা।[১০০] নিম্নের সারণীতে পাকিস্তানের দুই অংশের উন্নয়ন বৈষম্য তুলে ধরা হলো :

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন ব্যয়

সময়	উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যয়	পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়		মোট উন্নয়ন ব্যয়	মোট উন্নয়ন ব্যয়		গোটা পাকিস্তানের % হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়ন ব্যয়		
	মোট	সরকারী	বেসরকারী	পূর্ত	কর্মসূচী			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
পূর্ব পাকিস্তান								
১৯৫০/৫১-১৯৫৪/৫৫	১,০০০	৭০০	৩০০	-	-	১০০০	২৭১০	২০%
১৯৫৫/৫৬-১৯৫৯/৬০	২৭০০	১৯৭০	৭৩০	-	-	২৭০০	৫২৪০	২৬%
১৯৬০/৬১-১৯৬৪/৬৫	৯,২৫০	২৫০	৩০০০	-	৪৫০	৯৭০০	১০০৪০	৩২%
১৯৬৫/৬৬-১৯৬৯/৭০	১৬,৫৬০	১১০৬০	৫৫০০	-	-	১৬৫৬০	২১৪১০	৩৬%
			সিন্ধু অববাহিকা পূর্ব কর্মসূচী					
পশ্চিম পাকিস্তান								
১৯৫০/৫১-১৯৫৪/৫৫	৪০০০	২০০০	২০০	-	-	৪০০০	১১২৯০	৮০%
১৯৫৫/৫৬-১৯৫৯/৬০	৭৫০০	৪৬৪০	২৯৩০	-	-	৭৫৭০	১৬৫৫০	৭৪%
১৯৬০/৬১-১৯৬৪/৬৫	১৮৪০০	৭৭০০	১০৭০০	২১১০	২০০	২০৭১০	৩৩৫৫০	৬৮%
১৯৬৫/৬-১৯৬৯/৭০	২৬১০০	১০১০০	১৬০০০	৩৬০০	-	২৯৭৭০	৫১৯৫০	৬৪%

সূত্র : *চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উপদেষ্টা প্যানেলের প্রতিবেদন* ১ম খন্ড, পরিকল্পনা কমিশন, পাকিস্তান সরকার জুলাই, ১৯৭১।

শিক্ষা ক্ষেত্রে

বৈষম্যমূলক নীতির কারণে সাতচল্লিশ উত্তরকালে শিক্ষা ব্যবস্থায় চরম নৈরাজ্য নেমে আসে। পাকিস্তানের সরকারী পরিসংখ্যান ব্যুরো শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা গেছে যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের মতোই পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি পাঞ্জাবী শাসকদের ছিল সীমাহীন অবহেলা।[১০১] যে কারণে দেখা যায় যে ১৯৪৭-৪৮ সালে যেখানে পূর্ব বাংলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯,৬৩৩টি, সেখানে ১৯৫৪-৫৫ সালে নেমে দাঁড়ায় ২৬,০০০ টিতে। অর্থাৎ পাঁচ বছরের মধ্যে সাড়ে তিন হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটে। ফলে কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়।[১০২] শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৪৭-৪৮' ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত ২০ বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক স্কুল ও স্কুল বয়সী ছাত্রের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় তা ছিল নগণ্য। কেননা উপরোক্ত সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের শিশুদের স্কুলের সংখ্যা বেড়েছিল শতকরা ৩৫০ ভাগ। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে ছাত্র সংখ্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বিগুণ যেখানে ২০ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল পাঁচ গুণ আর পশ্চিম পাকিস্তানে বেড়েছিল ৩০ গুন।[১০৩] তাছাড়া ছাত্রদের বিদ্যালয় ত্যাগের সংখ্যাও ছিল পূর্ব বাংলার বেশী। বৈষম্য নীতির ফলে পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র সংখ্যা ইত্যাদির যেমন বৈষম্য ছিল, তেমন শিক্ষকদের বেতন স্কেল শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্ন ছকগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈষম্য তুলে ধরা হলো।

পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে তুলনামূলক বিদ্যালয় পরিত্যাগের শতকরা হার

পূর্ব	পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫৮-৬২	৭৪.২	৮১.৮	৫৭.৬
১৯৬০-১৯৬৪	৭২.৮	৭৮.৮	৫৬.২

সূত্র : *Education in progress, proceedings of the symposia, East Pakistan Education week,* 1968, P. 96.

Dhaka University Institutional Repository

উভয় প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার ছক ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬২-৬৩ পর্যন্ত

প্রতিষ্ঠানের ধরন	১৯৫০-৫১	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়						
পাকিস্তান	৩৭,২৫৮	৪৪,২২৪	৪৪,৪৮৪	৪৭,৫৭৪	৫১,৬৭৭	৫৫,৪৯২
পূর্ব পাকিস্তান	২৬,৩৫২	২৬,৬৮৮	২৬,৫৮৩	২৬,৬৬৫	২৬,৭৪৭	২৭,১৫৪
পশ্চিম পাকিস্তান	১০,৯০৬	১৭,৫৩৬	১৭,৯০১	২০,৯০৯	২৪,৯৩০	২৮,৩৩৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়						
পাকিস্তান	৬,৩৮২	৬,০৩০	৬০৯৬	৬,১১০	৬,৫৬৫	৬,৯৬৩
পূর্ব পাকিস্তান	৩,৫০৭	৩,০৬১	৩০৫৩	৩,১৪০	৩,২৫৪	৩,৩৭৭
পশ্চিম পাকিস্তান	২,৮৭৫	২,৯৬৯	৩০৪৩	২,৯৭০	৩,৩১১	৩,৫৮৬
শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়						
পাকিস্তান	১১৪	৯৬	১০২	১০৪	৯৮	৯৯
পূর্ব পাকিস্তান	৮২	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮
পশ্চিম পাকিস্তান	৩২	৪৮	৫৫	৫	৫০	৫১

সূত্র : *Statistical Digest of East Pakistan*, No. 2, 1964.
East Pakistan, Bureau of statistics P. 192.

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেলের বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তান

(ক)	মেট্রিক-নিম্ন (প্রশিক্ষণহীন)	ঃ	টা-৪৫ নির্ধারিত
(খ)	মেট্রিক-নিম্ন (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)	ঃ	টা-৫৫-১-৬০-২-৮০
(গ)	মেট্রিকুলেট (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)	ঃ	টা-৬০-১-৭০-২-৯০
(ঘ)	মেট্রিকুলেট (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)	ঃ	টা-৮০-১-৯০-২-১০০

পশ্চিম পাকিস্তান

(ক)	মেট্রিকুলেট (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) নিম্নতম গ্রেড (জুনিয়র)	ঃ	টা-১০০-৪-১৪০-৫-১৭৫
(খ)	মেট্রিকুলেট (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) নিম্নতম গ্রেড (সিনিয়র)	ঃ	টা-১১৫-৫-১৮০-২১৫
(গ)	১০% সিলেকশন গ্রেড	ঃ	টা-২১৫-১৫-৩০৫

সূত্র : *Report of the Commission on student problem and welfare*, Govt. of Pakistan, Ministry of Education (Karachi) 1966.

উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে ও ছিল বৈষম্য। গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যাপারে কৃষি চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রের ১৬টির মধ্যে ১৩টির অবস্থান ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। কলম্বো প্ল্যান, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, কমনওয়েলথ সাহায্য ইত্যাদির অধীনে বিদেশে অধ্যায়ন ও প্রশিক্ষণের জন্য যেই সব বৃত্তি দেয়া হতো তারও অধিকাংশ পেয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্ররা।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে বঞ্চনার ফলে পশ্চাৎপদ পূর্ব বাংলা আরো পিছিয়ে পড়েছিল ফলে এখানেও সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাপক বৈষম্য গবেষণা ক্ষেত্রে ব্যয়ে পূর্ব বাংলার প্রতি অনুসৃত বৈষম্যমূলক নীতির নমুনা নিম্ন ছকে তুলে ধরা হলো :

গবেষণা ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যঃ ১৯৫৪-৬৩

সাল	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫৪	৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ
১৯৫৫	১৩ "	৪৭ "
১৯৫৬	৫ "	১০ "
১৯৫৭	১৭ "	৮৩ "
১৯৫৮	২৬ "	৯০ "
১৯৫৯	১৮ "	১০৮"
১৯৬০	১৮ "	৯৭ "
১৯৬১	১৫ "	৮৫ "
১৯৬২	৩২ "	৯৯ "
১৯৬৩	৪২ "	১১৪ "
	মোট=১৯১ লক্ষ	মোট=৭৫৮ লক্ষ
	শতকরা ২০%	৮০%

সূত্র : *দৈনিক ইত্তেফাক* ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।

শুরু থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ যে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল, তার সাফল্য নির্ভরশীল ছিল স্বায়ত্তশাসন অর্জনের মধ্যে। বাঙালীর অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য স্বায়ত্তশাসন ছিল অনিবার্য। কিন্তু বার বার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা; বিশেষ করে পূর্ব বাংলার প্রতি কেন্দ্রের অর্থনৈতিক বঞ্চনার ফলে সৃষ্ট বিশাল বৈষম্য বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদসহ সমগ্র বাঙালী জাতিকে একাত্ম হতে সাহায্য করে। এ একাত্মতা বাঙালী জাতীয়তাবোধকে আরো দৃঢ় এবং সংহত করে। অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী শক্তি সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ; দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ভাঙ্গন ধরাতে মূল দায়িত্ব পালন করে। এভাবে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাব বলয় থেকে মুক্তি এবং বাঙালী জাতিসত্ত্বাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার পেছনে মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় অর্থনৈতিক আকাংখা, বাঙালী জাতির অর্থনেতিক স্বার্থ।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১।	রফিকুল ইসলাম	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা -৫৩।
২।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা - ৫৪।
৩।	মযহারুল ইসলাম	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১৩৮-১৩৯।
৪।	Md. Adbul Wadud Bhauyan	:	Emergence of Bangladesh and Role of Awami League. P.29.
৫।	এম, আর, আখতার মুকুল	ঃ	পাকিস্তানের চব্বিশবছর ভাসানী মুজিবের রাজনীতি পৃষ্ঠা ১১৪-১১৫।
৬।	আবুল মনসুর আহম্মেদ	ঃ	আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৪৭।
৭।	মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা - ৪৫৩
৮।	Shyamali Ghosh	:	The Awami League 1949-1971 P. 14.
৯।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা - ১৪-১৫।
১০।	আবুল মনসুর আহম্মেদ	ঃ	পূর্বোক্ত ২য় খন্ড পৃষ্ঠা - ৬০।
১১।	এম, আর, আখতার মুকুল	ঃ	পূর্বোক্ত ২য় খন্ড পৃষ্ঠা- ৯-১০।
১২।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা-১০।
১৩।	মওদুদ আহমদ	ঃ	বাংলাদেশ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা পৃষ্ঠা -৩৪।
১৪।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা- ৩৪।
১৫।	১৯৫৫ সালের ২১জুন পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যদের ভোটে দ্বিতীয় গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে বিজয়ী ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করা হলো। কে, এস, পির নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্টে কে, এস, পি থেকে নির্বাচিত সদস্যরা ছিলেন : এ, কে ফজলুল হক, হামিদুল হক চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী, আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, নরুল হক চৌধুরী, আবদুল ওহাব খান, আব্দুল সাত্তার, লুৎপর রহমান খান, আব্দুল আলীম, মাহফুজুল হক। নেজামে ইসলাম থেকে মাওলানা আতাহার আলী ও মওলবী ফরিদ আহম্মদ। গণতন্ত্রীদলথেকে মাহমুদ আলী, আব্দুল কারিম ; দল ছুট আওয়ামী মুসলীম লীগ থেকে সৈয়দ মেসবাহ উদ্দিন এবং অয়েণ উদ্দিন সহ মোট ১৬ জন। আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, জহির উদ্দিন, শেখ মুজিবুর রহমান, নুরুর রহমান, দেলদার আহমেদ, আবদুল রশীদ তর্কবাগীশ, আব্দুর রহমান খান, মোজাফফর আহমেদ, মোসলেম আলী মোল্লা, আব্দুল মালেক সহ মোট ১২ জন। এছাড়া কমিউনিষ্ট পাটি থেকে সর্দার ফজলুল করিম, মুসলিম লীগ থেকে মোহাম্মদ আলী (প্রধান মন্ত্রী) জাতীয় কংগ্রেস থেকে বসন্তকুমার দাস, ভুপেন্দ্রকুমার দাস, কান্তেশ্বর বর্মণ ও পিটার পল গোমেজ। ইউ পি পি থেকে ডঃ শৈলেন্দ্র কুমার সেন। কামিনী কুমার দত্ত। তফসিলী ফেডারেশন থেকে অক্ষয় কুমার দাস, রসরাজ মন্ডল, গৌর চন্দ্র বাবা এবং স্বতন্ত্র ফজলুর রহমান (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী)। আবু আল সাঈদ আওয়ামী লীগের ইতিহাস ১৯৪৯-১৯৭১ পৃষ্ঠা ৬০।		
১৬।	এম, আর, আখতার মুকুল	ঃ	পূর্বোক্ত ১ম খন্ড পৃষ্ঠা- ১৫৫।
১৭।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা- ৩৫।
১৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা -৩৬।
১৯।	এম, আর, আখতার মুকুল	ঃ	পূর্বোক্ত ২য় খন্ড পৃষ্ঠা -৫৪।
২০।	রফিকুল ইসলাম	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৬২।
২১।	এম, আর, আখতার মুকুল	ঃ	পূর্বোক্ত ১ম খন্ড পৃষ্ঠা- ১৫৬।
২২।	আবু আল সাঈদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা- ৭০।
২৩।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা -৭০।
২৪।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৩৯-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

২৫।	আবু আল সাঈদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৬৫।
২৬।	মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৪৫৭।
২৭।	আবু আল সাঈদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৮২।
২৮।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৪৮।
২৯।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা-৪৮।
৩০।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা-৪৮।
৩১।	মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পৃষ্ঠা ৪৫৮।
৩২।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা- ৫২-৫৩।
৩৩।	মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৪৬১।
৩৪।	আবু আল সাঈদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১০৭-১০৮।
৩৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা - ১০৮।
৩৬।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা - ১০৮।
৩৭।	মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪৬৩।
৩৮।	আবু আল সাঈদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১১০।
৩৯।	১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারী ফরমানে যে সকল রাজনীতিবিদদের এবডো আইনের (Elective BOdies Disqualification Order) আওতাভূক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাদের মধ্যে ছিলেন আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহাম্মদ মুনসুর আলী, মশিউর রহমান, কফিলুদ্দিন চৌধুরী, আবদুল লতিফ বিশ্বাস, মাহমুদ্দন্নবী চৌধুরী, আবদুল হাকিম, আবদুল হামিদ চৌধুরী, মোসলেম আলী মোল্লা, এম, কোরবান আলী, নুরুদ্দিন আহমেদ, আবদুল মতিন, ফজলুল করিম, আবদুস সালাম মোখতার, ওয়াহিদুজ্জামান ও দেওয়ান মহিউদ্দিন। তাছাড়া ইন্ডেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কর তালিকার অধীনে যাঁরা এবডোভূক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন সৈয়দ অজিজুল হক ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, প্রভাষচন্দ্র লাহীড়ী, সুরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বিজয়চন্দ্র রায়। তাছাড়া যারা জেলেছিলেন তারা স্বাভাবিক নিয়মেই এবডোর আওতায় আগে থেকেই রয়েছেন। আবু আল সাইদ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১১২-১১৩।		
৪০।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা- ৫৩।
৪১।	মৌলিক গণতন্ত্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী মোট ৮০,০০০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে। দুই অংশ থেকে সম সংখ্যক (৪০,০০০ হাজার পূর্ব বাংলা থেকে অনুরূপ সংখ্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে) নির্বাচিত গণতন্ত্রীরা আবার প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের নির্বাচিত করবেন। এর ফলে জনগণ একদিকে প্রত্যক্ষ ভোটের অধিকার হারায় অপর দিকে ৮০,০০০ হাজার নির্বাচিত সদস্যকে হাত করতে পারলে ক্ষমতায় টিকে থাকা ক্ষমতাসীনতের জন্য নিশ্চিত হয়ে যায়। মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪৬৩।		
৪২।	এম, আর, আখতার মুকুল	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৮৪।
৪৩।	আবু আল সাঈদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১১০।
৪৪।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫।	মোহাম্মদ হান্নান	ঃ	পূর্বোক্ত ২য় খন্ড পৃষ্ঠা-৫৪।
৪৬।	পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস (১৯৬৮) গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট পৃষ্ঠা-৫১-৫২)।		
৪৭।	মোহাম্মদ হাননান	ঃ	পূর্বোক্ত ২য় খন্ড পৃষ্ঠা-৫৬ ।
৪৮।	আবু আল সাঈদ		পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১১১।
৪৯।	মোহাম্মদ হাননান		পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৫৭।
৫০।	মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৪৬৪।
৫১।	আবু আল সাঈদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১১২।
৫২।	মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৪৬৪-৪৬৫।
৫৩।	মোহাম্মদ হাননান	ঃ	পূর্বোক্ত (২য় খন্ড)পৃষ্ঠা-৫৭।
৫৪।	মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৪৬৫।
৫৫।	আবু আল সাঈদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১১২।
৫৬।	মযহারুল ইসলাম	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-২১১।
৫৭।	আতাউর রহমান খান	ঃ	স্বৈরাচারের দশ বছর পৃষ্ঠা-২২০-২২৩।
৫৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা-২২০-২২৩।
৫৯।	মযহারুল ইসলাম	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-২১৬।
৬০।	ঐ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-২১৬-২১৭।
৬১।	ঐ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-২১৮।
৬২।	মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৪৬৭।
৬৩।	জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, পাকিস্তান সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জানুয়ারী-আগষ্ট ১৯৫৯ (করাচী ১৯৬১)।		
৬৪।	মোহাম্মদ হান্নান	ঃ	পৃষ্ঠা- ৩৯৫ - ৩৯৮।
৬৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা-২৪।
৬৬।	ঐ	ঃ	পূর্বোক্ত (২য় খন্ড) পৃষ্ঠা-৭১-৭৫।
৬৭।	আবু আল সাঈদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১১৪।
৬৮।	মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৪৬৭।
৬৯।	এম, আর, আখতার মুকুল	ঃ	পূর্বোক্ত ২য় খন্ড পৃষ্ঠা-৯৪।
৭০।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৬৩।
৭১।	তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)	ঃ	পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর পৃষ্ঠা-১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

৭২।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৬৩।
৭৩।	ঐ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৬৩।
৭৪।	মযহারুল ইসলাম	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৭৮।
৭৫।	ঐ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯ (লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব এ কথা বলেন উক্ত সময়ে সাংবাদিক কে, জি, মোস্তাফাসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।)
৭৬।	সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১৯৮৮ সালের ২১ জানুয়ারী সংখ্যা ও ৮ এপ্রিল প্রকাশিত নিবন্ধ এবং এ বিষয়ে লিখিত নুরউদ্দিন আহাম্মদ আশরাফ হোসেন ও আব্দুর রহমান সিদ্দিকীর চিঠি সমূহ। তাছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, দলিলপত্র অষ্টম খন্ড পৃষ্ঠা ৩১-এ বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে।		
৭৭।	ডঃ মোহাম্মদ হান্নান	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৫৪।
৭৮।	খোকা রায়	ঃ	সংগ্রামের তিন দশক (১৯৩৮-১৯৬৮) পৃষ্ঠা-১৮২।
৭৯।	স্বাধীন পূর্ববঙ্গ দাবী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক চিঠি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্টি পার্টি ১৪ই জুলাই ১৯৬২ সাল।		
৮০।	জেলা ইউনিট গুলোর কাছে প্রেরিত পার্টির সভ্যদের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির দলিল, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পাটি ২৮ আগষ্ট, ১৯৬২ সাল।		
৮১।	মযহারুল ইসলাম	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা - ২৩৩।
৮২।	অমিত গুপ্ত	ঃ	গতিবেগ চঞ্চল বাংলাদেশ মুক্তি সৈনিক শেখ মুজিব পৃষ্ঠা- ৫০৮।
৮৩।	আবু আল সাঈদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা - ১২৭।
৮৪।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৩০।
৮৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা -১৩০।
৮৬।	মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা -৪৭০।
৮৭।	মুওদুদ আহমদ	ঃ	পৃষ্ঠা - ৬৫।
৮৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা -৬৫।
৮৯।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা - ৬৫-৬৬।

৯০। ভারত থেকে আগত (১৯৫১ পর্যন্ত) উদ্বাস্তুদের সংখ্যা (লক্ষ লোকের হিসাব)

	প্রদেশ ও এস্টেটের নাম	জনসংখ্যা	প্রদেশের বা এস্টেটের মোট শতকরা
১।	উত্তর প্রদেশ পশ্চিম সীমান্ত	০.৫১	১.৬
২।	পাঞ্জাব	৪৯.০৮	২৬.১
৩।	ভাওয়ালপুর	৩.৭৩	২০.৫
৪।	সিন্ধু	৫.৪০	১১.৭
৫।	খয়েরপুর	০.১০	৩.১
৬।	বেলুচিস্থান	০.২৮	২.৪
৭।	করাচী ফেডারেল এলাকা	৬.১৭	৫৫.০
	মোট পশ্চিমপ াকিস্তান	৬৫.২৮	১৯.৫
	মোট পূর্ব পাকিস্তান	৬.৯৯	১.৭
	মোট পাকিস্তান	৭২.২৭	৯.৭২

Dhaka University Institutional Repository

৯১।	অজয় রায়	ঃ	বাংলাদেশের অর্থনীতি অতীত ও বর্তমান পৃষ্ঠা ১২৬।
৯২।	সূত্র Adapted from Nafis Ahmad, An Economic Geograply of East Pakistan, 2nd Ed. (london oxtord University press 1968) Table 35, P. 223, C.N.Vakil Economic Consequences of Divided India (Bombay: vora and Co. 1050), Tabls VII7, VII 23 and Appendix pp 286-7, The East Pakistan figures for Jutepress, Tea Factories, Hosiery and Rice Mills one all from Ahmad. All other figurrs and from vakhi vakills data for 1945 and Ahmads for 1947.		
৯৩।	আতিউর রহমান লেলিন আজাদ	ঃ	পৃষ্ঠা-১২২-১২৩।
৯৪।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা-১২২-১২৮।
৯৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা-১১১।
৯৬।	অজয় রায়	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১২৬।
৯৭।	আতিউর রহমান লেলিন আজাদ		পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১২০।
৯৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা-১১৪।
৯৯।	মুহাম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পৃষ্ঠা-৪৭৮।
১০০।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা-৪৭৮।
১০১।	মোহাম্মদ হান্নান	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা -১৪৬।
১০২।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা-১৪৭।
১০৩।	মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য	ঃ	পৃষ্ঠা-৪৭৮-৪৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়
বাঙালী জাতীয়তাবাদ

পাকিস্তানের দুই অংশে বিরাজমান দুই ধরনের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার অর্থনীতিবিদগণ বাংলার সর্বসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য ভিন্ন আন্দোলণের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেন। আন্দোলনমুখী প্রবণতার বর্হিপ্রকাশ ঘটে বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। যার প্রথম পদক্ষেপ ছিল অর্থনীতিবিদগণ কর্তৃক প্রদত্ত দুই অর্থনীতির তত্ত্ব। যে তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদী শক্তি তৈরী করে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী। কর্মসূচীর পক্ষে গণজোয়ার স্তব্ধ করার জন্য পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বেছে নেয় চরম নির্যাতনের পথ। এমন কি এর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের নির্বাচনী রায়কে পর্যন্ত উপেক্ষা করা হয়। পূর্ব বাংলার জনগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে, চালানো হয় সশস্ত্র আক্রমণ। ফলে অধিকার আদায়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী বাঙালী অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়। এভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদ।

১৯৫৬ সাল থেকে এদেশের অর্থনীতিবিদরা পাকিস্তানের দুই অংশে বিরাজমান অর্থনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বাঙালী অর্থনীতিবিদরা এই বিষয়ে আলোকপাত করেন।[১] এই নীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের কারণে ষাটের দশকে বিষয়টি আরো গুরুত্ব পেতে থাকে।[২] ১৯৬১ সালে বিভিন্ন উদাহরণ এবং যুক্তি প্রমাণের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার অর্থনীতিবিদরা জাতির সামনে পূর্ব ও পশ্চিমের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন যে নানা ঘটনা প্রবাহে পাকিস্তানে এখন দুই অর্থনীতি বিরাজমান। এর পেছনের কারণ চিহ্নিত করতে যেয়ে তিনি বলেন, এর একটি হচ্ছে উভয় অঞ্চলের মধ্যকার ভৌগলিক দূরত্ব। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সরকার সমূহের এক অর্থনীতি নীতি পরিচালনার ফলে পশ্চাদপদ পূর্ব বাংলার জন্য তা যেমন হয়েছে অসুবিধাজনক তেমন তা জন্ম দিয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্যের।[৩] ভৌগলিক দূরত্ব এবং শোষণের জের হিসেবে পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি দু'ভাবে হচ্ছে বলে অবিলম্বে বাস্তব পরিস্থিতি স্বীকার করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তারমত অনুযায়ী দেশের দুই অংশকে স্বায়ত্বশাসনের কাঠামোর মধ্যে এনে, দুই অংশকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে আভ্যন্তরীণ ও বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহারের কতৃত্ব ছেড়ে দিতে হবে। আঞ্চলিক আয় এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় এর সম্পূর্ণ অধিকার আঞ্চলিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পণ করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে পূর্ব বাংলা পিছিয়ে থাকার কারণে আপাততঃ কেন্দ্রকে দেয় পূর্ব বাংলার হিস্যা সামান্য নির্ধারণ করতে হবে। পূর্ব বাংলায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেলে কেন্দ্রকরে দেয় হিস্যার পরিমানও আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তাছাড়া তিনি আরো বলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের সমৃদ্ধি অর্থ পূর্ব বাংলার সমৃদ্ধি নয়। পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের এই নীতি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত হওয়ার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কোন অবস্থাতেই পূর্ব বাংলাকে সজীব করতে পারে না। বরং এর পরিণতি মোটেও সুখকর হবে বলে মনে হয় না। অধ্যাপক সোবহান আরো বলেন যে, বর্তমান সরকারের বিনিয়োগ নীতি মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ১ হাজার ৩ শত ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে সেখানে পূর্ব বাংলার জন্য লক্ষ্য মাত্রা হচ্ছে মাত্র ৯৫০ কোটি টাকা। উপরন্তু প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাইরে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পৃথকভাবে আরো ১ হাজার ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তাই সরকার অনুসৃত নীতির ফলে দেশের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য আরও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে বাধ্য।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর এই বক্তব্য পূর্ব বাংলায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর এই ধারণাকে রাজনীতিবিদদের স্বায়ত্তশাসন এর সম্পূরক হিসেবে গণ্য করা হতে থাকে। শ্যামলী ঘোষের ভাষায় : "If during the Martial Law period Ataur Rahaman had given the most extensive account of the political Maladies of pakistan, It was Rehman Sabhan who most clearly defined its economic maladies. And these two combined together signalled the course East Pakistani Politics was about to take after the ban on political parties was lifted."[৫]

রাজনৈতিক দল গুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পূর্বেই মার্শাল ল চলাকালীন বিষয়টি নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। ১৯৬১ সালে আইয়ুব খানের মন্ত্রী সভার দুই সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দিতে আসেন ছাত্ররা রেহমান সোবহানের বর্ণিত দুই অর্থনীতির সম্ভাব্যতা ও তার উপযোগিতা নিয়ে আলোচনার পর সরাসরি এ বিষয়ে মন্ত্রীদের মতামত দাবী করে। অপ্রস্তুত মন্ত্রীদ্বয় সদুওর দিতে ব্যর্থ হলে ছাত্রদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হন।[৬] পূর্ব বাংলার শিক্ষিত এবং ছাত্র সমাজের মধ্যে এর তীব্র প্রতিক্রিয়ার এটি হচ্ছে একটি দৃষ্টান্ত। শুধু এরাই নয় পূর্ব বাংলার শিক্ষিত এবং ছাত্র সমাজের মধ্যে এর তীব্র প্রতিক্রিয়ার এটি হচ্ছে একটি দৃষ্টান্ত। শুধু এরাই নয় পূর্ব বাংলার উঠতি শিল্পপতি ব্যবসায়ী পশ্চিমা বড় বড় শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে মুক্তি পাবার উপায় হিসেবে দুই অর্থনীতি নীতি বিষয়ে আগ্রহী হতে থাকেন। পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তি এবং এর দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির কথা ধ্বনিত হতে শোনা যায় জাতীয় পরিষদের এক সাংসদের কণ্ঠে। তিনি পূর্ব বাংলার বাঙালী ব্যবসায়ীদের এবং ব্যবসার অবস্থা সম্পর্কে বলেন : "How can we, East Pakistanis, form capital ? How can capital be formed in East Pakistan ? Sir, when the government decided to give more and more to East Pakistan in the import trade as you know in the import trade East Pakistanis are not categorized importers— they dicided that there should be OGL (Open General license) importers and the OGL system was introduced and East Pakistanis were allowed to import and they were registered as importers. But as soon as the authorities found that East Pakistanis are coming and becoming importers and trying to form small capitales, they overnight abolished the system of OGL and brought free list. Sir it is open to everybody that East Pakistanis have very small capital. They cannot compete in free list...They cannot compete with the big industrialists ... In East Pakistan, you will find that not even a single chamber will be able to come and stand for this system of free list because the system of free list has completely damaged the economic backing and background of the commercial community of East pakistan .... you cannot have the same system for both East and west Pakistan.....if you want real national integration ... treat us equally in the economic life of the country."[৭]

কাঁচামাল খুচরা যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য বরাদ্দকৃত লাইসেন্সের মুল্যের পরিমান ১৯৫১-৫৮ (১০০০.০০)

সময়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫১	৫২,৪০০	৮৮,৯৮১
১৯৫২	৪২,৫৭৯	১,৩৭,৪৬৮
১৯৫৩	৪৫,৫২৫	৮২,২৪২
১৯৫৪	৪৩,২২৭	১০৪,৬০৮
১৯৫৫	৫১,০৭২	১৪৪,২০১
১৯৫৬	৮৪,৭৮২	৮৪,১৭৮
১৯৫৭	৯৪,১২৩	৯৪,৮৫৪
১৯৫৮	৮৪,৮৩২	৮৭,২৬৬

সূত্র : *Economic Disparits Between East and west pakistan (1963),* Planing Department, East Pakistan P. 20.

পূর্ব বাংলার ব্যবসায়ী উঠতি পুঁজিপতি শ্রেণী পশ্চিমা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে মুক্তির

Dhaka University Institutional Repository

চমৎকার হাতিয়ার হিসেবে দুই অর্থনীতিকে সমর্থন দান করে। যার উপর ভিত্তি করে শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ৬ দফা প্রণয়ন করে ছিলেন। এভাবে এই শ্রেণীটিও স্বাত্তশাসনের সমর্থক হয়ে ওঠে। দেশের আমলা শ্রেণীও দুই অর্থনীতির সামর্থকে পরিণত হয়। কারণ তারা এটিকে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের চাবী কাঠি এবং কেন্দ্রর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ বলে ধরে নেন। সাধারণ বাঙালী শ্রমিক শ্রেণীও দুই অর্থনীতির প্রতি ঝুকে পড়ে।[৮] তারা শ্রেণী স্বার্থই এর প্রতি আগ্রহী হয়। কেননা পূর্ব বাংলার যে কয়টি শিল্প কলকারখানা ছিল তার মালিক থেকে শুরু করে অধিকাংশ কর্মচারী কর্মকর্তা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী অথবা অবাঙালী। যারা বাঙালী শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিশীল তা ছিলই না, বরং তারা বাঙালী অবাঙালী শ্রমিকদের ভিন্ন ভিন্ন নজরে দেখতো। তাছাড়া বাঙালী শ্রমিকের মজুরিও ছিল কম। এদের মধ্যে এই ধারণা জন্মে যে, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা হলে তারা এদের শোষক অবাঙালী মালিক, প্রতিদ্বন্দ্বি সহকর্মী শ্রমিক শ্রেণীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। গ্রামের কৃষক শ্রেণীও এর মধ্যে চরম শোষণ নির্যাতন এবং দারিদ্র থেকে মুক্তি পাওয়ার উজ্জল সম্ভাবনায় আশান্বিত হয়। বাংলার সচেতন কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষ সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে ভুল করে না এ কারণে দেখা যায় যে, পরবর্তীতে স্বায়ত্তশাসন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান যখন আসে তাতে নিম্ন শ্রেণী সাড়া দিতে বিলম্ব করে নাই। দুই অর্থনীতি তত্ত্বের ব্যাপক প্রচার বাংলার জনগণকে তীব্রভাবে স্বীয় স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। দুই অর্থনীতি বাংলার সকল শ্রেণীর মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। জনগণের মানসিক প্রস্তুতি এবং দুই অর্থনীতির ধারণা সায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের পক্ষের হাতকে শক্তিশালী এবং দৃঢ় করে। এই নীতির প্রবক্তরাই পরবর্তী সময় বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিকাশ এবং পরিণতির পথের নির্দেশনা প্রদান করেন। এর পর থেকে গণতন্ত্র স্বায়ত্তশাসন এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদ তিনটি শব্দ একাকার হয়ে যায়। একটি হয়ে ওঠে অপরটি সম্পূরক। এবং এই 'দুই অর্থনীতি'র তত্তকে মূলধন করে আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক সফল্যের পথ তৈরী করতে সক্ষম হয়। Shyamoli Ghosh এর ভাষায় : "Some Awami league leaders in East pakistan made the most ingennous use of the 'two economic' thesis as a strong foundation of their future oplitical programme."[৯]

পূর্ব বাংলার জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তনের এই ধারণা শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৬-দফার পটভূমি রচনা করে ছিল।[১০] যা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সনদ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে স্বতন্ত্র চেতনা বিস্তার এবং স্বায়ত্তশাসন দাবীকে দৃঢ় করার পেছনে আরো একটি ঘটনা বিশেষ ভূমিকা রেখে ছিল ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধ। পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যকার বৈষম্যের ব্যাপকতা যুদ্ধের ফলে পূর্ব বাংলার জনগণের চোখে পরিস্কারভাবে ধরা পড়ে। বিষয়টি যতই তাদের উপলব্ধিতে আসতে থাকে ততই তারা স্বায়ত্তশাসনের দাবীরপ্রতি অনমনীয় হতে থাকে। ভাষাভিত্তিক, অঞ্চল ভিত্তিক স্বতন্ত্র জাতি চিন্তাও তীব্র হতে থাকে। '৬৫ সালের যুদ্ধকালীন সমগ্র পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতা, তিন দিক শত্রু দ্বারা পরিবেষ্ঠিত অবস্থা; বাঙালীর মনে নিরাপত্তা হীনতার জন্ম দেয়। তারা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে যে, পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার বিষয়টি পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। তাছাড়া এতো দিন ধরে যে ধারণা পোষণ এবং প্রচার করা হয়েছে যে বাঙালীরা যোদ্ধা জাতি নয়, পশ্চিম রণাঙ্গনে বাঙালী সৈন্যদের বীরত্ব মরণ পণ লড়াই-এ তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ফলে একদিকে তারা যেমন পূর্ব বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সোচ্চার হয়, তেমন অপর দিকে বাঙালীদের সামরিক বাহিনীতে অধিক সংখ্যক সুযোগ দেয়ার দাবী তোলে। ১৫ দিনের যুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও ভবিষ্যৎ শত্রুতার সম্ভবনা থেকেই যায়। ফলে পূবাংশের স্বয়ং সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং এর জন্য এ অঞ্চল থেকে অধিকাংশ সৈন্য সংগ্রহের দাবীটি সময়ের দাবী হিসেবে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার সামরিক শিক্ষা এবং সকল সক্ষম ব্যক্তির জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কেন্দ্রের প্রতি আহ্বান জানান। প্রাদেশিক পরিষদে সরকারী, বিরোধী এবং স্বতন্ত্র সদস্যগণ কর্তৃক পূর্ব বাংলাকে সামরিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়। অপর দিকে তাসখন্দ ঘোষণা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকেও সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আবার যুদ্ধ চলাকালীন পূর্ব বাংলার প্রতি কেন্দ্রের উদাসীন্য দায়িত্বহীনতায় এ অঞ্চলের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়।[১১] ফলে সমগ্র পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী মনোভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে।

যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালীর মনে এই উপলব্ধি আগের থেকে আরো বেশী দৃঢ় হয় যে, পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতিক

Dhaka University Institutional Repository

দুরবস্থার মূল কারণ হচ্ছে সম্পূর্ণ রূপে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীলতা। যদি পূর্বাংশ কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পতিত হবে। পূর্ব বাংলা মুলতঃ কাঁচা মাল সর্বরাহ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে তেমন কোন কলকারখানা গড়ে তোলা হয় নাই। অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুদ করার মতো কোন উদ্যোগও গ্রহণ করা হয় নাই। বরং একে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এই অবস্থায় পূর্ব বাংলার বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ তিনটি দাবী নিয়ে সামনে চলে আসেন।[১২] লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার জন্য সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন; পাকিস্তানের দুই প্রদেশের জন্য দুই অর্থনীতি এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

চল্লিশের দশকের শেষে প্রান্তে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে জাতি চেতনার ইঙ্গিত দেখা যায়। পঞ্চাশের দশকে তার উন্মেষ ঘটে এবং রাজনৈতিক আন্দোন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সকল আন্দোলনের পেছনে অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনা মূল কারণ হলেও এটি তখন পর্যন্ত আড়ালেই থেকে যায়। কেন্দ্রের অনুসৃত নীতি, দেশের একাংশকে বঞ্চিত করে অপরাংশের সমৃদ্ধি অর্থাৎ পূর্ব বাংলাকে শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের ফল ষাটের দশকে এ অঞ্চলের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত করতে থাকে। বৈষম্য আর বঞ্চনার ইতিহাস ভুক্তভূগী বঞ্চিত সর্বসাধারণের জীবন জীবীকাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। পূর্ব বাংলার জনগণের বিপর্যস্ত ভাগ্য তাদেরকে মরণপণ লড়াই এ অংশ নিতে বাধ্য করে। ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে পূর্ব বঙ্গবাসী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। যার আদর্শ হিসেবে সামনে এসে দাঁড়ায় বাঙালী জাতীয়তাবাদ। শেষ পর্যন্ত বাঙালী জাতীয়তাবাদের আদর্শ শোষীত বাঙালীর অর্থনৈতিক মুক্তি রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ারে পরিণত হয়। যে আন্দোলনে যুক্ত হয় সর্বশ্রেণীর সর্বস্তরের বাঙালী। এই একাত্মতাই তাদের একটি লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করতে থাকে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ উপস্থিত করে ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচী।

৬-দফা ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ ও পরিণতির ইঙ্গিত বহ একটি প্রমাণ্য দলিল। ষাটের দশকে দুই অর্থনীতির প্রভাব অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রা বেড়ে এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে বিচ্ছিন্নতার চিন্তা অত্যান্ত দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নামে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার স্বৈরাচারী নীতির ফলে পাঞ্জাবী শাসক গোষ্ঠীর প্রতি বাঙালীর আস্থা সমূলে উৎপাটিত হয়ে ছিল। চরম শোষণ প্রক্রিয়া প্রতিটি বাঙালীর জীবন যাত্রার যে বিরূপ প্রভাব ফেলে ছিল, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পূর্ব বঙ্গবাসী মরিয়া হয়ে উঠে। এ সময়েই শেখ মুজিব স্বায়ত্তশাসন ভিত্তিক ৬-দফা দাবী নিয়ে বাঙালীর সামনে উপস্থিত হন। ফলে শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন বাঙালীর নেতা। ৬-দফা পরিণত হয়ে বাঙালীর মুক্তি সনদে। এর উপর নির্ভর করেই বাঙালী স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। যে কারণে ৬-দফাকে বাঙালী জাতীয় ইতিহাসের 'turning point' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ৬-দফার মূলদাবীগুলোর উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ফেডারেশন গঠন। প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র দপ্তর ছাড়া বাকীসব বিষয় ফেডারেশন গঠনকারী রাজ্যগুলোর হাতে অর্পণ। দুই অংশের জন্য সহজ বিনিময় যোগ্য পৃথক মুদ্রার প্রচলন এবং দুই অংশের জন্য দুটি স্বতন্ত্র ষ্টেট ব্যাংক স্থাপন। অথবা দুই অংশের জন্য একই মুদ্রা চালু করা তবে শাসনতন্ত্রে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা অন্য অঞ্চলে পাচার হতে না পারে। দুই অঞ্চলে দুটি পৃথক রিযার্ভ ব্যাংক স্থাপন। সকল ট্রাক্স খাজনা ধার্য করার ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর সদরদপ্তর প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠন করা ইত্যাদি।[১৩]

পূর্ববঙ্গবাসীর অধিকার সম্বলিত দাবী ৬-দফা দ্রুত বাঙালী সমাজে জন প্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। শেখ মুজিব স্বয়ং এই দাবীর সপক্ষে প্রচার কার্যে অবতীর্ণ হন। ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ থেকে ৮মে পর্যন্ত মাত্র ৩৫ দিনের মধ্যে তিনি এ দাবীর পক্ষে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।[১৪] দেশে এবং বিদেশে অবস্থিত সর্বস্থরের বাঙালী এর মধ্যে তাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মুক্তির সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত খুজে পান। '৫৪ এর ২১ দফার মতো ৬-দফাকে কেন্দ্র করে বাঙালী সমাজে আরেক দফা জাতীয়তাবাদী চেতনার ঢেউ ওঠে। জনগণের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে যেয়ে কে, আলী নিখেছেন : "The People of East Pakistan welcome the six points of Sheikh Majibur Rahman as the Magna Charta" [১৫] বাঙালীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা সম্পর্কে মোঃ এ, ওয়াদুদ ভূঁইয়া লিখেছেন : "It was virtually the blue print for Bengali right to live."[১৬]

৬-দফা আসলে নতুন কোন দাবী ছিল না। শেখ মুজিব স্বয়ং তার বিভিন্ন ভাষণেই বিষয়টি জনগণের কাছে বার

Dhaka University Institutional Repository

বার ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে '৬-দফা নতুন কিছু নয়। স্বায়ত্তশাসন দাবী আমরা জানিয়ে আসছি পাকিস্তানের জন্মসূত্র থেকেই। প্রদেশের জন্য অধিকার ক্ষমতা কেন্দ্রকে দূর্বল করে ফেলবে, একথা যাঁরা বলেন তারাই আসলে পাকিস্তানের অমঙ্গল কামনা করছেন। পাকিস্তান সেদিনই উন্নত একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবে যেদিন উভয় অংশ সমান শক্তিশালী এবং উন্নত হবে।'[১৭]

তিনি ৬-দফার প্রতিটি দফা ব্যাখ্যা করে বলেন, 'আপনারা নতুন করে পুরনো দাবীগুলোর কথা শুনছেন, ২১দফার মধ্যে ছিলো স্বায়ত্তশাসনের দাবী, কিছুদিন আগেও আমরা ১১-দফায় স্পষ্ট করেই স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছি। ৬-দফা মুলতঃ আমাদের বাঁচার অধিকারের দাবী।'[১৮]

ছয় দফা প্রকৃতই কোন নতুন দাবী ছিল না। ৬-দফার উল্লেখিত প্রস্তাবগুলো ছিল ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপিত আগের দাবীগুলোর ওপরে ভিত্তি করে প্রণীত তবে নিঃসন্দেহে তা ছিল বিস্তৃত ও বাস্তব কাঠামোসম্পন্ন। মওদুদ আহমদের মতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র সুবিন্যস্ত করার লক্ষ্যে ৬-দফা কর্মসূচীতে তেমন বিশেষ কোনো নতুনত্ব ছিল না। ১৯৩০ এবং '৪০ এর দশকের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কার্যোপযোগী একটি ফেডারেশন গঠনের ধারণা লাহোর প্রস্তাব এবং পরবর্তীকালে কেবিনেট মিশন পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হয়েছে। দুটিতেই স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রসমূহ গঠনের কথা বলা হয় যদিও লাহোর প্রস্তাবে 'স্বাধীনতা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। এই অর্থে কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা ছিল আরোবলিষ্ঠ। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের তালিকা প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয় এবং যোগাযোগ এই তিনটি বিষয়ে সীমিত করে রাখা হয়। ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের মহাসম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতারাও অংশ গ্রহণ করেন এবং সেখানে মুলনীতি কমিটির সুপারিশের বিরোধীতা করে প্রণীত শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবনায় কেন্দ্রের হাতে শুধু প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয় এই দুটি বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ দিয়ে 'পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র' গঠনের প্রস্তাব পেশ করা হয়। এতে আরো বলা হয় যে দেশের প্রতিটি অংশে একটি করে সেনাবাহিনীর দুটি ইউনিট থাকবে এবং কেন্দ্রীয় রাজধানীতে অবস্থানরত সেনা অধিনায়কের নির্দেশে আঞ্চলিক কম্যান্ডারদের নিয়ন্ত্রণে সেগুলো পরিচালিত হবে। সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানে একটি আঞ্চলিক পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় স্থাপনেরও প্রস্তাব দেয়া হয়। করারোপের ব্যাপারে সম্মেলনে প্রস্তাব দেয়া হয় যে, কেন্দ্র প্রদেশের সম্মতিসাপেক্ষে কেবলমাত্র কতিপয় সুনির্দিষ্ট খাতে করারোপ করতে পারবে। অপরদিকে ১৯৫৪ সালের ২১ দফা কর্মসূচীতে কেবলমাত্র মুদ্রা, প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে রেখে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেয়ার দাবীজানানো হয়।[১৯]

সুতরাং ৬-দফার উল্লেখিত দাবী গুলো সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার পরিচিত হলেও এই দাবী সমূহের ঘোষণায় তাদের আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কারণ ছিল অনেক। এমন এক সময়ে ৬-দফা কর্মসূচী দেয়া হয়। যখন বাঙালীরা ছিলেন রাজনৈতিক অংশীদারীত্বের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে প্রায় আট বছর যাবৎ বঞ্চিত এবং শোষণের মাত্রা সীমাছাড়িয়ে গিয়েছিল।[২০] তাছাড়া পাকিস্তান সৃষ্টি লগ্ন থেকে বাঙালী স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও, ৬-দফা কর্মসূচী অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ভিন্ন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়েছিল। এর আগে স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে কেন্দ্রের হাতে তিনটি বিষয় থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু ৬-দফায় শুধু দুইটি বিষয় কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেয়ার কতা বলা হয়েছে, যেমন দেশ রক্ষাও পররাষ্ট্র। দুই অঞ্চলের জন্য পৃথক ষ্টেট ব্যাংক, মুদ্রা চালু এবং সমস্ত ধরনের কর ধার্য্য করার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের আওতাভুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্ব বাংলার অনেক বামপন্থী নেতা কর্মী অনেক রাজনীতিবিদ এই ব্যবস্থার গুরত্ব উপলব্ধি করতে ব্যার্থ হয়। তবে এই অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয়টিতে যাদের স্বার্থে আঘাত লাগার সম্ভাবনা ছিল তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে শুধু পাকিস্তানের সরকারকে নয় অবাঙালী ব্যবসায়ী শিল্পপতি রাজনীতিক এবং স্বার্থন্বেষী মহলকে ভাবিয়ে তোলে। এরা ৬-দফার প্রবক্তা এর সমর্থকদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। অপর দিকে বাঙালী তার রাজনৈতিক অধিকার আদায় এবং অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জনগণের তীব্র রাজনৈতিক আকাংখা অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে বিবেচনা করে শেখ মুজিব সঠিক সময় দাবীসমূহ নিয়ে জনগণের সামনে উপস্থিত হন। যা বাঙালী নিজের দাবী বলে লুফে নেয়। আওয়ামী লীগ এর কাউন্সিলে যখন ৬-দফা গৃহীত হয় তখনো অন্যান্যদল বুঝতে পারেনি যে, ৬-দফা পূর্বঙ্গবাসীর আন্দোলনের নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠবে। মোনেম খাঁন ও অনেকটা সেই রকমই ধারণা করেছিলেন।[২১] কিন্তু বাস্তবে হয়ে ছিল উল্টোটা। ৬-দফার পক্ষে আন্দোলনের জোয়ার জন সমর্থন তাদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

এ দিকে ৬-দফাকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য আন্দোলনকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মহল থেকে ৬-দফার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে বলে উল্লেখ করা হতে থাকে। এই অপপ্রাচারে সরকার পক্ষ মূল ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালের ২৩মার্চ মওলানা ভাসানীও ৬-দফাকে সি, আই, এ-এর দলিল বলে উল্লেখ করেন।[২২] আইয়ুব প্রশাসনের প্রতি 'নন ডিস্টাব' নীতির কারণেই ভাসানী স্বায়ত্তশাসন ও বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক জন সংগ্রামী নেতা হওয়া সত্ত্বেও ৬-দফার বিরোধিতা করেন। নেজামী ইসলামের ভাষায় পাকিস্তানের সংহতি বিনাসের জন্য ৬-দফার যে কোন এক দফাই যথেষ্ট। ৬-দফার রচনার পিছনে গুরুতর রহস্য রয়েছে।[২৩]

কনভেনশন মুসলিম লীগ মন্তব্য করে, একটি প্রভুদেশের ইঙ্গিতে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করার জন্যই ৬-দফা পেশ করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ৬-দফা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে যেয়ে বলেন ৬-দফা যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার এক ভয়াবহ স্বপ্ন। ৬-দফা দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন। প্রায় সবকটি রাজনৈতিকদলই পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে ৬-দফার বিরুদ্ধাচারণ শুরু করে। নেজামে ইসলাম, জামায়েতে ইসলাম, এন, ডি, এফ, পিডিএম, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, ন্যাপ এর একাংশ ও কনভেনশন মুসলিম লীগ কোন দলই শেখ মজিবের ৬-দফার পক্ষে ছিল না।[২৪] শেখ মুজিব '৬৬ সালের আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ৬-দফা নিয়ে আলোচনা কালে বলেছিলেন সরাসরি রাজপথে যদি আমাকে একা চলতে হয়, চলবো। কেননা ইতিহাস প্রমাণ করবে বাঙালীর মুক্তির জন্য এটাই সঠিক পথ।[২৫] যথার্থই শেখ মুজিব ৬-দফা নিয়ে একাই নেমে ছিলেন। এমনকি তার দলের প্রবীণ নেতৃত্ব তার সঙ্গে ছিলনা। ৬-দফা প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে জনাব মওদুদ আহমেদ লিখেছেন : "আওয়ামী লীগের অভ্যন্তর থেকেও ছয় দফা কর্মসূচীর সমালোচনা করা হয়। বিশেষ করে দলের পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যরা ছিলেন কর্মসূচীর বিরুদ্ধে যা আওয়ামী লীগে একটি ভাঙনের সূচনা ঘটায়। এর প্রথম সমালোচনাকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন দলের জাতীয় সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান। অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানীনেতা ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এভাবে অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানী কর্মসূচী সমর্থন এবং পশ্চিম পাকিস্তানী বিরোধিতা করায় আওয়ামী লীগে অঞ্চল ভিত্তিক ভাঙনের সূত্র পাত ঘটে।"[২৬]

ফলে আওয়ামী লীগ পরিণত হয় বাঙালীর অধিকার আদায়ের রাজনৈতিক সংগঠনে। যদিও ৬-দফার কোন খানে বাঙালী শব্দটা ব্যবহৃত হয়নি এবং স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিন্দু মাত্র ইঙ্গিত ছিল না, তবু বাঙালীর ন্যায্য দাবীর প্রতি শুধু ডানপন্থী রাজনৈতিক দল এবং সরকারী প্রশাসনই নয় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ও মুখ ফিরিয়ে নেন। ফলে বাঙালীর একলা চলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না। এবং এই চলার পথে আওয়ামী লীগ হলো তাদের দিক নির্দেশক।

একদিকে সরকারের সুপরিকল্পিতভাবে ৬-দফা কর্মসূচী এবং আওয়ামী লীগ ও এর নেতাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচারণা। অপরদিকে ইসলাম পছন্দ ডানপন্থী দলগুলোর তীক্ষ্ণ সমালোচনা দুই, ৬-দফা বাস্তবায়ন আন্দোলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তার উপর বিচ্ছিন্নতার অপবাদের ধূয়া তুলে সরকারী প্রশাসন সর্বশক্তি দিয়ে আওয়ামী লীগের পেছনে লাগে।

যেহেতু ৬-দফা নতুন কোন দাবী ছিল না। সেহেতু অতীতে বাঙালীর অন্যান্য দাবী করার জন্য পাকিস্তানী প্রশাসনে যে দমনমূলক ব্যবস্থা আর ষড়যন্ত্রে আশ্রয় নিয়ে ছিল, বর্তমানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। নিয়ম অনুযায়ীই আওয়ামী লীগ এবং তার নেতা কর্মীদের উপর নেমে এলো চরম নির্যাতনের ষ্টিম রোলার। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান স্বয়ং 'অস্ত্রের ভাষায় ৬-দফার জবাব দেয়া হবে।"[২৭] বলে হুমকি দেন। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনেম খানে এর উদ্ধত বক্তব্য ছিল 'আমি যতদিন গভর্ণর থাকব ততদিন শেখ মুজিবকে জেলেই পচতে হবে।'[২৮]

শেখ মুজিবের ৬-দফার প্রতি জনগণের বিপুল সমর্থন লক্ষ্য করে আইয়ুব সরকার ভীষণ ক্ষুব্ধ হয় এবং ১৯৬৬ সালের ৫মে তাঁকে পাকিস্তান দেশ রক্ষা আইনের আওতায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে বারটি মামলা দায়ের করা হয়।[২৯] তাছাড়া আওয়ামী লীগের শত সহস্র নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করে সংগঠনটিকে নির্জীব করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এভাবে গড়ে ওঠা ৬-দফার আন্দোলন শুদ্ধ করার ব্যবস্থা নিলেও আন্দোলন চলতে থাকে।

৬-দফা আন্দোলন চরম পর্যায়ে উপস্থিত হয় ১৯৬৬ সালের ৭ জুন সফল হরতালের মাধ্যমে। এ সম্পর্কে এম, এ ওয়াজেদ মিয়া তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন : "১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ৬-দফা আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা

Dhaka University Institutional Repository

ছিলো ৭ই জুনের সফল হরতাল। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৬-দফা বাস্তবায়ন ও কারারুদ্ধ নেতা ও কর্মীদের মুক্তির দাবীতে ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সারা দেশে হরতাল আহ্বান করা হয়। ঐদিন দেশের বিভিন্ন শহরে ছাত্র জনতা ও শ্রমিকের সঙ্গে পুলিশ ও অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষ হয়। সবচেয়ে মারাত্মক সংঘর্ষ সংঘটিত হয় নারায়নগঞ্জের শিল্প এলাকায়। এ সমস্ত সংঘর্ষে বহুলোক গ্রেফতার ও হতাহত হয়। একমাত্র নারায়নগঞ্জের পুলিশ ও অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে শ্রমিকের সংঘটিত সংঘর্ষে ১০ জন শ্রমিক নিহত হয়।"[৩০]

গুলি হত্যা নির্যাতনের পরেও আন্দোলন থেমে যায় নি। বরং তা আরো জঙ্গী আরো বেগবান হয়ে ওঠে। ৬-দফা আন্দোলন ছড়িয়ে পরে এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে। জনাব আবু আল সাঈদের ভাষায় : "১৯৬৬ সালের ৭জুনের পর ৬-দফাকে ভিত্তি কের বাঙালী নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক নবতর আলোড়নের সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানে এমন কোন জায়গা ছিলো না যেখান থেকে ৬-দফা আন্দোলনের খবর পাওয়া যায় নি। গোয়েন্দা বিভাগ প্রতি মুহূর্তেই পাকিস্তান সরকারকে হুশিয়ার করে দিচ্ছিলো এই আন্দোলনের জন প্রিয়তা সম্পর্কে। সাধারণ স্কুল শিক্ষক, অফিসের কেরানী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শ্রেণী, দোকানদার, হকার, শ্রমিক, রিকশাচালক এবং কৃষক সম্প্রদায় সকল শ্রেণীর মানুষই উজ্জীবিত হয়ে উঠতে থাকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। তরুণ সম্প্রদায়ই ছিলো এই আন্দোলনের নেতৃত্বে। এই সময় দুই পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো যে, বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রমিক, কৃষকও মেহনতি মানুষ তার থেকে মুক্তির তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠেছিলো। এই সব অন্যায় ও শোষণের হাত থেকে বাঁচার পথ ৬-দফা এই বোধই তখন তীব্র ছিলো নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের মনেপ্রাণে।

এই সময় গোয়েন্দা বিভাগ খবর দিয়েছিলো, পূর্ব পাকিস্তানে ৬-দফা একটি জাতীয় আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে যেমনটা চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনের বেলায় ঘটেছিলো। গোয়েন্দারা আরো জানালেন, আন্দোলন এমন ভয়ংকর আকার ধারণ করছে যে, বাঙালী অফিসার বাঙালী আর্মি, বাঙালী নৌবাহিনী বাঙালী পুলিশ ও আনসার সকলের ভেতরেই তা সংক্রামিত হচ্ছে এবং পরিস্থিতি গৃহযুদ্ধের দিকে চলে যাচ্ছে।"[৩১]

আন্দোলনের তীব্রতায় দিশেহারা পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনেম খান আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতাদের গ্রেফতার করে ক্ষান্ত হলেন না। সারা দেশব্যাপী সকল শ্রেণীর নেতা, সক্রিয় কর্মীদের গ্রেফতার করে আন্দোলন স্তিমিত করার ব্যবস্থা করলেন। হাজার হাজার নেতা কর্মী কারারুদ্ধ হওয়ার ফলে ৬-দফা আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়।

নেতৃত্বহীন এবং সরকারী নির্যাতনের ফলে বিদ্ধস্ত আওয়ামী লীগ চলমান জাতীয় রাজনীতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় পরবর্তী দুই বছর সংগঠনটির কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেকে সক্রিয় রাখা সম্ভব হয়নি।[৩২] ৬-দফাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন যা গণ অভ্যুত্থানেরূপ নিতে পারত তা অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। তবে পরবর্তীতে ৬-দফার দাবীগুলো ১১-দফার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়ে '৬৯ গণ অভ্যুত্থানের জন্ম দিতে সক্ষম হয়। যার মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকশিত চেতনার বিস্ফোরণ ঘটে। মওদুদ আহমদ স্বায়ত্তশাসন ও বাঙালী জাতীয়তাবাদের আন্দোলনে ৬-দফার ভুমিকা গুলো ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সবকয়টি রাজনৈতিক দল 'স্বায়ত্তশানকে' তাদের অন্যতম দাবী হিসেবে বিবেচনা করলেও, ৬-দফা প্রকাশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের নাম কার্যকর এবং অর্থবহ ভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। ৬-দফা দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তি গুলোকে অনুপ্রানিত এবং সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করে এবং অচিরেই বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। এই কর্মসূচী ছিল বাঙালীদের ঐতিহাসিক আশা আকাংখার সুচিন্তিত বাস্তব বহিঃপ্রকাশ এবং দেশের যে কোনো রাজনৈতিক দলের যে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচীর চাইতে বেশি বলিষ্ঠ ও অকপট।[৩৩]

এভাবে দক্ষিণ ও বামপন্থী দলগুলো সঠিকভাবে পরিস্থিতি মুল্যায়নের আগেই বাংলার আপামর জনসাধারণ ৬-দফাকে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে; ৬-দফার মধ্য দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালী জাতীয়তাবাদ এর আদর্শ। তাছাড়া বাঙালী ন্যায্য দাবীর প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের সচেতন সমাজের বিরুদ্ধাচরণ, ৬-দফার বিরুদ্ধে তাদের দৃঢ় অবস্থান, বাঙালীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তাদের অবস্থান এবং অবস্থা সম্পর্কে আরেক বার ভাবতে শেখায়। যখন পূর্ব বাংলার জনগণ ৬-দফাকে নিজেদের বাঁচার দাবী বলে এর পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিচ্ছে। তখন পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ থেকে শিল্পপতি, আমলা শ্রেণী, শাসক শ্রেণী প্রত্যেকের অবস্থান ছিল এর বিরুদ্ধে। ফলে ৬-দফাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পশ্চিম এর স্বার্থের সংঘাতের প্রশ্নটি পাকিস্তানের দুই

Dhaka University Institutional Repository

অংশের জনগণকে স্বাধীনতার অনেক আগেই মানসিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হয়। ১৯৬১ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে বৈঠকে শেখ মুজিবের প্রস্তাবিত স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গে পার্টি যে নীতি গ্রহণ করতে বলেছিল—অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনকে সামনে রেখে আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন জোরদার করা। ৬-দফার মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে সেই আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার চেতনা জোরদার হয়ে ছিল। পার্টির আরো বক্তব্য ছিল যে, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আন্দোলন যত জোরদার হবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তিও তত দুর্বল হয়ে পড়বে। বাস্তবিক পক্ষে ৬-দফা পাকিস্তান রাষ্ট্রে ভিতকে নড়বরে করে দিতে সক্ষম হয়ে ছিল। সুতরাং ৬-দফার মধ্যে বাঙালী শব্দ বা বিচ্ছিন্নতার ইঙ্গিত না থাকলেও একে কেন্দ্র করেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভাঙনের সুর বাঁজতে থাকে। যে কারণে এর বিরুদ্ধে শাসক গোষ্ঠীর আক্রোশের সীমা ছিল না। এবং এই ৬-দফাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন সমূলে উৎপাটনের জন্য এর প্রনেতাকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানোর প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন বাস্তবায়ীত করার জন্য আইয়ুব প্রশাসন যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে ছিল তার নাম আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯৬৭ সালের শেষের দিকে গোপনে গ্রেফতারকৃত কতিপয় বাঙালী সি, এস, পি অফিসার এবং সামরিক বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইয়ুব সরকার কর্তৃক একটি মামলা দায়ের করা হয়। বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত ৬-দফার প্রবক্তা আওয়ামী লীগ সভাপতি কারা বন্দী শেখ মুজিবকে একনম্বর আসামী করে ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে অভূতপূর্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে উক্ত মামলার শুনানী শুরু হয়।[৩৪] পয়ত্রিশজন বাঙালীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র দ্রোহিতা ও পাকিস্তানের পূর্বাংশকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলাদেশ নামে ভিন্ন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অভিযোগ আনা হয়,' বিশেষ টাইবুনালে উথাপিত মামলাটির প্রকৃত নাম 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান[৩৫] হলেও এটি "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খাত। স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে প্রকাশিত প্রেস নোট উপরোক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে বলা হয়, গত মাসে (ডিসেম্বর ১৯৬৭) পূর্ব পাকিস্তানে উদঘাটিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।[৩৬]

গ্রেফতার কৃতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে প্রেস নোটে বলা হয়। "গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল"[৩৭]

এই মামলার মূল ভিত্তি ছিল সেনাবাহিনীর কতিপয় বাঙালী সদস্যর সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা।[৩৮] পরিকল্পনার স্থপতি, মূল নেতা ছিলেন নৌবাহিনীর লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ মুজিব নন।[৩৯] অথচ মামলার মূল আসামীই করা হয় শেখ মুজিবকে। এর পেছনের কারণ সম্পর্কে এই মামলা সংক্রান্ত রিপোর্টার, দৈনিক আজাদের তৎকালীন সংবাদিক ফয়েজ আহমদ তার গ্রন্থে লিখেছেন: "ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় এটি একটি বিদ্রোহের মামলা। প্রথমে সরকার সেনাবাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে' মিউটিনি'র অভিযোগ এনে কোর্ট মার্শাল বা অন্য ধরনের ট্রাইবুনালের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী চিন্তায় তারা সত্তর সালের আসন্ন নির্বাচনকে দৃষ্টিতে রেখে রাজনৈতিকও আধা রাজনৈতিক উচ্চপদস্থ বাঙালী অফিসারদের জড়িত করার সিদ্ধান্ত নেন। তাদের ধারণা ছিল উনসত্তর সালের প্রথম অধ্যায়ের ভেতরে বিশেষ ট্রাইবুনালে সামরিকও বেসামরিক যৌথ উদ্যোগে পূর্ব বাংলায় বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করে রায় প্রদত্ত হলে উক্ত রায়ের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক উত্থান স্তব্ধ করা যাবে। শেখ সাহেবসহ অনেকের ফাঁসির দন্ডাদেশ বা কারো কারো দীর্ঘস্থায়ী কারাদন্ডের ব্যবস্থা হলে ষাটের দশকের ৬-দফাসহ অন্যান্য আন্দোলন কঠোর ব্যবস্থার মধ্যে স্তিমিত হতে বাধ্য হবে। তার ফলে সত্তর সালের নির্ধারিত নির্বাচনে আইয়ুব খাঁ ও তার কনভেনশন মুসলিম লীগের বিজয় সুনিশ্চিত হতে বাধ্য। সে সময় বাঙালীদের সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সুযোগ থাকবে না। এই 'স্ট্র্যাটেজিক' কারণে জেলাখানাতেই অন্য রাজনৈতিক মামলায় আটক শেখ মুজিবুর রহমান ও তিনজন উচ্চপদস্থ বাংলাদেশের স্বার্থপন্থী সি এস পি অফিসারকে এই মামলায় সংযুক্ত করা হয়।"[৪০]

মামলায় শেখ মুজিবকে যুক্ত করার কারণ চিহ্নিত করতে যেয়ে উক্ত মামলার বিবাদী পক্ষের কৌশলীদের একজন ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন : "সরকারের অভ্যন্তরে এ নিয়ে বিতর্ক উত্থাপিত হলো স্বায়ওশাসন আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তা শেখ মুজিবকে জড়িত না করে কেবল কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ

Dhaka University Institutional Repository

উত্থাপন করা হলে উপরোক্ত মামলা দায়ের করার মাধ্যমে সরকারের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সাধিত হবে না। শেষাবধি মোনেম খানের নির্দেশে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে মামলার সঙ্গে শেখ মুজিবকে সরাসরিভাবে জড়িত করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণা যে এই মামলা শেখ মুজিবের মুখোশ উন্মোচিত করে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তাঁকে শেষ করে দেবে। জনগণ যদি একবার জানতে পারেন যে মুজিব ভারতের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছেন তাহলে তিনি তার রাজনৈতিক ভিত্তি সারাজীবনের জন্য হারিয়ে ফেলবেন। এতে করে স্বাভাবিকভাবেই ছয় দফার কর্মসূচী সমাধিস্থ হয়ে পড়বে।"[৪১]

কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক মামলায় গ্রেফতাকৃত শেখ মুজিবকে একনম্বর আসামী হিসেবে দাঁড়করানোর ফলে ট্রাইবুনালের এই মামলাটি জনসাধারণের কাছে রাজনৈতিক মামলা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। তাঁর নাম মামলায় আসার ফলে প্রস্তাবিত বিচারের চরিত্রও বদলে যায়। মামলাটি জনগণের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়। মামলার বিষয় বস্তু আসল ঘটনা সম্পর্কে উত্তর উত্তর জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাছাড়া অভিযুক্ত বন্দীদের উপর অকথ্য নির্যাতনের কাহিনী প্রকাশিত হলে বাংলার জনগণের সহানুভূতি দ্রুত তাদের পক্ষে যেতে থাকে। মামলার শুনানি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে বাঙালী জনগোষ্ঠী উপলব্ধি করতে শুরু করে যে তাদের স্বার্থ উদ্ধারে আপোষহীন সংগ্রামের নেতাকে ফাঁসি দেয়াই সরকারের উদ্দেশ্য। বাঙালী জাতীয়তাবাদের সংগ্রামকে চিরতরে নস্যাৎ করার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে সাজানো হয়েছে এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলা। ফলে বাঙালীর কাছে কোন অবস্থাতে এই মামলার সত্যতা গ্রহণ যোগ্য হয় নাই।

শেখ মুজিবের ইচ্ছা ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকে বাঙালীর স্বার্থ রক্ষা করা। যে ইচ্ছার মধ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে ছিল। তবে শাসকগোষ্ঠীর বাঙালীর স্বার্থ বিরোধী ভূমিকা পূর্ব বাংলার প্রতি রাজনৈতিক চরম অর্থনৈতিক বঞ্চনা তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থতা তাকে বার বার ভিন্ন চিন্তা করতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকে শুরু হয়েছিল। লাহোর প্রস্তাব সংশোধনের নামে রাজনৈতিক স্বাধীকার বঞ্চিত বাঙালীকে অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত করার জন্য যে পায়তাড়া চলছিল, তা অনেক সচেতন বাঙালীর মতো শেখ মুজিব উপলব্ধি করেছিলেন বলেই কোলকাতা ছেড়ে ঢাকায় এসে ছিলেন, নব পর্যায়ে সংগ্রাম শুরু করতে। শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব তাদের আচরণের ফলে সে সংগ্রামেও তাঁর মধ্যে স্বাধীনতার চিন্তা কাজ করেছিল। তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বার বার এই চিন্তা তাকে বাঙালীর ভাগ্য বদলের প্রয়াসে সাহসী করে তুলেছে। এ কারণেই হয়তো ১৯৬৩ সালে তিনি আগরতলা গিয়েছিলেন। স্বাধীনতার সপক্ষে সাহায্য লাভের আসায়। কিন্তু চীন-ভারত যুদ্ধ উত্তর কালে পন্ডিত জওয়াহর লাল নেহরু এতোবড় ঝুকি নিতে রাজী না হওয়ায় তাঁকে ফেরত চলে আসতে হয়।[৪২]

শেখ মুজিবের '৬৩ সালের আগরতলা সফরের সঙ্গে ১৯৬৭-৬৮ সালের' আগরতলা মামলার' যোগসূত্রের কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। তবু সরকার পক্ষ থেকে এটিকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে প্রচার করা হতে থাকে তাঁর এই মামলার সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য এবং জনগণের কাছে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই মওদুদ আহমদের ভাষায় কথিত ষড়যন্ত্রে ভারতীয় সরকারকে জড়িত করার বিষয়টি ছিল মামলাটির সহায়ক কৌশলমাত্র।[৪৩] শেখ মুজিবকে এই মামলায় জড়িত করার বিষয়টিই আইয়ুব সরকারের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে। সরকারের সকল পরিকল্পনা তাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। সচেতন এমন কি সাধারণ বাঙালীর মধ্যেও এই ধারণা জন্মে বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালীর আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের সংগ্রাম সমূলে উৎপাটন করার জন্য এটি একটি পরিকল্পিত প্রহসনমূলক মামলা। তাছাড়া মামলার আসামীদের মধ্যে শেখ মুজিব ছাড়া আর কারো কোন রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না। এমনকি এই মামলায় মুজিবের পার্টি আওয়ামী লীগের আর কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির যুক্ত থাকার কথাও বলা হয়নি। অথচ প্রথম থেকেই আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত সংগঠন হিসেবে পরিচিত। এর পরিচালিত সকল আন্দোলন ছিল নিয়মতান্ত্রিক। আওয়ামী লীগ কোন সশস্ত্র সংগঠন নয়। মুজিব কোন বিপ্লবী নেতা ছিলেন না। পার্টির সভাপতির নেতৃত্বে এতো বড় একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে পার্টির কোন সদস্যতা অভহীত নন বা তাঁরা কেউ এর সঙ্গে জড়িত নন, সচেতন সমাজের কাজে এটি বিস্ময়কর মনে হওয়াটা স্বাভাবিক। ফলে মামলাটি জনগণের কাছে গ্রহণ যোগ্য হয়নি। ট্রাইবুনালের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনকালে শেখ মুজিব

Dhaka University Institutional Repository

যে বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন তা ছিল জনগণের চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও শেখ মুজিবের সঙ্গে বিদ্রোহীদের যোগাযোগ ছিল। তবে মামলা দায়ের করার পদ্ধতি গত ত্রুটি অভিযুক্তদের নামের তালিকার জন্যই শেখ মুজিবের বিন্দু মাত্র জড়িত থাকার বিষয়টি সত্যের ভিত স্পর্শ করতে পারেনি। তাছাড়া মামলার সত্যতা যতটুকই থাকুন না কেন অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করেন। এ ক্ষেত্রে ট্রাইবনালে দেয়া শেখ মুজিবের দীর্ঘ বক্তব্যটি উল্লেখ যোগ্য যা জনগণকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সন্দেহ মুক্ত করতে সক্ষম হয়। তিনি তার বক্তব্যে মামলা সম্পর্কে বলেন 'আমার, আমার দল এবং বাঙালীদের স্বসম্মানে বাঁচার অধিকারের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র।'[৪৪]

তিনি বেসরকারী তিন জন কর্মকর্তা ছাড়া বাকীদের আদালতে আসার আগে কখনও দেখেননি বলে দাবী করেন মামলায় উল্লেখিত মানিক চৌধুরী ও সায়েদুর রহমানের সঙ্গে তার মামলার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন :

'তথাকথিত এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে আমি কখনো কারো সঙ্গে কোনো আলোচনা করিনি। এদের কেউই কখনো আমার বাড়ীতে আসেনি এবং আমি উক্ত ষড়যন্ত্রের সম্পর্কিত কোনো কারণে কাউকে কখনো টাকা পয়সা দেইনি। তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করার জন্য আমি মানিক চৌধুরী অথবা সায়েদুর রহমানকে কখনো কোন নির্দেশ দেইনি। আমার রাজনৈতিক দলে তিনজন ভাইস প্রেসিডেন্ট, ৪৪ জন নির্বাহী কমিটি সদস্য, একজন জেনারেল সেক্রেটারী এবং ৮ জন সেক্রেটারী রয়েছেন। আমার দলে রয়েছেন সাবেক মন্ত্রী, আইন পরিষদের সদস্যবর্গ, সংসদ সদস্যগণ। চট্টগ্রামেও নগর জেলা শাখার প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীদের মধ্যে রয়েছে পরিষদ ও সংসদের সদস্যগণ, তাদের কেউ কেউ অত্যন্তধনী ও প্রভাবশালী। এটা অসম্ভব যে আমি মানিক চৌধুরীর মতো একজন সাধারণ ব্যবসায়ী কিংবা সায়েদুর রহমানের মতো একজন এল, এম, এফ ডাক্তারের কাছে সাহায্য চাইবো উপরন্তু সায়েদুর রহমানকে ১৯৬৫ সাল থেকে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আমি কখনো সেয়েদুর রহমানের বাসায় যাইনি।"[৪৫]

তিনি তার দীর্ঘ বক্তব্যে আরো বলেন : 'আওয়ামীলীগ একটি শাসনতান্ত্রিক গণতন্ত্রী রাজনৈতিক দল এবং আমি এই দলের সভাপতি। অশাসনতান্ত্রিক রাজনীতিতে আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের একটি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কর্মসূচী রয়েছে। ছয় দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে আমি পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্য সুবিচার চেয়েছি। আমি দেশের জন্য যা মঙ্গল হবে বলে মনে করি, তা একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রকাশ্যে ঘোষণা করি। শাসক শ্রেণী এবং স্বার্থন্বেষী মহল সব সময়েই আমাকে অপদস্থ করেছেন। আমাকে এবং আমার দলকে দমন করে ক্ষমতাসীন মহল পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর শোষণ অব্যাহত রাখতে চান। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমাকে তিনবার গ্রেফতার করা হয়েছে। মে মাসে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে আমাকে গ্রেফতার করার পর থেকে আমি জেলখানায় রয়েছি। পাঁচ মাস সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আমাকে রাখা হয়েছিল সামরিক কারাগারে। প্রতিহিংসাবশতঃ আমাকে এই মামলার সঙ্গে জড়ানো হয়েছে। কেবল মাত্র আমার দলকে জনসমক্ষে অপমান, অপযশ এবং নিগৃহীত করার জন্যই তা করা হয়েছে। এই মামলার আসল উদ্দেশ্য হলো ছয় দফা কর্মসূচীতে উল্লেখিত সুবিচারের দাবী দমন করে রাখা। এটা হলো আমার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র।"[৪৬]

জনমনে এই বক্তব্যের প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যে কথা উল্লেখ করতে যেয়ে মওদুদ আহমদ লিখেছেন :

"পরদিন সংবাদপত্রে এই সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশিত হবার পর যে মুজিবকে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দায়ে যাবজ্জীবন করাদন্ডে দণ্ডিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, তিনি তখন কোন অপরাধ করেননি বলে সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। বাঙালীদের কাছে তিনি একজন সম্মানিত আত্মবলিদানকারীর মর্যাদা লাভ করতে থাকেন।"[৪৭]

শুধু নেতা শেখ মুজিবের বেলায় নয় এই মামলায় অভিযুক্ত সকলের প্রতি বাঙালী এই সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করতে থাকে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অর্থনৈতিক শোষণ, চরম বৈষম্য মূলক আচরণ, রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত বাঙালী যেমন প্রবলভাবে সরকার বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল এবং এই মনোভাব জাতীয়তাবাদের রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করছিল, তেমন সেনাবাহিনীর বাঙালী সদস্যদের মধ্যেও এই মানসিকতা বিরাজমান ছিল। শুধু মাত্র বাঙালী হওয়ার কারণে তাদেরকে বঞ্চনা আর বৈষম্যমূলক আচরণের বিষয়টি তিক্তভাবে মোকাবেলা করতে হতো। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে বাঙালী জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছিল। বাঙালীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

তাদের পেশাগত অবস্থানও যে বাঙালী জাতির মতো দুর্ভাগ্যজনক পর্যায়ে থেকে যাবে এই বোধ তাদের মধ্যে তীব্র হয়ে উঠেছিল। অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেমন সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাবের জন্ম দিয়ে ছিল, সে ভাবে তার প্রতিফলন ঘটেছিল বাঙালী সেনা সদস্যদের মধ্যেও। বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্বাধীন সমাজে পরাধীন জাতিগুলো যেমন জাতীয়তাবাদের আদর্শকে আক্রে ধরে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়। বিদ্রোহী সেনা সদস্যরাও সেই পথেই অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। এখানে তারা শেখ মুজিবকে তাদের রাজনৈতিক ভিত্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছিলেন। তিনি যে বাঙালী জাতির মুক্তি দিক নির্দেশক এটাও তারা উপলব্ধি করতে পারছিলেন। যে কারণে মুজিবের উপর তাদের ছিল সীমাহীন আস্থা ও বিশ্বাস। এমন একজন নেতাকে রক্ষা করে বাঙালী জাতির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্যই বিচার চলাকলে তারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদেরকে নির্দোষ বলে দাবী করেছিলেন এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ এর কথা অস্বীকার করেছিলেন। সেনা সদস্যরা যে বিদ্রোহের প্রায়স নিয়েছিলেন নিসন্দেহে তাছিল তাদের দেশ প্রেমের নিদর্শন। সমস্ত কিছুর পরিণতির কথা ভেবেই তারা জাতির মুক্তির জন্য সাহসী সন্তানের মতো মরণের পথ বেছে নিতে দ্বিধা করেননি। এই সমস্ত দেশ প্রেমিকদের রক্ষার জন্য শেখ মুজিবও দৃঢ়ভাবে তাদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগাযোগ অস্বীকার করেছিলেন। এই মামলা স্বাভাবিক গতিতে চললে এঁদের পরিণতি কি হতো তা সচেতন সমাজের অজানা ছিল না। কিন্তু প্রথম থেকেই যেহেতু জনমনে মামলার বিরুদ্ধে পরিবেশ তৈরী হয়েছিল ফলে সরকারের আপ্রাণ প্রচেষ্টায়ও মামলার গতি তাদের পক্ষে নেয়া সম্ভব হয় নাই।

১৯৬৬ সনে ৬-দফাকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদের আন্দোলন দ্রুত পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল চরম নিগৃহ আর নির্যাতনের ফলে তা স্তিমিত হয়ে যায়; তবে তা ছিল সাময়িক। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'কে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদের চেতনা পুনর্জ্জীবন লাভ করে। এ সময়ে জাতীয়তাবাদের ভিন্ন প্রবাহের আঘাতে বাঙালীর চিন্তাধারা দ্রুত পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হতে থাকে। বাঙালীর জাতীয়তা ভিত্তিক রাষ্ট্র চিন্তা যা ছিল বিশেষ গোপনীয় এবং নিষিদ্ধ তা ক্রমশ প্রকাশ্য আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। পূর্ব বাংলার পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার সম্ভাব্যতা, সচেতন সমাজের চিন্তা ভাবনায় এবং আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পেতে থাকে। এই মামলাকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাঙালী জাতির মধ্যে যে একাত্মতা বোধের জন্ম হয় পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ।

'৬৮ নভেম্বর মাস জুড়ে সমগ্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল উত্তপ্ত। পশ্চিম পাকিস্তানে একটি অরাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গণঅসন্তোষ আন্দোলনে পরিণত হয়। যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আইয়ুব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করা। কিন্তু পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন এখানে গণঅসন্তোষ অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এই বিদ্রোহ আইয়ুবী শসান কালের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও এর উদ্দেশ্য শুধু আইয়ুবের পতনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না ছিল বাঙালীর আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জন আকাংখার মধ্যে। তবে আইয়ুবী দশকের তীব্র রাজনৈতিক অর্থনৈতিক শোষণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ভুক্তভুগী দিশেহারা বাঙালীর সমস্ত ক্ষোভ প্রাথমিক পর্যায়ে আইয়ুবী প্রশাসনের বিরুদ্ধে আছড়ে পড়েছিল। দশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন শোষণ প্রক্রিয়া এ মাটিতে অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ছিল। যা শেষ পর্যন্ত বাঙালীকে একটি জাতিসত্ত্বা ভিত্তিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ করে দিয়ে ছিল। মওদুদ আহমদের ভাষায় : "কোনো একক উপলক্ষ্য যদি পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী হয়ে থাকে, তবে তা হলো আইউবের দশ বৎসরব্যাপী একচ্ছত্র কেন্দ্রীয় প্রশাসন এবং একটি জাতীয় রাজনীতি বিরোধী পদ্ধতি। শুধু এই কারণেই পাকিস্তানের দুই অংশে বিশাল এক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। আইউবের অর্থনৈতিক নীতিমালা শুধু পাকিস্তানের দুই অংশের বিদ্যমান দুরত্ব ব্যবধান আরো প্রসারিতই করেনি, তা গরীব এবং ধনীর মধ্যে সৃষ্টি করেছে বিশাল দুরত্ব। আইউব প্রশাসনের নিকৃষ্টতম অংশ ছিল এই যে, এতে রাজনৈতিকভাবে বৈষম্য এবং ব্যবধান গুলো আলোচনা ও সমাধান করার কোনো প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা হয়নি। ১৯৫৮ সালের আগে বাঙালীরা যে সামান্যতম রাজনৈতিক অধিকার হলেও পাচ্ছিলেন তাও শেষ পর্যন্ত বহাল থাকেনি। এরপরও অর্থনৈতিক বঞ্চনাজনিত হতাশা পুঞ্জীভূত হতে হতে ধারন করে এক বিস্ফোরণমুখী রূপ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কার্যবিবরনী সেই হতাশার অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করে।"[৪৮]

প্রথমতঃ এ দেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে শোষণ প্রক্রিয়া ওৎপ্রতোভাবে জড়িত ছিল। দশ বছরে এই প্রক্রিয়া সমগ্র পূর্ব বাংলায় এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বাঙালী জাতির অস্তিত্বেরস্বার্থে স্বায়ত্তশাসন ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

ভিন্ন কোন পথ উন্মুক্ত ছিল না। আইয়ুব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং স্বায়ত্তশাসন এদুটিই ছিল বাঙালীর মূল দাবী। কিন্তু পাকিস্তানের 'লৌহমানব' ভিন্ন এক কৌশলের মধ্য দিয়ে বাঙালীর উদ্দেশ্য নস্যাতে প্রায়াসী হন। ৬-দফা নির্ভর করে যে জাতীয়তাবাদী এবং স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তা ধ্বংস করে শোষণ প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখা আইয়ুব সরকারের জন্য ছিল জরুরী। বাঙালীকে রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত করে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে অব্যহত গতিতে পূর্ব বাংলার সম্পদ শোষণ সম্ভব। এই রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত করার পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ ছিল 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বাঙালী বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলে উনসত্তরে সমস্ত অশুভ এবং পূর্ব বাংলাও বাঙালীর স্বার্থ বিরোধী প্রয়াসের বিরুদ্ধে উড়িয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহের ধ্বজা।

মোহাম্মদ হাননান উনসত্তরের অভ্যুত্থানের কারণ চিহ্নিত করতে যেয়ে বলেছেন : পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ কর্তৃক পূর্বাঞ্চলেকে দীর্ঘদিন অর্থনৈতিক ভাবে শোষণ ও শিক্ষাক্ষেত্রে বঞ্চনা; অব্যহত অবিচার থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ জনজীবনে শ্রেণীদ্বন্দ্বের উদ্ভব ও চেতনার বিকাশ; বাঙালী রাজনীতিক, সামরিক অফিসারসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং জুন (১৯৬৮) থেকে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে তার বিচার শুরুর ঘটনা; বেতার ও টেলিভিশনে পুনরায় রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ ঘোষণা; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাঙালী ভাষার তথাকথিত সংস্কারের পুনঃ প্রচেষ্টা; আইয়ুব খানের রাজত্বকালের দশ বছরের তথাকথিত সাফল্যের প্রচারে ডামাডোল এবং অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। [৪৯]

বাঙালীর স্বার্থ আদায়ের আন্দোলনে নেতত্বদানে সক্ষম নেতাকে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করিতে এবং অন্যান্য নেতাদের উপর অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চালিয়ে আইয়ুব খান 'উন্নয়ন দশক' 'সংস্কার দশক' এর উৎসব নিয়ে ব্যবস্ত ছিলেন। এই উৎসব ছিল '৭০ সালে অনুষ্ঠিতিব্য নির্বাচনী প্রচারের অংশ, যে উৎসবে অর্থনৈতিক শোষণে নিরন্ন দিশেহারা দরিদ্র বাঙালী জনগোষ্ঠী সামিল হতে পারেনি। আইয়ুবের উন্নয়ন দশককে বাঙালী 'কালো দশক' আখ্যায়িত করে তাদের শোষণ বঞ্চনার জন্য সরাসরি আইয়ুবী প্রশাসনকে দায়ি করতে থাকে। আইয়ুবী দশকের জাকজমকপূর্ণ উৎসব ছিল বঞ্চিত এবং শোষীত বাঙালী জনগোষ্ঠীকে প্রবনঞ্চিত করার শামিল। চরম বৈষম্যের শিকার বাঙালীর অর্থনৈতক মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াবার কোন উপায় ছিল না। পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের নগ্ন চেহারা সাধারণ কৃষক শ্রমিকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। যে কারণে দেখা যায় পরবর্তী আন্দোলনে এই শ্রেণীর উপস্থিতি ছিল অভূতপূর্ব। এরা অতীতের মতো নিজেদেরকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের আন্দোলনে শরিক করতে থাকে এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক বিরাট অপ্রতিহত শক্তিতে পরিণত হয়। সচেতন শিক্ষিত সমাজ আগেই আন্দোলনের স্রোতধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিলেন। এভাবে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর বাঙালীর অর্থনৈতিক বঞ্চনা জনিত হতাশা ক্ষোভে পরিণত হতে থাকে যা শেষ পর্যন্ত '৬৯ এর শুরুতে বিস্ফোরিত হয়ে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতনের পথ তৈরী করে।

আইয়ুবী দশকের শুরু থেকেই এদেশের ছাত্রসমাজ প্রতিবাদী ভূমিকায় ছিল। তাছাড়া ভাষা আন্দোলন থেকে তারা যে সংগ্রামী ঐতিহ্য বহন করছিল সেই ঐত্যেহ্য গৌরব সামনে রেখে আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে সকল বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। '৬৯ গণ আন্দোলনের পটভূমি রচনায় ছাত্র সমাজের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে যেয়ে মওদুদ আহমদ লিখেছেন: 'প্রতিদিন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কার্যবিবরনী চলতে থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিও তখন ছিল উত্তপ্ত। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ জেলে থাকায় বিরোধী নেতারা এসময় হয় পরোক্ষভাবে আইউবকে সমর্থন দিচ্ছিলেন অথবা সরকারের বিরুদ্ধ ভূমিকায় যাবার মতো সাংগঠনিক ক্ষেত্রে দূর্বলতায় ভুগছিলেন। অবশ্য এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রাজনৈতিক দলবিহীন এবং ব্যক্তিসর্বস্ব। মুক্ত অবস্থায় একমাত্র সংগঠিত শক্তি ছিল ছাত্র সমাজ ফলে আন্দোলন সংগঠনের সামগ্রিক দায়িত্ব এসে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর। ছাত্ররা তাদের আশু প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন এবং ১লা ও ২রা ডিসেম্বর তারা প্রতিবাদসভা ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ অসন্তোষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।'[৫০]

এদিকে মওলানা ভাসানী ও আইয়ুব বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ন হন। হঠাৎ করে তার এই পরিবর্তন সম্পর্কে ফয়েজ আহমদ তার গ্রন্থে লিখেছেন আগরতলা মামলার আসামী শেখ মুজিবের ইঙ্গিতেই মওলানা ভাসানী আন্দোলনের

Dhaka University Institutional Repository

ডাক দিয়েছিলেন। ফয়েজ আহমদের ভাষায় : "সে সময় প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যাঁর নাম ধরে এই মামলা, সেই শেখ মুজিবর রহমান মওলানা ভাসানীর সঙ্গের সংযোগ রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি কাগমারিতে অবস্থানরত মাওলানা ভাসানীকে বাইরে আন্দোলনে নেতৃত্বদানের আহ্বান জানিয়ে জনৈক সাংবাদিককে এই খবর পৌঁছে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। শেখ সাহেব জানতেন যে, প্রথম শ্রেণীর জনবরেণ্য কোনো নেতা অগ্রগামী ভূমিকা না নিলে বাইরের আন্দোলন অগ্নিমুখী হয়ে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হবে না। ঘনিষ্ট ব্যক্তিরা জানেন মওলানা ভাসানী ব্যক্তিভাবে রাজনৈতিক দ্বিমত থাকলেও শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যাপারে অবিশ্বাস্য রকম দুর্বল ছিলেন। অতীতের অনেক রাজনৈতিক ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শেখ সাহেবও বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক দ্বিমতের মধ্যে থেকেও মওলানা সাহেবের মুখোমুখি গুরু ও শিষ্য অথবা পিতা ও পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করতেন। তৃতীয় একজন সাংবাদিকের মাধ্যমে মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবের আহ্বানের এই খবর পাবার সাথে সাথে উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন" 'শেখ মুজিব বলেছে! জানি আমাকে যেতে হবে। সরকার এদের সবাইকে ফাঁসি দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছে।' তার পরের দিন থেকেই মওলানা ভাসানী ঢাকার রাজপথে।"[৫১]

পেছনে যে কারণই থাক না কেনো মওলানা ভাসানীর আইয়ুব বিরোধী ভূমিকা সমগ্র বাঙালী জাতিকে যেমন একটি চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, তেমন তাৎক্ষনিকভাবে এই আন্দোলনে নিজেকে তিনি একক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবে তিনি ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রাথমিক পর্যায়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আন্দোলনে তার উপস্থিতি জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো বিদ্রোহী মানুষগুলোর মধ্যে যেন নতুন জীবনের নতুন চেতনার সঞ্চার করেছিল।

নেতৃত্ব হাতে নিয়ে মওলানা ৬ ডিসেম্বর জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালনের ডাক দেন। ঐদিনই অটোরিক্সা চালকদের অনুরোধ ৭ ডিসেম্বর হরতালের আহ্বান জানান। অটোরিক্সা শ্রমিকদের প্রতক্ষ্যঅংশ গ্রহণে সরকারের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হরতাল অভূতপূর্ব সফল্য লাভ করে। এই ঘটনায় ঊনসত্তরের গণ আন্দোলনের নাটকীয় পরিবর্তন সূচিত হয়। ঐদিনের পুলিশী গুলীতে নিহতদের জন্য গায়েবানা জানাজার আয়োজন করা হয় এবং পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে সকল দলের পক্ষ থেকে হরতাল ডাকা হয়। এভাবে রাজনৈতিকদলগুলোর মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ অতিক্রম করে ঐক্য অর্জনের প্রক্রিয়া আন্দোলনের মধ্য দিয়েই শুরু হয়ে যায়। এদিকে ছাত্র সমাজও আন্দোলনের সাফল্যের স্বার্থে সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যের আহ্বান জানান। ইতিমধ্যে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন। এই প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পাকিস্তানে এক নজির বিহীন গণআন্দোলনের জোয়ার বইতে থাকে। যা পূর্ব বাংলায় বিপ্লব পর্যায় পর্যবসিত হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির ১১-দফা দাবী নামা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আপামর জনগণের সমর্থনলাভ করে। ১১-দফাকে কেন্দ্র করে সমগ্র পূর্ব বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষ এক মঞ্চে এসে দাঁড়ায়। ১১-দফার পতাকা তলে বাঙালী জাতি বৃহত্তর ঐক্যের মধ্যে দিয়ে অভূতপূর্ব জাতীয়চেতনায় উদ্বুধ্য হয়।

ছাত্র সংগ্রাম কমিটির প্রদত্ত ১১-দফা দাবী বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিকাশের আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করতে সক্ষম হয়। সব কিছু ছাপিয়ে তখন ছাত্র সমাজের ১১-দফা হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রাণের দাবী।

১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারী ডাকসু কার্যালয়ে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাঙালী জাতির বিদ্রোহের প্রেরণা সঞ্চারকারী ১১-দফা দাবী পেশ করা হয়। এতে বলো হয় : "স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘদিনের অনুসৃত জনস্বার্থ বিরোধী নীতির ফলেই ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর জীবনের সংকট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। শাসনে শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া ছাত্র জনতা ছাত্র গণআন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এই অবস্থায় সরকার বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন সমূহ ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলনের দিকে আগাইয়া আসিতেছে না। সম্প্রতি দুই একটি দিবস ঐক্যবদ্ধ ভাবে পালন করা হলেও কর্মসূচী ভিত্তিক কোন ঐক্যফ্রন্ট গড়িয়া উঠিতেছে না।

আমরা ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্তদাবী সমূহের ভিত্তিতে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করিয়া ব্যাপক গণ আন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিবার জন্য সকল সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।"[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রসমাজ যে কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যের আহ্বান জানান তার মূল বিষয়ের মধ্যে ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবী দাওয়া বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন, 'জাতীয় শিক্ষা কমিশণ রিপোর্ট'ও 'হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট' বাতিল; গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা; পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং ফেডারেশন শাসন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ গঠন; দেশ রক্ষা পররাষ্ট্রনীতি এবং মুদ্রা ছাড়া সকল ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে অর্পণ; একই মুদ্রা ব্যবস্থায় পূর্ব থেকে পশ্চিম মুদ্রা পাচার রদের জন্যে শাসনতন্ত্রে সুনির্দিষ্ট বিধান রাখা, দুই অঞ্চলে দুইটি রিজার্ভ ব্যাংক গঠন। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন; বিভিন্ন প্রকার কর খাজনা ইত্যাদি আদায়ের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে অর্পণ, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রকারখানা ও নৌসদর দপ্তর স্থাপন এবং মিলিশিয়া প্যারা মিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠন ক্ষমতা প্রদান, তাছাড়া ব্যাংক বীমা জাতীয়করণ, কৃষক শ্রমিকদের স্বার্থ সংক্রান্ত দাবীসহ বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা, সিয়াটো সেন্টো সামরিক চুক্তি বাতিল; সকল বন্দীদের মুক্তি, আগরতলা মামলাসহ সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার ইত্যাদি।

১১-দফার কর্মসূচী ছাত্র শিক্ষক থেকে কৃষক শ্রমিকের অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর দাবী সমূহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এতে যেমন ছিল ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার উপস্থাপন তেমন ছিল শিক্ষাকদের দাবী দেওয়ার প্রতি জোড়াল সমর্থন। কর্মসূচীর প্রথম দফাতেই বিস্তৃত ভাবে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের স্বার্থের প্রতিদৃষ্টি দেয়া হয়। ফলে তাৎক্ষনীকভাবে সাধারণ ছাত্র সমাজ এবং শিক্ষক শ্রেণীর সমর্থন আদায় সহজ হয়।

'৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকেই এদেশের জনগণ গনতন্ত্র বাকস্বাধীনতা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে আসছিল। বিভাগ উত্তর কালে যতটুকু বাকস্বাধীনতা আর রাজনৈতিক অধিকার জনগণের ছিল আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় সেটুকুও হারাতে হয়। ১১-দফার ২নং দফার মধ্যে বাঙালী তার হৃত গণতন্ত্র পুনোরুদ্ধারের সম্ভাবনার আলো দেখতে পায়। ফলে গণতন্ত্রকামী জনগণের সমর্থন ছাত্র কর্মসূচীর পক্ষে দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে।

৩, ৪নং প্রস্তাবে আওয়ামী লীগের ৬-দফা থেকে গৃহীত হওয়ার পক্ষে সমর্থন ছিল পূর্ব পরীক্ষিত। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে সাব ফেডারেশন গঠনের দাবীগুলি ৬-দফা কর্মসূচীতে অস্পষ্ট থাকলেও ১১-দফা কর্মসূচী ছিল সেই ফর্মূলার পরিপূরক।[৫৩] ৯ও ১১ সহ ২ থেকে ৭ পর্যন্ত দাবীসমূহ তাৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তাৎক্ষনিক ভাবে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যার মধ্যে বিক্ষুব্ধ পূর্ব বঙ্গবাসীর উদগ্র ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছিল। ফলে ১১-দফা হয়ে ওঠে তাদের আকাংখা বাস্তবায়নের কর্মসূচী। ৬,৭ ও ৮ নং দফায় কৃষক শ্রমিক ও এ অঞ্চলের জনসাধারণের দীর্ঘকালের দাবী কর, খাজনা, রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি সকলের নিজের দাবী বলে বিবেচিত হতে থাকে। বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘট করার অধিকারসহ তাদের স্বার্থ রক্ষার প্রস্তাব সমূহ দলে দলে তাদেরকে ১১-দফার পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহীত করে। কর্মসূচীর মধ্যে সাধারণ মানুষের বাস্তব মৌলিক প্রয়োজনীয় দাবীগুলি সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে তা শহর ছেড়ে গ্রামে গঞ্জেও এর আবেদন পৌছে দিতে সমর্থ হয়।

১১-দফা কর্মসূচী সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে মওদুদ আহমদ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন :

"... এতে এমন কতগুলো দাবী উথাপন করা হয় যে গুলোর বাস্তাবায়ন ছিল ইতিমধ্যেই জনসাধারণের সুদীর্ঘলালীত স্বপ্ন। জনগণের মধ্যকার পুঞ্জীভূত হতাশা ও বিক্ষোভের বর্হিপ্রকাশ ঘটাতে এই কর্মসূচী বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই কর্মসূচী অনেকাংশে ছিল জনগণের অন্তর্নিহিত ক্ষোভের একটি প্রতীকী দলিল এবং গত দুই দশকে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।"[৫৪]

তাছাড়া সম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা, জাতীয়করণ প্রসঙ্গসহ সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় প্রভাবিত কিছু দাবী এতে সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে এর গুনগত মানের যেমন পরিবর্তনঘটে, তেমন দাবী নামাটি বামপন্থীদের সমর্থন আদায় করে নিতে সক্ষম হয়। বাঙালী জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের স্তরে স্তরে বামপন্থীদের উপস্থিতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ তাদের উপস্থিতির কারণেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমশ বাম ঘেষা আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে গণতন্ত্র অসাম্প্রদায়িক মনোভাবে সঙ্গে সমাজতন্ত্র শব্দটি যুক্ত হয়।

'৬৮ নভেম্বর মাস থেকে যখন আইনজীবী সাংবাদিক ছাত্র সমাজ আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে তখন

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তেমন কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হন। পরিস্থিতি যখন বিস্ফোরণের দ্বার প্রান্তে জাতীয় নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতা, আবারও ছাত্র সমাজকে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে জাতির নেতৃত্বে এগিয়ে আসতে হয়। এ অবস্থায় ছাত্র সমাজ ১১-দফা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতি তাদের কর্মসূচীর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে। ছাত্রদের কর্মসূচীকে দেশবাসী তাদের আশা আকাংখার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে। ফলে ১১-দফা পরিণত হয় বাঙালী জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দুতে।

সমগ্র পাকিস্তান ব্যাপী নেতৃত্ব দেয়ার মত জাতীয় নেতা বা সংগঠন না থাকায় পূর্ব বাংলায় আন্দোলন ভিন্ন পথে অগ্রসর হতে থাকে। বিরোধী দলগুলো বিচ্ছিন্নভাবে যেমন ন্যাপ (ভাসানী), ১৪-দফা, ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ ৮-দফা ইত্যাদি কর্মসূচী দিলেও জনগণের মধ্যে কোন সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়। ভাসানীর ১৪-দফার চেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত ইমেজ ছিল জনগণের কাছে বড়। ইসলাম পন্থী সংগঠন গুলোকে অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতি বহু আগেই বর্জন করে ছিল। ছাত্র সমাজের কর্মসূচী দেয়ার কয়েক দিন পর বিরোধী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রদান করে। ৮-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে গনতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (Democratic Action Committee) সংক্ষেপে ডাক গঠন করা হয়। ডাকে অবস্থানরত দক্ষিণ পন্থী দল গুলো পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন এবং সম্রাজ্যবাদ বিরোধী দাবীর কারণে ১১-দফায় সমর্থন দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও ওয়ালী পন্থী ন্যাপ ছাত্রদের কর্মসূচীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে।[৫৫]

ডাক এর মধ্যে বিভিন্ন আদর্শের সমন্বয় ঘটার ফলে এটি চলমান আন্দোলনে বিশেষ কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। ডাক-এ বিভিন্ন সংগঠন যোগ দিয়েছিল কৌশলগত কারণে। বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিরোধী ডান পন্থী নেতাদের সঙ্গে ঐক্যজোট বাধার পেছনে আওয়ামী লীগের কারণ ছিল সংগঠনের বিপর্যস্থ অবস্থা। এই অবস্থায় জেলের বাইরে অবস্থিত নেতারা ভেবে ছিলেন ঐক্য জোটের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আন্দোলনে সম্পৃক্ত থেকে সংগঠনকে সচল রেখে এর জনপ্রিয়তা ধরে রাখা। আওয়ামী লীগের এই সব নেতারা জনসাধারণের মধ্যে সংগঠনটির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে কোন ধারণাই করতে পারেননি। অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানী ডান পন্থী নেতাদের আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যজোট গঠনের কারণ ছিল; তাঁরা ভেবেছিলেন এক যোগে আন্দোলন করলে আওয়ামী লীগের ৬-দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন দাবী প্রতিহত করা যাবে। ফলে ডাক ৮-দফা ভিত্তিক কর্মসূচীতে স্বায়ত্তশাসনের চাইতে গণতান্ত্রিক অধিকার ও সংসদীয় পদ্ধতি পুনঃ প্রবর্তনের ওপর বেশী জোর দিতে থাকে। এক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সফলতা স্বায়ত্তশাসনের পথ সহজ করে দেবে।[৫৬] ডাক নেতাদের এই সমস্তযুক্তি কৌশল পশ্চিম পাকিস্তানে কিছুটা ভূমিকা রাখলেও পূর্ব বাংলায় ছিল অচল। পূর্ব বাংলায় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদের নেতৃত্বের দৃঢ়তার কাছে রাজনৈতিক নেতাদের নেতৃত্বের দুর্বলতা, দ্বন্দ তাদেরকে চলমান আন্দোলনে কোনঠাসা করে দেয়। ১১-দফা দুর্বার আন্দোলনের স্রোতে সমগ্র বাঙালী জাতির সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভেসে যায়। রাজনৈতিক সংগঠন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বর্জন করে, জাতি ছাত্র সমাজের কর্মসূচীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সংগ্রামী জনতা নেতা হিসেবে মওলানা ভাসানীকে মেনে নিলেও তার দলের ১৪ দফাকে গ্রহণ করে নাই। তবে এসময় মওলানা তার বিখ্যাত ঘেরাও আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। তিনি শোষণের সকল প্রকার হাতিয়ার নির্মূল করার আহ্বান জানান। তার এই ভূমিকা জনগণের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষ করে শিল্প শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। মওলানা ডাক-এ যোগদান করেন নাই। আবার ১১-দফাও সমর্থন করেন নাই। পরবর্তীতে ১১-দফা জনমনের দাবীতে পরিণত হলে তিনি এর পক্ষে যেতে বাধ্য হন। ডাক-এর দক্ষিণপন্থী নেতারা পরবর্তীতে ছাত্রদের সঙ্গে এক মঞ্চে শরিক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাছাড়া গণবিচ্ছিন্ন এই নেতাদের অতীত কর্মকাণ্ডের জন্যই তারা জনগণ কর্তৃক আরেক বার প্রত্যাখাত হন।

১৭ জানুয়ারী ছাত্র সমাজ তাদের কর্মসূচী নিয়ে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নেমে পড়ে। ডাক আগেই নিজস্ব কর্মসূচী দিয়েছিল। উভয় পক্ষের কর্মসূচী পালন কালে পলিশীনির্যাতনে গণমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ পরের দিন দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেন। ২০ তারিখ ছিল সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির হরতালের কর্মসূচী।

Dhaka University Institutional Repository

এই দিন আন্দোলন জঙ্গী রূপ ধারণ করে। ছাত্র জনতা লাঠি হাতে মিছিলে সভায় অংশ নেয়। ছাত্রদের কর্মসূচী চলাকালে জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টারের পিস্তলের গুলীতে নিহত হন পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র আসদুজ্জামান। এই ঘটনায় আন্দোলনের রূপ পাল্টে যায়। আসাদের মৃত্যুতে যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়তা শুধু '৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী সঙ্গে তুলনীয়। ম্যাডিকেল কলেজের দিকে সর্বশ্রেণীর শোকার্ত মানুষের ঢল নামে।[৫৭] এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ ছাত্র সমাজ আসাদকে শহীদের আসনে অভিষিক্ত করে তিন দিনের বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করে। আসাদের মৃত্যু বাংলার মানুষের অনুভূতিতে তীব্র আঘাত হানে। এই দুঃখজনক ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর অনুভূতি একই চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ক্ষোভ প্রতিশোধ স্পৃহা সমগ্র বাঙালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে প্রেরণা যোগায়। এর পর থেকে আন্দোলন হয়ে ওঠে প্রবল গতিশীল জঙ্গী এবং এতে প্রকাশ ঘটতে থাকে অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে অনমনীয় মনোভাবের। তিন দিনের কর্মসূচীর পর ছাত্র সমাজ ২৪ জানুয়ারী 'মহা গণঅভ্যুত্থান দিবস' পালনের ঘোষণা দেয়। তাদের দৃঢ় প্রত্যায়ী ঘোষণা ছিল শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। পরিস্থিতি এমন ভয়াল রূপ ধারণ করে যে, ঐ দিন নগরীতে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। গুলিতে নিহত হয় স্কুল ছাত্র কিশোর মতিয়ুর রহমান, ছাত্র কর্মী রুস্তম আলী।[৫৮] পরের দিন নিহত হয় বাবুল, আনোয়ার প্রমুখ। এভাবে আন্দোলন ক্রমশ বিদ্রোহের পর্যায়ে উপনিত হতে থাকে। প্রতিদিন পুলিশ সেনাবাহিনীর গুলি, ১৪৪ ধারা, সান্ধ্য আইন জারী সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। গুলিতে আহত নিহত হওয়ার ঘটনাও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। প্রাশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। সারাদেশ ছাত্র সংগ্রাম কমিটির নির্দেশ মতো চলতে থাকে। রাজপথ চলে যায় ছাত্র জনতার দখলে। অবস্থার ভয়াবহতা সরকারকে নমনীয় হতে বাধ্য করে। গণরোষ প্রশমণের জন্য সরকার ১১ ফেব্রুয়ারী প্রতিরক্ষা আইনে বন্দী সকলকে মুক্তিদানের ঘোষণা প্রদান করে। এই ঘোষণা ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিজয়ের প্রথম সোপান। তবে এই ঘোষণা আন্দোলন উত্তেজনা প্রশমিত করতে ব্যর্থ হয়।

১৪ ফেব্রুয়ারী ডাক এর জনসভায় ছাত্র জনতা বাঙালী জাতীয়তাবাদী বিরোধী নেতা নুরুল আমীন এবং ফরিদ আহমদকে বক্তব্য রাখার সুযোগ না দিয়ে সভা মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ উক্ত মঞ্চ দখল করে জনতার কাছে জানতে চান তাঁরা ৮-দফা না ১১-দফা সমর্থন করে। বিশাল জনতা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে হাত তুলে ১১-দফার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে। প্রকাশ্য জনসভায় জনতার রায়ে জাতীয়তাবাদী শক্তির মহাবিজয় অর্জিত হয়। কেননা ১১-দফার কর্মসূচী আর ছাত্র সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না তা পরিণত হলো কৃষক শ্রমিক লক্ষ কোটি জনতার কর্মসূচীতে। আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী লাক্ষো জনতার দাবী ছিলো অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমাজিক সুবিচার। আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত নিম্ন আয়ের লোকজন, কৃষক এবং শিল্প শ্রমিকরা। প্রতিনিয়ত যারা মিটিং মিছিলে জনতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছিল। বুক পেতে দিচ্ছিল বন্দুকের নলের সমানে। ছাত্র সমাজ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এদের সমর্থন আদায় করে নিতে সক্ষম হয়। শহুরে মধ্যবিত্ত উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থন আগেই অর্জিত হয়েছিল। ডাক নেতৃবৃন্দ প্রত্যাখাত হওয়ার পর আন্দোলন পরিচালনার চাবীকাঠি হয়ে দাঁড়ায় ছাত্র সমাজ। মূল নেতৃত্ব চলে আসে ছাত্র সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দের হাতে। এদিকে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের ব্যাপক সংখ্যক উজ্জীবিত তরুন চলে আসে আন্দোলনের প্রথম সারিতে, যারা ছিল কৃষক শ্রমিকদের প্রতিনিধি। সুতরাং এসময় ১১-দফা ভিত্তিক আন্দোলন বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিকাশের আন্দোলন হিসেবে পরিপূর্ণ অবয়বে আত্মপ্রকাশ করে।

সমগ্র পরিস্থিতি যখন জাতীয়তাবাদী শক্তির হাতে মুঠোয় তখন কিছু কিছু ঘটনা আইয়ুবের পতন ত্বরান্বিত করে। মারমুখী বেপরোয়া করে তোলে ছাত্র জনতা সাধারণ মানুষকে। জনতার চূড়ান্ত দাবী যখন ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার, জেল খানায় বন্দী শেখ মুজিবসহ তাঁর সহবন্দীদের মুক্তি তখনই ফেব্রুয়ারীর ১৫ তারিখে মামলার ১৭নং অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে সামরিক কারাগারে গুলি করে হত্যা করা হয়। সরকারী প্রেসনোটে বলা হয় তিনি পালাতে চেষ্টা করলে তাকে গুলি করা হয়। সরকারী বক্তব্য জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। এতে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

ঘটনার প্রতিবাদে পরের দিন হরতাল ডাকা হয়। মওলানা ভাসানী লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে ঘোষণা করেন 'প্রয়োজন হলে করাচী বিপ্লবের মত জেলখানা ভেঙ্গে মুজিবকে নিয়ে আসব।'[৫৯] তিনি এসভায় আরো ঘোষণা করেন 'দুমাসের মধ্যে ১১-দফা কায়েম এবং রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া না হলে খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হবে।'[৬০]

Dhaka University Institutional Repository

সার্জেন্ট জহুরুল হক হত্যাকান্ডের পর পরই ঘটে আরেক মর্মান্তিক ঘটনা।১৮ ফেব্রুয়ারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানঅনুষদের রিডার ডঃ শামসুজ্জোহা সেনাবাহিনীর ব্যয়নট চার্চে নির্মমভাবে নিহত হন। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর ছাত্র শিক্ষক বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। প্রতিবাদী শিক্ষক সমাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দেন। সান্ধ্যআইন উপেক্ষা করে রাত ১১টায় হাজার হাজার ছাত্র জনতা রাস্তায় নেমে পড়ে। মানুষের মধ্যে ক্রোধ প্রতিশোধ স্পৃহা এতোখানি তীব্র হয়ে উঠেছিল যে তারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণেও প্রস্তুত ছিল। তৎকালীন ছাত্র নেতা মাহফুজ উল্লাহ জণগণের তখনকার মানসিকতার কথা বর্ণনা করতে যেয়ে লিখেছেন:১৬৪

'সে রাতে মাওলানা ভাসানী ইস্কাটনে মরহুম সাইদুল হাসানের বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। জনগণ সে রাতে অস্ত্রের জন্য তাঁর কাছে ধর্না দেয়। কিন্তু মাওলানার পক্ষে তাদের নিরাশ করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। সেনাবাহিনীর গুলিকে মোকাবেলা করার জন্য জনগণ টিন হাতে বেরিয়েছিলেন রাস্তায়, পরিকল্পনা ছিল এই ঢেউটিন ব্যারিকেড হিসেবে কাজ করবে।'৬১

আন্দোলনের শুরু থেকে প্রতি হত্যাকান্ডে আন্দোলনের ঐক্য এবং শক্তিকে আরো বৃদ্ধি করে তীব্র গতিতে লক্ষ্য অর্জনের পথে ঠেলে দিতে থাকে। মুক্তি পাগল জনতা সকল ভয়ভীতি মৃত্যুকে উপেক্ষা করে সামনের দিকে ছুটতে থাকে। মওদুদ আহমদের ভাষায়:১৬৫

'এধরনের প্রত্যেকটি ঘটনায় ক্রমে ক্রমে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। যতবারই এধরনের ঘটনা ঘটে ততবারই বাঙালীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অর্জন করতে থাকে উত্তরোত্তার জন প্রিয়তা। এতে গণঅনুভূতি বহু গুনে বৃদ্ধি পায় ও জনতার ঐক্যবিধানে তা মূখ্য ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে আসাদ, ডঃ জোহা ও সার্জেন্ট জহুরুল হক সহ অন্যান্য শহীদের মৃত্যু বাঙালীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নজিরবিহীন শক্তির উৎস বলে বিবেচিত হয়।'৬২

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ঘোষণা অনুযায়ী সম্ভাব্য গোলটেবিল বৈঠক নিয়ে যখন জল্পনা কল্পনা চলছে তখন ২০ফেব্রুয়ারী হঠাৎ করে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হলে শহরময় গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, শেখ মুজিব মুক্তি পেয়েছেন। প্রায় এক লাখ মানুষ সেনানিবাস এলাকার বাইরে থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত 'জেলের তালা ভাঙ্গব শেখ মুজিবকে আনবো' শ্লোগানে শ্লোগানে পুরো এলাকা প্রকম্পিত করে তোলে। শেখ মুজিব প্যারলে মুক্তি নিয়ে এই পথ দিয়ে বৈঠকে যোগদেয়ার জন্য বিমানবন্দরে যাবেন। সেই সুযোগে তারা নেতাকে একনজরে দেখবেন এই আশা হয়তো তাদের ছিল। কিন্তু শেখ মুজিব শেষ পর্যন্ত প্যারলে মুক্তি নিতে অস্বীকার করলে তার মুক্তি বিলম্ব হয়। তিনি তাঁর মুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাখান করে সামগ্রীকভাবে মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান। অথচ সরকারের ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। সেনাবাহিনী কোন অবস্থাতেই এই মামলা প্রত্যাহারের পক্ষপাতী ছিল না। আবার শেখ মুজিবকে ছাড়া কোন রাজনৈতিক সমাধান জনগণ মেনে নেবে না। জনমনের রোষপ্রশমিত করার জন্য আশু রাজনৈতিক সমাধান ছিল জরুরী। এই অবস্থয় আইয়ুব খান চেয়েছিলেন প্যারলে মুক্তি দিয়ে শেখ মুজিবের বৈঠকে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে, আবার মামলা প্রত্যাহার না করে সেনাবাহিনীকেও হাতে রাখতে। প্যারলে মুক্তি নিতে শেখ মুজিবের অস্বীকৃতিতে সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা বরবাদ হয়ে যায়। মুজিবের দৃঢ়তা ও আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান ২২ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব সহ আগরতলা মামলার সকল আসামীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন এবং ষড়যন্ত্রমূলক মামলাটি প্রত্যাহার করে নেন। এভাবে ফাঁসির রজ্জুকে পেছনে ফেলে অসীম ত্যাগ সাহসের বলে শেখ মুজিব বাঙালী জাতির প্রতিনিধিত্বকারী একক নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে দেখতে পান বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বি নেতা হিসেবে এবং কর্তৃত্বের শীর্ষস্থানে। শেষ পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত ইমেজ প্রভাব তার জনপ্রিয়তা তাকে পরিণত করে পাকিস্তানের বৃহত্তর দলের নেতা হিসেবে। যার উপর নির্ভর করতে থাকে শুধু বাঙালী জাতির ভাগ্য নয় পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ।

মুজিব মুক্তি পাবার পর তাৎক্ষনিকভাবে ছাত্রদের ১১-দফাকে সমর্থন করে বলেন 'সংগ্রামী ছাত্ররা যে ১১-দফা দিয়েছেন তার প্রতি আমারও সমর্থন রহিল। কারণ ১১-দফার মধ্যে আমার ৬-দফার রূপরেখা রহিয়াছে।'৬৩ পরের দিন শেখ মুজিব তাঁকে দেয়া রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম কমিটির সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উভয় কর্মসূচীর প্রতি তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থনের কথা পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেন। স্মরনাতীত কালের এই বৃহত্তর জনসভায় তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ঐ সময়ে তার গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান প্রশ্নে রাজনৈতিক অঙ্গনে দ্বিমতের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় শেখ মুজিব বৈঠকে যোগদানের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে জনগণের দাবী আদায়ে অঙ্গীকার করে বলেন 'আমি আলোচনা এবং শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এসমস্ত দাবী আদায়ের পক্ষপাতী'[৬৪] তিনি আরো বলেন, 'গোলটেবিল বৈঠকে বসে আমি ছয় দফা ও ১১-দফা দাবী আদায় করবো যদি তা করতে ব্যর্থ হই তাহলে গোলটেবিল বৈঠক বর্জন করবো।'[৬৫] শেখ মুজিব ছিলেন বাঙালীর স্বার্থ আদায়ে নিবেদিত প্রাণ। যে কারণে তিনি উক্ত সভায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব স্থিরিকরনের মতো একটি নতুন বিষয় ও গোলটেবিলে উত্থাপন করবেন বলে সভায় উল্লেখ করেন। এতে জাতীয় সংসদে বাঙালীদের জন্য সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন নিশ্চিত হবে। 'এই দাবীর বাস্তবায়নে বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের জন্য তাদের পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদে নীতিমালা প্রণয়নের সুযোগের ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে।'[৬৬]

বাঙালীর দাবী আদায়ে ব্যর্থ হলে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠক বর্জনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শেখ মুজিবকে শেষ পর্যন্ত বৈঠক বর্জন করেই চলে আসতে হয়েছিল। বৈঠকে শেখ মুজিবের দেয়া বক্তব্য ছাত্র সমাজের ১১-দফা এবং আওয়ামী লীগের ৬-দফার ভিত্তিতেই প্রণীত হয়েছিল। উভয় কর্মসূচীতে স্বাওয়শাসন প্রশ্নে কিছু অমিল থাকলেও মোটামোটি একই চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটে ছিল। বৈঠকে মুজিব ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন। তাঁর ৬-দফার প্রতি দৃঢ় প্রত্যায়ী মনোভাব সরকার পক্ষতো বটেই, ডাক-এর নেতৃবৃন্দও মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ডাক নেতা বিশেষ করে পাঞ্জাবীরা ছিল চরম ভাবে ৬-দফা বিরোধী। তারা স্বায়ত্তশাসন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নটির উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেননি। অথচ বাঙালীর এতোকালের সংগ্রাম ছিল এদুটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে। '৬৯ গণঅভ্যুত্থানের পেছনেও এদুটি বিষয়ছিল গুরুত্বপূর্ণ শেখ মুজিব ছিলেন পূর্ব পশ্চিমের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার। অর্থনৈতিক বৈষম্য ঠেকান, বাঙালী ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য তিনি ৬-দফাকে সামনে তুলে ধরেছিলেন। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের ডাক নেতারা দেশে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্যর প্রতি কোনো গুরুত্বই দেননি। এমনকি বৈঠকে শেখ মুজিব বাঙালী স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে পূর্ব বাংলার ডান পন্থী সুবিধাবাদী ডাক নেতাদের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হন। বৈঠকে সমাপ্তী অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বক্তব্যও ছিল বাঙালীর আশা আকাংখার সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি তার বক্তব্যে শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে জোর দিয়ে বলেন 'আমি শক্তিশালী কেন্দ্র ভিত্তিক একটি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে বিশ্বাসী।'[৬৭] তিনি '৫৬ সালের সংবিধান সংশোধনের বিষয়টিও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর এবং তার অনুসারীরা চেয়েছিলেন পূর্ব বাংলা যেন '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রশাসনিক কাঠামো মেনে নেয়। স্বায়ত্তশাসন বলতে ক্ষমতাশীনরা পাকিস্তানকে খন্ড বিখন্ডিত করার প্রয়াস বলে এর চরম বিরোধীতা করে। শেখ মুজিব প্রেসিডেন্টর বক্তব্য পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আশা আকাংখা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এ বক্তব্য বাংলার জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে তিনি সভাকক্ষ পরিত্যাগ করেন।[৬৮]

গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা এবং শেখ মুজিবের ডাক-এর থেকে সরে দাঁড়াবার ফলে রাজনৈতিক সমাধানের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সংবিধান লঙ্ঘন করে সেনানাহিনী প্রধান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাংখাকে ধুলিসাৎ করে দিয়ে পাকিস্তানকে আরেকবার সামরিক শাসনের আওতাধীন করা হয়। ক্ষমতার হাত বদলে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেও পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে নেমে আসে গভীর হতাশা। বাঙালীকে তার ন্যায্য অধিকার ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করার অভিসন্ধি নিয়েই দ্রুত অরাজনৈতিক এবং অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা হাত বদল করা হয়। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা এবং পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী স্বীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখার এই প্রবণতা বাঙালী সহজ ভাবে গ্রহণ করেনি। আইয়ুবের ২৫ মার্চের বক্তব্যের মধ্যেও বাঙালীকে তার দাবী থেকে বঞ্চিত করার ইঙ্গিত পরিস্কার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তার বক্তব্যে বলেন : "কতিপয় লোক আমার নিকট প্রস্তাব করেন যে, যদি তাহাদের সমূদয় দাবী মানিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। আমি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কোন দেশে ? এই সকল দাবী মানিয়া নেওয়া হইলে পাকিস্তান ধ্বংস হইয়া যাইত।"[৬৯]

অর্থাৎ ৬-দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকবে না। এ দাবী মেনে নিলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে এই ধারণার কথা প্রকাশ করলেও মূল ভীতি ছিল ৬-দফায় বাঙালীর ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপর। রাজনৈতিক হিস্যার ন্যায্য অংশীদারত্ব দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার হাতে সকল কর্তৃত্ব চলে যাবে পাঞ্জাবী আমলা সেনাবাহিনী এবং ক্ষমতাশীনরা কোন অবস্থায় এই কর্তৃত্ব হতে ছাড়া করতে রাজী ছিলেন না। আবার বিদ্রোহী

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালীকে শান্ত করার প্রয়োজনও ছিল। ফলে ক্ষমতার হাত বদলের প্রহসনেরও প্রয়োজন ছিল। ইয়াহিয়া ক্ষমতায় এসে গণরোষ প্রশমণের জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিস্থিতি অনুকূলে আসার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনের অঙ্গীকার ঘোষণা করেন।

ইয়াহিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ এবং নির্বাচনের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যের আরো নতুন নতুন উদাহরণ সৃষ্টি হতে থাকে।'৭০ সালের ৫অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের প্রাগকালে জুলাই মাসে সারা প্রদেশব্যাপী বন্য পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ লাভ করে। এ সময়ে দূর্গত পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য কেন্দ্র থেকে বারান্দ করা হয় মাত্র ২০ লক্ষ টাকা। শাসকগোষ্ঠীর এই ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে দেশবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নেতৃবৃন্দ এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। সাহায্যের বিষয়ে সরকার উদাসীন থাকলেও বন্যার কারণে নির্বাচন পছিয়ে দেয়ার দাবী দ্রুত পূরণ করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি; নির্বাচনে যাদের ভরাডুবী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তারা বন্যা পরিস্থিতির ওছিলায় নির্বাচন পেছানোর দাবী করে। শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বরে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়।'৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনের আগে ঘটে যায় স্মরণাতীত কালের আরেক ভয়াবহ ঘটনা। ১২ নভেম্ব দক্ষিণ বাংলার উপকূলবর্তী এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্নিঝড় আর জলোচ্ছাসে ১০ থেকে ১২ লাখ লোক নিহত হয়। বাংলার এই দুর্দিনে যখন সারা বিশ্বের মানুষ সহানুভূতী আর সহমর্মীতা প্রকাশ করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনগোষ্ঠী রইল বিষ্ময়কর ভাবে উদাসীন।[৭০] ক্ষমতাশীনদের এই মানসীকতা বাঙালীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো নিজের অবস্থান সম্পর্কে আরেক দফা ভাবার সুযোগ করে দিল। এই ভাবনার পূর্ণ প্রকাশ ঘটনো '৭০ এর নির্বাচনী প্রচার কালে, সভা সমিতিতে। বাঙালী জাতীয়তাবাদের পক্ষে সকল শক্তি পূর্ব বাংলার বঞ্চনার কথা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি জনগণের সমানে তুলে ধরতে লাগল। এই সব দলগুলির বেতার টিভির নির্বাচনী বক্তব্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য স্বায়ত্তশাসন বিষয়টি গুরুত্ব পেল সর্বাধিক । বৃহত্তর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ৬ দফাকে আক্রে থাকল দৃঢ় ভাবে। 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' শিরনামে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিসংখ্যান সমৃদ্ধ পোষ্টার জনগণের ভাবাবেগে প্রবল নাড়া দিতে সক্ষম হলো। আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী প্রচার কালে গণতন্ত্রের সঙ্গে শোষণ মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করল।[৭১] আওয়ামী লীগের শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে পার্টির চারিত্রিক বৈশিষ্টের পরিবর্তণের ইঙ্গিত বহন করে। যে আওয়ামী লীগ এক সময় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যাত্রা শুরু করে ছিল সে পার্টি সময়ের দাবীকে স্বীকার করে ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে অসম্প্রদায়িক পার্টিতে পরিণত হয়। '৭০ এর নির্বাচন প্রাগকালে সমাজতন্ত্র তথা শোষনহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে আরেকবার সময়ের প্রয়োজনের কাছে আত্মসমর্পণ করে; পার্টি পরিণত হয় কৃষক-শ্রমিক-মেহনতীজনতার পার্টিতে। এভাবে আওয়ামী লীগ সর্বসাধারণের অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নির্বাচনে নামে।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের আসন বন্টন প্রক্রিয়া ছিল নিম্নরূপ :

	সাধারণ আসন	মহিলাদের আসন
পূর্বপাকিস্তান	১৬২	৭
পাঞ্জাব	৮২	৩
সিন্ধু	২৭	১
বেলুচিস্থান	৪	১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে	১৮	১
কেন্দ্রীয় প্রশাসনভুক্ত উপজাতীয় এলাকা	৭	-
মোট	৩০০	১৩

সূত্র : মওদুদ আহমদ; *বাংলাদেশঃ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা* পৃষ্ঠা-১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রাদেশিক পরিষদসমূহে আসন বন্টন প্রক্রিয়া ছিল নিম্ন রূপ :

প্রদেশ সমূহ	সাধারণ আসন	মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০
বেলুচিস্থান	২০	১
পাঞ্জাব	১৮০	৪
সিন্ধু	৬০	২
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪০	২

সূত্র : মওদুদ আহম্মদ : পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১৬৪।

আওয়ামী লীগ প্রধান বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচার সভায় পূর্ব পাকিস্তানের নাম বাংলাদেশ রাখার আহ্বান জানিয়ে ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্যের প্রতিদৃষ্টি প্রদান করে বাঙালী জাতিয়তাবাদের চেতনাকে উজ্জীবিত রাখতে সচেষ্ট হন। '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের উচ্চারিত বাঙালী জাতি চেতনা সমৃদ্ধ শ্লোগান সমূহ যেমন ' জাগো জাগো, বাঙালী জাগো', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'জয় বাংলা' ইত্যাদি নির্বাচনী প্রচার সভা এবং মিছিলে মিছিলে ধ্বনিত হতে থাকে। 'জয় বাংলা', শ্লোগানটির জন্ম গণঅভ্যুত্থানের সময় হলেও নির্বাচনের আগে এটি বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীদের মূল শ্লোগানে পরিণত হয়। সব কিছু ছাপিয়ে বাঙালী জাতীয় চেতনা হয়ে ওঠে মূল আদর্শ। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর মধ্যে থেকেও পূর্ব বঙ্গবাসী তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘোষণায় বিভোর হয়ে যায়। এই মানিসকিতা বাঙালীকে পাকিস্তান ভিত্তিক চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাঙালী জাতীয়তাবাদের জোয়ারের প্রবল তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। ঊনসত্তরের যে বাঙালী তার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনার কূলে কূলে খুঁজে পেয়ে ছিল সত্তরে তা পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। নির্বাচনে অভাবিত সাফল্য লাভ করেও ক্ষমতা লাভে ব্যর্থতা এবং একাত্তরে নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি তাকে এই মানসিকতা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য করে।

১৯৭০ এর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল	বিজয়ী আসন	মহিলা সদস্য	মোট
আওয়ামী লীগ	১৬০	৭	১৬৭
পিপলস পার্টি	৮৩	৫	৮৮
মুঃলীগ (কাইয়ুম)	৯	-	৯
মুঃলীগ (কাউন্সিল)	৭	-	৭
মুঃলীগ (কনভেনশন)	২	-	২
ন্যাপ (ওয়ালী)	৬	১	৭
জামাতে ইসলামী	৪	-	৪
জমিয়তে ওলামা	৭	-	৭
জমিয়তে ওয়ামা (থানভী)	৭	-	৭
পিডি, পি	১	-	১
স্বতন্ত্র	১৪	-	১৪
সর্বমোট	৩০০	১৩	৩১৩

সূত্র : এম, আর আখাতার মুকুল: *পাকিস্তানের চব্বিশ বছর ভাসানী মুজিবের রাজনীতি* (দ্বিতীয় খন্ড) পৃষ্ঠা- ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

দুই প্রদেশে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা :

জাতীয় পরিষদ নির্বাচন- ১৯৭০

রাজনৈতিক দল	পূর্ববঙ্গ	পঃ পাকিস্তান	মোট
আওয়ামী লীগ	১৬৭	০	১৬৭
পিপলস পার্টি	০	৮৮	৮৮
৩টি মুসলিম লগি	০	১৮	১৮
২টি জমিয়তে ওলেমা	০	১৪	১৪
স্বতন্ত্র	১	১৩	১৪
ন্যাপ (রুশ পন্থী)	০	৭	৭
জামাতে ইসলামী	০	৪	৪
পিডিপি	১	০	১

সূত্র : এম, আর, আখাতার মুকুল, *পাকিস্তানের চব্বিশ বছর ভাসানী মুজিবের রাজনীতি* (দ্বিতীয় খন্ড) পৃষ্ঠা ৩

নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেও বাঙালী ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দিগ্ন হয়ে ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টোর বক্তৃতা বিবৃতি এই সন্দেহ আরও ঘনিভূত করে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের উদ্বোধনী দিন বলে ঘোষণা দেন। ১৩ ফেব্রুয়ারী ভূট্টোর সম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট এই তারিখ ঘোষণা করেন। অথচ এই ঘোষণার দুদিন পর অর্থাৎ ১৫ ফেব্রুয়ারী ভুট্টো তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা রাজনৈতিক মহলকে বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ৬-দফা ভিত্তিক জনগণের এই রায় কোন অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতাশীন গোষ্ঠী মেনে নিতে রাজী ছিল না। '৭০ এর নির্বাচনী ফলাফল ক্ষমতাশীনদের সকল আশা আকাংখা ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছিল। তারা এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। যারা বাঙালীকে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদারিত্ব দিতে কখনই রাজী ছিল না এবং ৬-দফার ছিল চরম বিরোধী তারা ভূট্টোকে তাদের স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠিত ২২ পরিবার যারা দিনের পর দিন পূর্ব বাংলাকে শোষণ করে সম্পদের পাহাড় জমা করে ছিল, আমলা শ্রেণী যারা এই শোষণ প্রক্রিয়ায় ২২ পরিবারকে সাহায্য করেছে নিজেদের স্বার্থে, সেনাবাহিনী যারা দিনের পর দিন কখনো নেপথে থেকে কখনো প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতের মুঠোয় রেখে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষা করেছে; এরা সবাই ভূট্টোর পেছনে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেয়।

প্রধানতঃ ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়াভুন্ডল করে দেয়ার জন্যই এই ঘোষণা ছিল ভূট্টোর একটি কৌশল মাত্র। এমনিতে পূর্ব বাংলায় ভূট্টো এবং তার দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির কোন সমর্থন ছিল না। এমনকি পূর্ব বাংলার কট্টর ডানপন্থী দলও ৬-দফা কর্মসূচী বিরোধীতা করে ভূট্টোকে সমর্থন করেনি। সবুর খানের মতো ডানপন্থী নেতাও জনগণের রায়কে মেনে নিয়ে সংবিধান প্রণয়নে মুজিবকে সহযোগীতার জন্য ভূট্টোকে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন।[৭২] কিন্তু ভূট্টো ৬-দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের কোনো সংবিধান প্রণয়ন করা হলে সেই সংবিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার হুমকী প্রদান করেন। তার এই ধরনের হুমকী বক্তৃতা বিবৃতি তাকে পূর্ব বাংলার জনগণের কাছ থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

এই পরিস্থিতিতে প্রেডিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ এক বেতার ভাষণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন।[৭৩] ঘোষণার পর পর পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে দোকান পাট জানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অফিস আদালত ছেড়ে দলে দলে লোক রাস্তায় নেমে পড়ে।[৭৪] ঢাকা পরিণত হয় মিছিলে শহরে। ইয়াহিয়ার ঘোষণা বিরোধী, ভুট্টো বিরোধী এবং পাকিস্তানের ঐক্য বিরোধী শ্লোগানে আকাশ বাতাস প্রকম্পীত হয়ে ওঠে। শ্লোগানের ভাষা ছিল পরিপূর্ণভাবেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙ্গে ফেলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পক্ষে। 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর' 'তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ', 'ঢাকা না পিন্ডি, ঢাকা ঢাকা' ইত্যাদি শ্লোগান নিঃসন্দেহে বাঙালীর পাকিস্তান

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন সর্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের প্রস্তুতিরই বর্হিপ্রকাশ আর ইয়াহিয়া ভূট্টো চক্রের কর্মকান্ড এই প্রস্তুতি পর্ব ত্বান্বিত করে।

'৬৯ সালে জেলের অভ্যন্তরে থেকেই শেখ মুজিব বাঙালী জাতির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর শুধু বাংলার জনগণই নয় ১১-দফা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও তাঁর নেতৃত্বে পরিপূর্ণ ভাবে আস্থা স্থাপন করে। ১১-দফা এবং ৬-দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়নের সকল দায়দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। গোলটেবিল বৈঠক থেকে ৬-দফা কর্মসূচীর বিষয়টিই বেশী গুরুত্ব পেতে থাকে। বাঙালীর নির্বাচনী রায়ও ছিল ৬-দফার পক্ষে, এই অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের এবং ক্ষমতাশীনদের ৬-দফা বিরোধী ভূমিকায়, বাঙালী পাকিস্তানের ক্ষমতাশীন শাসকগোষ্ঠীর উপরই নয় পাকিস্তানী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ফেলে। ১ মার্চ থেকে সারা পূর্ব বাংলার জনগণই শুধু নয় সরকারী অফিস আদালতও চলতে থাকে শেখ মুজিবের নির্দেশে। ৩মার্চ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে শুরু হয় ঐতিহাসিক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। সারা বাঙালী জাতি এই আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। মওলানা ভাসানী থেকে আতাউর রহমান খান পর্যন্ত সকল নেতৃবৃন্দ জনগণকে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আস্থাশীল থাকার জন্য আহ্বান জানান। জাতীয়তাবাদী শক্তির সমর্থক সকল দল শেখ মুজিবের নেতৃত্বকে সমর্থক দান করে তার পেছনে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এদিকে ছাত্র সমাজ ২মার্চ স্বাধীনতা এবং বাঙালী জাতিসত্ত্বাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের এক দুঃসাহসি পদক্ষেপ গ্রহন করেন। তারা ' .... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের সামনে স্মরণ কালের বৃহত্তম ছাত্রসভায় বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে'।[৭৫] একই সভায় পূর্ব বাংলার মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয়। এভাবে বাঙালী জাতিসত্ত্বাভিত্তিক একটি রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া বাস্তব পথে যাত্রা শুরু হয়। আন্দোলনের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দাবীটিরও ব্যাপকতা বাড়তে থাকে। পূর্ব বাংলার উপর কেন্দ্রের সকল নিয়ন্ত্রণ শিথিত হয়ে যায়।

৭ মার্চ বাঙালীজাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে স্বাধীনতার প্রস্তুতি গ্রহনের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন : '.... বাংলার ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল যার যা আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রাস্তা ঘাট বন্ধ করে দিতে হবে। আমরা তাদের ভাতে মারবো পানিতে মারবো। আমি যদি হুকুম দেয়ার জন্য না থাকি, যদি আমার সহকর্মীরা না থাকেন, আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।'[৭৬]

তার এই আহ্বানের মধ্যে বাঙালীকে অস্ত্র হাতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অবতীর্ন হওয়ার নির্দেশ রয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায় স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা, যে যুদ্ধ বাঙালীর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। ঐ দিন তিনি তার ঘোষণায় বলেন : "মনে রাখবেন রক্ত যখন দিয়েছি, আরও দেব, তবু এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্। এ বারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"[৭৭]

৭মার্চ শেখ মুজিব তার বক্তৃতার মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার ডাক দেন। বাঙালী যখন ঘরে ঘরে সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে, স্থানে স্থানে পাকিস্তান সেনবাহিনী সঙ্গে চলেছে জনতার সংঘাত, তখন মুজিব-ইয়াহিয়া, পরবর্তীতে মুজিব - ইয়াহিয়া-ভুট্টো বৈঠকের নামে চলছে প্রহসন। যে প্রহসনের মাধ্যমে কালক্ষেপন করে লোক চক্ষুর অন্তরালে হাজার হাজার সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলায় আনা হতে থাকে। উদ্দেশ্যে ছিল বাঙালী জাতিয়তাবাদের আন্দোলন, বাঙালী স্বাধীনতা স্পৃহা চরম ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়া। শাসক গোষ্ঠী উপলব্ধি করতে পেড়েছিল যে, বাঙালী যেভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তাদের সাথে আপোষরফার কিছু নাই। তবে আপোষের নামে কালক্ষেপন করে শেষ রক্ষা করার সর্বশেষ চেষ্টা অর্থাৎ বল প্রয়োগের দ্বারা যতদিন নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ২৫ মার্চ গভীর রাতে সেই শেষ চেষ্টা হিসেবেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পূর্ব বঙ্গবাসীর উপর ঝাপিয়ে পড়ে। আধুনিকতম মারণাস্ত্র ব্যবহার করে নিরস্ত্র নিরিহ বাঙালী হত্যায় মেতে ওঠে। এই বর্বোরচিত আক্রমনে বাঙালীর স্বাধীনতা স্পৃহা স্তব্ধ না হয়ে আগুনের মতো জ্বলে ওঠে। ২৬মার্চ প্রথম প্রহরে শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানকে তিনি গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বলে উল্লেখ করেন।[৭৮] তিনি তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণায় বলেন : "পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী আকস্মিক ভাবে ঢাকা সেনানিবাস পিল খানা ইপি আর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য স্থানে মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে নিরীহ নিরপরাধ বাঙালীদের হত্যা করছে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।...আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি।...ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানে রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা মাতৃভূমিকে

Dhaka University Institutional Repository

মুক্ত করার জন্য বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে চলেছে। সর্ব শক্তিমান আল্লাহর নামে আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি এবং নির্দেশ দিচ্ছি যে, দেশকে মুক্ত করার জন্য জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করুন। পুলিশ বাহিনী, ইপি আর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসার বাহিনীর প্রতি আমার নির্দেশ জনগণের পাশে এসে যুদ্ধ করুন। কোনো আপোষ নয়, বাংলার মাটি থেকে শেষ শত্রুটিকে পর্যন্ত বিতাড়িত করুন। সব আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও অন্যান্য দেশ প্রেমিক স্বাধীনতাকামীদের কাছে এ বার্তা পৌছে দিন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। জয়বাংলা"।[৭৯]

এই ঘোষণার পর থেকে স্বাধীকার সংগ্রাম স্বাধীনতাযুদ্ধে পরিণত হয়। বাঙালী নিজ দেশ জাতি ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার জন্য মরণ গণলড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় স্বতঃস্ফুর্ত গণযুদ্ধ। ছাত্র-জনতা, বাঙালী পুলিশ, ই,পি,আর, সেনা সদস্য পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বোরচিত আক্রমণও গণহত্যার বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নয় মাস ব্যাপী চলে বাঙালীর রক্তাক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধ। এ যুদ্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্রভারত সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় সবিয়েত রাশিয়া (বর্তমানে বিলুপ্ত) ও পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ। প্রাথমিক পর্যায়ে বাঙালী তরুণ যোদ্ধারা গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে শক্তিশালী পাকিস্তানী বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দিতে এবং জান মালের প্রভূত ক্ষতিসাধণে সক্ষম হয়। শেষ পর্যায়ে অথ্যাৎ ডিসেম্বরে শুরু হয় মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ অভিযান। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বিসর্জনে আত্মতাগ স্বজন হারানোর বেদনা দুঃখ কষ্টের বিনিময়ে জন্ম নেয় বাঙালী জাতিসত্ত্বা ভিত্তিক রাষ্ট্র বাঙালী জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের ফসল স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতিসত্ত্বা রক্ষার যে প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছিল।, সে প্রতিজ্ঞা ক্রমে ক্রমে দৃঢ়তা লাভ করে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতার মধ্যদিয়ে । যে ধারার স্তরে স্তরে বিকাশ লাভ করেছে বাঙালী জাতীয়তাবাদ। এই বিকাশের পেছনে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচ্ছন্ন থেকে পরবর্তীতে মূল বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে অর্থনৈতিক শোষণবৈষম্য। বাঙালী জাতীয়তাবাদী বিকাশের একটি প্রধান উৎসে পরিণত হয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য। এর মাত্রা যত বৃদ্ধি পেতে থাকে আন্দোলনের তীব্রতা তত বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক শোষণের অনিবার্য ফল বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালী একের পর এক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। প্রতিটি আন্দোলন বাঙালী জাতি চেতনাকে উত্তর উত্তর দৃঢ় সংহত এবং ঐক্যবদ্ধ রূপ দিতে থাকে। আগরতলা মামলার প্রতিক্রিয়ার পরিণতিতে তা বিস্ফোরিত হয়। অর্থনৈতিক শোষণ বৈষম্য চালু রাখার এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঙালীর ক্ষোভ '৬৯-এ গণ অভ্যুত্থান রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় থেকে বাইশ বছরের অভিজ্ঞাতা লব্ধ পূর্ব বঙ্গবাসী নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের আশায় বিদ্রোহী কণ্ঠে তুলে নেয় যে শ্লোগান তার মধ্যে তার পরবর্তী রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা শেষ পর্যন্ত '৭১ রে বাঙালীর স্থায়ি ঠিকানায় পরিণত হয়। এই ঠিকানা যে রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল তা ছিল বাঙালী জাতিয়তাবাদ বিকাশের এবং পরিণতি লাভের সংগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১।	Rounaq Jahan	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮৫।
২।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৮৬।
৩।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৮৬।
৪।	এম, আর, আখাতার মুকুল	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮৫ - ৮৬।
৫।	Shyamali Ghosh	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৫৩।
৬।	মোহাম্মদ হাননান	ঃ	পূর্বোক্ত খন্ড পৃষ্ঠা ৫৩।
৭।	এ, এস, এম সুলায়মান	ঃ	পাকিস্তানে ন্যাসনাল এসেমলী, ডিবেটস জুন ২২, ১৯৬৬ পৃষ্ঠা ১২৮১-৮২।
৮।	Rounaq Jahan	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮৮ -৮৯।
৯।	Shyamali Ghosh	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৫৩।
১০।	Rounaq Jahan	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬৪।
১১।	Md. Abdul Wadud Bhaiyan	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯৮।
১২।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯।
১৩।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭২-৭৫।
১৪।	আবু আল সাঈদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৪৮।
১৫।	K. Ali	ঃ	Bangladesh A New Nation P. 77.
১৬।	Md. Abdul Wadud Bhulyan	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১০০।
১৭।	আবু আল সাঈদ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৪৫।
১৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৪৫।
১৯।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮।
২০।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৭৮।
২১।	আবু আল সাঈদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৪৪।
২২।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৪৭।
২৩।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৫৮।
২৪।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৫৮ -১৫৯।
২৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৪৩।
২৬।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭৯।
২৭।	এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া	ঃ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ পৃষ্ঠা ২৫।
২৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২৫।
২৯।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২৫ ।
৩০।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ২৫-২৬।
৩১।	আবু আল সাঈদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৬০-১৬১।
৩২।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পৃষ্ঠা ৮০।
৩৩।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৭৭।
৩৪।	ফয়েজ আহমদ	ঃ	'আগরতলা মামলা' শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ পৃষ্ঠা ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫।	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের নামের তালিকা ঃ ১। শেখ মুজিবুর রহমান, ২। কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ৩। ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ৪। প্রাক্তন এল, এস, সুলতান উদ্দিন আহমদ, ৫। এল, এস, নূর মোহাম্মদ, ৬। আহমদ ফজলুর রহমান সি, এস, পি, ৭। ফ্লাইট সাজেন্ট মফিজুল্লাহ, ৮। প্রাক্তন কপোরাল এ, বি সামাদ, ৯। প্রাক্তন হাবিলদার দলিলউদ্দিন, ১০। রুহুল কুদ্দুস সি, এস, পি, ১১। ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, ১২। ভুপতি ভূষণ (মাণিক) চৌধুরি ১৩। বিধান কৃষ্ণ সেন, ১৪। সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, ১৫। মুজিবর রহমান ই, পি, আর, টি, সি ক্লার্ক, ১৬। সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুর রাজ্জাক ১৭। সাজেন্ট জহুরুল হক, ১৮। মোহাম্মদ খুরশীদ, ১৯। কে, এম শামসুর রহমান সি, এস, পি, ২০। রিসালদার শামসুল হক, ২১। হাবিলদার আজিজুল হক, ২২। এস, এ, সি মাহফুজুল বারি, ২৩। সাজেন্ট শামসুল হক, ২৪। মেজর শামসুল আলম, ২৫। ক্যাপ্টেন মুত্তালিব, ২৬। ক্যাপ্টেন শওকত আলী, ২৭। ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা, ২৮। ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান, ২৯। সজেন্ট আবদুল জলিল, ৩০। শাহাবুদ্দিন চৌধুরী, ৩১। লেঃ এস, এম, এম রহমান ৩২। প্রাক্তন সুবেদার তাজুল ইসলাম, ৩৩। মোহাম্মদ আলী রেজা ৩৪। ক্যাপ্টেন খুরশীদ, ৩৫। লেঃ আবদুল রউফ। ফয়েজ আহমদ, 'আগরতলা মামলা' শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ পরিশিষ্ট-৩ পৃষ্ঠা ১২১-১২৩।		
৩৬।	**মযহারুল ইসলাম**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৪৮।
৩৭।	**ঐ**	ঃ	পৃষ্ঠা ৩৪৮।
৩৮।	**ফয়েজ আহমদ**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৯।
৩৯।	**মওদুদ আহমদ**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯০।
৪০।	**ফয়েজ আহমদ**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৪-২৫।
৪১।	**মওদুদ আহমদ**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮১।
৪২।	আগরতলায় শেখ মুজিবের উপস্থিতি সম্পর্কে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের বক্তব্য : ১৯৬৩ইং আমার ভঅই MLA শ্রী উমেশলাল সিং সমবিব্যাহারে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ১০ জন ত্রিপুরার পালাম জিলার খোয়াই মহকুমা দিয়া আগরতলায় আমার আগরতলার বাংলোয় রাত্র ১২ঘটিকায় আগমর করেন। প্রাথমিক আলাপ -আলোচনার পর আমার বাংলো বাড়ি হইতে মাইল দেড়েক দূরে ভগ্নী হেমাঙ্গিণী দেবীর বাড়িতে শেখ সাহেব আসেন। সেখানেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর মুজিবুর ভাইয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহর লাল নেহরুর সাথে দেখা করি। আমার সাথে ছিলেন শ্রী শ্রীরমণ চীফ সেক্রেটারি। তাকে (শ্রীরমণকে) শ্রী ভান্ডারিয়ার বিদেশ সচিবের রুমে রাখিয়া প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করি। তিনি মুজিবুর রহমানকে ত্রিপুরায় থাকিয়া প্রচার করিতে সম্মত হন নাই। কারণ চীনের সাথে লড়াইয়ের পর এতোবড় ঝুঁকি নিতে রাজি হন নাই। তাই ১৫দিন থাকার পর তিনি (শেখ মুজিব) ত্রিপুরা ত্যাগ করেন। সোনাপাড়া পশ্চিম ত্রিপুরারই এক মহকুমা কুমিল্লার সাথে সংলগ্ন। শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। ফয়েজ আহমদঃ 'আগরতলা মামলা,' শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ, পরিশিষ্ট-৭ পৃষ্ঠা ১২৮।		
৪৩।	**মওদুদ আহমদ**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯০।
৪৪।	**ঐ**	ঃ	পৃষ্ঠা ৯৬।
৪৫।	**ঐ**	ঃ	পৃষ্ঠা ৯৬।
৪৬।	**ঐ**	ঃ	পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭।
৪৭।	**ঐ**	ঃ	পৃষ্ঠা ৯৭।
৪৮।	**ঐ**	ঃ	পৃষ্ঠা ১০৯।
৪৯।	**মোহাম্মদ হাননান**	ঃ	পূর্বোক্ত ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ১৫৭।
৫০।	**মওদুদ আহমদ**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১১১।
৫১।	**ফয়েজ আহমদ**	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৬ - ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫২।	মাহফুজ উল্লাহ	ঃ	অভ্যুত্থানের উনসত্তর পৃষ্ঠা ৫২-৫৫।
৫৩।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১১২।
৫৪।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১১২।
৫৫।	মোহাম্মদ হাননান	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৬৪।
৫৬।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পৃষ্ঠা ১১৩।
৫৭।	মোহাম্মদ হাননান	ঃ	পৃষ্ঠা ১৬৭।
৫৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১৭০।
৫৯।	মাহফুজ উল্লাহ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭৪।
৬০।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৭৪।
৬১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৭৫।
৬২।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পৃষ্ঠা ১১৫।
৬৩।	মাহফুজ উল্লাহ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬।
৬৪।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১২১।
৬৫।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১২১।
৬৬।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১২২।
৬৭।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১২৯।
৬৮।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ১২৯।
৬৯।	মযহারুল ইসলাম	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪৭৬।
৭০।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৬১৯।
৭১।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৬০৭।
৭২।	মওদুদ আহমদ	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৭৬।
৭৩।	মযহারুল ইসলাম	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬৮৮।
৭৪।	দৈনিক ইত্তেফাক ২ মার্চ, ১৯৭১ সাল।		
৭৫।	মযহারুল ইসলাম	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭০৩ -৭০৪।
৭৬।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৭৪৪।
৭৭।	ঐ	ঃ	পৃষ্ঠা ৭৪৫।
৭৮।	সিদ্দিক সালিক	ঃ	উইটনেস টু সারেন্ডার পৃষ্ঠা ৭৫।
৭৯।	মযহারুল ইসলাম	ঃ	পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮০৮।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে অর্থনীতি এবং রাজনীতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সমাজে বিদ্যমান শ্রেণীগুলোর অর্থনৈতিক স্বার্থ একটি নির্দিষ্ট ভুখন্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস বহুলাংশে নির্ধারণ করে। আবার রাজনীতিকে চিহ্নিত করা যায় সমাজে বিরাজমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে। বাংলার ক্ষেত্রে এটা এতো প্রকট যে, বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা ছাড়া জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা সম্পর্কে ধারণা দুরূহ। এজন্যে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলের জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারার উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি আলোচনায় বিশাল রাজনৈতিক ইতিহাস প্রদক্ষিণ করে আসতে হয়। আবার ইতিহাসের গতিধারার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিকেও নজর রাখতে হয়। কেননা এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন বার বার তাদের জাতীয় চিন্তাধারার প্রকৃতিতে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। উনিশশ সাতচল্লিশ সালের সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের পেছনে যেমন মূল আকাংখা ছিল অর্থনৈতিক; তেমন উনিশশ সাতচল্লিশোত্তর কালের সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ চেতনা উদ্ভবের পেছনেও কাজ করেছে এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ কাল পর্বের জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে চাইলে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় চেতনার কথা বলতে হয়। ১৯৪৭ এর যে জাতীয় চেতনার জোয়ার বাংলার ইতিহাসের গতিধারার পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, তা ছিল সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ। এর মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম এবং এর বাস্তবায়ন হয়েছিল বিশাল ভারতবর্ষকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে। বাংলায় এর অস্তিত্ব ছিল ক্ষণস্থায়ী দেশ বিভক্তির সঙ্গে সঙ্গে এর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। শুধু ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে তোলা চেতনা, জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞায় সজ্ঞায়িত করা কঠিন, তাই শেকড়হীন সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনাকে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে, নবসৃষ্ট পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক বাঙালী চেতনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। ঐতিহ্যের শক্তিশালী ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকা বাঙালী জাতি চেতনার কাছে পরাজিত হয় ১৯৪৭ কাল পূর্বের জাতীয়তাবাদ। শুরু হয় ভিন্ন আরেক জাতীয় চেতনার উন্মেষ, বিকাশও পরিণতির ইতিহাস রচনার কাল। যদিও এর ভিত রচিত হচ্ছিল ঐতিহ্যবাহী বাংলার জনপদের হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাসের পরতে পরতে। বাংলার ভাষা সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে বাঙালী জনগোষ্ঠী একটি জাতি হিসেবে গড়ে ওঠে। ঐতিহ্য নির্ভর এ জাতি সুলতানী আমলে পেয়েছিল তার রাজনৈতিক ঐক্য এবং ভৌগোলিক সীমা। সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছিল ভাষা সংস্কৃতি নির্ভর অসাম্প্রদায়িক জাতিসত্তা গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ। যার সদ্ব্যবহার করে বাঙালী হয়ে উঠেছিল একটি সমৃদ্ধশালী জাতি। আধুনিককালে যে সমৃদ্ধি তাকে দিতে পারতো শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন জাতির আসন; এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব ভূখন্ডে জন্ম হতে পারত ভাষা সংস্কৃতি নির্ভর উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় একটি বৃহৎ বাঙালী রাষ্ট্রের। কিন্তু মোঘল আমল এবং তৎপরবর্তীকালের ইতিহাস বাঙালীর উত্থানের গতিধারায় পরিবর্তন এনে দেয়। বৃটিশ আমলের দুশো বছরের শোষণ শাসনের তীব্র প্রভাবে এ পরিবর্তন যেমন হয় ব্যাপক তেমন হয় মারাত্মক।

বাংলায় বিরাজমান আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামো থেকে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার সম্ভাবনা উজ্জ্বল ছিল বিদেশী হস্তক্ষেপে তা স্বাভাবিক পথ পরিহার করে ভিন্ন পথে অগ্রসর হতে থাকে। একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে বাঙালীর মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িক উদার চেতনার জন্ম হয়েছিল তা সাম্প্রদায়িকতার পথে অগ্রসর হতে থাকে।

১৯৪৭ সালে এ পথ ধরেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি যার ভিত্তি ছিল দ্বিজাতিতত্ত্ব। প্রায় দুশ বছর বৃটিশ শাসনকালে গড়ে ওঠা আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এই জাতীয়তাবাদের জন্ম এবং বিস্তৃতির পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। তারও আগে বৃটিশ পুঁজির আগ্রাসনে ভেঙ্গে পড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজ এই নতুন পরিবেশ গড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়। অথচ আবহমানকালের বাংলার রূপ ছিল অসাম্প্রদায়িক। একই ভাষা সংস্কৃতির ঐতিহ্যের অধিকারী বাংলার হিন্দু মুসলমান ছিল সমাজে একে অপরে পরিপূরক। তাছাড়া ধর্মান্তরিত মুসলমান জনগোষ্ঠী তখন পর্যন্ত তাদের সনাতন বহু আচার অনুষ্ঠান ধরে রেখেছিল। এছাড়াও বিরাজমান স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও বাঙালীর অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের নিশ্চয়তা দিয়েছিল।

একটি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অবস্থান তার মানসিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মানুষের সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্কের রূপ পরস্পরের সম্পর্কের ভিত গড়ে তুলতে সহায়তা করে। মধ্যযুগে বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলোতে হিন্দু মুসলিমের মিলিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড তাদের সম্পর্কের যেমন একটি স্বাভাবিক রূপ দিয়েছিল তেমন সম্পর্ক করেছিল দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু এই পরিস্থিতি পাল্টে যায় যখন বহিশক্তি চাপিয়ে দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তনের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক আর্থিক সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে। বৃটিশ বাণিজ্যগত পুঁজির আঘাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের কাঠামো যেমন ভেঙ্গে পড়ে তেমন শিল্পগত পুঁজির আগ্রাসান এর শেষ চিহ্নটুকু ধ্বংস করে দেয়। এই ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন সম্ভব হয় বিদেশীশক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের কারণে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নিজের স্বার্থেই রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার প্রয়াসী হয়ে উঠেছিল। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধ ছিল তার মহড়া আর ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধের ফলে ক্ষমতা হাতের মুঠোয় চলে আসে।

অর্থনৈতিক ধ্বংসযজ্ঞের উপর গড়ে ওঠা নতুন যে আর্থ-সামাজিক কাঠামো তা শুধু বৃটিশ পুঁজির স্বার্থে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দৃঢ় ও সংহত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে। এই চাপিয়ে দেয়া পরিবর্তনের সঙ্গে বাংলা তথা ভারতীয়দের স্বার্থের কোন সম্পর্ক ছিল না। তবে তাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। নবসৃষ্ট আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় যে শ্রেণী বিন্যাস লক্ষ্য করা যায় তাও একই লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। বৃটিশ কোম্পানী অনুসৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এবং সামাজিক স্তর বিন্যাসের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক মানসিকতা গড়ে ওঠার প্রবণতা দেখা দেয়। এর পেছনেও ছিল বিদেশী শাসককুলের সচেতন প্রয়াস। তার প্রথম পদক্ষেপ হিন্দু মুসলমানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ভেঙ্গে দেয়া। পরবর্তীতে দুই সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক সামাজিক স্তর বিন্যাসের ভিন্ন মেরুতে দাঁড় করিয়ে পরস্পরের মধ্যে বৈষম্যের বিদ্বেষের বিভেদের দেয়াল তুলে দেয়। প্রথম পর্যায়ে এই প্রয়াসের গতিমন্থর হলেও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কৃষক সমাজের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়ে দ্রুত তা বাস্তবতার ভিত স্পর্শ করতে থাকে।

বাংলার কৃষককুলের বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দুর্দিনের চরম পর্যায় লক্ষ্য করা যায় ১৭৬৫ সালে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর থেকে; যখন বাংলার কৃষকরা সীমাহীন অর্থনৈতিক শোষণ নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়। এর ফলে নিঃস্ব হয়ে যায় কৃষি প্রধান বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী। আবার এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান ফলে ক্ষমতা লাভের প্রথম আক্রমণে মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহদাংশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে। এই শোষণ এতটা ভয়ংকর ছিল যে দুশ বছর নিম্ন আয়ের মুসলিম জনগোষ্ঠী মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। এভাবে বিদেশী স্বার্থে একটি সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে যায়। ফলে প্রথমে এরা হয়ে ওঠে বৃটিশ বিরোধী পরে বিদ্রোহী। এই মানসিকতার কারণেই এই শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন অর্থাৎ ওয়াহাবী, ফারায়েজী আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। বৃটিশ বিরোধী মুসলিম ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনকারীরাও এই সুযোগে মুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়কে হিন্দু সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করতে অনেকখানি সক্ষম হয়। এভাবে মুসলিম নেতৃবৃন্দ বৃটিশ বিভেদনীতির সহায়ক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হন। একইভাবে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারগুলোর নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটেছিল, প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসন শুরুর আগেই। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে কোম্পানী নবাব, নবাব পরিবার রাজকর্মচারী এবং সরকারী প্রশাসন থেকে বিভিন্ন উপায়ে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করেছিল তাতে যেমন নবাবের কোষাগার শূন্য হয়ে গিয়েছিল তেমন বিত্তবান সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারগুলোর ভাগ্য বিপর্যয়ের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল।

পেশীজীবী মুসলিম অভিজাত শ্রেণীকে চাকুরীচ্যুত করার ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত কোম্পানীর ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া চলাকালীন থেকেই। তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল সেনাবাহিনী থেকে বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সদস্যকে বরখাস্ত এবং উক্ত পদে বাঙালী মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়োগ সম্ভাবনা বাতিলকরণ। তাছাড়া অন্যান্য পেশা যেমন রাজস্ব, প্রশাসন, বিচার বিভাগ ইত্যাদি পদ থেকেও মুসলমানদের চাকুরিচ্যুতী ঘটতে থাকে এবং পুনর্নিয়োগের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। ১৭৬৫ থেকে ১৮৬৪ সাল এ সময় নতুন আইন প্রণয়ন করে মুসলমান আইন অফিসাদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয় ; একশ বছর ধরে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৭৯৩ সালে ঘোষিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যার বদৌলতে রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে জড়িত মুসলিম কর্মকর্তা চাকুরী হারান। একই সঙ্গে ভিন্ন সম্প্রদায়ের বনেদী জমিদারদের মত 'সূর্যাস্ত আইনের' সুবাদে মুসলিম বনেদী জমিদার পরিবারগুলোর অনেকেই জমিদারী হারান। এই হৃত জমিদারী পুনরুদ্ধার ভাগ্যহত বাঙালী মুসলমানের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এছাড়া রাজভাষা ফারসীর বদলে ইংরেজী চালু হওয়ার কারণে রাতারাতি রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে মুসলিম সম্প্রদায় অযোগ্য বিবেচিত হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বাঙালী মুসলমান বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা গ্রহণ করে নাই। মুসলিম সম্প্রদায় "নাসারাদের' ভাষা বলে ইংরেজী বর্জন করেছে, ইংরেজ বিধর্মী বলে তার প্রতি বৈরী মনোভাব প্রদর্শন করেছে। বিদেশী শাসক এবং ভাষা বিমুখতা বাঙালী মুসলমানের ভাগ্য বিপর্যয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। একদিকে কোম্পানী রাজের মুসলিম বিরোধী ভূমিকা অপরদিকে মুসলমানদের অসহযোগিতা দুই এদেশের মুসলমানদের জন্য সুফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়। বরং মুসলমানদের ইংরেজ বিরোধী ভূমিকা কোম্পানীর অনুসৃত নীতির অসামান্য সাফল্যের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই অসহযোগিতা মুসলমানদের জন্য ছিল আত্মহননের সামিল। যখন সমাজের উচ্চস্তর তেকে নিম্নতম স্তরে; ক্ষমতার শীর্ষতম থেকে নিম্নতম স্থানে, বাঙালী মুসলমানদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটছে, তখন ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাচ্ছে ভিন্ন সম্প্রদায়ের। যদিও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সমাজের ভাগ্য মুসলিম সম্প্রদায়ের চেয়ে কোন অংশে উন্নত ছিল না। তবে উচ্চ এবং মধ্যস্তরে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। বৃটিশ শাসনের সর্বনাশা প্রভাবে সমাজের উপর থেকে শেকড় পর্যায়ে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। অথচ এর আগে যুগ যুগ ধরে শাসকের পরিবর্তন ঘটেছে। একমাত্র ক্ষমতার হাত বদল ছাড়া আর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। ফলে তখন সমাজের নিম্নস্তর এই পরিবর্তন সম্পর্কে যেমন সচেতন ছিল না তেমন এ ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহও ছিল না। অথচ বৃটিশ শাসনকালে ঘটেছিল উল্টোটাই। এ অঞ্চলে একের পর এক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে পুরনো বনেদী পরিবারগুলো জমিদারী হারালে তাদের স্থলে আরেক দল নুতন জমিদারের আবির্ভাব ঘটে এদের সবাই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এই নব্য জমিদার শ্রেণীর সিংহভাগ ছিল দালাল, ফরিয়া, কয়াল প্রভৃতির মধ্য থেকে উদ্ভূত, সমাজে যাদের ইতিপূর্বে কোন সম্মানজনক স্থান ছিল না। এরা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে বাণিজ্য করে প্রভূত অর্থ সম্পদের মালিক হয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকের সম্পদের পরিমাণ এতো ছিল যে তারা এদেশে শিল্প গড়ে তোলার আকাংখা পোষণ করতেন। তাদের এই আকাংখা অবদমিত করা কোম্পানীর স্বার্থে প্রয়োজন ছিল। এই নব্যধনিক শ্রেণীর অর্থ ছিল সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তৎকালনি সমাজে আভিজাত্যে প্রতীক ছিল ভূমি মালিকানা। কোম্পানীর ভূমি ব্যবস্থা তাদের আভিজাত্য কিনে নিতে সাহায্য করে। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারার কাজটি সমাধা হয়। একদিকে শিল্প গড়ে ওঠায় সম্ভাবনা লুপ্ত হওয়ার ফলে তারা তাদের সম্ভাব্য এদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিদের হাতে থেকে রক্ষা পায়। অপরদিকে জমিদারী ব্যবস্থায় সমাজে সম্মানজনক স্থান লাভ করে এই শ্রেণী কোম্পানী তথা বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের বিশ্বস্ত গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। ভূমি নিয়ন্ত্রণ ও ভূমি রাজস্ব শাসনের ফলে নতুন সামাজিক স্তর বিন্যাসে এই নব্য জমিদার, আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণী বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের ক্ষমতার দূর্গে পরিণত হয়। আবার এই শ্রেণীর মধ্য থেকে উদ্ভব হয় এক নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। যারা প্রথমে বৃটিশ শাসকের পক্ষে ছিলেন সোচ্চার। ইংরেজ শাসককুলও প্রশাসন এবং সর্বক্ষেত্রে এদের নিয়োগ প্রদান করে এদের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

মুসলমান সমাজ যখন একদিকে ইংরেজ শাসককুলের বৈরী মনোভাবের শিকার হয়ে এবং ইংরেজী বর্জন করে চলমান অর্থনেতিক কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন তখন হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজী শিখে শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতা লাভ করে নতুন পরিস্থিতিতে তারা তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ফারসী এবং ইংরেজী দুই যেমন তাদের কাছে ছিল ভীন দেশী ভাষা; তেমন মুসলমান এবং খৃষ্টান উভয়ই ছিল তাদের কাছে বিধর্মী বিদেশী। ফলে অতীতে হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায় মুসলিম বিজয়ীদের স্বাগত জানিয়ে যেমন নিজের অবস্তান ঠিক রাখতে দ্বিধা করেননি; পরবর্তীতে তারাই ইংরেজ শাসককুলকে মেনে নিয়ে নিজের ভাগ্যের চাকা সচল রাখতে দ্বিধা করেনি। ফলে বৃটিশ ভারতেও তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। অথচ আত্মাভিমান আত্মপ্রত্যয়ের অভাব সর্বোপরি বিভ্রান্ত হতাশ মানসিকতা, মুসলমান সমাজের অগ্রগতির চাকা স্তব্ধ করে দেয়। যখন হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তখন তাদের সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্বসম্পন্ন করেন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করে সংস্কারের নামে মুসলিম ধর্মীয় নেতারা তাঁদের ইংরেজ বিরোধী মনোভাব দৃঢ়ভাবে পোষণ করতে থাকেন। ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' বা 'বিধর্মী রাষ্ট্র' ঘোষণা করে জেহাদের ডাক দেন। সংস্কারের নামে সম্প্রদায় ভিত্তিক সংঘাতের পথ উন্মুক্ত হয়। ওয়াহাবী এবং ফরায়েজী আন্দোলন একদিকে মুসলমানদেরকে যেমন চরম ইংরেজ বিদ্বেষী করে তোলে তেমন সম্প্রদায়গত সংস্কারের ফলে নিজেদের ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে অধিকতর সচেতন করে সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে দৃঢ় করে। তাছাড়া বৃটিশ বিরোধী মুসলিম সমাজ বৃটিশ সহযোগী শক্তি হিন্দু সম্প্রদায়কেও তাদের শত্রুভাবতে থাকে। এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন বাংলার মুসলমানদেরকে হিন্দু সম্প্রদায় থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়। তাছাড়া ক্ষমতাশীনদের অনুসৃত নীতি ইতিমধ্যে হিন্দু মুসলিম উভয় শ্রেণীকে আর্থ-সামাজিক অবস্থার দুই ভিন্ন মেরুতে দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে ভাগ্যাহত মুসলমানরা হিন্দু সম্প্রদায়কে সন্দেহ এবং ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে।

এই অবস্থায় আঠারো শতকের অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা উনিশ শতকে চরম সাম্প্রদায়িক রূপ লাভ করে। অষ্টাদশ শতকে হিন্দু মুসলিম অভিন্ন অর্থনৈতিক সম্পর্কে আঘাত করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধ্বংসের যে বীজ রোপণ করা হয়েছিল উনিশ শতকের মধ্য ভাগে উভয় ধর্মের সংস্কার আন্দোলনের ফলে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। বাঙালীর সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে ধর্মীয় সমন্বয়জাত উপাদানের ছিল যে ঐক্য সেগুলি ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে দুটি ভিন্ন স্রোতধারা বইতে থাকে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা মূলতঃ এই ভিন্ন ধারার প্রবণতার জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী ছিল। দুই সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে একদিকে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী অপরদিকে উত্তর ভারতের মুসলিম রাজনীতিকরা।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু সম্প্রদায় যখন উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের জোয়ারে গা ভাসিয়ে বৃটিশ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ। তখনই মুসলিম নেতারা মুসলমান সম্প্রদায়কে বৃটিশের সহযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। হিন্দু মুসলিম পরস্পরের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যবধানের যে বিশাল দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল মুসলমানদের বৃটিশ শাসকদের প্রতি বৈরীতা পরিহার করার ফলে তা কমে আসতে থাকে।

দেরীতে হলেও হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো মুসলিম সমাজেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই শ্রেণীর সঙ্গে নব্য মুসলিম মধ্য শ্রেণীর অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব সাম্প্রদায়িক মানসিকতার পথ আরো প্রশস্ত করে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর তীব্র অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্নে সম্প্রসারিত সাম্প্রদায়িক মনোভাবই উগ্র সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষা সংস্কৃতি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার জন্ম হয়েছিল তা ধর্মান্ধ নেতৃবৃন্দের হাতে পড়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়। একইভাবে বাঙালী মুসলমানের মধ্যে বিস্তৃত সাম্প্রদায়িক মানসিকতার সুযোগ গ্রহণ করে মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাদের সামনে উপস্থিত করেন দ্বিজাতিতত্ত্বের আদর্শ। প্রতিকূল অবস্থার শিকার বাঙালী মুসলমান স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এই আদর্শকে লুফে নেয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রথমে পৃথক নির্বাচন এবং পরবর্তীতে পৃথক রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপন করা হয়। সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্র বাঙালী মুসলমান ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুক্তির একমাত্র পথ বলে ভেবে নেয়। নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তৎকালীন যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরেছিলেন তাতে একথাই বুঝানো হয়েছিল যে, পৃথক রাষ্ট্র ছাড়া শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য কোনক্ষেত্রেই বাঙালী মুসলমান প্রতিষ্ঠা পাবে না। সুতরাং বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীও দ্বিজাতিতত্ত্বের জাতীয়তাবাদ তাদের প্রতিষ্ঠা লাভের পথ বলে ধরে নেয়।

যে অর্থনৈতিক সত্ত্বা হিন্দু মুসলমানকে এক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল সেই অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বী করে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এনে দেয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা এত তীব্র ছিল যে উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালী নেতবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বাঙালী জাতির মধ্যে সংহতি ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন। ১৯১৬ সালের লক্ষ্মৌ চুক্তি; ১৯১৯ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত অসহযোগ খেলাফত আন্দোলনের ঢেউ, ১৯২৩ সালের বেঙ্গল প্যাক্ট এবং ১৯৩৭ ও ১৯৪১ সালে এ, কে, ফজলুল হক কর্তৃক দুবার মন্ত্রীসভা গঠনের মধ্যদিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বাঙালী জাতিসত্ত্বার প্রতি সংহতি ঘোষণা করেছিলেন। যার সর্বশেষ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় ১৯৪৭ সালে প্রস্তাবিত সোহরাওয়ার্দী-শরৎবসুর 'অখন্ড স্বাধীনবাংলা রাষ্ট্র' গঠনের উদ্যোগের মধ্যে। সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের প্রবল জোয়ারে সে প্রচেষ্টা ও ভেসে যায়। ১৯৪৭ সালে জন্ম হয় মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান।

কোন সম্প্রদায় যখন রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করতে থাকে তখন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তা বজায় রাখার চেষ্টা করে। বাঙালী তার অর্জিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারায়নি বলেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে বাঙালী নিজেকে যখন দেখতে পায় একটি প্রান্তিকীকৃত অর্থাৎ ন্যায্য সুযোগ সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী হিসেবে এবং তাকে একটি প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় তখন তার রাজনৈতিক চরিত্রের পুনঃপ্রকাশ ঘটে। যদিও বাঙালী মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণ আকাংখার সূত্রপাত ঘটে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার ফলে হতাশাগ্রস্থ বাঙালী লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে তার সেই আকাংখা প্রস্তাবায়নের সম্ভাবনা দেখতে পায়। অথচ দিল্লী কনফারেন্সে সে সম্ভাবনারও ইতি টেনে দেয়া হয়। নব সৃষ্ট রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বছর না ঘুরতেই বাঙালী উপলব্ধি করতে পারে ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে মাত্র। বাঙালীর ভাগ্য বদল হয়নি। লাহোর প্রস্তাব সংশোধন বাঙালী আশা আকাংখার পরিসমাপ্তির প্রচেষ্টা হলেও এ অন্যায় নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এসে বাঙালী তার বঞ্চনা সম্পর্কে নীরব থাকেনি। একদিকে তার অর্জিত রাজনৈতিক চরিত্র তাকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রতিবাদী করে তুলেছে। অপরদিকে তার জাতি সচেতনতাই তাকে একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তার আশা আকাংখা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বায় উজ্জীবিত হতে সাহায্য করেছে। যে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং বঞ্চনার ইতিহাস থেকে মুক্তি লাভের দীর্ঘকালীন আকাংখায় বাঙালী মুসলমান লাহোর প্রস্তাবের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। সে জোয়ারে বাঙালীর ভূমিকার গুরুত্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে তাকে ব্যবহার করেছিল চমৎকারভাবে। বাঙালী মুসলমান তার পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের উদ্দেশ্য অর্জনের হাতিয়ারেই শুধু পরিণত হয়েছিল। তার বদলে পেয়েছিল এক প্রভুর বদলে আরেক প্রভুকে। দুশো বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে পিছিয়ে পড়া বাঙালী মুলমান পাকিস্তানের মাটিতেও বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়। বৃটিশ আনুকূল্যে নিজেদেরকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা সর্বক্ষেত্রে দাপটে বিচরণ করার মতো দক্ষ দূরদর্শী স্বসম্প্রদায়ের পাঞ্জাবীদের সঙ্গে বাঙালী মুসলমানকে আবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। হার মানতে হয় বাঙালীকেই। কেননা বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে সবেমাত্র একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে। ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা এবং বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

পেশায় তাদের পদচারণা সাম্প্রতিক কালের। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী পাটের মূল্য বৃদ্ধির ফলে পাট বিক্রির প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছিল যে বাঙালী মুসলমান তারা সে অর্থ ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্পে বিনিয়োগ করার চেয়ে দেশত্যাগী হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি কেনাটা বেশী লাভজনক ভেবেছে। আবার পাকিস্তান অর্জনে যে রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক সে মুসলিম লীগে বাংলার উপযুক্ত প্রতিনিধি ছিল না। ক্ষমতাশীন মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতারা প্রায় সবাই ছিলেন অবাঙালী। ফলে না প্রশাসন, না ব্যবসা বাণিজ্যে, না রাজনীতিতে—কোথাও বাঙালীর উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব ছিল না। আবার যতটুকু যোগ্যতা ছিল তারও উপযুক্ত মূল্যায়ন হয় নাই। ফলে সর্বক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানের অনুপস্থিতি এবং যোগ্য বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশ ত্যাগ দেশ জুড়ে সৃষ্টি হয় এক বিরাট শূন্যতার। যা পূর্ণ করা হয় পাঞ্জাবী এবং অবাঙালী পেশাজীবী ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের দ্বারা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দেশ বিভাগের ফলে ক্ষমতার কাঠামোতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তার মধ্যেই বাংলার ঔপনিবেশিকরণের পথ তৈরী হতে থাকে। একদিকে এই অবাঙালীরা সর্বত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগটি যেমন হাতছাড়া করেনি আরেকদিকে বাঙালী মুসলমানের উত্তরণের সকল পথ রুদ্ধ করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। এই ষড়যন্ত্রে প্রথম নগ্ন প্রকাশ ঘটে বাঙালীর ভাষা সংস্কৃতির উপর হামলার মধ্যদিয়ে। যার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীর অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়ে, তার জাতিসত্ত্বাকে অবলুপ্ত করে পূর্ব বঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে প্রস্তুত করা।

এই ষড়যন্ত্রে সচেতন বাঙালীর গোচরীভূত হতেই তারা তাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। বিভাগোত্তরকালের ছয় মাসের মধ্যে বাঙালী পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় তার অবস্থা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। যে কারণে গণপরিষদের একজন বাঙালী সদস্য ঐ সময়ে পরিষদে বলেন; "পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে এ ধারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে যে পূর্ব পাকিস্তানকে উপেক্ষা করা হচ্ছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কেবল একটি ঔপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।"

শুধু গণপরিষদ সদস্য নয় শিক্ষিত বাঙালী সমাজের এই উপলব্ধি তাদেরকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করে। ফলে ভাষা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিহত করার সাংগঠনিক প্রতিরোধ আসে শিক্ষিত ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে। এদের মধ্যে যেমন প্রথম প্রতিরোধ স্পৃহা জন্মায় তেমন অসাম্প্রদায়িক শাশ্বত বাঙালী চেতনা পুনর্জীবন লাভ করে। এই নতুন প্রজন্মই খুবই দ্রুত সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদকে ঝেড়ে ফেলে অসাম্প্রদায়িক বাঙালী চেতনায় সম্পৃক্ত হন। ১৯৪৭ পরবর্তীকালে এদের মধ্যে যে বাঙালী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব তা কেবল মুসলমানদের জাতীয়তাবাদ নয় বরং তা ছিল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালী জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদ। আর এ ছাত্র সমাজ ছিল এই জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ।

১৯৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের আবরণ খুলে ফেলে এত দ্রুত ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদ গ্রহণের পেছনে যে কারণ ছিল তা ছিল সহজ এবং স্বাভাবিক। প্রথমতঃ ১৯৪৭ সালের জাতীয়তাবাদ ছিল চাপিয়ে দেয়া। অর্থনৈতিক মুক্তি লাভের আশায় যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে পতাকাতলে বাঙালী সামিল হয়েছিল তা তার আকাংখিত মুক্তি দানে ব্যর্থ হয়। ফলে বাঙালী দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। যেহেতু সাম্প্রদায়িক মনোভাব বাঙালীর সহজাত প্রবৃত্তি ছিল না। সেহেতু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের পথ পরিহার করতে তাকে বেগ পেতে হয়নি। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক অবস্থা রাজনৈতিক পরিস্থিতি তার অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে বাঙালীকে আবারও মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে হয়। এই সংগ্রাম ছিল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালী জাতিসত্ত্বাকে রক্ষা করার সংগ্রাম। পূর্ববঙ্গে যার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলনের মধ্যদিয়ে। ভাষা সংস্কৃতির আন্দোলন প্রমাণ করে যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকেও বাঙালী স্বতন্ত্র সত্ত্বার অধিকারী। ভাষা সংস্কৃতি আন্দোলন যে অসাম্প্রদায়িক ধাচে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার রাজনৈতিক অবয়বটিও অসাম্প্রদায়িক ধাচে গড়ে উঠতে থাকে।

চল্লিশের দশকে বাঙালী মুসলমান হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীকে তার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে হুমকি স্বরূপ চিহ্নিত করে ধর্মের নামে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল স্বধর্মের কিন্তু ভিন্ন ভাষা সংস্কৃতির অধিকারী অবাঙালী বুর্জোয়া শ্রেণী। ফলে তাদের বিরুদ্ধে বাঙালীর ঐক্য গড়ে ওঠে ভাষা সংস্কৃতির নামে। যে ভাষা সংস্কৃতি একদিন তারা প্রায় বর্জন করেছিল। যদিও দুই বারই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পেছনে মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং বঞ্চনার ক্ষোভ। এই ক্ষোভকে কেন্দ্র করে বৃটিশ শাসনকালে যেমন স্বতন্ত্র মুসলিম জাতিসত্ত্বা বিকাশ লাভ করেছিল। তেমন বিভাগ উত্তরকালের বঞ্চনার ক্ষোভকে আশ্রয় করে বাঙালী জাতিসত্ত্বার বিকাশ ঘটে। এই ক্ষোভই তাকে মুক্তির লক্ষ্য অর্জনে প্রয়াসী করে তোলে। ভাষা আন্দোলন ছিল তাদের এই মুক্তির পথ নির্দেশক, যার মধ্যদিয়ে শুরু হয় বাঙালীর অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদের পথে যাত্রা; শুরু হয় বাঙালী মুসলমানের ঘরে ফেরার আয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ, রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থানপতন বাংলা ভাষা সংস্কৃতির মতো বাঙালীর জীবনেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যে ভাষা সংস্কৃতির রাজনৈতিক উত্থান পতনের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে; যোগসূত্র রয়েছে তার জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রশ্নের সেই ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলন খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে বাঙালীর ভাষা সংস্কৃতির আন্দোলন রাজনৈতিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সব ধরনের আন্দোলনের পেছনে যেমন অর্থনৈতিক প্রয়োজন বিদ্যমান থাকে এ আন্দোলনের পেছনেও প্রচ্ছন্নভাবে তা বিরাজমান ছিল।

বৃটিশ যুগে বঞ্চনা আর বৈষম্যের যে রাজনৈতিক ইতিহাস রচিত হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা ক্রিয়াশীল ছিল বিভাগ উত্তরকালের রাজনীতিতেও। বৈষম্যের ধারাবাহিকতার শিকার বাঙালীর চেতনায় প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান অর্থনৈতিক আকাংখার প্রশ্নটি ক্রমশ দৃঢ় ভিত্তি লাভ করতে থাকে। শিক্ষিত সমাজ এবং নেতৃবৃন্দের প্রথম থেকেই দাবী ছিল কেন্দ্রীয় সুযোগ সুবিধার ন্যায্য অংশ। মূলনীতি নির্ধারণ কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বাঙালীর ন্যায্য অধিকার লাভের বিষয়টি প্রকৃত রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে যে রাজনৈতিক চেতনার বিস্তার ঘটে; সে চেতনা পঞ্চাশের দশকের ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তীতে বাঙালী জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের রাজনৈতিক ধারার জন্ম দেয়। ২১ দফা দাবীনামার মধ্যে তার সুসংহত সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। ২১ দফায় মূলতঃ বাঙালীর ন্যায্য হিস্যা লাভের আকাংখার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। একে কেন্দ্র করেই অবাঙালী বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে বাঙালী বুর্জোয়া শ্রেণীর মুখপত্র হিসেবে যুক্তফ্রন্টের আবির্ভাব ঘটে। ফলে পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকে ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে একের পর এক ঘটনা ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়। বাঙালী বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে তা ক্রমাগত বাঙালী জাতীয়তাবাদের পক্ষে প্রবাহিত হতে থাকে। এ সময় রাজনৈতিক সচেতনতা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

পশ্চিমা বুর্জোয়া শ্রেণীর যোগ্য প্রতিনিধি আইয়ুবের দশ বছরের স্বৈরশাসনে নূন্যতম গণতান্ত্রিক অধিকার বঞ্চিত, চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত পূর্ব বঙ্গবাসী, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূলে আঘাত হানার মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। তাছাড়া এ সময়ে বাংলার জনগণের রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস এবং মেরুকরণ, পরিস্থিতিকে প্রচন্ড বিস্ফোরণের দাঁড় প্রান্তে এনে উপস্থিত করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এই বিস্ফোরণের সূত্রপাত ঘটায়। যে বিস্ফোরণের প্রচন্ডতা, ভয়াবহতা সমগ্র রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত নড়বরে করে দেয়। যেহেতু বাঙালী প্রথম থেকে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল ভাষা সংস্কৃতির নামে সেহেতু ভাষা সংস্কৃতি নির্ভর বাঙালী জাতীয়তাবাদের আদর্শ তখন মুখ্য ভূমিকা পালন করতে থাকে। সমগ্র পূর্ববঙ্গবাসী ঐক্যবদ্ধ হয় বাঙালী জাতীয়তাবাদের আদর্শের পতাকাতলে। সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মতো বাঙালী বুর্জোয়া শ্রেণী আগেই অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদকে তাদের উত্তরণের অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছিল। এবং এই বুর্জোয়া শ্রেণীর মুখপত্র হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল আওয়ামী লীগ ফলে প্রথম থেকেই এই অঞ্চলের অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ধারায় সংগঠনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। যে কারণে দেখা যায় যে, পঞ্চাশের দশক থেকেই সংগঠনটির ভাঙ্গন বিপর্যয় পুনর্গঠন বাঙালী জাতির ইতিহাসকে প্রভাবিত করে চলে। সমাজের উচ্চ শ্রেণী থেকে কৃষক শ্রমিক সর্বসাধারণের আওয়ামী লীগের প্রতি গভীর আস্থার কারণে বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের দায়দায়িত্ব সংগঠনটির উপর বর্তায়। আওয়ামী লীগ কর্তৃক পরিচালিত ষাটের দশকের ৬-দফা ভিত্তিক পূর্ণস্বায়ত্বশাসন গণতন্ত্রের আন্দোলন সমগ্র বাঙালী জাতির আন্দোলনে পরিণত হয়। ৬-দফা পরিণত হয় বাঙালীর বাঁচার দাবীতে। ৬-দফার মধ্যেই ছিল লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার কথা, তবে এর মধ্যে অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয় সত্ত্বা ভিত্তিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও ছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে বিস্ফোরিত গণরোষ ১১-দফাকে কেন্দ্র করে গণবিদ্রোহে পরিণত হয়। ১১-দফার মধ্যদিয়ে বাঙালীর স্বায়ত্তশাসন অর্জনের প্রশ্নটি আরো ব্যাপকতা এবং দৃঢ়তা লাভ করে। বাঙালী তখনই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অস্বীকার করে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত পূর্ব বাংলাকে তার আবাসভূমি বলে ঘোষণা করে। রাজপথে জনতার মুখে মুখে উচ্চারিত এই ঘোষণায় সমগ্র বাঙালী জাতির জাতীয়তাবাদী চেতনার চরম বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

২১ দফা থেকে শুরু করে তৎপরবর্তী সময়ের সকল দাবীর মধ্যে বার বার উত্থাপিত হয়েছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এবং স্বায়ত্তশাসনের আকাংখা। একথা অনস্বীকার্য যে একমাত্র স্বায়ত্তশাসনই বাঙালীকে দিতে পারত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে মুক্তি। কিন্তু এই দাবী অর্জনে একের পর এক ব্যর্থতার গ্লানি হতাশা বাঙালীকে স্বাধীনতার আকাংখায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে এই চিন্তা বাঙালী মানসে ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করতে তাকে। আইয়ুব খান থেকে ইয়াহিয়া, এক সামরিক শাসনের পরিবর্তে আরেক সামরিক শাসক আশাহত বাঙালী এই পরিবর্তন সহজে মেনে নেয়নি। '৬৯ গণআন্দোলনের আকাংখিত লক্ষ্য বাঙালীর কাছে শাসকের পরিবর্তনের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

নিহিত ছিল না, এর লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তি। সত্তরের নির্বাচন তার ভাগ্য পরিবর্তনের শেষ প্রয়াস। এ সময়ে বাঙালী জাতির ঐক্য চেতনার দৃঢ়তা প্রকাশ পায়, বাঙালী জাতীয়তাবাদের পক্ষের শক্তি আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মধ্যদিয়ে। এই নির্বাচনের ফলাফল বাঙালীর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। সত্তরের নির্বাচনের গুরুত্ব ছিল এই যে জনসাধারণ বাঙালী জাতীয়তাবাদের পক্ষে দৃঢ় সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে এবং '৪৬ এর নির্বাচনী রায়ের বিপরীতে ঐক্যবদ্ধভাবে অবস্থান নেয়।

বাংলার জনগণ কখনই তার নির্বাচনী রায়ের সুফল ভোগ করতে পারেনি। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব থেকে যখনই কোন নির্বাচনের ফলাফল এ অঞ্চলের জনগণের পক্ষে গেছে তখনইতা কোন না কোনভাবে বানচাল করার ষড়যন্ত্র হয়েছে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বাঙালী কিন্তু '৭০ এর রায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়েছে। অতীতে শক্তিশালী নেতৃত্বের অভাবে গণরায়কে উপেক্ষা করে প্রতিপক্ষ তার কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কখনও কখনও নির্বাচনের নামে করেছে প্রহসন। কিন্তু সত্তরের নির্বাচনের পরিবেশ ও অবস্থা ছিল ভিন্ন। মাত্র দু একজন ছাড়া বাংলার সকল নেতা ছিলেন বাঙালীর রায়ের পক্ষে। এমনকি অনেক দক্ষিণ পন্থী নেতাও জনগণকে জাতীয়তাবাদী শক্তির নেতৃত্বের উপর আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। যে কারণে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী সংগঠন আওয়ামী লীগের পক্ষে যে কোন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। নির্বাচন উত্তরকালের ক্ষমতা হস্তান্তরের টালবাহানা পূর্ববঙ্গবাসীকে স্বাধীনতার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বাধ্য করে। একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার ইঙ্গিত বাঙালী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ধারায় নতুন মাত্রা যোগ করে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালীর উপর সশস্ত্র আক্রমণে স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত হয়। পুর্ব বঙ্গবাসী স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়। এভাবে ২৪ বছরের ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার এবং ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রাম সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়। নয় মাসের রক্তস্নাত যুদ্ধের মধ্যদিয়ে জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বাঙালী জাতিসত্ত্বাভিত্তিক রাষ্ট্রের যা ছিল অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনার বাস্তব রূপ।

এই অসাম্প্রদায়িক বাঙালী চেতনা ছিল বাঙালী জাতির সহজাত। এ কারণেই সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ চিন্তাধারার প্রবল জোয়ারের মধ্যেও বাঙালী হিন্দু মুসলিম নেতৃবৃন্দ অসাম্প্রদায়িক বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাঙালী জাতিসত্ত্বা ভিত্তিক বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের যে ছবি তাঁদের কেউ কেউ একেছিলেন, তার সঙ্গে একাত্তরের সৃষ্ট অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতিসত্ত্বা ভিত্তিক বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসে বাঙালী জাতীয়তাবাদের চেতনা বিকাশের রাজনৈতিক ধারায়ও এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রাধান্য পেয়েছে বার বার।

বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টারা যেমন ধর্মনিরপেক্ষ বাংলা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাঙালী জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ফসল বাংলাদেশের মূল বৈশিষ্ট্যও ছিল তাই। অর্থনৈতিক কাঠামো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও ছিল মিল। শরৎবসু ভেবেছিলেন বাংলা ভাগ হলে দুই বাংলাই বহুজাতিক কোম্পানীর শোষণের ক্ষেত্র ভূমিতে পরিণত হবে। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। বাঙালী পাকিস্তান রাষ্ট্রে পা দিয়ে তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তাই প্রথম থেকেই পাঞ্জাবী শোষক চক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রবণতা বাঙালীর মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে। বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সত্তরের নির্বাচনী প্রচারকালে তার দলের আদর্শের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেন। বাঙালী জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারার সঙ্গে গণতন্ত্রের মতো সমাজতন্ত্র শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। যা ছিল কল্পিত বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য। তবে সঙ্গত কারণেই তার ভৌগলিক সীমা চিহ্নিত হয়েছিল লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী। প্রাচীনকাল থেকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একটি জাতি হিসেবে গড়ে উঠার যে প্রবণতা বাঙালী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল তা কখনই থেমে থাকেনি। আধুনিক কালেও বাঙালীর চেতনায় যে জাতীয়তাবাদী ধারণার জন্ম তা অসাম্প্রদায়িক ধারায়ই নিরন্তর প্রবাহমান ছিল। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ধাক্কা অর্থনৈতিক বঞ্চনার ক্ষোভ তাতে সাময়িক বাধার সৃষ্টি করেছিল মাত্র, বিলুপ্ত করতে পারেনি। ১৯৪৭ এর অসাম্প্রদায়িক 'বৃহত্তর বাংলা' রাষ্ট্রের প্রয়াস এবং '৭১ ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের জন্ম তার প্রমাণ বহন করে। তাছাড়া দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণ একথাই প্রমাণ করে যে অর্থনৈতিক প্রয়োজনই বার বার বাংলার জনগণকে তার জাতীয়তাবাদের চিন্তা ধারায় পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১
নেহরু রিপোর্ট

কংগ্রেসের উদ্যোগে ১৯২৮ সালের প্রথম দিকে দিল্লীতে এবং মে মাসে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে (All Parties Conference) ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের খসড়া রচনার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। পন্ডিত মতিলাল নেহরু ও তদীয় পুত্র জওহরলাল নেহরুকে যথাক্রমে এই কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয় এবং এতে সকল দলের প্রতিনিধিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই কমিটিই 'নেহরু কমিটি' নামে পরিচিত। কমিটি ১৯২৮ সালের আগষ্ট মাসে যে রিপোর্ট প্রকাশ করে, তাই নেহরু রিপোর্ট নামে খ্যাত।

এই নেহরু রিপোর্টের প্রধান প্রধান সুপারিশ নিম্নরূপ ছিল :

(১) নেহরু কমিটির রিপোর্টে ডোমিনিয়ন ধরনের দায়িত্বশীল সরকারকে তাদের প্রস্তাবগুলির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য ডোমিনিয়নের মতো সমান সাংবিধানিক মর্যাদাভোগ করবে। যা ভারতীয় কমনওয়েলথ (Commonwealth of India) নামে পরিচিত হবে। ভারতের জন্য আইন-প্রণয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ভারতীয় পার্লামেন্ট থাকবে। শাসন বিভাগ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকবে।

(২) এই রিপোর্টে সর্বসাধারণের মৌলিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা দানের সুপারিশ করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিচারে সকল ব্যক্তি নাগরিক অধিকার সমভাবে ভোগ করতে পারবেন।

(৩) ভারত কমনওয়েলথের শান্তি শৃঙ্খলা ও সুশাসনের জন্য আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত থাকবে। রাজ সিনেট ও হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস্‌কে নিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত হবে। সিনেটের সদস্য সংখ্যা হবে ২০০ জন। তাঁরা প্রাদেশিক পরিষদগুলির সদস্যদের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন। সেখানে প্রত্যেক প্রদেশই জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন লাভ করবে। হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের সদস্য সংখ্যা হবে ৫০০ জন। তাঁরা সার্বজনীন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

(৪) ভারতীয় কমনওয়েলথের নির্বাহী-ক্ষমতা বা শাসন-ক্ষমতা রাজার উপরই ন্যস্ত থাকবে। রাজার প্রতিনিধি হিসেবে গভর্ণর-জেনারেল আইনের বিধানসাপেক্ষে শাসন-পরিষদের পরামর্শক্রমে সেই ক্ষমতা চর্চা করবেন। গভর্ণর জেনারেল রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে তাঁর সন্তুষ্টিমত সময়কাল অবধি সেই পদে বহাল থাকবেন।

(৫) কোন প্রদেশের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা রাজা ও স্থানীয় আইন-পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে। প্রদেশের প্রতি ১০০,০০০ লোকের জন্য আইন-পরিষদে একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন। তবে ১ কোটির চেয়ে কম জনসংখ্যাবিশিষ্ট প্রদেশগুলির আইন-পরিষদ সর্বোচ্চ ১০০ জন সদস্য থাকতে পারবেন। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ সার্বজনীন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

(৬) প্রদেশের নির্বাহী ক্ষমতা বা শাসন-ক্ষমতা গভর্ণরের উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি প্রাদেশিক শাসন-পরিষদের পরামর্শ অনুসারে দায়িত্ব পালন করবেন। গভর্ণর রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে সংশ্লিষ্ট প্রদেশে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবেন।

(৭) একজন লর্ড প্রেসিডেন্ট (Lord President) পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক অন্যান্য বিচারককে নিয়ে একটি সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হবে। সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার পার্লামেন্টের দ্বারা নির্ধারিত হবে। তবে সুপ্রীম কোর্টকে কয়েকটি বিষয়ে আদিম এখতিয়ার (original jurisdiction) প্রদান করা হয়।

(৮) বর্তমান সময় অবধি দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি ভারত সরকারের যে সব অধিকার ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে তাদের প্রতি ভারত কমনওয়েলথেরও সেই সব অধিকার ও দায়-দায়িত্ব থাকবে।

(৯) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে অন্যান্য প্রদেশের মতো মর্যাদা দেয়া উচিত। সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে আলাদা করে পৃথক প্রদেশে পরিণত করা উচিত।

(১০) নেহরু রিপোর্টে সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচকমন্ডলী ও 'গুরুত্ব দানে'র ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করা হয়। এই রিপোর্টের মতে, পৃথক নির্বাচকমন্ডলী দায়িত্বশীল সরকারের মূলনীতির বিরোধী এবং তা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক আধিপত্যের আশংকাবোধই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মূল কারণ। মুসলিমগণ সামগ্রিকভাবে ভারতে সংখ্যালঘু হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের আধিপত্যের

Dhaka University Institutional Repository

আশংকাবোধ করেন। আবার বাংলা, পাঞ্জাব ইত্যাদি মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের আধিপত্যের ভয়ে ভীত থাকেন। নেহরু রিপোর্টে 'সকল সম্প্রদায়ের প্রতি নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে এনে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের কথা বলা হয়। কেবলমাত্র আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। মুসলমানদের জন্য অবশ্যই আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অমুসলমানরা ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত না। যেক্ষেত্রে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত রাখা উচিত না। কেন্দ্রে এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতেই কেবল মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা উচিত। রিপোর্টে আরও বলা হয়, সংরক্ষিত আসন ছাড়া অন্যান্য আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার দেয়া যেতে পারে, কিন্তু 'গুরুত্ব দানের' নীতি প্রত্যাখ্যান করা উচিত। কোন সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা তার জনসংখ্যার সমানুপাতিক হওয়া উচিত। সেহেতু কেন্দ্রীয় আইন সভাতে এক তৃতীয়াংশ আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত রাখার জন্য মুসলমানদের দাবী মেনে নিতে এই রিপোর্টে অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়।

নেহরু রিপোর্টে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্ব-কল্পনা করা হয়। কিন্তু এতে দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গঠনের কথা চিন্তা করার চেষ্টা করা হয় নাই। অবশ্য, এই রিপোর্টে বৃটিশ ভারতীয় রাজনীতিকদের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার জন্য দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সূত্র : বিপুল রঞ্জন নাথ, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক রাজনৈতিক বিকাশ* পৃষ্ঠা ৪০-৪২

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ২
জিন্নাহর চৌদ্দ দফা

মুসলিম লীগ নেহরু রিপোর্ট গ্রহণে অক্ষ বলে জিন্নাহ অভিমত ব্যক্ত করেন এবং তিনি ১৯২৯ সালের ২৮ মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভায় ভারতের ভবিষ্যত সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে কতকগুলি প্রস্তাব পেশ করেন। এই সব প্রস্তাবই 'চৌদ্দ-দফা' প্রস্তাব নামে প্রসিদ্ধ। জিন্নাহ সর্বদলীয় অধিবেশনে নেহরু রিপোর্টের উপর যে সব সংশোধনী উপস্থিত করেন সেইগুলির উপরই তাঁর চৌদ্দ-দফা প্রস্তাব বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত। চৌদ্দ-দফা প্রস্তাব কার্যকরী করা না হলে, ভারতের কোন ভবিষ্যৎ সংবিধানই মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না বলে তিনি ঘোষণা করেন। জিন্নাহর চৌদ্দ দফা ছিল ঃ

(১) ভারতের ভবিষ্যত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় হবে এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদেশসমূহের উপর ন্যস্ত করতে হবে।

(২) সকল প্রদেশকে সম-পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে।

(৩) প্রত্যেক প্রদেশের সংখ্যালঘুদেরকে পর্যাপ্ত ও কার্যকর প্রতিনিধিত্বদানের সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে দেশের সকল আইনসভা ও অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থা গঠিত হবে। কোন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘিষ্ঠ বা এমন কি সংখ্যাসম সম্প্রদায়ে পরিণত করা হবে না।

(৪) কেন্দ্রীয় আইন-সভায় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না।

(৫) সম্প্রদায়গত গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিত্বের মাধ্যম হিসেবে পৃথক নির্বাচকমন্ডলী ব্যবস্থাই বজায় থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন সময়ে যেকোন সম্প্রদায় যৌথ নির্বাচকমন্ডলী ব্যবস্থার অনুকূলে এর পৃথক নির্বাচকমন্ডলী ব্যবস্থা, পরিত্যাগ করতে পারবে।

(৬) ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় হতে পারে এমন ভূ-খন্ডগত পুনর্বিন্যাস কোনক্রমেই পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে প্রভাবিত করবে না।

(৭) সকল সম্প্রদায়ের জন্যই পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

(৮) আইন-সভায় বা অন্য কোন নির্বাচিত সংস্থায় কোন বিল বা প্রস্তাব গৃহীত হবে না, যদি উক্ত আইন-সভায় বা সংস্থায় কোন সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশ উক্ত বিল বা প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, অথবা এ ক্ষেত্রে সম্ভবপর বিকল্প ব্যবস্তা উদ্ভাবন করতে হবে।

(৯) সিন্ধু প্রদেশকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী থেকে পৃথক করতে হবে।

(১০) অন্যান্য প্রদেশের সাথে সমমর্যাদার ভিত্তিতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানেও সাংবিধানিক সংস্কার প্রবর্তন করা উচিত।

(১১) রাষ্ট্র ও স্থানীয় স্ব-শাসিত সংস্থাগুলির সব চাকুরীতে অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে মুসলমানদেরও পর্যাপ্ত অংশ দেয়ার বিধান সংবিধানে থাকা উচিত।

(১২) মুসলমানদের কৃষ্টি, শিক্ষা ইত্যাদি সংরক্ষণ ও উন্নতিবিধানের জন্য পর্যাপ্ত রক্ষাকবচ সংবিধানে সন্নিবেশিত থাকা উচিত।

(১৩) অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান মন্ত্রী না নিয়ে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক কোন মন্ত্রীসভাই গঠন করা উচিত হবে না।

(১৪) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির সম্মতি না নিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক সংবিধানে কোন পরিবর্তন সাধন করা হবে না।

সূত্র : বিপুল রঞ্জন নাথ, বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিকাশ পৃষ্ঠা ১৩৮-১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৩
পাকিস্তান সংবিধান সভায় মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশ

১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ পাকিস্তান সংবিধান সভার একটি প্রস্তাব অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি নির্ধারক কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটি ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সংবিধান সভায় তাঁদের অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে তাঁরা যে সুপারিশ করেন তা হলো নিম্নরূপ :

কেন্দ্রীয় আইনসভা : কেন্দ্রীয় আইন সভায় হাউস অব ইউনিটস এবং হাউস অব পিপলস নামে দুটি পৃথক পরিষদ থাকবে। উচ্চ পরিষদ, হাউস অব ইউনিটস, প্রত্যেকটি প্রদেশের সমান সংখ্যক প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে। নিম্নপরিষদ হাউস অব পিপলস জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে। দুই পরিষদের পারস্পরিক ক্ষমতা ও কেন্দ্রীয় শাসনভার এর বিষয়ে উভয় পরিষদ সমান ক্ষমতার অধিকারী হইবে। কোন বিষয়ে মতবিরোধ উপস্থিত হইলে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে উভয় পরিষদে যুক্ত অধিবেশন আহূত হব। বাজেট ও অর্থ সংক্রান্ত বিল উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে আলোচিত হবে। যুক্ত অধিবেশন আহ্বানের ক্ষমতা থাকবে প্রেসিডেন্টের হাতে। দুই যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করা হবে। এছাড়া রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচন ও অপসারণ এবং মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনার জন্যেও যুক্ত অধিবেশন আহূত হবে।

প্রেসিডেন্ট : ফেডারেশনের শাসন কর্তৃত্ব প্রেসিডেন্টের ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হবেন। তাঁর কার্যকাল হবে পাঁচ বৎসর। সশস্ত্র বাহিনীর ওপর প্রেসিডেন্টের সর্বময় কর্তৃত্ব থাকবে। তাছাড়া নির্বাচন পরিচালনা এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার সর্বপ্রকার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত থাকবে। উভয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্য দাবী করলে উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে মোট সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ভোটে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করা যেতে পারবে।

প্রেসিডেন্ট বা "রাষ্ট্রনায়ক কর্তৃক প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হবেন।" "জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রে রাষ্ট্রনায়কের যে ক্ষমতা থাকবে প্রদেশে প্রাদেশিক শাসনকর্তারও সেই ক্ষমতা থাকবে, তবে এই সকল ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপকতায় তিনি রাষ্ট্রনায়কের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশাধীন থাকবেন।" "প্রদেশের মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্তের ব্যাপারে প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে রাষ্ট্রনায়কের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করতে হবে।"

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার পারস্পরিক সম্পর্ক : "প্রাদেশিক ও সম্মিলিত বিষয়ের তালিকা সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয়-সাধনের ক্ষমতা কেন্দ্রের থাকবে। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইন সভা আইন প্রণয়ন করতে পারবেন।

"কেন্দ্রীয় আইনসভা কোন আইন প্রণয়ন করলে পরিচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে আইন প্রণয়ন করে কেন্দ্রীয় আইনসভা তা সংশোধিত অথবা বাতিল করতে পারবে, কিন্তু যে প্রদেশের উপর এই আইন প্রয়োগ হবে সেই প্রদেশের আইনসভায় আইন পাশ করে সংশোধন ও বাতিল করা চলবে না।"

"কেন্দ্রীয় আইনসভা ও প্রাদেশিক আইনসভায় প্রণীত আইনের অসামঞ্জস্য বা কোন বৈসাদৃশ্য দেখা দিলে কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রাদেশিক আইন সভার উপর প্রাধান্য লাভ করবে।"

"জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে কেন্দ্র প্রাদেশিক তালিকায় উল্লিখিত যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারবেন।"

"প্রদেশের শাসন ক্ষমতা এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন এবং প্রদেশের প্রচলিত আইনের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেয়া প্রয়োজন মনে করলে ফেডারেশনের শাসন ক্ষমতা অনুসারে সেই নির্দেশ দান করবেন।

"প্রত্যেক প্রদেশের শাসনক্ষমতা এমনভাবে পরিচালনা হবে যাতে ফেডারেশনের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় তা বাধাস্বরূপ না হয়ে দাঁড়াতে পারে।"

জরুরী অবস্থা : কোন বিশেষ অবস্থাকে জরুরী বিবেচনা করলে প্রেসিডেন্ট সাময়িকভাবে শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখতে পারবেন।

ক্ষমতা বন্টন : কেন্দ্র ও প্রদেশ সমূহের ক্ষমতা তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন বিভাগ, প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্বাধীন বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন বিভাগ। তালিকাভুক্ত ক্ষমতা ব্যতীত সমস্ত অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী : প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। প্রেসিডেন্ট এমন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করবেন যিনি তাঁর মতো কেন্দ্রীয় আইন সভার উভয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন। প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী মন্ত্রীসভার অপরাপর সদস্য নিযুক্ত করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় সরকারের উভয় পরিষদের কাছে সমানভাবে দায়ী থাকবেন।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা : প্রাদেশিক পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করবেন। প্রাদেশিক মন্ত্রীরা প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে প্রাদেশিক শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। প্রাদেশিক শাসন কর্তা কর্তৃক কোন মন্ত্রীর নিয়োগ অথবা বরখাস্তের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা চলবে না।

অর্ডিন্যান্স : প্রেসিডেন্ট যে সমস্ত অর্ডিন্যান্স জারী করবেন সেগুলি কেন্দ্রীয় আইনসভার পরবর্তী অধিবেশনে উত্থাপন করতে হবে। আইন সভা অর্ডিন্যান্সের জন্যে নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করবেন।

রাষ্ট্রভাষা : পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।

সূত্র : বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (দ্বিতীয় খন্ড) পৃষ্ঠা ৩৮০-৩৮২।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৪
মূলনীতি কমিটির সুপারিশের পাল্টা প্রস্তাব

রাষ্ট্রের নাম : রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের দুটি অংশ থাকবে-পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান।

রাষ্ট্র প্রধান : পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন। তিনি কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। দেশদ্রোহিতা এবং অসদাচরণের জন্যে রাষ্ট্র প্রধানকে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের দুই তৃতীয়াংশ ভোটে অপসারণ করা যাবে। রাষ্ট্র প্রধানের আকস্মিক মৃত্যু বা অপসারণের পর নতুন রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পার্লামেন্টের স্পীকার রাষ্ট্রপ্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হবেন। নতুন রাষ্টপ্রধান নির্বাচন রাষ্ট্রপ্রধানের পদ শূন্য হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। রাষ্টপ্রধানের ক্ষমতা ও দায়িত্ব হবে : (ক) তিনি ক্ষমা প্রদান করবেন (খ) তিনি হবেন পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (গ) তিনি নির্বাচন কমিশনার, সুপ্রীম কোর্টের জজ এবং অডিটর জেনারেল নিয়োগ করবেন (ঘ) পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন এমন একজনকে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো অন্যান্য মন্ত্রীরাও তাঁর দ্বারা নিযুক্ত হবেন। তিনি বিদেশী দূতদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করবেন এবং সকল আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট : পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের একটি মাত্র পরিষদ থাকবে। পার্লামেন্টের অধিবেশন পর্যায়ক্রমে কেন্দ্রীয় রাজধানী এবং তারপর পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক অঞ্চল থেকে একই সংখ্যক লোকের ভোটে সার্বজনীন ভোটাধিকার ও যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে পার্লামেন্টের সদস্যেরা নির্বাচিত হবেন। প্রত্যেক এলাকার ভোটদাতারা তাঁদের প্রতিনিধিকে ইচ্ছে করলে পার্লামেন্ট থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। পার্লামেন্ট থেকে সকল অর্থ বিল রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে প্রেরিত হওয়ার তিন দিনের মধ্যে তাঁকে স্বাক্ষর দান করতে হবে। অন্যান্য বিলে তাঁকে স্বাক্ষর দান করতে হবে তিরিশ দিনের মধ্যে। নির্বাচন কমিশন, সুপ্রীম কোর্টের জজ ও পাকিস্তানের অডিটর জেনারেলকে দেশদ্রোহিতা ও অসদাচরণের জন্যে পার্লামেন্ট দুই তৃতীয়াংশ ভোটে অপসারণ করতে পারবেন। পার্লামেন্টের সদস্যেরা সরকারের অধীনে কোন লাভবান পদে বহাল হতে পারবেন না। কোন কোন জরুরী জাতায় প্রশ্নে জনগণের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিতে পারবেন। কোন ব্যক্তি বা দলই পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রীত্ব গঠন করতে পারছেন না এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার থাকবে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার। এর ৪৫ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা : মন্ত্রী পরিষদের সদস্যেরা একক এবং যৌথভাবে পার্লামেন্টের কাছে দায়ী থাকবেন। পাকিস্তানের যে কোন নাগরিক পার্লামেন্টের সদস্য থাকলে তিনি মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন। সদস্য নন এমন কোন নাগরিক যদি মন্ত্রী হন তাহলে মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব নেওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই তাঁকে পার্লামেন্টের সদস্যরূপে নির্বাচিত হতে হবে।

সুপ্রীম কোর্ট : পাকিস্তানের একটি সুপ্রীম কোর্ট থাকবে এবং তার সেশন পর্যায়ক্রমে কেন্দ্রীয় রাজধানী এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে।

রাষ্ট্রভাষা : পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা এবং উর্দু।

কেন্দ্রের আওতাভুক্ত বিষয় : দেহরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকবে। দেশরক্ষা বাহিনীর দুটি ইউনিট থাকতে হবে যার একটি থাকবে পূর্ব এবং অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তানে। এই ইউনিটগুলি আঞ্চলিক অধিনায়কদের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং কেন্দ্রীয় রাজধানীতে অবস্থিত সর্বাধিনায়কের অধীনস্থ থাকবে। প্রত্যেক অঞ্চলের দেশরক্ষা বাহিনী সেই অঞ্চলের লোক দিয়েই গঠিত হতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে একটি আঞ্চলিক বৈদেশিক মন্ত্রণালয় থাকতে হবে। অন্যান্য সকল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে প্রদেশের হাতে।

কেন্দ্র কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর কর ধার্য করতে পারবে কিন্তু প্রদেশের অনুমতি ব্যতীত কেন্দ্র তা করতে পারবে না।

সংবিধানের সংশোধন : কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের ক্ষমতা সংক্রান্ত সংবিধানের যে কোন অংশ কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংশোধিত হতে পারবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যে কোন একটি বা প্রত্যেকটি আঞ্চলিক সরকারের সম্পর্ক সম্পর্কিত কোন অংশ প্রথমে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পার্লামেন্টের দুই তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হয়ে তার পর কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের দুই তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হতে হবে। অন্য যে কোন সংশোধন হবে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পার্লামেন্টের দুই তৃতীয়াংশ ভোটে।

সংবিধান স্থগিত রাখার ক্ষমতা : কোন অবস্থাতেই সংবিধান স্থগিত রাখার ক্ষমতা কারো থাকবে না।

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিক সরকার : পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে দুটি পৃথক আঞ্চলিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সরকারের একজন আঞ্চলিক প্রধান থাকবেন এবং তিনি আঞ্চলিক পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা অথবা অসদাচরণের জন্যে তাঁকে অপসারণ করার জন্যে আঞ্চলিক পার্লামেন্টের দুই তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হবে। যে কোন কারণে আঞ্চলিক প্রধান অপসারিত হলে তাঁর স্থলে আঞ্চলিক পার্লামেন্টের স্পীকার সাময়িকভাবে আঞ্চলিক প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর নব্বই দিনের মধ্যে আঞ্চলিক পার্লামেন্টকে নতুন একজন আঞ্চলিক প্রধান নির্বাচিত করতে হবে। আঞ্চলিক পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন একজনকে আঞ্চলিক প্রধান আঞ্চলিক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করবেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্য মন্ত্রীরা তাঁর দ্বারা নিযুক্ত হবেন।

আঞ্চলিক পার্লামেন্টের একটি মাত্র পরিষদ থাকবে এবং সেই পরিষদের সদস্যেরা সার্বজনীন ভোটাধিকার ও যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হবেন। ৫ বৎসরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোন গুরুতর কারণে প্রয়োজন হলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী আঞ্চলিক প্রধান আঞ্চলিক পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিতে পারবেন। তবে এইভাবে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়ার ষাট দিনের মধ্যে আঞ্চলিক প্রধানকে নতুন নির্বাচনের অনুষ্ঠান করতে হবে। মন্ত্রী পরিষদের সদস্যেরা একক ও যৌথভাবে আঞ্চলিক পার্লামেন্টের কাছে দায়ী থাকবেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের কতকগুলি বিশেষত্বের জন্যে সেখানে আঞ্চলিক সরকারের বাস্তব রূপ কি হবে তা নির্বাচনের জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের একটি কনভেনশন আহ্বানের প্রস্তাব জাতীয় মহাসম্মেলনে করা হয়।।

জাতীয় মহাসম্মেলনে গৃহীত মূলনীতি প্রস্তাবসমূহের সবশেষে নাগরিকদের অধিকার।অধিকার সম্পর্কিত একটি প্রস্তাবে নিম্নলিখিত অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয় :

ক. (১) আইনের চোখে সকল নাগরিকই সমান।

(২) আদালতে বিচার না করে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা চলবে না।

(৩) অপ্রকৃতিস্থ নয় এমন যে কোন নাগরিক ১৮ বৎসর বয়স হলে ভোট দানের ক্ষমতা লাভ করবে এবং ২১ বৎসর বয়স হলে পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্যে নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবে।

(৪) হেবিয়াস কর্পাস অধিকার রদ করার কোন ব্যবস্থা থাকবে না।

খ. প্রত্যেক নাগরিকের নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ থাকবে :

(১) জীবন

(২) শিক্ষা—একটা পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা

(৩) কাজ ও জীবিকা

(৪) চিকিৎসার সাহায্য

(৫) আশ্রয়

(৬) জীবিকার মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মজুরী

(৭) ট্রেড ইউনিয়ন ও ট্রেড সেক্রেটারিয়েট গঠন এবং যৌথ দরকষাকষির জন্যে ধর্মঘট

গ. রাষ্ট্র নিম্নলিখিত বিষয়ে নাগরিকদেরকে নিশ্চিত করবে ঃ

(১) বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, চলাচলের স্বাধীনতা, চিন্তা, কর্ম, সমিতি গঠন, ভাবপ্রকাশ, প্রার্থনা ও বিবেকের স্বাধীনতা সহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমূহ।

(২) মর্যাদা ও সুযোগের সমানাধিকার

(৩) ব্যক্তির মর্যাদা

(৪) বার্ধক্যের সংস্থান

(৫) মাতৃত্বের সুযোগ সুবিধা

(৬) উৎপাদনের শক্তিসমূহের সামাজিকরণ

(৭) কোন আইন পরিষদই এমন কোন আইন করতে পারবে না যার দ্বারা শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষকে শোষণের সুবিধা হয়।

সূত্র : বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (দ্বিতীয় খন্ড) পৃষ্ঠা ৪০০-৪০৪।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৫

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা কর্মসূচী

নীতি ঃ কোরান ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করাহবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিকে নাগরিকদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হবে।

১। বাংলা ভাষা হবে পাকিস্তানের অন্যতম একটি রাষ্ট্রভাষা।

২। ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে যে কোন প্রকারের জমিদারি বিলুপ্তিকরণ এবং উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন। করের পরিমাণ হ্রাস।

৩। পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ, পাট উৎপাদকদের জন্য উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ। মুসলিম লীগ আমলের পাটশিল্পের দালালদের অনুসন্ধান করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।

৪। সমবায় শিল্প প্রথা প্রতিষ্ঠা দ্বারা কুটির শিল্প ও শ্রমশিল্পের উন্নতি।

৫। লবণ শিল্পে পূর্ব পাকিস্তানের স্বনির্ভরতার জন্য এই শিল্পের পত্তন এবং পাট-দালালদের মত লবণ শিল্পের দালালদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬। সর্বপ্রকার উদ্বাস্তু-বিশেষত কারিগর ও শিল্প শ্রমিকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। বন্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য সেচ পরিকল্পনা।

৮। পূর্ববঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা শিল্প শ্রমিকদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান।

৯। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা।

১০। সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থা বিলোপের দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১১। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কালাকানুন বাতিল করে তাদের স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরকরণ।

১২। প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের বেতনে সমতা আনয়ন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীরা ১,০০০ টাকার বেশী বেতন গ্রহণ করবেন না।

১৩। সর্বপ্রকার দুর্নীতি, আত্মীয় পোষণ, উৎকোচের অবসান এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালের পরের সময়ের প্রত্যেক সরকারী অফিসারও বাণিজ্যপতিদের সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ।

১৪। বিভিন্ন জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স কর্তৃক ধৃত সকল বন্দীর মুক্তি এবং সভা সমিতি, প্রেস ও বাক স্বাধীনতা দান।

১৫। বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থা পৃথকীকরণ।

১৬। বর্ধমান ভবনকে প্রথমে ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগারে পরিণতকরণ।

১৭। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদের স্মৃতিতে একটি শহীদ স্তম্ভ নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ দান।

১৮। ২১শে ফেব্রুয়ারী 'শহীদ দিবস' এবং ছুটির দিন ঘোষণা।

১৯। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক, সম্পর্ক এবং মুদ্রাব্যবস্থা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে পূর্ববঙ্গের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। প্রতিরক্ষা বিষয়েও কেন্দ্রে যেমন থাকবে নেভি হেড কোয়ার্টার্স এবং পূর্ববঙ্গকে অস্ত্রের ব্যাপারে স্বনির্ভর করার জন্য তেমনি পূর্ববঙ্গে হবে 'অস্ত্র কারখানা' প্রতিষ্ঠা। আনসারদের পুরোপুরি সৈনিকরূপে স্বীকৃত।

২০। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা কোন কারণেই আইনসভা বা মন্ত্রীসভার কার্যকাল বৃদ্ধি করবেন না এবং যাতে নির্বাচনী কমিশনারের মাধ্যমে স্বাধীন পক্ষপাতহীন নির্বাচন হতে পারে তার জন্য তারা নির্বাচনের দু'মাস পূর্বে পদত্যাগ করবেন।

২১। প্রত্যেকটি আইনসভা সদস্যদের শূন্যপদ শূন্য হওয়ার তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন দ্বারা পূর্ণ করা হবে এবং যদি যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী পর পর তিনটি উপনির্বাচনে পরাজিত হন তবে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে।

সূত্র : মযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পৃষ্ঠা ১৩৭-১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৬

আঞ্চলিক বৈষম্যের কয়েকটি চিত্র :

১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৯-৬০ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণ বন্টন (কোটি টাকা হিসেবে)

বিষয়	পূর্ব পাকিস্তান	শতকরা	পশ্চিম পাকিস্তান	শতকরা	কেন্দ্র	শতকরা	মোট
বৈদেশিক উন্নয়ন সাহায্য ইউ, এস	৯৩.৮৯	১৭	৩৩৫.২২	৬২	১১৩.০৩	২১	৫৪২.১৪
পণ্য দ্রব্য	১২৯.০০	৩০	২৬২.০০	৬৪	১৮.০০	৬	৪৩৯.০০

সূত্র : Economic Disparities Between East and West Pakistan (1963) Planning Department, East Pakistan P.21.

১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন খরচ

	পূর্ব পাকিস্তান মোট কোটি টাকা হিসেবে	মাথাপিছু টাকা	পশ্চিম পাকিস্তান মোট কোটি টাকা হিসেবে	মাথা পিছু টাকা
অর্থ বিনিয়োগ	১৭২	৩৮	৪৩০	১১৭
ঋণ সমূহ	১৮৪	৪০	২২৪	৬১
সাহায্য মঞ্জুরী	৭৬	১৫	১০১	২৮

সূত্র : Economic Disparities Between East and West Pakistan (1963) Planning Department, East Pakistan P. 18.

স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের বৈষম্য (রূপী হিসেবে)

সময়	মোট	পূর্ব পাকিস্তান মোট	শতকরা	পশ্চিম পাকিস্তান মোট	শতকরা
১৯৪৯-৫০	১১৯৩১০০০	৩০৫৫০০০	২৫.৬১	৮৮৭৬০০০	৭৪.৩৯
১৯৫০-৫১	১৮০৯৬০০০	৩৬১৮০০০	২০	১৪৪৭৮০০০	৮০
১৯৫১-৫২	২৫৯৮৯০০	৩৭৮২০০০	১৪.৫৫	২২২০৭০০০	৮৫.৪৫

তথ্য সংগ্রহ ঃ আতিউর রহমান, লেলিন আজাদ ভাষা আন্দোলন অর্থনৈতিক পটভূমি পৃষ্ঠা ১২১-১২২।

পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যের নমুনা

পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ : পূর্ব	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
প্রথম	৩২%	৬৮%
দ্বিতীয়	৩২%	৬৮%
তৃতীয়	৩৬%	৬৪%
বৈদেশিক সাহায্য	২০-৩০%	৭০-৮০%
রপ্তানি আয়	৫০-৭০%	৩০-৫০%
আমদানি ব্যয়	২৫-৩০%	৭০-৭৫%
সিভিল সার্ভিস চাকুরী	১৬-২০%	৮০-৮৪%
সামরিক বাহিনীতে চাকুরী	১০%	৯০%

সূত্র ঃ Tariq Ali Can pakistan survive : 86.

Dhaka University Institutional Repository

. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক ভারসাম্য :

	বৈদেশিক সমতা		আন্তঃআঞ্চলিক সমতা	মধ্যপরি সমতা	
সময়	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব (-) পশ্চিম (+)	পূর্ব	পশ্চিম
১৯৪৮-৪৯	১৪.৬৮	-৬৪.৮৩	১২.০৫	২.৬৩	-৫২.৭৮
১৯৪৯-৫০	২৪-৪১	-৩৪.৭০	১৮.৫১	৫.৯০	-১৬.১৯
১৯৫০-৫১	৭৫.৮২	+১৭.৫৪	২০.৮৫	৭৪.৯৭	+৩৮.৩৯
১৯৫১-৫২	৩২.৩১	-৫৫.২০	১৮.৭৭	১৩.৫৪	-৩৬.৪৩
১৯৫২-৫৩	২৬.৭১	-১৪.৯৯	৬.৯২	২০.৬৯	-৮০৭
১৯৫৩-৫৪	৩৫.১৯	-১৮.৩৩	২৩.৫০	১১.৬৯	+৫.১৭
১৯৫৪-৫৫	৪১.১৪	-২৯.১৬	১০.৬৮	৩০৪৬	-১৮.৪৮
১৯৫৫-৫৬	৬৮.০৬	-২২.২১	৯.৫৫	৫৮.৫১	-১২.৬৬
১৯৫৬-৫৭	৯.০৯	-৮১.৭৮	১৯.৭৭	১০.৬৮	-৫২.০১
১৯৫৭-৫৮	২৫.২৫	-৮৮.০৭	৪৩.২৯	-১৮.০৪	-৪৪.৭৮

সূত্র : Mahammad Anisur Rahman 'East and West Pakistan : A Poblem in the Political Economy of Regional Planning' (Cambridge Centre for International Affairs, harvard University. 1968) P.12.

পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক বাণিজ্যের খতিয়ান (মিলিয়ন টাকার)

পূর্ব পাকিস্তানে-আমদানি

সময়	চাল ও গম	সূতী বস্ত্র	তৈলবীজ	কাঁচাতুলা	তামাকজাতপণ্য	মোট
১৯৬৪-৬৫	১৯.৫	২৫৪.৩	৮০.৩	৮১.৪	৮৯.৫	৮৭৪.৫
১৯৬৫-৬৬	১৫০.০	২৮৫.৪	১৩৫.৬	১৩৬.৪	১০৩.৭	১২০৮.৬
১৯৬৬-৬৭	১৫০.১	২৭৭.৯	৮৯.৮	৯৩.৮	১২১.৫	১৩২৪.৮
১৯৬৭-৬৮	৮৯.৪	২৪৫.৬	১১৪.৭	১২১.০	১০০.৭	১২৩৩.৭
১৯৬৮-৬৯	১২৯.২	২৭৮.৩	১০৮.৮	১৫৭.৮	১২৩.৬	১৩৮৫.৩

পূর্ব পাকিস্তানে রপ্তানি

	চা	পাটজাত পণ্য	কাগজ	মোট
১৯৬৪-৬৫	১৮৫.৪	১০৪.৯	৮৫.৯	৫৩৭.১
১৯৬৫-৬৬	২৪৩.৫	১৩৭.৫	৭৮.৯	৬৫১.৮
১৯৬৬-৬৭	২৮৭.৩	১৩৭.৭	৭৬.৩	৭৩৮.৯
১৯৬৭-৬৮	২২৮.৯	১৪০.২	৯১.০	৭৮৪.৯
১৯৬৮-৬৯	২৫৭.০	১২৩.৮	১০৯.৫	৮৭০.০

সূত্র : পরিকল্পনা বিভাগ, ইকনমিক সার্ভে অব ইষ্ট পাকিস্তান ১৯৬৯-৭০।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি মালিকানা কাঠামো

	ভূমির আকার (একর)	মালিকানার শতাংশ	মোট জমির শতাংশ
পশ্চিম পাকিস্তান	৫ অথবা এর কম	৬৪·৫	১৫·০
	৫ থেকে ২৫	২৮·৫	৩১·৭
	২৫ থেকে ১০০	৫·৭	২২·৪
	১০০ থেকে ৫০০	১১·১	১৫·৯
	৫০০ থেকে উর্ধে	০·১	১৫·০
পূর্ব পাকিস্তান	০ থেকে ০·৪	১৩·০	১·০
	০·৫ থেকে ০·৯	১১·০	২·০
	১·০ থেকে ২·৪	২৭·০	১৩·০
	২·৫ থেকে ৪·৯	২৬·০	২৬·০
	৫·০ থেকে ৭.৪	১২·০	১৯·০
	৭·৫ থেকে ১২.৪	৭·০	১৯.০
	১২·৫ থেকে ২৪·৯	৩·০	১৪·০
	২৫·০ থেকে ৩৯·৯	-	৩·০
	৪০·০ থেকে উর্ধে	-	২·০

উৎসঃ পশ্চিম পাকিস্থান : ভূমি সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন ১৯৫৯, পরিশিষ্ট-১

পূর্ব পাকিস্তান : পাকিস্তান কৃষি পরিসংখ্যান, পূর্ব পাকিস্তান, প্রথম খন্ড, খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি শুমারী সংস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৭
আওয়ামীলীগের ছয় দফা

পাকিস্তান হবে একটি যৌথ রাষ্ট্র এবং ছয় দফা ফর্মূলার ভিত্তিতে এই যৌথ রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

প্রথম দফা

সরকারের বৈশিষ্ট্য হবে যৌথ রাষ্ট্রীয় ও পারিষদিক পদ্ধতির, তাতে যৌথ রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো থেকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্বাচন জনসংখ্যার ভিত্তিতে হতে হবে।

দ্বিতীয় দফা

কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় এবং তৃতীয় দফার ব্যবস্থিত শর্তসাপেক্ষ বিষয়।

তৃতীয় দফা

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দু'টি পৃথক মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যা পারস্পরিকভাবে কিংবা অবাধে উভয় অঞ্চলে বিনিময় করা চলবে। অথবা এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার অধীনে দুই অঞ্চলে দু'টি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে। তাতে এমন বিধান থাকতে হবে যেন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর কিংবা মূলধন পাচার হতে না পারে।

চতুর্থ দফা

রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা তাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে। প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজস্বের যোগান দেওয়া হবে। শাসনতন্ত্রে নির্দেশিত বিধানের বলে রাজস্বের এই নির্ধারিত অংশ স্বাভাবিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে জমা হয়ে যাবে। এহেন শাসনতান্ত্রিক বিধানে এমন নিশ্চয়তা থাকবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারটি এমন একটি লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে যেন রাজস্ব নীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে থাকে।

পঞ্চম দফা

যৌথ রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে, সেই অঙ্গরাজ্যের সরকার যাতে স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে তার পৃথক হিসাব রাখতে পারে, শাসনতন্ত্রে সেরূপ বিধান থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে, শাসনতন্ত্রে নির্দেশিত বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত অনুপাতের ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্যগুলো থেকে তা আদায় করা হবে। শাসনতন্ত্রের বিধানুযায়ী দেশের বৈদেশিক নীতির কাঠামোর মধ্যে যার দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে চুক্তিসম্পাদনের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলোর হাতে থাকতে হবে।

ষষ্ঠ দফা

ফলপ্রসূভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কাজে সাহায্যের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলোকে মিলিশিয়া কিংবা আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে একটি অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, সামরিক একাডেমী ও নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করতে হবে।

সূত্র : মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ : *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা* পৃষ্ঠা ৭১-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৮
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবী

১. (ক) সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফট নৈশ আই এ, আই, এসসি আইকম ও বি এ, বিএসসি, বিকম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এমএ ও এম কম ক্লাস চালু করিতে হইবে।

(ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

(ঙ) হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও ক্যান্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(চ) হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

(জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

(ঝ) মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশন ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিক্যাল কাউন্সিল অর্ডিনেন্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিক্যাল ছাত্রদের দাবী মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষ বর্ষেও ক্লাশ দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্স'-এর সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনালে পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিস্টার পরীক্ষা ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

(ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবী অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আই. ই. আর. ছাত্রদের দশ-দফা, সমাজ কল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এম. বি. এ. ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবী মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা 'ফ্যাকাল্টি' করিতে হইবে।

(ড) কৃষি বিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের কনডেন্স কোর্স-এর দাবীসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ঢ) ট্রেনে, স্টীমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি' কার্ড দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাসে যাতায়াতেও শতকরা ৫০ বাগ 'কন্সেসন' দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজ যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারী ও আধাসরকারী উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হইবে।

(ণ) চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে এবং ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈকালিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩. নিম্নলিখিত দাবীসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে ঃ

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানেএকটি ফেডারেশন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে। এই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী-রপ্তানি চলিবে। এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রপ্তানি করিবার অধিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ, নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করিতে হইবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানে বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদানকরতঃ সাব ফেডারেশন গঠন।

৫. ব্যাঙ্ক, বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬. কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মন প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে। এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮. পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহারের এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষে :
আবদুর রউফ, সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।
খালেক মোহাম্মদ আলী, সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।
সাইফুদ্দিন আহমদ, সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
সামসুদ্দোহা, সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
মোস্তফা জামাল হায়দার, সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
দীপা দত্ত, সহ সম্পাদিকা
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
তোফায়েল আহমদ, সহ সভাপতি
ডাকসু।
নাজিম কামরান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক
ডাকসু।

সূত্র : রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম* পৃষ্ঠা ৮১-৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৯
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

'ভাইয়েরা আমার!

আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী রংপুরে আমার ভাই-এর রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়। বাংলার মানুষ অধিকার চায়। নির্বাচনে আপনারা ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়ী করেছিলেন। শাসনতন্ত্র তৈরী করবো—এবং এই শাসনতন্ত্রে মানুষ তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তিলাভ করবে। কিন্তু ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের মুমূর্ষু আর্তনাদের ইতিহাস, রক্তদানের করুণ ইতিহাস, নির্যাতিত মানুষের কান্নার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গতিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে মার্শাল ল জারী করে আইয়ুব খাঁন দশ বছর আমাদের গোলাম করে রাখলো। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দেওয়া হলো এবং এ অপরাধে আমার বহু ভাইকে হত্যা করা হলো। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া খান এলেন। তিনি বললেন, তিনি জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন-শাসনতন্ত্র দেবেন-আমরা মেনে নিলাম। তারপরের ঘটনা সকলেই জানেন। ইয়াহিয়া খানের সংগে আলোচনা হলো। আমরা তাকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার অনুরোধ করলাম। কিন্তু মেজরিটি পার্টির নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার কথা শুনলেন না, শুনলেন সংখ্যালঘু দলের ভুট্টো সাহেবের কথা। আমি শুধু বাংলার মেজরিটি পার্টির নেতা নই-সমগ্র পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা। ভুট্টো সাহেব বললেন মার্চের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন ডাকতে। তিনি মার্চের তিন তারিখে অধিবেশন ডাকলেন। আমি বললাম, তবুও আমরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যাবো এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি ন্যায্য কথা বলে আমরা তা মেনে নেব, এমন কি তিনি যদি একজনও হন।

জনাব ভুট্টো ঢাকা এসেছিলেন, তার সঙ্গে আলোচনা হলো। ভুট্টো সাহেব বলে গেছেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। মওলানা নূরানী, মওলানা মুফতি মাহমুদসহ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য পার্লামেন্টারী নেতা এলেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা হলো—উদ্দেশ্য ছিলো আলাপ-আলোচনা করে শাসনতন্ত্র রচনা করবো। তবে আমি তাদের জানিয়ে দিয়েছি যে, ৬-দফা পরিবর্তনের কোন অধিকার নেই—এটা জনগণের সম্পদ। কিন্তু ভুট্টো সাহেব হুমকি দিলেন। তিনি বললেন, এখানে এসে ডবল জিম্মি হতে পারবেন না। পরিষদ কসাইখানায় পরিণত হবে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের প্রতি হুকুকি দিলেন যে, পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিলে রক্তপাত করা হবে, তাদের মাথা ভেংগে দেয়া হবে। হত্যা করা হবে। আন্দোলন শুরু হবে, পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত। একটি দোকানও খুলতে দেওয়া হবে না।

তা সত্ত্বেও পঁয়ত্রিশ জন পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্য এলেন। কিন্তু পয়লা মার্চ ইয়াহিয়া খান পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে, বলা হলো আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য কিছু করা হয়নি।

এরপর বাংলার মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো। আমি শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য হরতাল ডাকলাম। জনগণ আপন ইচ্ছায় পথে নেমে এলো। কিন্তু কি পেলাম আমরা? বাংলার নিরস্ত্র জনগণের উপর অস্ত্র ব্যবহার করা হলো। আমাদের হাতে অস্ত্র নেই। কিন্তু আমরা পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনে দিয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সে অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার নিরীহ মানুষদের হত্যা করার জন্য। আমার দুঃখী জনতার উপর চলছে গুলী। আমার বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যখনই দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে চেয়েছে, তখনই ষড়যন্ত্র চলেছে-আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইয়াহিয়া খান বলেছেন, আমি নাকি দশই মার্চ তারিখে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে চেয়েছি-তার সাথে টেলিফোনে আমার আলাপ হয়েছে। আমি তাকে বলেছি আপনি প্রেসিডেন্ট। ঢাকায় আসুন, দেখুন আমার গরীব জনসাধারণকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমার মায়ের কোল কিভাবে খালি করা হয়েছে। আমি আগেই বলে দিয়েছি, কোন গোলটেবিল বৈঠক হবে না, কিসের গোলটেবিল বৈঠক? যারা আমার মা-বোনের কোল শূন্য করেছে, তাদের সাথে বসবো আমি গোলটেবিল বৈঠকে?

তিন তারিখে পল্টনে আমি অসহযোগের ডাক দিলাম। বললাম, অফিস-আদালত, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করুন। আপনারা মেনে নিলেন।

হঠাৎ আমার সঙ্গে বা আমার দলের সঙ্গে আলোচনা না করে একজনের সাথে পাঁচ ঘন্টা বৈঠকের পর ইয়াহিয়া খান যে বক্তৃতা করেছেন তাতে সমস্ত দোষ আমার ও বাংলার জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। দোষ করলেন ভুট্টো, কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

গুলি করা হলো আমার বাংলার মানুষকে। আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের; আমরা বুলেট খাই, দোষ আমাদের। ইয়াহিয়া সাহেব অধিবেশন ডেকেছেন কিন্তু আমার দাবী, সামিরকআইন প্রত্যাহার করতে হবে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, হত্যার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো পরিষদে বসবো কি বসবো না। এ দাবী মানার আগে পরিষদে বসার কোন প্রশ্নই উঠে না। জনগণ আমাকে সে অধিকার দেয়নি। রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি, শহীদের রক্ত পারা দিয়ে ২৫ তারিখে পরিষদে যোগ দিতে যাবো না।

ভাইয়েরা আমার! আমার উপর বিশ্বাস আছে? (লক্ষ লক্ষ মানুষ হাত তুলে 'হ্যাঁ' বলে)। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, মানুষের অধিকার চাই। প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে আমাকে নিতে পারেনি। ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে নিতে পারেনি। আপনারা রক্ত দিয়ে আমাকে ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সে দিন এই রেসকোর্সে আমি বলেছিলাম রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়েই শোধ করবো; মনে আছে? আজো আমি রক্ত দিয়েই রক্তের ঋণ শোধ করতে প্রস্তুত।

আমি বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে কোর্ট কাচারী, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট, অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দ থাকবে। কোন কর্মচারী অফিসে যাবেন না-এ আমার নির্দেশ। গরীবের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য রিকশা চলবে, ট্রেন চলবে আর সব চলবে। ট্রেন চলবে তবে সেনাবাহিনী আনা-নেওয়া চলবে না। করলে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে আমি দায়ী থাকবো না।

সেক্রেটারীয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্টসহ সরকারী, আধাসরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো বন্ধ থাকবে। শুধু পূর্ব বাংলার আদান প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলো দু'ঘন্টার জন্য খোলা থাকবে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা যেতে পারবে না। বাঙালীরা বুঝেশুনে চলবেন। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বাংলাদেশের মধ্যে চালু থাকবে, তবে সাংবাদিকরা বহির্বিশ্বে সংবাদ পাঠাতে পারবেন।

এদেশের মানুষকে খতম করা হচ্ছে, বুঝে-শুনে চলবেন, দরকার হলে সমস্ত চাকা বন্ধ করে দেয়া হবে। আপনারা নির্ধারিত সময়ে বেতন নিয়ে আসবেন। বেতন যদি না দেওয়া হয়, যদি আর একটি গুলি চলে তাহলে বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো-যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিতে হবে। আমরা তাদের ভাতে মারবো-পানিতে মারবো। আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, যদি আমার সহকর্মীরা না থাকেন, আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ কিছু বলবে না। গুলি চালালে আর ভাল হবে না। সাত কোটি মানুষকে আর দাবায়ে রাখতে পারবা না। বাঙ্গালীরা মরতে যখন শিখেছে-তখন কেউ তাদের দাবাতে পারবে না।

শহীদ ও আহতদের পরিবারের জন্য আওয়ামী লীগ সাহায্য কমিটি করেছে। আমরা সাহায্যের চেষ্টা করবো। আপনারা যে যা পারেন দিয়ে যাবেন।

সাত দিনের হরতালে যেসব শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছেন, কারফিউর জন্য কাজ করতে যেতে পারেন নি-শিল্প মালিকেরা তাদের পুরো বেতন দিয়ে দিবেন।

সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। কাউকে যেন অফিসে দেখা না যায়। এদেশের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা ট্যাক্স বন্ধ থাকবে। আপনারা আমার উপর ছেড়ে দিন-আন্দোলন কিভাবে করতে হয় তা আমি জানি।

কিন্তু হুশিয়ার-একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদের মধ্যে শত্রু ঢুকেছে, ছদ্মবেশে তারা আত্মকলহের সৃষ্টি করতে চায়। বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, হিন্দু-মুসলমান সবাই আমাদের ভাই, তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।

রেডিও-টেলিভিশন ও সংবাদপত্র যদি আমাদের আন্দোলনের খবর প্রচার না করে তবে কোন বাঙ্গালী রেডিও এবং টেলিভিশনে যাবেন না।

শান্তিপূর্ণভাবে ফয়সালা করতে পারলে ভাই ভাই হিসাবে বাস করার সম্ভাবনা আছে, তা না হলে নাই। বাড়াবাড়ি করবেন না, মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

আমার অনুরোধ, প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায়, ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। মনে রাখবেন রক্ত যখন দিয়েছি, আরও দেব, তবু এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশা আল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। প্রস্তুত থাকবেন, ঠান্ডা হলে চলবে না। আন্দোলন ও বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন। আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লে তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে-শৃংখলা বজায় রাখুন। কারণ শৃংখলা ছাড়া কোন জাতি সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে না। জয় বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

দলিল পত্র , রিপোর্ট

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১-১৫ খন্ড) তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪-৮৫।
বজ্রকণ্ঠ : বাংলাদেশ সরকারের তথ্য দফতর, ১৯৭১-৭২।
শেখ মুজিবর রহমান : আমাদের বাঁচার দাবী ৬-দফা কর্মসূচী; ঢাকা ২০, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯।
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উপদেষ্টা প্যানেলের প্রতিবেদন ১ম খন্ড, পরিকল্পনা কমিশন, পাকিস্তান সরকার, জুলাই, ১৯৭১।
পশ্চিম পাকিস্তান ভূমি সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন, ১৯৫৯।
পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেমলি ডিবেটস্ ২২, জুন, ১৯৬৬।
Adam's Report an vernacular Education 1935, 1836 and 1938.
Annual Report of the Bengal Provincial Muslim League, Branch office Dacca, 1944.
Bangladesh Documents Vol. I & Vol II Ministry of External Affairs, Government of India, 1971.
Census of India, Vol. I VI-A.
East Bengal Legislative Assembly proceedings VOL I, 1948.
East Bengal Legislative Assembly Proceedings Fourth session 1949-50 Vol, IV.
East Bengal. Memorandum on Allocation of Revenue Between the Central and the provincial Governments of Pakistan for Presentation to the Export-Committee, 1951.
East Pakistan Legislative Assembly proceedings, 1952.
East Pakistan Finance Department. Economic Survey of East Pakistan, 1961-68.
East Pakistan planning Department. Comments on planning Commission paper on Guidelines for the Third Five year plan, 1964.
Ellis Commission Report-1952.
Economic Disparities Between East and west Pakistan 1963. Planning Department East Pakistan.
Education in progress, proceedings of the Symposia, East Pakistan Education week 1968.
Pakistan Constituent Assembly list of Members of the Constituent Assembly of Pakistan, 1952.
Pakistan Election Commission, Pakistan General Election, 1962.
Pakistan Ministry of Law. The Basic Democracies older, 1959.
Pakistan Ministry of Law. Tht Constitution of the Republic of Pakistan, 1962.
Pakistan Ministry of Law the Canstitution of the Islamic Republic of Pakistan (as amended up to February 28, 1965), 1965.
Pakistan Establishment Division. Gradation List of the civil service of Pakistan, July 1, 1957; 1967; January 1, 1968.
Pakistan Ministry of Home and Kashmir Affair, Home Affairs Division, population census of Pakistan, 1961.
Planning Commission (of pakistan) Reports of the Advisory, panels for the Five years plan, Vol-1, Islamabad, July 1970.
Pakistan Budget Reports, 1968-69, Ministry of Finance Government of Pakistan, Islamabad.
Pakistan Budgets Reports, 1970-71. Ministry of Finance, Government of Pakistan, Islamabad, 1970.
Proceeding of the Annual Meeting of Bengal Provincial Muslim League, 1943.
Quaid-I-Azam Mohammad Ali Jinnah's Speechs as Governor General, Pakistan Publication, Karachi.
Report of the Commission on Student problem and welfare.Govt. of pakistan Ministry of Education (Karachi), 1966.

Dhaka University Institutional Repository

Report of Dampier, the Superintendent of police to the Govt. of Bengal, dated May; 13, 1843 (Selections from the Records of the Govt. of Bengal).

Report of the East Bengal Language Committee, 1949.

Report of the Basic principls Committee published by the Government of Pakistan, 1952.

The Bengal Legislative Council proceedings, VoI-XIV. No. 1. Fourteenth Session, 1924.

The Bengal Legislative Council proceedings, VoI-LX-No. 4, 1941.

The India Round Table conference proceedings : November 12, 1930, January 19, 1931.

The Indian Annual Register, VoI. II Calcutta, 1940.

The Report of the Eleventh Indian National Congress, poona Delivered at the Fifth session of the All India Muslem League held in calcutta on 3rd and 4th March 1912 by the Honourable Nawab Sir Khajeh Salimullah Bahadur, G.C.S.I.K.C.S.I of Dacca.

The Statistical Digest of East Pakistan No. 2, 1964. East pakistan Bureau of statistics.

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আকাশ, এম, এম ঃ ভাষা আন্দোলন শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯০।

আজাদ, মওলানা আবুল কালাম ঃ ইন্ডিয়া ইউন্স ফ্রীডম, ঢাকা-১৯৮৯।

আজাদ, হুমায়ুন ঃ লাল নীল দীপাবলি বা বাংলা সাহিত্যের জীবনী, আগামী প্রকাশন, ঢাকা-১৯৯২।

আনিসুজ্জামান ঃ মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮), ঢাকা-১৯৬৪।
'একুশে ফেব্রুয়ারী ও আমাদের সংস্কৃতি চেতনা' একুশে ফেব্রুয়ারী হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত সংকলন, ঢাকা-১৯৫৩।

আলী, সৈয়দ মকসুদ ঃ রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯২।

আহমদ, আবুল মনসুর ঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ১ম খন্ড, ঢাকা-১৯৮৮।
আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ২য় খন্ড ও ৩য় খন্ড, ঢাকা-১৯৮৯।
শেরেবাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, ঢাকা-১৯৬৪।

আহমদ, কামরুদ্দীন ঃ স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৮২।
বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ ১ম খন্ড ও ২য় খন্ড ইনসাইড লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৮২।

আহমদ, ফয়েজ ঃ আগরতলা মামলা শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৪।

আহমদ, বদরুদ্দীন ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনী, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা-১৯৮৬।

আহমদ, মওদুদ ঃ বাংলাদেশঃ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯২।

ইসলাম, মযহারুল ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৪।

ইসলাম, মুস্তাফা নুরউল ঃ বাংলাদেশঃ বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা-১৯৯১।

ইসলাম, রফিকুল ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯২।
বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা, ঢাকা-১৯৮৩।

ইসলাম, রফিক-উল ঃ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা-১৯৮৩।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) ঃ বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, ঢাকা-১৯৮৪।

উমর, বদরুদ্দীন ঃ পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১ম খন্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৮৯।
পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ২য় খন্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৭৫।
পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ৩য় খন্ড, বইঘর, চট্টগ্রাম-১৯৮৫।

উল্লাহ, ওয়ালি ঃ আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লাহ মাহফুজ, ঃ অভ্যুত্থানের ঊনসত্তর, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৩
ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিলপত্র (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪।

ওঝা, কৃত্তিবাস ঃ আমি মুজিব বলছি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৭২।

কবিরাজ, নরহরি ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের বাংলা, বাণী প্রকাশ, ঢাকা।

কামাল, মেসবাহ ঃ আজাদ ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, বিবর্তন, ঢাকা-১৯৮৬।

কামাল, মোস্তফা ঃ ভাষা আন্দোলনের ডায়েরী, শতদল প্রকাশনী লিঃ, ঢাকা-১৯৮৯।

করিম, আবদুল ঃ ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৮। বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস (অনুবাদঃ মোকাদ্দেসুর রহমান), ঢাকা-১৯৯৩।

করিম, এ, কে, নজমুল ঃ মুসিলম অভিজাত ও মধ্যবিত্ত এ, কে, নজমুল করিম স্মারকগ্রন্থ, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১৯৮৪।

খান, আতাউর রহমান ঃ স্বৈরাচারের দশ বছর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৭০।

খান, কে, এম, রাইছউদ্দিন ঃ বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ঢাকা-১৯৯৩।

খান, আসগর ঃ জেনারেল ইন পলিটিকস ১৯৫৮-৮২, ঢাকা-১৯৮৩।

খান, মোঃ হাবিবুর রহমান ঃ বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব, সিটি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯১।

গুপ্ত, অমিতাভ ঃ বাংলাদেশ, আনন্দধারা প্রকাশন, কলকাতা-১৩৭৮।

ঘোষ, বিনয় ঃ বাংলার বিদ্বৎ সমাজ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-১৯৭৮।
বাংলার নবজাগৃতি, ওরিয়েন্টলংম্যান, কলকাতা-১৩৯১।

চক্রবর্তী, জ্ঞান ঃ ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট পার্টির অতীত যুগ, জনসাহিত্য প্রকাশন, ঢাকা-১৯৭২।

চট্টোপাধ্যায়, প্রণব কুমার ঃ আধুনিক ভারত, ১ম ও ২য় খন্ড, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৯৯২।

চট্টোপাধ্যায়, সরল ঃ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা-১৯৯০।

চৌধুরী, কবীর ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালী জাতীয়তাবাদ মুক্তিবুদ্ধির চর্চা, ব্যাডিক্যাল, এশিয়া পাবলিকেশন্স, লন্ডন-১৯৯২।

তর্কবাগীশ, আবদুর রশিদ ঃ একুশের স্মৃতিচারণ একুশের স্মারকগ্রন্থ '৮৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৮।

দত্ত, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ ঃ ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি ৩য় খন্ড, বর্মন।

দত্ত, রমেশচন্দ্র ঃ ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস (১৭৫৭-১৮৩৭), সারমন লাইব্রেরী, কলকাতা-১৩৮৯।

দে, অমলেন্দু ঃ পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৯৮৯। বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলকাতা-১৯৭৪।

দেশাই, এ, আর ঃ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, কে, পি, বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা-১৯৮৭।

নাথ, বিপুল রঞ্জন ঃ বাংলাদেশের সাংবিধানিক রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ (১৯৬১....), বুক সোসাইটি, ঢাকা-১৯৮৭।

নেহরু, জওহরলাল ঃ ভারত সন্ধানে, সিনেট প্রেস কলকাতা-১৩৫৬।

পেইন, রবার্ট ঃ ম্যাসাকার বাংলাদেশ-গণহত্যার ইতিহাসে ভয়ংকর অধ্যায়, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

বর্মন, রেবতী ঃ সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ, প্রকাশক আনোয়ার উদ্দিন, ঢাকা।

বসু, পূরবী, হারুন হাবীব, ঃ বাঙালী, বেদন ফাউন্ডেশন, ঢাকা-১৯৯২।

মুকুল, এম, আর আখতার ঃ কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা-১৯৮৭।
পাকিস্তানের চব্বিশ বছর ভাসানী মুজিবের রাজনীতি, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা-১৯৮৯।

মর্গান, লুইস হেনরি ঃ আদিম সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৫।

মতিন, আবদুল ও রফিক আহমদ ঃ ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯২।

মতিন, আবদুল ঃ স্মৃতিচারণ একুশের স্মারকগ্রন্থ সাতাশি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৭।

মামুন, মুনতাসীর ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ, ইতিহাস চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১৯৭৫।

মাযহার, আহমদ ঃ শেখ মুজিব সংগ্রামী জননায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৯৩।

মিয়া, এম, এ, ওয়াজেদ ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা, ঢাকা-১৯৯১।

ম্যাসকারেনাস, এ্যান্থনি ঃ বাংলাদেশ লাঞ্ছিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৩।

রায়, অজয় ঃ আমাদের জাতীয়তার বিকাশধারা, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৮১।
বাংলাদেশের অর্থনীতি অতীত ও বর্তমান, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৭৯।

রায়, সুপ্রকাশ ঃ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ডি এন বি এ ব্রাদার্স, কলকাতা-১৯৮০।

রহমান, আতিউর লেনিন আজাদ, ঃ ভাষা আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯০।

রহমান, আতিউর সৈয়দ হাশেমী ঃ ভাষা আন্দোলন অশংগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯০।

রহিম, মুহম্মদ আবদুর
আবদুল মমিন চৌধুরী
এ, বি, মহিউদ্দিন মাহমুদ ও সিরাজুল ইসলাম ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৭৭।

রহিম, এম, এ ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭, প্রকাশক নূরজাহান রহিম, ঢাকা-১৯৭৬। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম ও ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮২।
ভাষা আন্দোলন অর্থনৈতিক পটভূমি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯০।

রমেশ চন্দ্র ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস ১ম খন্ড ও ৩য় খন্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১৯৮৯।

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ ঃ পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা একুশের সংকলন ১৯৭১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭১।

সাঈদ, আবু আল ঃ আওয়ামী লীগের ইতিহাস, (১৯৪৯-১৯৭১), সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৩।

সেন, রংগলাল ঃ বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, ভাষা শহীদ গ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৬।

সেন, রংগলাল ঃ বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো ঐতিহাসিক পটভূমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা চতুর্থ সংখ্যা, ঢাকা-১৯৮১।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার, বিহারীলাল ঃ তিতুমীর, কলিকাযন্ত্র, কলিকাতা-১৩০৪।

সরকার, মোনায়েম ঃ ইতিহাসের শিক্ষার আলোকে বাঙালী জাতীয়তার বিকাশ ও বঙ্গবন্ধু, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯২।

সিং, মেজর জেনারেল লসমন ঃ ভিক্টোরী ইন বাংলাদেশ।

হক, আবুল কাশেম ফজলুল ঃ ভাষা আন্দোলন ও উত্তরকাল একুশের সংকলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৬।

হক, আবদুল ঃ ভাষা আন্দোলন আদিপর্ব, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৭৪।

হক, খোন্দকার সিরাজুল ঃ মুসলিম সাহিত্য সমাজঃ সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪।

হক, গাজীউল ঃ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, পুথিঘর প্রকাশনী, ঢাকা-১৩৭৮।

হক, মোঃ আজিজুল ঃ বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৪।

হান্টার, উইলিয়াম ঃ দি ইন্ডিয়ান মুসলমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৪।

হান্নান, মোহাম্মদ ঃ বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ২য় খন্ড, ওয়াসী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮৭।

হান্নান, মোহাম্মদ ঃ বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ৩য় খন্ড, গ্রন্থলোক, ঢাকা-১৯৯১।

হালদার, গোপাল ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৭৪।

হোসেন, তফাজ্জল (মানিক মিয়া) ঃ পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, বাংলাদেশ বুকস্, ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ঢাকা-১৯৮৪।

হোসেন, সেলিনা ঃ ঊনসত্তরের গণআন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৫।

হাশিম, আবুল ঃ আমার জীবন ও বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৮৭।

হায়দর, রশীদ ঃ অসহযোগ আন্দোলন; একাত্তর, ঢাকা-১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

BOOKS IN ENGLISH

Abdullah, Abu	:	'The class Bases of Nationalism Pakistan and Bangladesh' (Paper presented at the Bengal Studies Conference in Torento in April 1972 and Published in the Conference volume 1973).
Ahmed, A.F. Salauddin	:	Bangladesh Tradition and Transformation U.P.L Dhaka-1987.
Ahmed, Aziz	:	Islamic Modernism in India and Pakistan 1857-1964. London-1967.
Ahmed, Moudud	:	Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy. University press Limited, Dhaka-1991.
		Bangladesh : Era of Sheikh Mujibur Rahman U.B.L Dhaka-11983.
Ahmed, Nafis	:	An Economic Geography of East Pakistan. Oxford University Press: London-1968.
Ahsan, Syed Qamarul	:	Politics And Personalities in Pakistan. Mohiuddin & sons: Dhaka-1969.
Ali, K	:	Bangladesh A New Nation Ali Publications: Dhaka-1982.
Ali, Tariq	:	Can Pakistan Survive? Penguin Books: London-1983.
		Pakistan Military Rule or eople's Power, London-1970.
Basu, Aparna	:	The Growth of Education and political Development of India, (1898-1920) Delhi-1974.
Benerjee, D, N	:	East Pakistan: A case study in Muslim Politics: Vikas Publishing House Ltd. Delhi-1969.
Bernier, Francois	:	Travels in the Mughal Empire oxford University Press: London-1914.
Bhattacharjee, G, P	:	Renaissance and Freedom Movements in Bangladesh. Minrava Associates : Calcutta-1973.
Bhuiyan, Md. Abdul Wadud	:	Emergence of Bangladesh and Role of Awami League. University Press Limited: Dhaka-1982.
Blaut, M, James	:	The National Question Decolonising The Theory of Nationalism Zed Books: London and New Jersey-1987.
Chandra, Bipan: Mridula Mukherjee Aditya Mukherjee K. N. Panikkar Sucheta Mahajan	:	India's struggle for Independence. VIKING: Calcutta-1944.
Chatterjee, Partha	:	National Thought and Colonial world A Derivative Discourse: Zed Books: London-1986.
Chopra, P. N	:	Indian Muslims in Freedom struggle Criterion publications: New Delhi-1988.
Chowdhury, Benoy	:	Agrarian Economy and Agrarian Relations in Bengal, 1859-1885. Oxford University Press: Bombay-1967.
		Agricultural Production in Bengal 1850-1900, Co-existance of Decline and Growth; Bengal-past and present Culcutta: June-December-1969.
Collins, Larry & Dominique Lapierre	:	Mountbatten and Independent India, 16 August-1947-18 June-1948. TARANG PAPER BACKS: New Delhi-1989.
		Freedom AtMidnight, Avon-1975.

Dhaka University Institutional Repository

Desai, TB : Economic History of India 1757-1947. Vora & Co: Bombay-1972.

Devis, Horace : Toward a Marxist Theory of Nationalism MOnthly Review Press: New York and London-1978.

Dutt, R.P : India Today: Victor Gollaez: London-1940.

Ghosh, Shyamali : The Awami League, 1949-1971. Academic publishers: Dhaka-1990.

Habib, Irfan : The Agrarian System of Mughal Inala (1700-1757) New York-1963.

Haque, Wahidul : Bangladesh: Problematics of Transition, a paper presented at the special Conference on the Draft two year plan (1978-80) huld under the auspices of Bangladesh Economic Association, 16-18 June-1978.

Hunter, W. W : Annals of Rural Bengal. Smith, Elder and Co. London-1868.

Jahan, Rounaq : Pakistan Failure in National intergration. University Press Limited. Dhaka-1977.

Jr., J.M.S. Bajgon : The Reforms and Religious Ideas of Sir Sayyid Ahmad Khan. SH. Muhammad Ashraf: Lahore, 1964.

Kabir, Mafizullah : Experiences of An Exile At Home, Asiatic Press, Dhaka-1972.

Khan, Dr. Muin-ud-Did Ahmad : History of the Faraidi Movement. Islamic Foundation Bangladesh Dhaka-1884.

Mallick, Azizur Rahman : British Pokicy and the muslims in Bengal, 1757-1856. Bangla Academy, Dhaka-1977.

Marx, Karl : The East India Company: Article New Youk Tribune-1853.

Mascarenhes, Anthony : Bangladesh: A degacy of Blood, London-1986.

Misra, B.B : The Indian Middle Classes (There Growth in Modern time). Oxford University Press: Delhi-1946.

Maniruzzaman, Talukdar : The Politics of Development : The case of Pakistan, Dbaka-1971.

Nehru, Jawaharlal : An Autobiography London-1936.

Osmany, Shireen Hasan : Bangladeshi Nationalism History of Dialectics and Dimensions. University Press Limited, Dhaka-1992.

Philips, C.H : The East Indian Company (1784-1834). Manchester, 1940. India, London-1986.

Quddus, Muhammd a, : Pakistan a case Study of a plural society Minerva Associates (Publications). PVT. Ltd. Calcutta-1981.

Rashid, Harun-or, : The 1940 Lahore Resolution: Bengal Ideas of State hood (Aritcle) Journal of the Asiatic society of Bangladesh Volume 39, Dhaka-1994.

Roberts, P.E : History of Brithsh India. Oxfird University Press. Oxford-1986.

Salik, Siddque : Witness to surrender Oxford University Press. Karachi-1977.

Sen, Rangalal : Political Elites in Bangladesh University Press Limited. Dhaka-1986.

Shelvankar, K.S : Problems of India. Penguin Book Ltd. London-1940.

Shelly, Miznur Rahman : Emergence of a New Nation in a Maltipolar world: Bangladesh, UPL, Dhaka-1979.

Dhaka University Institutional Repository

Sinha, N.K	:	The Economic History of Bengal Vol. I & Vol. II Calcutta-1961 & 1962.
Sitaramyya's Pattabhi	:	History of Indian National Congress (1885-1947). S. Chand & Company (PVT). Ltd. New Delhi-1988.
Srinivasamurthy, A.P	:	History of India's Freedom Movement (1857-1947). S. Chand & Company (PVT). Ltd. New Delhi-1987.
Tarachand	:	History of Freedom Movement in India. Publication Division Ministry of information and Broadcasting, Govt. Of India New Delhi-1967.
Thomas, F.W	:	The Mutual Influence of Muhammedans and Hindus. London-1892.
Thompson, Edward and G.T. Garratt	:	Rise and fulfilment of British Rule in India. Central Book Depol. Allahabad-1962.
Traipath, A	:	Trade and Finance in the Bengal Presidency Bomby and Calcutta-1956.
Wedderburn William	:	Allen Octovian Hume, C.B. London-1913.
Wood, Charles	:	Educational Despatch to India Dated 19 july 1854.

Dhaka University Institutional Repository

পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী

আজকের কাগজ ২৮ অক্টোবর, ১৯৯২ সাল
আজকের কাগজ ৩০ অক্টোবর, ১৯৯২ সাল
আজকের কাগজ ২ নভেম্বর ১৯৯৩ সাল।
একুশের স্মারকগ্রন্থ '৮৭ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
একুশের স্মারকগ্রন্থ '৮৮ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
একুশের স্মারকগ্রন্থ '৮৯ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
কৃষ্টি ১ম বর্ষ, ১৩৫৪ সাল (সংকলিত, একুশের সংকলন-১৯৭১) বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
দৈনিক আজাদ ১ জানুয়ারী, ১৯৪৯ সাল
দৈনিক আজাদ ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ সাল
দৈনিক আজাদ ২ অক্টোবর, ১৯৫০ সাল
দৈনিক আজাদ ৪ অক্টোবর, ১৯৫০ সাল
দৈনিক আজাদ ১ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ সাল
দৈনিক সংবাদ ২১ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ১৯৯০ সাল
দূরবীণ ১৪ জুলাই ১৮৬৯ সাল।
নওবেলাল ১৭ মার্চ, ১৯৪৯ সাল
নওবেলাল ৭ এপ্রিল ১৯৪৯ সাল
বাংলাদেশ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা। স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি, ঢাকা-১৯৮৯।
বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ষষ্ঠ খন্ড বিশেষ সংখ্যা, ১৩৯৫,
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।
শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতা, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২,
ইতিহাস বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
সাপ্তাহিক ফরিয়াদ ২৫ জুন, ১৯৪৯ সাল
সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২১ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ১৯৮৪ সাল
সৈনিক ১ জানুয়ারী, ১৯৪৯ সাল
সৈনিক ৮ এপ্রিল, ১৯৪৯ সাল
সৈনিক ২২ এপ্রিল ১৯৪৯ সাল
Dawn (Karachi) January 9, 1956.
Dawn (Karachi) January 18, 1956.
Journal of the Asiatic society of Bangladesh volume 39 Mumber 1, June 1994.
Pakistan observer January 30, 1952.